নাটক সমগ্র

প্রথম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

সলিউশন এক্স (একাঙ্ক) ... ১
বড়োপিসীমা ... ৩৫
শনিবার (একাঙ্ক) ... ১১১
রাম শ্যাম যদু ... ১৩৩
সমাবৃত্ত ... ১৯৯
এবং ইন্দ্রজিৎ ... ২৬১
সারারাত্তির ... ৩১৩
বল্লভপুরের রূপকথা ... ৩৫৭
কবি কাহিনী ... ৪৪৯

প্রথম দৃশ্য

(বৈজ্ঞানিক ডক্টর শম্ভুনাথ সেনগুপ্তর বাড়ি। ঘরটি তাঁহার নিজস্ব গবেষণাগার। মঞ্চের পিছন দিকে একটি বড়ো টেবিলে গবেষণাসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, রসায়ন পদার্থ ইত্যাদি রহিয়াছে। নিকটে খান দুই টুল। সম্মুখের দিকে একপাশে একটি লিখিবার টেবিল ও চেয়ার, অন্যপাশে একটি বড়ো গদি-সমন্বিত চেয়ার। পিছনে বড়ো টেবিলটির নিকটে একটি টুলের উপর একটি মাঝারি আকারের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, উপরে ঢাকনা ও সামনে ছোট একটি কল— যেমন সচরাচর থাকে। কলের নিচে একটি বালতি অথবা অনুরূপ পাত্র। লিখিবার টেবিলে টেলিফোন। ঘরের একদিকে বাহিরে যাইবার পথ, অন্যদিকে অন্দরের।

টেলিফোন বাজিতেছে। পর্দা উন্মোচিত হইল। ঘরে কেহ নাই। শম্ভুনাথ হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া ফোন ধরিলেন। পরিধানে পরিপাটি ধুতি, চোখে চশমা, গেঞ্জিটি অর্ধ-পরিহিত। যেন কোথাও বাহির হইবেন, কিন্তু মন পড়িয়াছিল ফোনের দিকে।)

শম্ভুনাথ : (এক নিশ্বাসে) হ্যালো হ্যালো— খাইয়েছিলেন? কী হোলো খরগোশটার?... অ্যাঁ? বুঝতে পারছেন না? কী আশ্চর্য, খরগোশটাকে দেন নি সলিউশনটা? ব'লে এলাম যে রিয়্যাকশনটা আজই না জানতে পারলে শান্তি পাবো না! এমন জানলে আমিই র'য়ে যেতাম, না হয় নাই যেতাম নেমন্তন্নয়— আঃ, দাঁড়ান, আমার কথাটা শুনে নিন আগে ভালো ক'রে। ফিল্‌ট্রেশন হয়েছে তো? আচ্ছা, টোয়েন্টি ফাইভ্‌ সি. সি. দেবেন খরগোশটাকে— অ্যাঁ? কী বলছেন?... কিছু বুঝতে পারছেন না?... মুস্তোফি? না, আমি সেনগুপ্ত, শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত... কতো?... ফোর-ও-সিক্স-থ্রি? আজ্ঞে না— ভেরি সরি, রং নাম্বার। (ফোন রাখিলেন) যতো সব!

(খানিকটা বিভ্রান্ত ও অনেকটা হতাশভাবে গেঞ্জি পরিধানের আরব্ধ কার্যটি সমাধা করিলেন।)

কিন্তু চ্যাটার্জি এতো দেরি করছে কেন?

(টুটুলের প্রবেশ। তাহার বয়স আট।)

টুটুল : বাবা, মা জিজ্ঞেস করছে তোমার কতো দেরি?

শম্ভুনাথ : অ্যাঁ? হ্যাঁ হয়ে গেছে। বল গে গেঞ্জিটা প'রেই যাচ্ছি।

টুটুল : গেঞ্জি তো তোমার গায়েই আছে বাবা?

শম্ভুনাথ : না না, চ্যাটার্জি—

টুটুল : সোমেন কাকা? সোমেন কাকার গেঞ্জিটা পরবে?

শম্ভুনাথ : কী মুস্কিল! আচ্ছা, তুই এখানে একটু বোস। ফোন বাজলেই আমাকে ডেকে দিবি। আমি জামাটা প'রে নিই। খবরদার কোনো জিনিসে হাত দিস নি যেন!

(শম্ভুনাথের প্রস্থান। টুটুল ধীরে ধীরে পিছনের টেবিলের দিকে গেল। এদিক ওদিক চাহিয়া একটি কাঁচের 'বীকার'-এ সন্তর্পণে আঙুল ছোঁয়াইয়াছে— ফোন বাজিয়া

উঠিল। টুটুল চমকাইয়া হাত টানিয়া লইল। তারপর আসিয়া গম্ভীরমুখে ফোন ধরিল।)

টুটুল : হ্যালো... কে? ডক্টর চ্যাটার্জি? সোমেন কাকা? আমি টুটুল।...বাবা? বাবা জামা পরতে গেছেন। আপনার গেঞ্জিটা চাইছিলেন—

(শম্ভুনাথ ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া রিসিভার কাড়িয়া লইলেন। অঙ্গে পাঞ্জাবিটি চড়িয়াছে, যদিও বোতাম নাই। টুটুল চলিয়া গেলো ফোনে কথাবার্তার ফাঁকে।)

শম্ভুনাথ : (এক নিশ্বাসে) কে চ্যাটার্জি? খরগোশটাকে (সহসা থামিয়া) ইয়ে— সোমেন চ্যাটার্জি তো?... মানে, ডক্টর সোমেন চ্যাটার্জি তো?... যাক, ঠিক আছে তা হলে— বাঁচা গেলো— কী হোলো বলুন তো?... হ্যাঁ...হ্যাঁ... আর কিছু না?... আচ্ছা, ছটফট কতোক্ষণ করেছে?... ছটফট নয়? লাফালাফি?... দু' মিনিট তেরো সেকেন্ড? কী রকম ধরনের?... দু'পায়ে দাঁড়িয়েছিলো? ক'বার?... তিনবার? কোন দু'পায়ে?... দু'বার পেছনের পায়ে, একবার সামনের?... আর কিছু?... আর কিছু হোলো না?... একেবারে নর্ম্যাল?... সে কী!... আচ্ছা শুনুন, আপনি ফিল্টার্ড সলিউশনটা একটু আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারবেন? না না, পাঠিয়ে নয়, আপনি নিজে যদি নিয়ে আসতে পারেন— আর কাউকে বিশ্বাস নেই।... আসছেন? থ্যাঙ্কস্।

(ফোন রাখিয়া প্রথমে বিভ্রান্ত ও পরে উত্তেজিত অবস্থায় পদচারণ করিতে লাগিলেন।)

অসম্ভব।... অসম্ভব। (সহসা থামিয়া) তিনবার দু'পায়ে দাঁড়িয়েছে। (নোটবুকে টুকিলেন) দু'বার পেছনের পায়ে— একবার সামনের পায়ে—

(অণিমার প্রবেশ। বাহিরে যাইবার সাজপোশাক।)

অণিমা : কী গো, আবার কী হোলো? সাড়ে সাতটা বাজে যে?

শম্ভুনাথ : ক'টা? সাড়ে সাত? পাঁচ মিনিট বেরুতে, পনেরো মিনিট পথে— সাতটা পঞ্চাশের মধ্যেই এসে যাবে। কী বলো?

অণিমা : কে এসে যাবে?

শম্ভুনাথ : কেন, চ্যাটার্জি? (অণিমার সাজ লক্ষ্য করিয়া) কোথাও যাচ্ছো না কি?

অণিমা : (রাগ করিয়া) হ্যাঁ, যাচ্ছিলাম একটু দাদার বাড়ি! তার মেয়ের জন্মদিন কি না? দাদাকে চেনো তো?

শম্ভুনাথ : চিনবো না কেন? কী আশ্চর্য!

অণিমা : কী জানি মনে আছে কি না? আমার সেই দাদার একটি মেয়ে আছে। তার আজকে ন'বছর বয়স হোলো।

শম্ভুনাথ : বীথি তো! ন'বছর হয়ে গেলো আজ? বলো কী? আচ্ছা, ঘুরে এসো তা হলে। সাবধানে যেও। (নোটবুক খুলিলেন)

অণিমা : আর একটা কথা ছিল।

শম্ভুনাথ : আমার খাবার তো? সে হরি দেবে'খন।

অণিমা : তা হ'লে হরিকে উপোস করতে হয়। তোমারও নেমন্তন্ন ছিল কি না, তাই হরি ছাড়া আর কারো রান্না হয় নি।

শম্ভুনাথ : তাই না কি? তা হ'লে তো— আচ্ছা ঠিক আছে। আমি না হয় হরিকে দিয়ে হোটেল থেকে গোটা কতক স্যান্ডউইচ আনিয়ে—

অণিমা : দোকান থেকে স্যান্ডউইচ্ না আনিয়ে আর এক কাজ করলে হয় না?

শম্ভুনাথ : না না, তোমাকে এখন আবার রান্না চড়াতে হবে না, তুমি ঘুরে এসো। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।

অণিমা : তা জানি। কিছু না খেলেও তোমার অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমি বলছিলাম, তোমাকে না নিয়ে ও বাড়ি গেলে আমার বিশেষ অসুবিধে হবে। বিশেষ ক'রে যখন পরশু বৌদিকে তুমি নিজের মুখে কথা দিয়েছো!

শম্ভুনাথ : কিন্তু চ্যাটার্জিকে আসতে বললাম যে? তুমি একটু আগে যদি বলতে—

অণিমা : আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে ধুতি পাঞ্জাবি প'রে বোতাম লাগাবার ঠিক আগে তুমি সব ভুলে গিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জিকে ডিনারের নেমন্তন্ন ক'রে বসবে!

শম্ভুনাথ : কী আশ্চর্য! নেমন্তন্ন করবো কেন? দু'পায়ে দাঁড়ালো কি না?

অণিমা : দু'পায়ে দাঁড়ালো?

শম্ভুনাথ : হ্যাঁ। তিনবার। একবার আবার সামনের দু'পায়ে!

অণিমা : সামনের দু'পায়ে? ডক্টর চ্যাটার্জি?

শম্ভুনাথ : কী মুস্কিল। চ্যাটার্জি হতে যাবেন কেন? চ্যাটার্জির সামনে তো হাত! সামনে মানে— উপরের দিকে।

অণিমা : আমিও তো তাই জানতাম। তবে তোমাদের এক্সপেরিমেন্টে কখন কী হয়ে যাচ্ছে সব সময়ে জানতে পারি না তো!

শম্ভুনাথ : আমাদের এক্সপেরিমেন্ট তো মানুষকে চতুষ্পদ বানাবার জন্য হচ্ছে না? আমরা রিসার্চ করছি বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রাখবার ওষুধ বার করতে। বললাম না, প্রায় বার করে ফেলেছি। কিন্তু দু' মিনিট তেরো সেকেন্ড পরেই আবার নর্ম্যাল হয়ে যাচ্ছে—

(ডঃ সোমেন চ্যাটার্জির প্রবেশ। হাতে একটি বড়ো শিশি।)

এই যে চ্যাটার্জি, এসেছেন? থ্যাঙ্কস্ এ লট। আমি ভেবেছিলাম আরো দেরি হবে।

সোমেন : ট্যাক্সি নিয়ে নিলাম। আপনি আবার নেমন্তন্নয় যাবেন বলেছিলেন কি না? নমস্কার বৌদি।

অণিমা : আপনার তো নেমন্তন্নর কথা মনে আছে দেখছি?

সোমেন : বাঃ, উনি আজ বিকেলেই বলছিলেন যে? সেইজন্যই তো আমায় টেস্টটা করতে বলে চলে এলেন। এর মধ্যে ভুলবো কী?

অণিমা : তা হ'লে আপনাকে আরো বহুদিন রিসার্চ করতে হবে। উনি বিগত পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ভুলে ব'সে আছেন, আর আপনি তিন ঘণ্টা সমানে মনে রেখেছেন!

শম্ভুনাথ : না না, ভুলবো কেন? বীথির জন্মদিন, তাই রান্না হয় নি, হরিকে দিয়ে স্যান্ডউইচ আনাতে হবে। সব মনে আছে। আমি না হয় এখুনি ব'লে দিচ্ছি। হরি! হরি!— বুঝলেন চ্যাটার্জি, বেসিক ফরমুলায় কোনও ভুল আছে ব'লে আমার মনে হয় না। তা হ'লে ঐ রিয়্যাকশনটুকুও হোতো না। কী বলেন?

সোমেন : ওটুকু তো সলিউশনটার স্বাদ বা ঝাঁঝের জন্যেও হ'তে পারে।

শম্ভুনাথ : তা পারে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না।

(হরির প্রবেশ)

কী রে, কে এসেছে? এখন দেখা হবে না ব'লে দে। কাল সকালে আসতে বলিস আটটার মধ্যে।

হরি : আজ্ঞে কেউ আসেন নি তো? আপনি ডাকলেন মনে হোলো—

শম্ভুনাথ : আমি? তোকে? কই না?

অণিমা : তোকে আমি ডেকেছি। তুই রামচরণকে ব'লে দে গাড়িটা বার ক'রতে—টুটুলকে ওর মামার বাড়ি দিয়ে আসতে হবে। আর শোন—একটু চায়ের জল বসিয়ে দে। আর দু'জনের মতো চাল নিয়ে ধুয়ে ফেল। আমি যাচ্ছি।

(হরির প্রস্থান)

শম্ভুনাথ : সে কী? তোমার যে নেমন্তন্ন ছিল?

অণিমা : (রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন) ছিল না কি? কোথায় ছিল মনে পড়ছে না।

শম্ভুনাথ : বীথির জন্মদিন না? সেদিন যে এতো ক'রে ব'লে গেলো তোমার বৌদি? তোমার বড়ো ভুলো মন।

অণিমা : বৈজ্ঞানিকের আঁচ লেগেছে। সোমেন বাবু, চলে যাবেন না, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সোমেন : (শম্ভুনাথকে) সে কী? আপনি যাবেন না?

শম্ভুনাথ : যাবো বৈকি? শুধু একবার দেখে নিই গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট বি-ফোরের প্রোপোর্শনটা আর একটু বাড়ালে হয় কি না—

অণিমা : সোমেন বাবু। ওঁকে আর ঘাঁটাবেন না। শেষকালে পকেটে ক'রে গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট নিয়ে গিয়ে দাদার মেয়েটাকে খাইয়ে দেবেন। তার চেয়ে ওঁর এখানে থাকাই ভালো।

(শম্ভুনাথ আপত্তি করিবার পূর্বেই অণিমার প্রস্থান)

শম্ভুনাথ : সমস্ত ব্যাপারটা আমার মিস্টিরিয়াস্ লাগছে। গত তিনটে টেস্ট মোটামুটি সাকসেসফুল হোলো, আর ফাইন্যাল টেস্টে— আচ্ছা ফিল্ট্রেশনে কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো?

সোমেন : ওটুকু অন্তত আমার উপর নির্ভর করতে পারেন স্যার।

শম্ভুনাথ : না না, সে কথা বলছি না। আমার কিন্তু মনে হয় গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট বি-ফোর ফাইভ পার্সেন্ট বাড়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন কোনও ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগতেই পারে না। আচ্ছা, ইনস্টিটিউটে কে আছে এখন?

সোমেন : রমেশের ডিউটি আছে রাত দশটা অবধি। কেন স্যার, যাবেন?

শম্ভুনাথ : যাবার দরকার নেই। আর সবই এখানে আছে, শুধু বি-ফোরটা নিয়ে এলেই হবে। (ফোনে) ক্যালকাটা থ্রি নাইন এইট ফোর— ইয়েস্ প্লীজ্।

সোমেন : এখুনি করবেন স্যার?

শম্ভুনাথ : এটা শেষ না ক'রে শান্তি পাচ্ছি না ভাই। হ্যালো— কে, রমেশ?... আমি শম্ভুনাথ বলছি, শোনো, গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট বি-ফোর তিন নম্বর লকারে আছে, ফিফ্‌টি সি.সি. তার থেকে নিয়ে এখুনি দিয়ে যাও দেখি আমার বাড়িতে...

সাবধানে আনবে।... হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চাই কিন্তু। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিও, এখানে ভাড়া দিয়ে দেবো... বুঝেছো তো? বি-ফোর। (ফোন রাখিলেন)

সোমেন : আপনার ফোনটা একবার ইউজ করতে পারি? বাড়িতে ব'লে দেবো ফিরতে দেরি হবে।

শম্ভুনাথ : আপনি থাকবেন? আমি একাই তো পারতাম—

সোমেন : এই এক্সপেরিমেন্টটার প্রত্যেক স্টেজে আপনার সঙ্গে আছি স্যার, লাস্ট স্টেজে আমাকে তাড়াবেন?

(শম্ভুনাথ অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সোমেনের হাত চাপিয়া ধরিলেন।)

শম্ভুনাথ : থ্যাঙ্কস্। থ্যাঙ্কস্ এ লট্। কিন্তু যদি বেশি রাত হয়?

সোমেন : ব'লে দিচ্ছি আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি।

(সোমেন ফোন করিতে লাগিলেন, অণিমা ও হরির প্রবেশ। হরির হাতে চায়ের ট্রে।)

সোমেন : সাউথ ফোর সিক্স ডাব্‌ল্ টু... কে, বেলা? আমি সোমেন, ডক্টর সেনগুপ্তর বাড়ি থেকে ফোন করছি। শোনো, আজ একটা জরুরি কাজ আছে, বেশি রাত হয়ে গেলে আজ আর ফিরবো না।... হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সকালে আটটার মধ্যেই পৌঁছোবো... আচ্ছা... আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি।

অণিমা : সোমেনবাবু থাকছেন না কি?

সোমেন : হ্যাঁ— এইটার শেষ না দেখে যেতে পারছি না। আপনার কিছু অসুবিধে করবো না, ল্যাবোরেটরিতেই রাত কেটে যাবে একরকম করে—

অণিমা : তা তো ঠিকই। ড্রইং রুমের সোফা পর্যন্ত যদি পৌঁছোবার সময় না হয়, তবে এই টেবিলটা তো আছেই। আর খাবেন কী? গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট? (শম্ভুনাথকে) আচ্ছা, এ কথাটা যে আমাকে বলতে হবে, তা তোমার মাথায় আসে নি, না?

শম্ভুনাথ : কী আশ্চর্য! আমি তো হরিকে ডাকতে যাচ্ছিলাম কিছু স্যান্ডউইচ—

অণিমা : থাক হয়েছে। যখন শুনে ফেলেছি তখন তোমার আর মাথা না ঘামালেও চলবে। হরি, তুই আর একটু চাল ধুয়ে দিস। এগুলো পরে নিবি।

(হরির প্রস্থান)

বার্ধক্য নিবারণ পাঁচ মিনিট পরে করলে যদি চলে, তা হলে কাপড়টা ছেড়ে এসো। তাতে তোমারও কাজের সুবিধে হবে, পাঞ্জাবিটাও বাঁচবে।

শম্ভুনাথ : আরে তাই তো, এগুলো পরেছি কী করতে?

অণিমা : ভুলে প'রে ফেলেছো বোধ হয়। যাও আমি সব বার করে রেখে এসেছি খাটের উপরে। ততক্ষণ আমি বসছি এখানে।

(শম্ভুনাথের প্রস্থান)

সোমেন : (সিগারেট ধরাইয়া) আচ্ছা বৌদি, দুর্ভোগটা আপনাদের উপর দিয়েই যায়, না?

অণিমা : (হাসিয়া) কিসের দুর্ভোগ?

সোমেন : এই যে নেমন্তন্নয় যাওয়া হোলো না। এদিকে আবার ভাত রাঁধা। আমি তো বেলাকে ব'লে রেখেছিলাম সকাল সকাল ফিরতে পারলে আজ সিনেমায় যাবো। আর এখন দিব্যি ব'লে দিলাম—রাত্রে না ফিরতেও পারি।

অণিমা : আপনি তবু বলেছেন। উনি হলে তাও বলতেন না। যাই হোক, বেলা কী বললো?

সোমেন : বলবে আর কী? বেশি রাত জাগতে বারণ করলো, আর কাল সকালে যেন এখান থেকেই সিধে ইনস্টিটিউটে না চলে যাই, তাই বললো। সিনেমার কথা উচ্চারণই করলো না। আমার মধ্যে মধ্যে বড়ো আশ্চর্য লাগে।

অণিমা : কী?

সোমেন : ও চ'টে যায় না কেন? মানে, চটে অবশ্য মাঝে মাঝে, তবে খুব সিরিয়াসলি তো কোনো দিনই চটে না?

অণিমা : চ'টে কী করবে?

সোমেন : কিছু করবার হয় তো নেই। কিন্তু একটা ভদ্ররকম স্বামী যে-কপালে জুটলো না, সেই কপালটাকে অন্তত চিৎকার করে গাল পাড়তে পারতো। তাও তো করে না?

অণিমা : একটু ভেবে দেখলে হয় তো বুঝতে পারতেন, এখন স্বামীটি যদি বদলে যাকে বললেন ভদ্ররকম— তাই হয়ে যায়, তবে সবচেয়ে ভুগবে বেলাই।

সোমেন : সে কী, কেন?

(টুটুলের প্রবেশ)

টুটুল : মা, বাবা যেন কী সব খুঁজে পাচ্ছেনা, তোমাকে ডাকছে।

অণিমা : সব তো বার করে রেখে এলাম, আবার কী হোলো? আপনি একটু বসুন সোমেন বাবু, আমি দেখে আসি।

(অণিমার প্রস্থান)

সোমেন : হ্যালো টুটুলবাবু, কী খবর তোমার?

টুটুল : আচ্ছা সোমেন কাকা, আবিষ্কার মানে কী?

সোমেন : আবিষ্কার মানে কোনো নতুন জিনিস খুঁজে বার করা—যা মানুষের খুব কাজে লাগবে।

টুটুল : আচ্ছা, মা যে বলে বাবা আবিষ্কার করবে?

সোমেন : করবেনই তো।

টুটুল : কিন্তু বাবা তো খালি ঐ বোতলের ওষুধগুলো ঢালাঢালি করে, আর গরম করে, আর খাতায় কী সব লেখে। ওখানে তো নতুন কিছু নেই? বাবা তো খোঁজেও না কিছু? শুধু গলার বোতাম খোঁজে— তাও তো মা আবিষ্কার ক'রে দেয়!

সোমেন : আবিষ্কার মানে ঠিক ওরকম খুঁজে বার করে দেওয়া নয়। পাঁচটা জিনিস মেশালে, গরম করলে একটা নতুন জিনিস তৈরি হয়। সেই রকম তৈরি করাকে আবিষ্কার বলে।

টুটুল : তা হলে তো মা-ও আবিষ্কার করে?

সোমেন : মা আবার কী আবিষ্কার করলেন?

টুটুল : কেন? লুচি ভাজে যখন?

সোমেন : (হাসিয়া) ঠিক বলেছো। তবে লুচি একজন আবিষ্কার ক'রে গেছে অনেকদিন আগে। আর তোমার বাবা যেটা করবেন সেটা এখনো কেউ বার করতে পারে নি। সেটা হবে নতুন আবিষ্কার।

টুটুল : ঐ ওষুধগুলো দিয়ে বুঝি নতুন আবিষ্কার হবে?

সোমেন : হ্যাঁ।
টুটুল : আমিও আবিষ্কার করবো।
সোমেন : কী আবিষ্কার করবে?
টুটুল : নতুন জিনিস।

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ : এই যে স্যার— গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট বি-ফোর। একটু বেশি করে আনলাম স্যার— হান্ড্রেড সি.সি., যদি লেগে যায়।
সোমেন : আচ্ছা ঐ টেবিলে রেখে দাও। ট্যাক্সি করে এলে তো?
রমেশ : হ্যাঁ স্যার। (সোমেনকে টাকা বাহির করিতে দেখিয়া) ও স্যার বড়ো সাহেবই বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।
সোমেন : ও, আচ্ছা। তুমি ল্যাবোরেটরিতে কতোক্ষণ থাকবে?
রমেশ : আজ সারারাত থাকবো স্যার। বড়ো সাহেব তাই বললেন। যদি কিছু দরকার পড়ে আপনাদের? শুধু ন'টার সময়ে একবার বাড়ি যাবো স্যার— খেতে। এই— ঘণ্টাখানেক।
সোমেন : ভালোই হয়েছে। দরকার হলে ফোন করবো 'খন।
রমেশ : আর স্যার, বড়োসাহেব আপনাদের বলতে বললেন— কিছু খবর থাকলে তাঁকে যেন তখুনি বাড়িতে টেলিফোন করা হয়।
সোমেন : আচ্ছা ঠিক আছে।

(রমেশের প্রস্থান)

টুটুলবাবু, তুমি এবার মার কাছে যাও। আমি একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি। বাথরুমটা ঐ দিকে না?
টুটুল : আসুন, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।
(সোমেন ও টুটুলের প্রস্থান। অল্পক্ষণ পরে টুটুল প্রবেশ করিয়া সন্তর্পনে পিছনের টেবিলের নিকটে গেল। টেবিলটি যেন তাহাকে টানিতেছে। এদিক ওদিক চাহিয়া আরম্ভ করিল তাহার গবেষণা। একটি বড়ো বীকারে নানা প্রকার তরল পদার্থ আসিয়া মিশিল — যাহার মধ্যে সলিউশন এক্স ও গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্টের পরিমাণ বড়ো কম নহে।)
অণিমা (নেপথ্যে) : আমি কিন্তু ঠিক সাড়ে ন'টার সময়ে খেতে ডাকবো, দেরি করতে পারবে না। খেয়ে দেয়ে তারপর যা ইচ্ছে কোরো।
শম্ভুনাথ (নেপথ্যে) : আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ডাকলেই যাবো।
(অণিমার গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে টুটুল ভীষণ চমকাইয়া বীকারটি লইয়া সরিয়া আসিয়াছে। অপরাধের নিদর্শনটি লুকাইবার সুবিধামত স্থান কিছুতেই তাহার চোখে পড়িতেছে না। অবশেষে জলের ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলিয়া তাহার মধ্যে বীকারটি রাখিয়া আবার ঢাকনা বন্ধ করিয়া দিল শম্ভুনাথ ও অণিমা ঘরে প্রবেশ করিবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে। শম্ভুনাথ পিছনের টেবিলের দিকে গেলেন।)
অণিমা : টুটুল, তুমি এখানে কেন? কী ভাঙবে আবার কে জানে?
টুটুল : বা রে, সোমেন কাকা তো হাত মুখ ধুতে গেলো, আমাকে বললো লাইট জ্বালিয়ে দিতে—

অণিমা : (হাসিয়া) তাই বুঝি? আচ্ছা তুমি এখন এসো। রামচরণ বসে আছে। ওখানে গিয়ে দুষ্টুমি কোরো না যেন?

(টুটুল অণিমার সহিত বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে জলের ট্যাঙ্কের দিকে একটি শঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিয়া গেল।)

শম্ভুনাথ : এই যে— বি-ফোর এসে গেছে দেখছি। ফিফ্‌টি সি.সি.-র চেয়ে একটু কম মনে হচ্ছে। যাক গে এতেই চলে যাবে।

(সোমেনের প্রবেশ)

সোমেন : আপনি এসে গেছেন?

শম্ভুনাথ : হ্যাঁ, বড়ো দেরি হয়ে গেলো। চশমাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

সোমেন : চশমা তো আপনার চোখেই থাকে বরাবর?

শম্ভনাথ : জামাটা ছাড়বার সময়ে খুলে কোথায় রেখেছিলাম।

(হরির প্রবেশ। কাঁধে এক কলসি জল, হাতে একটি অ্যাপ্রন। সোমেনকে অ্যাপ্রনটি দিল।)

হরি : মা আপনাকে দিতে বললেন।

শম্ভুনাথ : ও কলসিটা কিসের?

হরি : মা বললেন টেঙ্কিতে জল নেই বোধ হয়, তাই—

(হরি ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলিয়া কলসির জলটা হুড়মুড় করিয়া ঢালিয়া দিল।)

সোমেন : বৌদির সব দিকে নজর আছে দেখছি।

(হরির প্রস্থান)

শম্ভুনাথ : (হাসিয়া) আমার নজরটা কম ব'লে ওকে পুষিয়ে দিতে হয়। —তা'হলে আসুন, লেগে যাওয়া যাক।

(শম্ভুনাথের অ্যাপ্রন পরাই ছিল। সোমেনেরও ততক্ষণে পরা হইয়াছে। দুইজনে লাগিয়া গেলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রথম দৃশ্যের পর সময়ের ব্যবধান দেখাইতে এক মুহূর্তের জন্য পর্দা বন্ধ থাকিবে। মঞ্চ অন্ধকার করিয়াও তাহা করা চলে। শম্ভুনাথ একটি Measure-glass-এর তরল পদার্থ বীকারে ঢালিতেছেন। সোমেন এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। ঢালা শেষ হইলে শম্ভুনাথ সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। সোমেনও।)

শম্ভুনাথ আশা করি এইটাই ফাইন্যাল।

সোমেন আই হোপ্ সো। রমেশকে টেলিফোন করি?

শম্ভুনাথ কেন?

সোমেন একটা খরগোশ আনতে বলি? টেস্টটা হয়ে যাক আজ রাত্রেই।

শম্ভুনাথ না চ্যাটার্জি। খরগোশে হবে না।

সোমেন দুটো বাঁদর অবশ্য আছে। কিন্তু সে কি রমেশ সামলে আনতে পারবে?

শম্ভুনাথ বাঁদরেও হবে না।

সোমেন : ডক্টর খাস্তগীর বলছিলেন সব টেস্ট সাকসেসফুল হ'লে একটা শিম্পাঞ্জির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তাহ'লে তো আজ আর হয় না?

শম্ভুনাথ শিম্পাঞ্জি দরকার নেই। আমিই খাবো।

সোমেন আপনি খাবেন?

শম্ভুনাথ এর রিয়্যাকশন আমার চেয়ে ভালো আর কে নোট করতে পারবে?

সোমেন না না, তা কী ক'রে হয়?

শম্ভুনাথ কেন হবে না? আপনি তো জানেন— এতে বিষ কিছু নেই।

সোমেন কিন্তু স্যার—

শম্ভুনাথ আর কিন্তু নেই। (এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া) ওঃ, কি বিশ্রী খেতে!
(একটি খালি বীকারে ট্যাঙ্কের কল খুলিয়া জল লইয়া পান করিলেন)
আঃ, এর পরে জলের স্বাদটাও ভালো লাগছে। নিন, বসে যান কলম নিয়ে— দেরি করবেন না।

(সোমেন তাড়াতাড়ি বসিলেন)

লিখুন—স্বাদ অত্যন্ত তেঁতো, অল্প ঝাঁঝালো, গলা একটু জ্বালা করে। পরে জল খেলে জলের স্বাদ অন্যরকম লাগে— মিষ্টি মিষ্টি; অনেকটা পেপারমিন্টের মতো। রিয়্যাক্শন—কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করে, শরীরে যেন—ইলেকট্রিক শকের মতো মনে হয়। আর— আর—
(সোমেন লিখিয়া চলিয়াছেন, শম্ভুনাথ পিছনে। শম্ভুনাথের মুখের ভাব নিমেষে নিমেষে বদলাইতেছে। প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণ মুছিয়া যাইতেছে। আরো চেঁচাইয়া, আরো জোর দিয়া, আরো তাড়াতাড়ি কথা বলিতেছেন। চলা ফেরাও দ্রুততর।)

সোমেন : মাথা ঘোরা স্যার?

শম্ভুনাথ : না, মাথা ঘোরা নেই, তবে মাথায় একটা, মাথাটা যেন—কী বলবো—অনেক তাজা মনে হচ্ছে, মানে—হাল্কা মনে হচ্ছে। এক কথায় খুব ভালো লাগছে— শরীরটা, মাথাটা—শুধু চোখে একটু ঝাপসা দেখছি, একটু উঁচু নিচু—
(হঠাৎ চশমা খুলিয়া ফেলিলেন। একবার পিটপিট করিয়া একেবারে সোজা তাকাইলেন।)
আরে! আরে!

সোমেন : কী হোলো স্যার?

শম্ভুনাথ : (চিৎকার করিয়া) চ্যাটার্জি!!

(সোমেন লাফাইয়া উঠিয়া শম্ভুনাথকে ধরিলেন)

সোমেন : কী হোলো স্যার? মাথা ঘুরছে?
(শম্ভুনাথ হাত ছাড়াইয়া সোমেনের কাঁধে একটি প্রচণ্ড চাপড় মারিলেন। সোমেন বসিয়া পড়িলেন।)

শম্ভুনাথ : ড্যাম্ ইয়োর মাথা ঘোরা! বুঝতে পারছেন না? আজ বারো বছর পরে চশমা ছাড়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি! পরিষ্কার! কে বলে আমার চোখ খারাপ? মনে হচ্ছে আমার বয়স বিশ বছর কমে গেছে! মনে হচ্ছে হাড়ের জয়েন্টগুলোকে নতুন অয়েল করা হয়েছে। ফুসফুসে পাম্প করা হয়েছে। মাস্‌ল্‌গুলো—

(কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে শম্ভুনাথ বৈঠক-জাতীয় ব্যায়ামের নানাবিধ কসরতে প্রৌঢ়ত্ব-মোচনের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। সোমেন লিখিতে ব্যস্ত, অত দেখেন নাই।)

সোমেন : একটু আস্তে আস্তে স্যার। ফুসফুসে পাম্প, মাস্‌ল্‌গুলো—

(শম্ভুনাথ সহসা সোমেনের ঘাড়ে ভর রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সোমেন টেবিলে প্রায় হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন।)

শম্ভুনাথ : চ্যাটার্জি!!

সোমেন : বলুন স্যার?

শম্ভুনাথ : ড্যাম ইয়োর স্যার্! দেখতে পাচ্ছো না—আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল? সেন্ট পার্সেন্ট সাকসেসফুল? চ্যাটার্জি! এসো— সেলিব্রেট করা যাক!

সোমেন : (লিখিতে লিখিতে) এক মিনিট স্যার—

শম্ভুনাথ : (ধমকাইয়া) আবার স্যার বলছো!

সোমেন : ইয়েস স্যার, নো স্যার—মানে—'নো' স্যার। আর স্যার নয়— সেই কথা বলছিলাম।

শম্ভুনাথ : দ্যাট্‌স্ বেটার।

(শম্ভুনাথের অস্থির পদচারণার সুযোগ লইয়া সোমেন লিখিয়া ফেলিলেন)

সোমেন : 'আপনি' থেকে 'তুমি'— 'স্যার' বলা বারণ—

শম্ভুনাথ : চ্যাটার্জি, সিগারেট আছে?

সোমেন : সে কি স্—ইয়ে, ডক্টর সেনগুপ্ত! আপনি তো সিগারেট খান না?

(সিগারেট কেস ও দেশলাই বাহির করিয়া দিলেন)

শম্ভুনাথ : কলেজে থাকতে খেতাম। অনেকদিন হোলো ছেড়ে দিয়েছি। আজ খেতে ইচ্ছে করছে। কী সিগারেট হে? রেড এ্যান্ড হোয়াইট? এ তো আমাদের আমলে ছিল না?

সোমেন : এটা বেশিদিন বেরোয় নি।

শম্ভুনাথ : এ তো ঘাসের মতো লাগছে হে? এর থেকে একটা নল মুখে দিয়ে হাওয়া টানলেই পারো!

(আর একটি ধরাইয়া দুইটি এক সঙ্গে লইয়া একটি গাঁজার টান দিলেন)

আঃ। এইবার একটু জুৎ হচ্ছে বটে।

(শম্ভুনাথ সমানে বকিতে লাগিলেন। সোমেন তাঁহার অশান্ত হাতের জ্বলন্ত সিগারেট-যুগল হইতে মাথা মুখ বাঁচাইবার কৌশলের ফাঁকে ফাঁকে লিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।)

কলেজের হোস্টেলে যখন থাকতাম— দিনে তিন প্যাকেট ক'রে সিগারেট ওড়াতাম। একবার তো ল্যাবোরেটরিতে সিগারেট খাবার জন্যে ফাইন হয়ে গেলো আমার আর সন্দীপের। সন্দীপ মিত্তির ছিল আমাদের ব্লকের পাণ্ডা, ফুটবল টিমে সেন্টার হাফ খেলতো। একদিন হয়েছে কী—হি হি—ফুটবল ম্যাচে জিতে এসে হোস্টেলের বারান্দায় খুব হল্লা হচ্ছে, এমন সময়ে— হো হো— সুপারিন্টেন্ডেন্ট হঠাৎ দরজা খুলে—হাঃ হাঃ হাঃ— সন্দীপ তখন নাচছে

বিলিতি নাচ— হো হো হো— আর আমরা সবাই তাল দিচ্ছি— ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা, ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা, ডুম ডুম, ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা--

(সজোরে টেবিল বাজাইতে লাগিলেন। সোমেন স্তব্ধ।)

—সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দেখেই— ওঃ হো হো হো হো—(সহসা হাসি থামাইয়া) তুমি শুনছো না কিছু!

সোমেন : (চমকাইয়া) শুনছি বৈ কি, নিশ্চয়ই শুনছি!

শম্ভুনাথ : কী বলছিলাম বলো তো?

সোমেন : ইয়ে— ডুম ডুম ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—

শম্ভুনাথ : হাঃ হাঃ হাঃ— ঠিক বলেছো! আর একটা তাল ছিল। টাট্টা রাটা, ডুম টারাটা (বাজাইতে বাজাইতে থামিয়া গেলেন)— কিন্তু চ্যাটার্জি?

সোমেন : আজ্ঞে?

শম্ভুনাথ : এতো বড়ো একটা আবিষ্কার ক'রে এরকম চুপ ক'রে ব'সে থাকবো?

সোমেন : খুব যে একটা চুপ ক'রে ব'সে আছেন, তা তো—

শম্ভুনাথ : আরে না না! বলছিলাম— দুনিয়ার কেউ জানলোই না এখনো? ঠিক হয়েছে! অণিমাকে ডেকে আনি!

সোমেন : (ব্যস্ত হইয়া) এখন রাত প্রায় দেড়টা— বৌদিকে আর ডেকে কাজ নেই। তার চেয়ে— ডক্টর খাস্তগীর ব'লে পাঠিয়েছিলেন কিছু পেলে তাঁর বাড়িতে টেলিফোনে খবর দিতে—

শম্ভুনাথ : রাইটো!! (ফোনে) হ্যালো হ্যালো। হ্যালো-ও-ও! এই যে খুকুমণি, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?...ওহো, তুমি আবার মেম সাহেব— নম্বর ছাড়া কিছু বোঝো না। (মিহি সুরে) নাম্বার প্লীজ? ইয়েস প্লীজ। সাউথ থ্রি-ও-নাইন-টু প্লীজ...একটু চট ক'রে লক্ষ্মী মেয়ের মতো প্লীজ... হ্যালো...হ্যালো হ্যালো-ও-ও!... চ্যাটার্জি, কেউ সাড়া দিচ্ছে না যে?

সোমেন : ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়।

শম্ভুনাথ : ঘুমিয়ে পড়েছে? আমরা খেটে মরছি, আর ব্যাটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!— এই যে, হ্যালো— কে? ডক্টর খাস্তগীর?... অ্যাঁ? স্পীকিং?... ওহো আপনি স্পীকিং, মানে ডক্টর খাস্তগীর স্পীকিং।...আমি? আমি শম্ভু—শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত— ডাক্তার— ন্যাশনাল বায়োলোজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে কাজ করি... চিনতে পেরেছেন? তা তো পারবেনই-- অনেক বছর হোলো তো স্যার আপনার কোম্পানিতে...কী বলছেন, খবর? জবর খবর স্যার! আবিষ্কার! ইউরেকা! ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা ডুম!... বুঝতে পারছেন না? কেন, এ তো জলের মতো পরিষ্কার... অ্যাঁ? ডুম?...ওঃ হো, ডুম নয় স্যার— ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা ডুম। ও একটা নাচের বাজনার তাল।... না না। নাচের বাজনার সঙ্গে এক্সপেরিমেন্টের সম্পর্ক থাকতে যাবে কেন? ও বাজনাটা হোলো ফক্স ট্রটের। না কি পোল্‌কার? ওয়াল্ট্‌জ-ও হ'তে পারে স্যার ঠিক মনে পড়ছে না।

ব'সে ব'সে ছাইভস্ম কী সব লিখছে আর কড়িকাঠের দিকে তাকাচ্ছে— বোধহয় কবিতা স্যার।

(সোমেনের চোখ গোল হইয়া উঠিল)

আচ্ছা স্যার— (গলা নামাইয়া) চ্যাটার্জি প্রেমে টেমে পড়েছে না কি? আপনাকে কখনো কিছু বলেছে? (সোমেন মুহ্যমান)... কী বললেন?... শুনতে পাচ্ছি না, আর একটু জোরে বলুন... চ্যাটার্জিকে দেবো? (সোমেনকে রিসিভার দিয়া) চ্যাটার্জি ধরো ভাই—ব্যাটা মাথামোটা বাংলাভাষা বুঝতে পারছে না।

সোমেন : হ্যালো— হ্যাঁ স্যার, আমি সোমেন চ্যাটার্জি, শুনুন, ডক্টর সেনগুপ্ত রাত একটা তেরোয় সলিউশনটা খেয়েছেন। তার আগে গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট বি-ফোরের পার্সেন্টেজ একটু বাড়ানো হয়েছিলো। তারপর থেকে বড়ো অদ্ভুত সব রিয়্যাক্শন হচ্ছে।... এখন? এখন নাচছেন স্যার। (কথাটা মিথ্যা নয়)... কী রকম ভাবে? আমি তো ঠিক চিনি না স্যার—বোধ হয় ফক্সট্রট। ওয়াল্ট্জ-ও হতে পারে— ডক্টর সেনগুপ্ত বলছিলেন সন্দীপ মিত্তিরের কথা... (শশব্যস্তে) না না স্যার, আমি কিছু খাই নি! আমি শুধু রিয়্যাক্শনগুলো বলবার চেষ্টা করছিলাম— তবে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। ওঁকে দেখে কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে— আ হা হা করছেন কী, প'ড়ে যাবেন প'ড়ে যাবেন!... না স্যার আপনাকে নয়। ডক্টর সেনগুপ্ত চেয়ারের উপর টুল খাড়া ক'রে ওঠবার চেষ্টা করছেন, তাই... আপনি আসবেন?... হ্যাঁ স্যার, কাল সকালেই আসবেন। রাতটা আমি সামলে দেবো কোনো রকম ক'রে... হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, রিয়্যাক্শন সব লিখছি বৈ কি— ঐ গেলো গেলো গেলো—

(শম্ভুনাথ টুল চেয়ার সমেত উল্টাইয়া পড়িলেন। সোমেন ফোন রাখিয়া ছুটিলেন, কিন্তু ততক্ষণে শম্ভুনাথ এক লাফে খাড়া।)

শম্ভুনাথ : ঘাবড়াও কেন ব্রাদার? কলেজের সি-টিমে খেলেছি— কতো ধড়াধ্বড় পড়েছি তখন! ফেলেছিও বিস্তর! একবার এক রাইট ইন্ বল নিয়ে এগুচ্ছে, আমি ছিলাম ব্যাকে। এক পা এক পা ক'রে পোছয়ে হঠাৎ লাফিয়ে গিয়ে ধরলাম ব্যাটার কোমর জড়িয়ে! আঃ।

(সোমেন পিছাইয়া গিয়া অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেলেন। শম্ভুনাথ পরমানন্দে চোখ বুজিলেন, যেন কল্পনানেত্রে রাইট ইনের পতন দেখিতেছেন।)

সোমেন : তারপর?

শম্ভুনাথ : (কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়া) রেফারি ব্যাটা ফাউল দিয়ে দিলে!

সোমেন : তাই না কি? ভারি অন্যায় তো?

শম্ভুনাথ : (উত্তেজিত সুরে) শুধু কি তাই? আমার বি-টিমে ওঠবার কথা হচ্ছিল— সেটা তো বন্ধ হয়ে গেলোই, উপরন্তু সি-টিমেও থাকতে দিলে না!

সোমেন : কোথায় গেলেন? ডি-টিমে?

শম্ভুনাথ : তাই যেতাম। কিন্তু সি-টিমের নিচে আর টিম ছিল না।

(অণিমার প্রবেশ)

অণিমা : একটা কিসের আওয়াজ শুনলাম— যেন কে প'ড়ে গেলো?

শম্ভুনাথ : (সোল্লাসে) ডার্লিং তুমি এসেছো? ইউরেকা! মেরে দিয়েছি!

(অনিমার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া নাচিতে শুরু করিলেন)

ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা, ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা, ডুম ডুম ট্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা— বাজাও চ্যাটার্জি—

(চ্যাটার্জি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

(একই ঘর। পরদিন বেলা নয়টা। বড়ো চেয়ারে শম্ভুনাথ ঘুমাইতেছেন। শিয়রের কাছে অণিমা একটি টুলে বসিয়া ঢুলিতেছেন। হাতে একটি হাত-পাখা। হরির প্রবেশ)

হরি : মা।

অণিমা : উঁ?

হরি : বাজার এসেছে।

অণিমা : বলে দে এখন দেখা হবে না।

হরি : আজ্ঞে?

অণিমা : (চটকা ভাঙিয়া) কী বলছিস?

হরি : বলছিলুম বাজার এসেছে। বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে কী রান্না হবে।

অণিমা : যা হয় নিজে বুঝে রাঁধতে বল।

(হরির প্রস্থান। শম্ভুনাথ পাশ ফিরিয়া শুইবার একটি দুশ্চেষ্টা করিলেন। অসুবিধা বোধে ঘুম ভাঙিয়া গেল।)

অণিমা : এখন কেমন বোধ করছো?

শম্ভুনাথ : (হাতড়াইয়া) আমার চশমাটা কোথায় রাখলাম—

অণিমা : এই যে—

(শম্ভুনাথ চশমা পরিয়া চারিদিকে চাহিলেন)

শম্ভুনাথ : এখানে শুয়েছিলাম কেন? ওঃ হো, মনে পড়েছে। সলিউশন এক্স! কাল ফাইনাল টেস্ট করেছিলাম, না? সাকসেসফুল।

অণিমা : (হাসিয়া) হ্যাঁ, সাকসেসের ধাক্কাটা আমার উপর দিয়ে কম যায় নি?

শম্ভুনাথ : (লজ্জিত হইয়া) তোমাকে একটু নাচিয়েছিলাম, এই তো? কিন্তু— কিন্তু ঘুমোলেই কি এফেক্ট কেটে যায়? চশমা ছাড়া আবার কানা, শরীরেও তো সেরকম— কিন্তু হবে! নিশ্চয়ই হবে! কয়েক ঘণ্টার জন্যে যখন হ'চ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

অণিমা : আমার শুধু মনে হয় যতো তাড়াতাড়ি এ ভুত ঘাড় থেকে নামে ততো ভালো।

শম্ভুনাথ : কী বলছো তুমি? যুগান্তকারী আবিষ্কার! দুনিয়ার চেহারা পাল্টে যাবে! আমি ঠিকই ধরেছিলাম—গ্ল্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট বি-ফোর। আচ্ছা, চ্যাটার্জি কোথায়?

অণিমা : ডক্টর খাস্তগীরের সঙ্গে ইনস্টিটিউটে গেছেন। তোমার সলিউশনের খানিকটা নিয়ে গেছেন— টেস্ট করতে।

শম্ভুনাথ : ডক্টর খাস্তগীর এসেছিলেন নাকি? কখন?

অণিমা : সকালেই গোটা সাতেকের সময়ে। সোমেনবাবুর মুখে সব শুনে বললেন— এখুনি টেস্ট ক'রে দেখবেন।

শম্ভুনাথ : কিন্তু ও টেস্ট আর করবার দরকার কী? বরং বি-ফোরের পার্সেন্টেজ আর একটু বাড়িয়ে—

(পিছনের টেবিলের দিকে গেলেন। ফোন বাজিল। অণিমা ধরিলেন।)

অণিমা : হ্যালো... ও হ্যাঁ, এখানেই আছেন। দিচ্ছি। সোমেনবাবু ফোন করছেন ইনস্টিটিউট থেকে।

শম্ভুনাথ : হ্যালো... হ্যাঁ আমি শম্ভুনাথ।... অ্যাঁ?... কী বলছেন কী?... কোনো রিয়্যাকশন নেই?... শুধু একটু মাথা ঘোরা?... অসম্ভব। ইম্‌পসিব্‌ল্! আই ডোন্ট বিলিভ্।... কী বললেন? আপনি নিজের উপর টেস্ট করে দেখেছেন? কোনো এফেক্ট নেই?... কিন্তু কী করে হবে? কাল রাত্রে তো নিজের চোখে দেখলেন? অণিমাও তো দেখেছে!... অ্যাঁ?... হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে... হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখুনি যাচ্ছি। (অল্পক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন) ইম্‌পসিব্‌ল্। হতে পারে না!

(বলিতে বলিতে পিছনের টেবিলে গেলেন। খানিকটা সলিউশন মাপিয়া ঢালিলেন)

প্রমাণ করে দেবো। আই'ল্ প্রুভ্ ইট টু দ্য ওয়ার্ল্ড—

(অণিমা ছুটিয়া আসিয়া গ্লাসটি কাড়িয়া লইলেন)

অণিমা : না!

শম্ভুনাথ : দাও অণিমা, দাও—

অণিমা : না। তোমাদের গিনিপিগ আছে, বাঁদর আছে— তাদের উপর টেস্ট করো। নিজের উপর এই ভূতুড়ে ওষুধ আর চালাতে দেবো না।

শম্ভুনাথ : (শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে) গ্লাসটা দাও অণিমা। আমাকে টেস্ট করতেই হবে।

অণিমা : না। (ফেলিয়া দিতে উদ্যত)

শম্ভুনাথ : ফেলে লাভ নেই অণিমা। আমি আবার তৈরি করবো। এখানে না পারি, ইনস্টিটিউটে খাবো। টেস্ট আমাকে করতেই হবে।

অণিমা : টেস্ট করতেই হবে?

শম্ভুনাথ : হ্যাঁ। এ অবস্থায় আমি ছেড়ে দিতে পারবো না।

অণিমা : ঠিক আছে করো টেস্ট। (এক চুমুকে গ্লাসটি খালি করিয়া দিলেন)

শম্ভুনাথ : কী করলে অণিমা!

অণিমা : উঃ, কী তেতো! (ট্যাঙ্কের কল খুলিয়া জল লইয়া খাইলেন)
আঃ জলটাও ভালো লাগছে! (আর এক গ্লাস জল খাইলেন)
নাও, এবার কী করতে হবে বলো।

শম্ভুনাথ : বোসো অণিমা। কীরকম বোধ করছো বলো তো?

অণিমা : কিছুই না। বেশ ভালোই বোধ করছি।

শম্ভুনাথ : কিছুই মনে হচ্ছে না?

অণিমা : কৈ, না?

(শম্ভুনাথ হতাশ হইয়া পিছনের টেবিলে গেলেন। অণিমা কপালে একবার হাত চালাইয়া লইলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। মুখে ছেলেমানুষি ভাব। মৃদুকণ্ঠে গানের আভাস। সহসা গান থামিল।)

ওগো শুনছো? অনেকদিন সিনেমায় যাই নি। যাবে আজ?

শম্ভুনাথ : সিনেমায়!!

অণিমা : চলো না লক্ষ্মীটি! কিম্বা এক কাজ করা যাক। চলো আজ বটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরে আসি। যাবে?

শম্ভুনাথ : বটানিক্যাল—

অণিমা : চিড়িয়াখানায় গেলেও হয়। নতুন একটা কী যেন এসেছে। ঠিক হয়েছে, চলো, চিড়িয়াখানাতেই যাই।

(চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া শম্ভুনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন)

শম্ভুনাথ : আরে আরে দাঁড়াও— আমার ইনস্টিটিউটে যেতে হবে যে!

অণিমা : না আজ ইনস্টিটিউটে যেতে পাবে না। রোজ তো যাও? আর চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছিলে সেই ক—বে!

(আবার টানিয়া লইয়া চলিলেন)

শম্ভুনাথ : শোনো শোনো দাঁড়াও! হঠাৎ চিড়িয়াখানায় যাবার ইচ্ছে হচ্ছে কেন বলো তো?

অণিমা : (ঝড়ের মতো) হ্যাঁ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে, আলবাৎ হচ্ছে, একশোবার হচ্ছে! তুমি আজকাল আমাকে কোথাও নিয়ে যাও না। আমার যেন কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই, সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই— যতো কিছু সব যেন তোমারই—

শম্ভুনাথ : (হাঁপাইয়া উঠিয়া) শোনো শোনো, আরে কী মুস্কিল। আমি বলছিলাম— বড়ো হঠাৎ বললে কি না? মানে— কোনোরকম ইয়ে বোধ করছো না কি?

অণিমা : না, তা বোধ করবো কেন? যতো বোধশক্তি সব তো তোমারই! তুমি ভালো বোধ করবে, তুমি খারাপ বোধ করবে, তুমি রাগ বোধ করবে, তুমি—

শম্ভুনাথ : আ হা হা, তা নয়, বলছিলাম ওষুধটা খেয়ে—

অণিমা : হ্যাঁ, তা তো বটেই! একদিন একটু বেড়াতে যেতে চেয়েছি, অমনি হাজার অজুহাত! ওষুধ খেয়ে, ভাত খেয়ে, চান ক'রে, দাঁত মেজে, দাড়ি কামিয়ে— (সহসা শম্ভুনাথের দুহাত ধরিয়া ঠোঁট ফুলানো অভিমানের সুরে) তুমি আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছো, আমাকে আর একটুও ভালোবাসো না!

শম্ভুনাথ : (স্তম্ভিত) সে কী? আমি— আমি তো—

অণিমা : (রোদনোন্মুখ) জানি জানি! আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি দেখতে ভালো না, আমাকে তোমার আর ভালো লাগবে কেন? আমি এখন হয়েছি তোমার বোঝা, আমাকে তুমি দু'চোক্ষে দেখতে পারো না। আমি মরলে তুমি বাঁচো!

(কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন)

শম্ভুনাথ : কী যা তা বলছো, পাগল হলে না কি?

(অণিমা কান্না থামাইয়া ফোঁস করিয়া উঠিলেন)

অণিমা : খবরদার যা তা গালাগাল কোরো না বলছি, ভালো হবে না!

শম্ভুনাথ : (ঘাবড়াইয়া) কী বললাম?

অণিমা : যা মুখে আসে তাই বলবে? আমি পাগল? কাল বলবে আমি চোর, পরশু বলবে আমি—

শম্ভুনাথ : অণিমা একটু শান্ত হয়ে বোসো। আমাকে একটু বুঝতে দাও—

(অণিমা আবার ভাঙিয়া পড়িলেন)

অণিমা : তা তো বটেই। আমাকে পাগল না বানালে তোমার সুবিধে হবে কেন? তুমি যা খুশি তাই ক'রে বেড়াবে, যাকে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবে, যতোক্ষণ ইচ্ছে আড্ডা দেবে—

শম্ভুনাথ : অ্যাঁ?

অণিমা : ন্যাকা সেজো না বলছি! তুমি রোজ অতো রাত্তির অবধি ইনস্টিটিউটে কাজ করবার নাম ক'রে কোথায় থাকো? আমি সব বুঝি। তুমি সোমেনবাবুর বাড়ি যাও কেন? আমার বয়স হয়ে গেছে। সোমেনবাবুর বৌয়ের অল্প বয়স, সে দেখতে ভালো—

শম্ভুনাথ : অণিমা!!

অণিমা : (সহসা মিষ্ট হাসিয়া ততোধিক মিষ্ট কণ্ঠে) কী বলছো?

শম্ভুনাথ : অ্যাঁ? না, মানে—

অণিমা : ওগো চলো না একটু যাই আজ চিড়িয়াখানায়। দেখো কী সুন্দর দিনটা আজ, কী মিঠে রোদ উঠেছে। আজ নিশ্চয়ই খুব খু-ব ভালো লাগবে। ওগো তোমার দু'টি পায়ে পড়ি চলো—

শম্ভুনাথ : অণিমা শোনো, তুমি—

অণিমা : যাবে না তো?

শম্ভুনাথ : আরে কী মুস্কিল, আমার কথাটা—

অণিমা : তোমার কথা তোমার কথা তোমার কথা! সারাদিন ধরে কেবল তোমার কথা শুনি! আমার কথাটা যেন কিছু নয়! বেশ, ঠিক আছে! আড়ি আড়ি আড়ি, তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি!

(অণিমা ঘর হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। শম্ভুনাথ পিছনে যাইতে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তারপর আসিয়া ফোন ধরিলেন।)

শম্ভুনাথ : ক্যালকাটা থ্রি নাইন এইট ফোর... হ্যালো, কে চ্যাটার্জি? আমি শম্ভুনাথ কথা বলছি... শুনুন, অণিমা একটু আগে সলিউশন এক্স খেয়েছে... হ্যাঁ, অত্যন্ত প্রোনাউন্সড্ রিয়্যাক্‌শন্‌স্! এক্ষুনি চলে আসুন যদি নিজে দেখতে চান।... আসছেন? থ্যাঙ্কস্।

(ইতিমধ্যে অণিমা প্রবেশ করিয়াছেন। মুখে লাজুক ভাব।)

অণিমা : তুমি রাগ করেছো?

শম্ভুনাথ : কী আশ্চর্য? রাগ করবো কেন?

অণিমা : হ্যাঁ, তুমি রাগ করেছো। কী রকম হাঁড়ির মতো মুখ ক'রে আছো!

শম্ভুনাথ : (কাষ্ঠ হাসি) কৈ? এইতো— হাসছি—

অণিমা : (উজ্জ্বল হইয়া) সত্যি রাগ করো নি?

শম্ভুনাথ : না।

অণিমা : তিনবার বলো?

শম্ভুনাথ : না, না, না।

অণিমা : (ঠোঁট ফুলাইয়া) ও রকম দায়সারা ভাবে বলছো কেন?

শম্ভুনাথ : কী রকম ভাবে বলবো বলো?

অণিমা : বলো— রাগ করিনি, রাগ করিনি, একটু-ও রাগ করিনি।

শম্ভুনাথ : (যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া) রাগ করিনি, রাগ করিনি, রাগ— মানে একটুও রাগ করিনি।

অণিমা : (মহানন্দে) তা হলে চলো চিড়িয়াখানায়!

শম্ভুনাথ : অ্যাঁ? (সামলাইয়া) হ্যাঁ, চলো যাই।

অণিমা : কী মজা, কী মজা, চিড়িয়াখানায়— কী মজা!
(অণিমা হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিলেন। সেই ফাঁকে শম্ভুনাথ কলম ধরিয়াছেন।)
তুমি লি—খছো!

(বেলার প্রবেশ)

বেলা : এই যে অণিমাদি, কাল উনি রাত্রে—

(অণিমা ছুটিয়া গিয়া বেলাকে টানিয়া আনিলেন)

অণিমা : কে বেলা? এসো এসো, কদ্দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি, তুমি আসোই না, খোঁজই করো না বেঁচে আছি কি মরে গেছি—

বেলা : সে কি, আমি তো এই সে দিন—

অণিমা : তা বৈ কি? সেই ক—বে এসেছিলে গত রোববার। জানো বেলা, আজ আমরা এক্ষুণি চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি, সেখানে নতুন সাদা ভাল্লুক এসেছে— তোমাকেও যেতে হবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে—

বেলা : আমি—

অণিমা : না না, কোনও আপত্তি শুনবো না, যেতেই হবে। আমরা হাতি চড়বো, কী বলো অ্যাঁ? আর সেই ছোট্ট ছোট্ট বাঁদরগুলো— কী মিষ্টি দেখতে! তাদের ছোলা খাওয়াবো। না না, তোমাকে ছোলার পয়সা দিতে হবে না, আমিই দেবো—

বেলা : তুমি কি পাগল হলে না কি অণিমাদি?

অণিমা : (সহসা গম্ভীর হইয়া) তুমি আমাকে পাগল বললে? তুমিও আমাকে পাগল বললে?

বেলা : অণিমাদি!

অণিমা : ও বলেছে সহ্য করেছি। তুমি বলবে কেন? ও আমার স্বামী হয়, দস্তুর মতো হিন্দুমতে বিয়ে করেছে— ও বলতে পারে। তুমি বলবার কে?

বেলা : আমি তো—
(অণিমা বেলার কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে চিৎকার করিতে লাগিলেন)

অণিমা : কোন্ সাহসে তুমি আমাকে পাগল বলো? কোত্থেকে তোমার এতো সাহস আসে?

বেলা : ডক্টর সেনগুপ্ত! অণিমাদির কী যেন হয়েছে—
(অণিমা বেলাকে ছাড়িয়া হিংস্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন)

অণিমা : ডক্টর সেনগুপ্ত। ড—ক্টর সে—ন গুপ্ত! ও! ভিতরে ভিতরে এই! আমি তা হ'লে ঠিকই আন্দাজ করেছি!

শম্ভুনাথ : অণিমা, অণিমা, দোহাই তোমার, তুমি একটু— তুমি একটু যাও। বরং তৈরি হয়ে নাও-— যাবে না চিড়িয়াখানায়?

অণিমা : বটে! আমাকে ঐ ছুতোয় তাড়িয়ে তোমরা দুজনে একা একা এইখানে গুলতানি করবে? সে আমি হতে দিচ্ছি না!

শম্ভুনাথ : উঃ, এইবার আমিই পাগল হয়ে যাবো!

অনিমা : বেশ বেশ— থাকো তোমরা। আমি তো চোখের বালি, পথের কাঁটা! আমি তো আপদ বালাই— দূর হলেই বাঁচো। থাকো— থাকো তোমরা!

(ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেলেন। শম্ভুনাথ দুহাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিলেন।)

বেলা : ডক্টর সেনগুপ্ত— এ সব কী কাণ্ড? উনি আজ সকালে বাড়ি ফিরবেন বলেছিলেন— এখনো ফেরেন নি। তাই খোঁজ করতে এসে এ সব কী বিশ্রী বিশ্রী কথা শুনতে হোলো আপনার স্ত্রীর কাছে। কী ব্যাপার কী— আমি জানতে চাই!

শম্ভুনাথ : অ্যাঁ? হ্যাঁ, দাঁড়ান বলছি। একটু বসুন, বলছি।

(ট্যাঙ্ক হইতে এক গ্লাস জল লইয়া পান করিলেন। করিয়াই অবাক হইয়া গ্লাসটির দিকে চাহিলেন।)

বেলা : বলুন ডক্টর সেনগুপ্ত, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার আর একটুও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

শম্ভুনাথ : কী বলছেন? একটু দাঁড়ান। এ রকম হোলো কেন? এ রকম হচ্ছে কেন?

(কপালের উপর একবার হাত চালাইলেন)

বেলা : কী হোলো ডক্টর সেনগুপ্ত? অসুস্থ বোধ করছেন না কি? বসুন, ব'সে পড়ুন এই চেয়ারটায়-—

(বেলা শম্ভুনাথের বাহু ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। অণিমার প্রবেশ)

অণিমা : চমৎকার! চমৎকার! এই তো চাই! কলকাতায় বৃন্দাবন! ল্যাবোরেটরি হোলো কুঞ্জবন!

বেলা : অণিমাদি তুমি যদি ঐ সব বিশ্রী বিশ্রী কথা না থামাও, তা হ'লে—

অণিমা : তা হ'লে? কী ক'রবে তুমি তা হ'লে? এই— এই— এই—

(বেলার নাকের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িতে লাগিলেন। সোমেনের প্রবেশ।)

সোমেন : এ কী!!

(অণিমা সোমেনকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বড়ো চেয়ারটায় এলাইয়া পড়িলেন)

অণিমা : সো—মেন বা—বু!(সোমেন তাড়াতাড়ি অণিমার নিকটে গেলেন)

সোমেন : কী হোলো কী বৌদি?

অণিমা : (ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে) সোমেন বাবু— দেখুন আপনার বৌ—ঐ বেলাটা— আমাকে পাগল বলছে-- আরো কতো কী বলছে— আর বলছে— আমি কোনো কথা বললেই— আমাকে মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে!

সোমেন : কী সাংঘাতিক রিয়্যাক্শন! ডক্টর সেনগুপ্ত---

(সোমেন স্তম্ভিত। শম্ভুনাথ একটি কাগজ-চাপা কপালে রাখিয়া টেবিলে শুইবার চেষ্টা করিতেছেন, দুই বাহু দুই দিকে প্রসারিত। সোমেনের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বেলাও

হতবাক। শম্ভুনাথ এইবার উঠিতেছেন। অণিমা সহসা হাততালি দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।)

অণিমা : সাবাস! সাবাস!

(শম্ভুনাথ চমকাইয়া উঠিতে কাগজ-চাপাটি পড়িয়া গেল! ক্রুদ্ধ শম্ভুনাথ অণিমার দিকে ফিরিলেন।)

শম্ভুনাথ : দেখো, বেশি ফটর ফটর কোরো না বলছি, ভালো হবে না!

সোমেন : স্যার স্যার, আপনার কী হোলো স্যার? আপনিও কী সলিউশন—

শম্ভুনাথ : এই যে চাটুয্যে! এই দেখো না অণিমাটা কী ফাজিল হয়েছে। একটা শক্ত খেলা দেখাচ্ছি— আর ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে পেছন থেকে ষাঁড়ের মতো— সাবাস!

অণিমা : এই খবরদার তুমি ভ্যাংচাবে না বলে দিচ্ছি!

শম্ভুনাথ : (বিকট মুখভঙ্গী করিয়া) ভ্যাংচাবে না ব্যাল্যা দিচ্ছি!

অণিমা : দাঁড়াও, ইয়ার্কি বার ক'রে দিচ্ছি তোমার!

(বড়ো চেয়ার হইতে বালিশটি তুলিয়া শম্ভুনাথকে তাড়া করিলেন। সোমেনকে সরাইয়া দিলেন এক ধাক্কায়। শম্ভুনাথ হাতের কাছে বেলাকে পাইয়া দুই হাতে তাহার কাঁধ ধরিয়া সম্মুখে রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।)

বেলা : ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ডক্টর সেনগুপ্ত! ওগো দেখছো না—

(অণিমা সহসা থামিয়া গেলেন)

অণিমা : আবার ডক্টর সেনগুপ্ত? লজ্জা করে না তোমার? সোমেনবাবু দেখুন। আপনার বৌয়ের কাণ্ডটা দেখুন, কথাটা শুনুন! আর ঐ একজন ভণ্ড বৈজ্ঞানিক সলিউশনের নাম ক'রে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে!

সোমেন : মাই গড!

(অণিমা বালিশ ফেলিয়া সোমেনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সোমেন পিছাইয়া যাওয়াতে শুধু তাঁহার জামাটি শক্ত মুষ্টিতে ধরিতে পারিলেন।)

অণিমা : সো—মেনবাবু!

বেলা : (শম্ভুনাথের হাত ছাড়াইয়া) ওগো তুমি কিছু বলবে না? এইরকম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে?

অণিমা : কেন? তুমি আবার এখানে কেন? যাও না, তোমার— ড—ক্টর সেন—গুপ্তর কাছে!

(বেলাকে ঠেলিয়া দিলেন। শম্ভুনাথ বালিশটি লইয়া লোফালুফি করিতেছিলেন— বেলার ধাক্কা খাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন।)

শম্ভুনাথ : (ক্ষেপিয়া) আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটো— উজবুক কোথাকার? দেবো একটি চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে—

(একটি অস্ফুট চিৎকার করিয়া বেলা চেয়ারে লুটাইয়া পড়িলেন। সোমেন তাড়াতাড়ি নিকটে গেলেন।)

সোমেন : বেলা, বেলা, কী হোলো বেলা?

বেলা : আমি বাড়ি যাবো, আমাকে তুমি বাড়ি নিয়ে চলো।

সোমেন : বাড়ি? আচ্ছা চলো—

(বেলাকে লইয়া দরজার দিকে গেলেন)

অণিমা : ওঃ বেলার দুঃখে বুক ফেটে গেলো! বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে! যেমন কর্ম তেমনি ফল হয়েছে! থাক প'ড়ে ও, চলুন আমরা চিড়িয়াখানায় যাই।

(সোমেনের হাত ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। অন্য হাত ধরিয়া বেলা তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। হরির প্রবেশ।)

শম্ভুনাথ : এই যে শ্রীহরি-মধুসূদন! বেটাচ্ছেলে সকাল থেকে তোমার টিকিটি দেখা যায় না। ক্ষিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেলো, এক কাপ চা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারলে না!

হরি : বাবু, আমি—

শম্ভুনাথ : দাঁড়াও, তোমার পিণ্ডি চটকাচ্ছি আমি!

(বালিশ লইয়া তাড়া করিলেন। হরি অণিমাকে পাশ কাটাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেই অণিমা পা বাড়াইয়া দিলেন। হরি হোঁচট্ খাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া বাহির হইয়া গেল।)

ব্র্যাভো, ব্র্যাভো! চীয়ারাপ্ অণিমা!

(ফোন বাজিল। শম্ভুনাথ ফোনে কথা কহিতে কহিতে চেয়ারে বসিতে গেলেন। অণিমা চেয়ারটি নিঃশব্দে পিছন হইতে সরাইয়া লইলেন। শম্ভুনাথ কিন্তু পড়িলেন না, নির্বিকার ভাবে টেবিলে কনুই রাখিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বিনা চেয়ারেই অল্পক্ষণ বসিলেন। তারপর আলগোছে নিজেকে মেঝেয় নামাইয়া দিলেন।)

শম্ভুনাথ : হ্যালো... হ্যালো হ্যালো মাই ডিয়ার মাই ডার্লিং শ্যালক-পত্নী। ইয়েস, ইয়েস ম্যাডাম, দিস্ ইজ্ শম্ভুনাথ স্পীকিং—স্বয়ং—ইন পার্সন—ইয়োর ঠাকুরজামাই... কী হয়েছে? ...অ্যাঁ? আমার কী হয়েছে? ...আমার অতো খোঁজে তোমার দরকার কী বৎসে? তোমার কুশল কহো... কী বললে ডার্লিং? টুটুল? টুটুল তার মামার বাড়ি গেছে— সেটা ঘটনাচক্রে তোমারই বাড়ি। তুমি খোঁজ রাখো না ডিয়ার? ...অ্যাঁ? জানো? বেশ বেশ। সাবধানে রেখো। টুটুল খাসা ছেলে, তুখোড় ছেলে, বড়ো হলে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হবে— আই মীন আইনস্টা—কী? . আমি পাগলামি করছি? মাইরি?... হ্যালো হ্যালো! হ্যালো—ও-ও, হ্যালো, হ্যালো—ধুত্তোর!

(উঠিয়া রিসিভার রাখিলেন। অণিমা এতক্ষণ খড়ি দিয়া ছক কাটিয়া পেপার-ওয়েট লইয়া এক্কা দোক্কা খেলিতেছিলেন। শম্ভুনাথ পা দিয়া পেপার-ওয়েটটি সরাইয়া দেওয়ায় ভীষণ চটিয়া গেলেন।)

অণিমা : তুমি কেন আমার ঘুঁটি সরিয়ে দিলে?

শম্ভুনাথ : বেশ করেছি! যতো সব ছেলেমানুষি খেলা।

অণিমা : ইঃ! ছেলেমানুষি! নিজে কতো খেলা জানে?

শম্ভুনাথ : জানিই তো। মেয়েগুলোর খালি ঐ ঘুঁটি খেলা, না হয় তো এক্কাদোক্কা। না পারে মার্বেল খেলতে, না পারে হাডুডু!

অণিমা : ওঃ, ভারি হাডুডু দেখাচ্ছে! তুমি হাডুডু-র কী জানো? একেবারে মেরে বসিয়ে দেবো না!

শম্ভুনাথ : অতো সোজা নয়!

অণিমা : হ'য়ে যাক একবার?

শম্ভুনাথ : বেশ, হ'য়ে যাক! এই লাইন।

(খড়ি দিয়া লাইন টানিলেন)

চু-উ-উ—

অণিমা : দাঁড়াও, দাঁড়াও— (কোমরে আঁচল জড়াইয়া লইলেন)

শম্ভুনাথ : চু-উ-উ-উ— (দম লইয়া) উ-উ-উ

অণিমা : এই তুমি দু' দম নিয়েছো, দু' দম নিয়েছো—-

শম্ভুনাথ : কক্ষনো না!

অণিমা : আলবাৎ নিয়েছো! খেলবো না, যাও!

শম্ভুনাথ : আচ্ছা আচ্ছা, আবার। চু-উ-উ-উ—

(অণিমা প্রায় ধরা পড়িয়াছেন)

অণিমা : এই আব্বা আব্বা—

শম্ভুনাথ : (ঠাস করিয়া পিঠে থাপ্পড় মারিয়া) মোর—যাও!

অণিমা : কক্ষনো না, আমি আব্বা দিয়েছি!

শম্ভুনাথ : আব্বা আবার কিসের? ধরা প'ড়ে আব্বা!

অণিমা : মোটেই আমি ধরা পড়তাম না! পায়ে লেগেছে— আব্বা দেবো না?

শম্ভুনাথ : ওঃ! পায়ে লেগেছে! মিথ্যুক কোথাকার!

অণিমা : খবরদার, মিথ্যুক বলবে না ব'লে দিচ্ছি!

শম্ভুনাথ : মিথ্যুক! জোচ্চোর!

অণিমা : দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!

(বড়ো টেবিল হইতে খুঁজিয়া সাদা একটি গুঁড়া পদার্থ শম্ভুনাথের গালে মাখাইয়া দিলেন। শম্ভুনাথও অণিমার ঘাড় ধরিয়া তাঁহার গালে পদার্থটি ঘষিয়া দিলেন।)

আমি থাকবো না এখানে! আমি চলে যাবো— এক্ষুনি, এক্ষুনি!

(প্রায় কাঁদিয়া প্রস্থান)

শম্ভুনাথ : আমার তাতে ব'য়েই গেলো!

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন। অসময়ে খেলা নষ্ট হইবার ক্ষুব্ধ হতাশায় অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর অণিমার উদ্দেশ্যে একটি বিকট ভেংচি কাটিলেন।)

ওঃ, আমি যেন একলা খেলতে পারি না। —চু-উ-উ-উ—

(একাই খেলিতে লাগিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

(একই ঘর। ঘন্টাখানেক পরে। লিখিবার টেবিলটির নিচে অণিমা কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। হরি সন্তর্পনে প্রবেশ করিল। পিছনে গণেশ।)

হরি : কৈ রে গণেশ, এখানেও তো নেই?

গণেশ : তবে গেলো কোথায়? ওদিকে কোত্থাও তো পেলুম না?

হরি : যাবে আবার কোথায়? ঐ যে বললুম তোকে— তোদের বাড়ির কেউ এসে নিয়ে গেছে। মোক্ষদা টৌক্ষদা কেউ এসেছিলো হয় তো?

গণেশ : মোক্ষদা এলো, আমায় কিছু না ব'লে নিয়ে চলে গেলো?

হরি : তোকে দেখতে পায় নি হয় তো? তুই তো আমার ঘরে ব'সেছিলি! তাড়াতাড়ি ছিল বোধ হয়— নিয়ে গেছে।

গণেশ : নারে, আমার ভালো মনে হচ্ছে না। যদি কিছু হয়ে থাকে— গিন্নীমা কর্তাবাবু আর আস্ত রাখবে না!— বলি হ্যাঁরে, তোদের কর্তাবাবুর ঘরটা একবার দেখবি না কি?

হরি : ওরে বাস রে! সে আমি পারবো না! বাবু মা দুজনেই আজ ক্ষেপে আছে! আমি এই পাঁচ বচ্ছর চাকরি করছি এখেনে— এমন ক্ষ্যাপা ক্ষেপতে কোনো দিন দেখিনি!

গণেশ : তাই তো রে। তবে কী করি?

হরি : তুই বাড়ি যা। নিশ্চয়ই মোক্ষদা নিয়ে গেছে, দেখগে।

গণেশ : তাই দেখি। একবার রাস্তার আনাচ কানাচ খুঁজে দেখি — বেরিয়ে গেলো, না কী ক'রলো—

(গণেশের প্রস্থান। হরি মেঝে হইতে পেপারওয়েটটি কুড়াইয়া তুলিতে গিয়া টেবিলের নিচে ঘুমন্ত অণিমাকে দেখিয়া ফেলিল। ভূত দেখার মতো দুই পা পিছাইয়া আসিল। তারপর সাহস সঞ্চয় করিয়া স্বপ্ন না বাস্তব যাচাই করিতে সন্তর্পনে আর একবার উঁকি মারিয়াছে— অণিমা নড়িয়া উঠিলেন। হরি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। অণিমা উঠিয়া টেবিলের নিচ হইতে বাহির হইলেন। চোখে তখনও ঘুম।)

অণিমা : হরি! হরি!

(শঙ্কিত পদক্ষেপে হরির প্রবেশ)

তোর বাবু কোথায় রে?

হরি : আজ্ঞে বাবু তো বাথরুমে ছিলেন। তারপর বোধ হয় বেরিয়েছেন, বাড়িতে তো দেখছি নে?

অণিমা : (ব্যস্ত হইয়া) বেরিয়েছেন? কোন দিকে গেলেন?

হরি : আজ্ঞে আমি তো দেখি নি।

অণিমা : যা তো বাবা, একটু এদিক ওদিক দেখে আয়।

হরি : আজ্ঞে যাই।

অণিমা : শোন, যদি কাছেপিঠে না দেখতে পাস তো একবার সোমেনবাবুর বাড়িতে খোঁজ করে আসবি।

হরি : যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

অণিমা : কোথায় গেলো এই অবস্থায় আবার! (সহসা মনে পড়ায়) ইস্ ছি ছি! কি কাণ্ডটাই করেছি। হরিটাও বুঝি এসেছিলো একবার ঘরে।

(গালে হাত দিলেন। সাদা রং উঠিয়া আসিল)

ইস্ দেখেছো! হরিটা কী ভাবলো!

(দ্রুত প্রস্থান। অল্পক্ষণ পরে সোমেন ও ডঃ খাস্তগীরের প্রবেশ।)

সোমেন : ডক্টর খাস্তগীর, আপনি বসুন। বোধ হয় ভিতরে আছেন, আমি দেখছি।
(ছুটিয়া অণিমার প্রবেশ। কোলে একটি শিশু, তোয়ালে দিয়া সর্বাঙ্গ আবৃত।)

অণিমা : সোমেন বাবু— সর্বনাশ হয়ে গেছে!!

সোমেন : কী হোলো কী?

অণিমা : কী সব ভুতুড়ে ওষুধ আপনারা বার করলেন— আমি এখন কী করি—

সোমেন : হয়েছে কী বলুন না? ডক্টর সেনগুপ্ত কোথায়?

অণিমা : (শিশুটিকে দেখাইয়া হৃদয়বিদারক স্বরে) এই যে— আপনাদের ডক্টর সেনগুপ্ত!

সোমেন : কী যা তা বকছেন? একটু শান্ত হয়ে বসুন তো?

অণিমা : শান্ত হয়ে বসবো? শান্তি জীবনে যাতে না পাই, তারই তো ব্যবস্থা করেছেন! আমার সর্বনাশ করেছেন!

সোমেন : (ডঃ খাস্তগীরকে) সলিউশনের এফেক্ট এখনো কাটে নি, দেখছেন তো স্যার?

অণিমা : সোমেনবাবু, দোহাই আপনার— আমাকে পাগল ক'রে দেবেন না। সলিউশনের এফেক্ট এক ফোঁটাও আর আমার উপর নেই! থাকলে মুখের চুনকালি ধুতে বাথরুমে যেতাম না। আর বাথরুমে— বাথরুমে গিয়ে দেখি—

সোমেন : কী দেখলেন কী?

অণিমা : দেখলাম— ওঁর ট্রাউজার্স, অ্যাপ্রন সব একপাশে পড়ে রয়েছে-- আর উনি— (শিশুটিকে দেখাইয়া) উনি বাথটাবটার পেছনে বসে খেলা করছেন।

সোমেন : সে কী?

অণিমা : আমিও প্রথমে বুঝতে পারি নি। কিন্তু হরি বলেছিলো ওঁকে বাথরুমে যেতে দেখেছে। তারপর কখন বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন— কেউ দেখে নি।

খাস্তগীর : কিন্তু এ যে অসম্ভব!

অণিমা : আপনি—?

খাস্তগীর : নমস্কার?
(অণিমা প্রতি-নমস্কার না করিয়া কঠিন দৃষ্টিতে ডঃ খাস্তগীরের দিকে চাহিলেন)

অণিমা : আপনাদের ইনস্টিটিউট কি মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করবার জন্যে তৈরি হয়েছে? আপনারা রিসার্চ করবেন, আর মানুষ হবে তার গিনিপিগ?
(ডঃ খাস্তগীর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন)

খাস্তগীর : কিন্তু মিসেস সেনগুপ্ত— আমি— আমরা তো—

অণিমা : জানি জানি। বলবেন— আপনারা মানুষের কল্যাণের জন্যে গবেষণা করেন। আর তার জন্যে দু'একটা প্রাণ বলি দিতেই হয়। কিন্তু বলতে পারেন— আমি এখন কী করবো? আমাদের আট বছরের টুটুল এখন কী করবে?

খাস্তগীর : কিন্তু— মানে এরকম তো— উনি তো নিজেই—

অণিমা : হ্যাঁ, উনি নিজেই ওষুধ খেয়েছেন, সুতরাং আপনাদের তার দায়িত্ব থাকবে কেন? এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে ইনস্টিটিউটের নাম হবে, আপনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খাবেন, আর যে বার করলো— সে তার স্ত্রীর, তার ছেলের কোলে চড়ে ঘুরে বেড়াবে, আর ঝুমঝুমি বাজাবে!

সোমেন : বৌদি বৌদি— শুনুন! এ রকম মাথা গরম ক'রে কোনো লাভ আছে? তার

চেয়ে দেখি চেষ্টা ক'রে কী উপায় বের করা যায়। দেখি এইখানে শুইয়ে দিন তো—

(বড়ো চেয়ারটি ঘুরাইয়া দিলেন। অণিমা শিশুটিকে আঁকড়াইয়া এক পা পিছাইয়া গেলেন। চোখে অবিশ্বাস)

অণিমা : কী করবেন?

সোমেন : বৌদি, আপনি তো জানেন— ওঁর কোনো ক্ষতি আমি জেনেশুনে করবো না। (অণিমা শিশুটিকে সাবধানে শোয়াইয়া দিলেন। বালিশটি মাথার নিচে দেওয়া হইল। অণিমা ও সোমেন দুইদিকে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। ডঃ খাস্তগীরও আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন।)

অণিমা : দেখেছেন সোমেনবাবু? ঠিক সেই নাক, সেই মুখ— শুধু গোঁফটা নেই। ওগো শুনছো? তুমি একটু কথা বলতে চেষ্টা করো না? আমার কথা বুঝতে পারছো না?

সোমেন : ডক্টর সেনগুপ্ত! ডক্টর সেনগুপ্ত!

অণিমা : ঐ দেখুন! আপনি ডাকতেই আপনার দিকে ফিরেছেন। নাম মনে আছে নিশ্চয়ই!

খাস্তগীর : দেখুন— ইয়ে, ডক্টর সেনগুপ্ত! আমাকে চিনতে পারছেন?

অণিমা : (ঠোঁটে আঙুল দিয়া) স্ স্ স্ স্!

(ডঃ খাস্তগীর চমকাইয়া পিছাইয়া গেলেন।)

কী যেন বলবার চেষ্টা করছেন। ঐ দেখুন— ঠোঁট নড়ছে।

সোমেন : ডক্টর সেনগুপ্ত! আপনার কি কিছু মনে পড়ছে না? আমি চ্যাটার্জি— সোমেন চ্যাটার্জি। কাল আপনি আর আমি এই ঘরে কাজ করছিলাম?

খাস্তগীর : দেখুন ডক্টর সেনগুপ্ত, আমরা আপনাকে মানুষ করতে— মানে, ইয়ে— আপনাকে আবার 'আপনি'— অর্থাৎ ডক্টর সেনগুপ্ত করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনাকেও আমাদের সাহায্য করতে হবে।

অণিমা : ও রকম ক'রে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

খাস্তগীর : ভয় দেখাবো কেন? বোঝাবার চেষ্টা করছি তো?

অণিমা : আপনার গলা শুনে ভয় পাচ্ছেন। ঐ দেখুন— চোখ কী রকম গোল হয়ে উঠেছে। যেন কেঁদে ফেলবেন। ওগো শুনছো? একটু কথা বলতে চেষ্টা করো না? আমাকে চিনতে পারছো না?— সোমেনবাবু! কেমন যেন নির্জীব দেখাচ্ছে! কী হোলো?

সোমেন : বোধ হয় ঘুম পেয়েছে?

অণিমা : ঘুম পেয়েছে? ঘুম? (উঠিয়া) ঠিক হয়েছে।

সোমেন : (উঠিয়া) কী হয়েছে।

অণিমা : ঘুমোলে বোধ হয় ঠিক হয়ে যাবে। আমার তো তাই হোলো। কাল রাত্রে ওঁরও তো ঘুমিয়েই এফেক্টটা কাটলো।

খাস্তগীর : তা'হলে তো ওঁকে নিরিবিলি একটু ঘুমোতে দেওয়া দরকার!

অণিমা : আমি ওঁকে ও ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিই।

(শিশুটিকে লইয়া দরজা অবধি গিয়া আবার ফিরিলেন।)

না না, আপনারাও আসুন। আমি একা নিয়ে যেতে পারবো না। পথে যদি কিছু হ'য়ে যায়।

(অণিমা, সোমেন ও ডক্টর খাস্তগীর ভিতরে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে বাহির হইতে বেলার প্রবেশ।)

বেলা : কৈ, এখানেও তো কেউ নেই? কোথায় গেলেন আবার কে জানে? নাঃ, এবার পাগল হ'য়ে যাবো!

(ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। হরির প্রবেশ।)

হরি : মা, বাবুকে তো কোথাও দেখতে পেলাম না— কে? ওহো, ভুল ক'রে ফেলেছি, আমি বলি মা বুঝি ব'সে র'য়েছেন।

বেলা : হরি, উনি এ বাড়িতে এসেছেন?

হরি : আজ্ঞে, তা তো বলতে পারবো না? আমি বাড়ি ছিলুম না। আপনাদের বাড়িতেই গিয়েছিলুম। মা বললেন কি না— হরি, একবার যা, সোমেনবাবুর বাড়ি জিজ্ঞেস ক'রে আয় বাবু ওখানে গিয়েছেন কি না—

বেলা : আমাদের বাড়ি? কৈ, না তো? হরি, তোমার মা কোথায় দেখো তো একটু?

হরি : যে আজ্ঞে।

(হরির প্রস্থান। অল্প পরে সোমেন ও ডঃ খাস্তগীরের প্রবেশ।)

সোমেন : এই যে— বেলা— ইয়ে, ডক্টর খাস্তগীর, আমার স্ত্রী। (নমস্কার বিনিময়) তুমি আবার এলে যে?

বেলা : অণিমাদি ডক্টর সেনগুপ্ত সব কেমন আছেন দেখতে এলাম। যা সব আজগুবি রিসার্চ তোমাদের? ওহো— সরি ডক্টর খাস্তগীর।

খাস্তগীর : বিলক্ষণ! অন্যায় কিছু বলেন নি। বরং এমন রিসার্চ চালানোর জন্য আমারই অনুতাপ হচ্ছে।

বেলা : ওঁরা সব কোথায়?

সোমেন : বৌদি ডক্টর সেনগুপ্তকে ঘুম পাড়াচ্ছেন।

বেলা : ঘুম পাড়াচ্ছেন!!

খাস্তগীর : হ্যাঁ। থাবড়ে— মানে চাপড় মেরে—

সোমেন : ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে—

বেলা : থাবড়ে? গান গেয়ে?

খাস্তগীর : হ্যাঁ, বিছানায় কিছুতেই শুতে চাইছেন না ব'লে কোলেই রাখতে হ'য়েছে।

বেলা : কোলে??

সোমেন : দোলনা হ'লেই ভালো হোতো, কিন্তু বৌদি বললেন টুটুল বড়ো হয়ে জাহাজ জাহাজ খেলে দোলনাটা ভেঙে ফেলেছে।

(বেলা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দুইজনের দিকে চাহিয়া পিছাইতেছিলেন। একবার পিছনের টেবিলে বোতলগুলির উপর নজর গেল।)

আরে, তুমি কি ভেবেছো আমরাও ওষুধ খেয়েছি? কী মুস্কিল, আমরা ও ওষুধের ধারে কাছেও যাই নি!

খাস্তগীর : আমরা খাবো কেন? ডক্টর সেনগুপ্ত খেয়েছেন। তাই তো এই সব বিপদ!

সোমেন : ডক্টর সেনগুপ্তর বয়স এখন বছর খানেক!

বেলা : (অবিশ্বাসের চোখে তাকাইয়া) যাঃ!

সোমেন : আমাদের নিজের চোখে দেখা!

খাস্তগীর : বিশ্বাস না হয়— ও ঘরে দেখে আসুন! পা টিপে টিপে যাবেন—

(পা টিপিয়া টিপিয়া শম্ভুনাথ প্রবেশ করিলেন ভিতরের দিক হইতে। পরিধানে পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন। চোখে চশমা নাই। প্রথম নজরে পড়িল বেলার।)

বেলা : ডক্টর সেনগুপ্ত!

(শম্ভুনাথ ভীষণ চমকাইলেন। সোমেন ও ডঃ খাস্তগীরও চমকাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।)

শম্ভুনাথ : কে? ও—গুড মর্নিং ডক্টর খাস্তগীর, বসুন, বসুন।

(বড়ো চেয়ারটি ঘুরাইয়া দিলেন)

আপনি?—ওহো, চ্যাটার্জি। ইয়ে—আপনাকে তো ঠিক—মিসেস চ্যাটার্জি না কি?

বেলা : চিনতে পারছেন না?

শম্ভুনাথ : পেরেছি পেরেছি। ভালো দেখতে পাচ্ছি না। চশমাটা যে কোথায় গেলো—

সোমেন : আমি দেখছি খুঁজে—

খাস্তগীর : আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন—

বেলা : আপনি বসুন ডক্টর সেনগুপ্ত—

(সোমেন ও ডঃ খাস্তগীর মহা ব্যস্ত হইয়া চশমা খুঁজিতে লাগিলেন। বেলা শম্ভুনাথকে বড়ো চেয়ারটিতে বসাইয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন)

শম্ভুনাথ : (বিব্রত) আপনারা কেন— ছি ছি ছি— আপনারা বসুন। অণিমা কোথায়? অণিমাকে বরং—

সোমেন : এই যে পেয়েছি।

(একটি বড়ো বীকার হইতে চশমাটি উদ্ধার করিয়া শম্ভুনাথকে দিলেন)

শম্ভুনাথ : থ্যাঙ্কস্। (চশমা পরিয়া) আপনি হাওয়া করছেন কেন? কী মুস্কিল—

বেলা : (মিষ্ট হাসিয়া) তাতে কী হয়েছে? আপনি একটু রেস্ট নিন!

(সোমেন ইতিমধ্যে নোটবুক পেন্সিল বাগাইয়া ধরিয়াছেন)

সোমেন : এখন কেমন বোধ করছেন?

শম্ভুনাথ : কী আশ্চর্য, আমি তো— অণিমা কোথায় গেলো?

সোমেন : বৌদি তো আপনাকেই ঘুম পাড়াচ্ছিলেন?

শম্ভুনাথ : আমাকে—কী করছিলেন?

বেলা : ঘুম পাড়াচ্ছিলেন।

সোমেন : কোলে নিয়ে।

শম্ভুনাথ : কোলে?— ছি ছি, কী যা তা বলছেন?

সোমেন : সে কী? আপনার কিচ্ছু মনে পড়ছে না? ঐ যে— বাথরুমে— আপনি খেলা করছিলেন? তারপর বৌদি গিয়ে আপনাকে কোলে করে, তোয়ালে দিয়ে মুড়ে—

খাস্তগীর : আপনি কথা বলতে পারলেন না— ঘুম পেয়ে গেলো—

সোমেন : তাই বৌদি ও ঘরে নিয়ে চাপড়ে চাপড়ে— ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে— মনে নেই আপনার?

খাস্তগীর : ঐ যে ঐ গানটা— (সুর করিয়া) ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী—
(সহসা সচেতন হইয়া থামিয়া গেলেন। শম্ভুনাথ বিভ্রান্ত। অণিমার প্রবেশ।)

অণিমা : সোমেনবাবু, ঘুমিয়ে পড়েছেন— এ কী? তুমি?

শম্ভুনাথ : অণিমা, এঁরা কী সব বলছেন— কিছু বুঝতে পারছি না!

অণিমা : তুমি— তুমি এখানে কী ক'রে এলে?

শম্ভুনাথ : কেন, দরজা দিয়ে? ঐ দরজাটা—

অণিমা : না না, মানে বেরুলে কী করে? আমি তো তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সোজা আসছি!

শম্ভুনাথ : বেরুবো কেন? নামলাম তো!

অণিমা : নামলে? কোথা থেকে!

শম্ভুনাথ : ছাত থেকে।

অণিমা : ছাত থেকে??

সোমেন : ছাতে কী করছিলেন?

শম্ভুনাথ : ঘুমোচ্ছিলাম।

অণিমা : ঘুমোচ্ছিলে?

খাস্তগীর : ছাতে?

শম্ভুনাথ : (লজ্জিত) হ্যাঁ। বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে চান করতে ইচ্ছে করলো। চান ক'রে বড়ো ঘুম পেলো। তাই ছাতে গেলাম।

অণিমা : তাই— ছাতে গেলে?

শম্ভুনাথ : মানে— তখন কেমন যেন মনে হয়েছিলো ছাতটা ভালো জায়গা— বেশ নিরিবিলি—

(ভিতরের দিক হইতে গীতার প্রবেশ)

গীতা : এই যে, সব এখানে দেখছি। আমি এ ঘর ওঘর সব খুঁজে এলাম। এই যে শম্ভুবাবু— আজ হয়েছিলো কী আপনার? আগডুম বাগডুম কী সব বললেন ফোনে— উনি বললেন একবার খোঁজ করে দেখতে। তা ছাড়া টুটুলকে আরো দিন দুই রাখবো, তাই ভাবলাম একবার বলে যাই— ও মা!

(ডঃ খাস্তগীরকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন)

অণিমা : ইনি ডক্টর খাস্তগীর— ওঁদের ইন্‌স্টিটিউটের ডায়রেক্টর। সোমেনবাবু আর বেলাকে তো চেনোই। ইনি আমার বৌদি।

গীতা : হ্যাঁ ঠাকুরঝি, ও ঘরের বিছানায় শুয়ে ওটি কে? বেশ ফুটফুটে দেখতে—

সোমেন : উনি ডক্টর সেনগুপ্ত— অর্থাৎ— (থামিয়া গেলেন)

অণিমা : এখন অবশ্য নয়। একটু আগে ছিলেন—

খাস্তগীর : তবে এখনো কী ক'রে আছেন তা ঠিক—

সোমেন : আপনি ও ঘরে দেখলেন? এখনি?

(হরির প্রবেশ)

হরি : মা, একটা কথা—

অণিমা : এখন যা। এখন বিরক্ত করিস নি!

হরি : আজ্ঞে না। শুধু বলতে এলুম— খোকাকে নিয়ে গেলো।

অণিমা : খোকাকে নিয়ে গেলো!!

সোমেন : সে কী? কোন খোকা??

হরি : ঐ যে ও ঘরে বিছানায় ঘুমুচ্ছিলো? ও ঐ গলির মোড়ের উকিল বাবুদের ছেলে।

সোমেন-অণিমা-বেলা-খাস্তগীর (একসঙ্গে) : অ্যাঁ??

হরি : আজ্ঞে হ্যাঁ। গণেশ আমার দেশের লোক, ওদের বাড়ি কাজ করে। ওকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলো। তা কোন্ ফাঁকে গিয়ে ও ঘরে খাটে উঠে ঘুমিয়েছে। বড়ো দুরন্ত ছেলে—

অণিমা : আগে বলিস নি কেন হতভাগা?

হরি : আজ্ঞে আমি মোটে এই মাত্তর দেখলুম! গণেশ ঘুরে এসে বললে—

অণিমা : (তাড়াতাড়ি) আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে— তুই এখন যা।

(ডঃ খাস্তগীর রুমাল দিয়া ঘাম মুছিয়াছেন। তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া ট্যাঙ্কটি দেখিয়া এক গ্লাস জল লইয়া খাইয়াছেন। বেলাও দেখাদেখি জল খাইলেন।)

গীতা : কী ব্যাপার বলো তো ঠাকুরঝি? আমি তো এক বর্ণও বুঝতে পারছি না।

অণিমা : (চিৎকার করিয়া) বৈজ্ঞানিক কাকে বলে জানো বৌদি? পাগলকে! ঐ যে বসে আছে! (শম্ভুনাথ কুঁকড়াইয়া গেলেন) ঐ যার সঙ্গে তোমার কর্তা আর তোমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার বিয়ে দিয়েছেন! এর চেয়ে হাত পা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিলে পারতেন!

(ডঃ খাস্তগীর হাতের গুলি ফুলাইয়া নবলব্ধ যৌবন উপলব্ধি করিতেছিলেন। তারপর টেবিল হইতে রুলার লইয়া তর্জনীতে খাড়া রাখিবার দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্যপৃত হইয়াছেন। বেলা রুলারটি ফেলিয়া দিতে গিয়া তাড়া খাইয়াছেন। আর কেহ এ সব দেখেন নাই।)

গীতা : আঃ ঠাকুরঝি? কী যা তা বকছো?

অণিমা : (লজ্জিত হইয়া) সোমেনবাবু, কিছু মনে করবেন না। ডক্টর খাস্তগীর, আমি—

(থামিযা গেলেন। চোখে চোখ পড়িবামাত্র ডঃ খাস্তগীব বগ দেখাইয়া জিভ বাহির করিয়া একটি বিকট ভেংচি কাটিয়াছেন। বেলা ইতিমধ্যে ডঃ খাস্তগীরের কোটের পকেট হইতে নিপুণ হস্তে রুমালটি তুলিয়া লইয়াছেন। হাতের চুড়ি হইতে সেফ্‌টিপিন খুলিয়া রুমাল দিয়া ডঃ খাস্তগীরের কোটের পিছনে লাঙ্গুল সৃষ্টি করা একটি সৎকার্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল।)

গীতা : আমার মাথাটা ঘুরছে! একটু জল!

(শম্ভুনাথ গীতাকে বসাইয়া দিলেন। সোমেন ছুটিয়া ট্যাঙ্কের কল খুলিয়া জল লইয়া আসিলেন। গীতা এক নিশ্বাসে জলপান করিলেন। ডঃ খাস্তগীরের লাঙ্গুল ঝুলিয়াছে। তিনি তখনও ফুটরুলের খেলা লইয়া ব্যস্ত, অতো দেখেন নাই।)

সোমেন : এ কী হলো! ডক্টর সেনগুপ্ত, কিছু বুঝতে পারছেন?

শম্ভুনাথ : তাই তো! এরা তো কেউ সলিউশন এক্স খায় নি!

সোমেন : তবে কী—

শম্ভুনাথ : কী?

সোমেন : হয় তো— হয় তো সলিউশন এক্সের আসলে কোন এফেক্ট নেই।

শম্ভুনাথ : আপনার কি এখনো বিশ্বাস হয় নি চ্যাটার্জি?

(সোমেনের অবিশ্বাসে শম্ভুনাথের ক্ষুব্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। গীতা বর্তমানে ভ্যানিটি ব্যাগ লোফালুফি করিতেছেন। বেলা ডঃ খাস্তগীরের সদ্যলব্ধ লাঙ্গুল ধরিয়া টানাটানি করায় তিনি বেলাকে রুলার পেটা করিবার চেষ্টায় আছেন। অণিমা— "বৌদি" "ডক্টর খাস্তগীর" "বেলা" বলিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিয়া তিনজনের কাছেই তাড়না ভোগ করিতেছেন।)

সোমেন : ভেবে দেখুন। ইন্‌স্টিটিউটে টেস্ট ক'রে তো কিছুই পাওয়া গেলো না। আমি নিজেও তো খেয়েছি!

শম্ভুনাথ : আপনি কি বলতে চান—

সোমেন : আমি বলতে চাই— এ সব এমন কিছুর এফেক্ট, যা এ ঘরে আছে, কিন্তু ইনস্টিটিউটে নেই।

শম্ভুনাথ : তাই তো! এখন মনে পড়ছে— গতবারে আমিও তো সলিউশন খাই নি?

সোমেন : (চিৎকার করিয়া) কী আশ্চর্য! জল!

(ছুটিয়া ট্যাঙ্কের নিকট গেলেন। কল হইতে জল হাতে লইয়া মুখের কাছে লইলেন, কিন্তু বেলা, গীতা ও ডক্টর খাস্তগীরের কার্যকলাপ দেখিয়া ভরসা হইল না। ঢাকনাটি খুলিয়া ভিতরে হাত চালাইয়া টুটুলের রাখা বীকারটি বাহির করিয়া সামনের দিকে আসিলেন। শম্ভুনাথ ও অণিমাও সঙ্গে আসিলেন। গীতা, বেলা ও ডঃ খাস্তগীর তখন জটলা করিয়া কী যেন পরামর্শ করিতেছেন।)

অণিমা : কী হোলো সোমেন বাবু?

শম্ভুনাথ : কী ওটা?

সোমেন : এইটাই যতো নষ্টের মূল। কিন্তু এটা যে কী এবং কী ক'রে এখানে এলো— আমার বুদ্ধির বাইরে।

(তিনজনে বীকারটিকে পরীক্ষা করিতেছেন— সহসা চমকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা, গীতা ও ডঃ খাস্তগীর মিলিত চিৎকারে সংগীত ধরিয়াছেন— সেই সঙ্গে নৃত্য। নৃত্যটি ব্রতচারী না পোলকা, সুর কোন পর্দায় রহিয়াছে— এ সকল তথ্য ঐ তাণ্ডব হইতেও বিশেষজ্ঞরা হয়তো বাহির করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই যবনিকা নামিয়া আসিল।)

বড়ো পিসীমা

মুখবন্ধ

'বড়ো পিসীমা' রচনার কাল—উনিশ-শো উনষাটের মাঝামাঝি। স্থান—লন্ডন। প্রেরণা—একাধিক নাট্যপ্রচেষ্টায় জড়িত লক্ষাধিক ঝামেলা।

ইহা ছাড়া আর একটি কথা বলিবার আছে। যদি কোনও সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় এ নাটক মঞ্চস্থ করিয়া ফেলেন, তবে প্রকাশকের ঠিকানায় আমাদের নিমন্ত্রণপত্র দিলে বাধিত হইব। না দিলে, যদি টের পাই, আড়ালে কটুকাটব্য করিতে পারি।

বাদল সরকার

বড়ো পিসীমা

প্রথম অভিনয়
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০
এ.বি.টি.এ. হল

প্রযোজনা
চক্র

ভূমিকালিপি
(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

অনু	নাটকের নায়িকা	অঞ্জলি বসু
ধ্রুবেশ	নাটকের দুর্বৃত্ত	দেবজ্যোতি গুহ
অনাথ	নাটকে ভৃত্য	সমরেশ সেন
নিতাই	নাট্যপরিচালক	মোহন পাল
রাজীব	নাটকের নায়ক	সোমেন মিত্র
স্মারক	প্রম্প্টার / ট্রেজারার	সিদ্ধেন্দ্র মিত্র
বনানী	নাটকের সহনায়িকা	অর্চনা দাশগুপ্ত
শশাঙ্ক	নাটকের চরিত্র	শ্যাম সরদার
মিঃ সেন	বনানীর স্বামী	বিজন দাশগুপ্ত
শম্ভু	মঞ্চাধ্যক্ষ ও অভিনেতা	বাদল সরকার
যোগীন	অনুর পিতা	শ্যামল চক্রবর্তী
বড়ো পিসীমা	অনুর পিসীমা	পুতুল সরকার
পিসেমশাই	অনুর পিসেমশাই	প্রতীপ দত্ত
খোকা	শম্ভুর ভাইপো	অভিজিৎ সরকার
খুকু	শম্ভুর ভাইঝি	ভারতী সরকার
জগৎ	নাট্যকর্মী	সুফল পাল
অনন্ত	নাট্যকর্মী	আশিস ঘোষ
বৌদি	শম্ভুর বৌদি	বিজয়া সরকার

নেপথ্য-সহায়তায় :
লিলি সেন, বিশ্বনাথ বসাক, অমিয় ভট্টাচার্য ও অজিত বসু

প্রথম অঙ্ক

(একতলার ফ্ল্যাটের বসিবার ঘর। পিছনে ডানদিক ঘেঁসিয়া দরজা, সংলগ্ন বারান্দায় যাইবার। বর্তমানে বন্ধ। বামদিকে অন্দরের পথ, অন্যদিকে সদর দরজা। পিছনে বামদিকে একটি জানালা—খোলা। দরজা ও জানালার মধ্যবর্তী অংশে একটি 'ডিভান'। মঞ্চের মধ্যস্থলে একটি ছোট টেবিল এবং দু'টি সাধারণ চেয়ার। একপাশে একটি বড়ো গদি আঁটা চেয়ার।

যবনিকা সরিবার পূর্বমুহূর্ত হইতেই নায়িকার গলা শোনা যাইবে। যবনিকা পুরা খুলিবে না, দুইপাশে অল্প আড়াল থাকিবে। দুর্বৃত্ত আরাম কেদারায় আরামে উপবিষ্ট; হাতে নির্বাপিত পাইপ, যদিও টানিতে বাধিতেছে না। টেবিলে ছাইদান, সিগারেট ও দেশলাই কাঠির দগ্ধাবশেষে পূর্ণ। নায়িকা টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া, টেবিলে রাখা হাত অল্প কাঁপিতেছে। তাহার মুখভাবে স্নায়বিক উত্তেজনা চাপা দিবার চেষ্টা প্রকট।)

নায়িকা : আপনার আর কিছু বলবার আছে?

দুর্বৃত্ত : না, আমার যা বলবার বলেছি। তোমার উত্তর শোনবার জন্য কান পেতে আছি।

নায়িকা : আপনার কষ্ট করে কান পেতে থাকবার দরকার নেই। আমার কী জবাব, তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আপনার আছে বলেই আমার ধারণা।

দুর্বৃত্ত : তোমার প্রথম জবাবটা কী, সেটা আমার জানা আছে।

নায়িকা : আমার প্রথম জবাব শেষ জবাব সব জবাব—না! এবং আপনার যদি আর কিছু বলবার না থাকে—

দুর্বৃত্ত : ধীরে প্রমীলা ধীরে! এইবার আমার আরো কিছু বলবার সময় এসেছে। বলতে না হলেই ভালো ছিল, কিন্তু তুমি যখন তাতে রাজি নও—(সহসা স্বর বদলাইয়া) তুমি রাজীবকে ভালোবাসো?

নায়িকা : (চমকাইয়া) আমি—তাতে—সে কথায় আপনার কী?

দুর্বৃত্ত : (আবার আরামে এলাইয়া, পূর্বস্বরে) আমার? আমার কিছু না। যা কিছু তোমারই। রাজীবের সঙ্গে আমার প্রণয়ের সম্পর্ক নেই; তার বাবার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বৈষয়িক সম্পর্ক আছে মাত্র। বন্ধুভাবে তোমাকে একটা কথা শুধু জানিয়ে রাখতে চাই—রাজীবের বাবার হাত এবং পুলিশের হাতকড়ার মধ্যে শুধু একটি মাত্র ব্যবধান আছে—আমার হাতের একখানি সই।

নায়িকা : (মুখ রক্তহীন, হাত আরো কাঁপিতেছে) অসম্ভব! মিথ্যে কথা!

দুর্বৃত্ত : ঘটনাটা যে অসম্ভব নয় একথা তুমি ভালো করেই জানো। রাজীব তোমার কাছে লুকোবে হয়তো, কিন্তু রাজীবের বাবার ব্যবসায়গত অবস্থা তোমার কর্ণগোচর করবার মতো হিতৈষী বান্ধবের অভাব সংসারে এখনো হয়নি। এবং মিথ্যে যে নয়, সেটা কাগজে কলমে প্রমাণ করে দিতে পারি, যদি চাও। হিসেব বেশি জটিল নয়, বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমারও আছে বলেই আমার ধারণা।

নায়িকা : (চাপা ক্রুদ্ধস্বরে) বেরিয়ে যান! বেরিয়ে যান আপনি!

দুর্বৃত্ত : (বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়া না করিয়া) বলো—যাচ্ছি। আসছে মঙ্গলবার এই সময়ে আমি একবার আসবো। এর মধ্যে রাজীবের কাছে অথবা লোকমুখে দু' একটা নতুন খবর পাবে হয় তো। মঙ্গলবারে যদি দরজা না খোলো, তবে বুধবারে খবরের কাগজে রাজীবের বাবার পাকা খবরটা পাবে।

নেপথ্যে ভৃত্য : দিদিমণি!

দুর্বৃত্ত : ভাববার এক সপ্তা সময় আছে, তাড়াহুড়ো কোরো না। (দাঁড়াইল) আর যদি আগেই মনস্থির হয়ে যায়—শনিবার রাতে শশাঙ্কবাবুর বাড়ি পার্টিতে আমার দেখা পাবে।

নায়িকা : বেরিয়ে যান! (কিন্তু কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর। দুর্বৃত্ত দুর্বৃত্তসুলভ বাঁকা হাসি হাসিয়া যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইল। নায়িকা কয়েক সেকেন্ড কাঁপিয়া চেয়ারে লুণ্ঠিত হইয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মথিত হইল।)

(ভৃত্যের প্রবেশ। ভৃত্যের মতো পোশাক নয়। জামাকাপড় ফর্সাই, এবং হাতে ঘড়ি, পকেটে কলম শোভিত।)

ভৃত্য : দিদিমণি! মা ডাকছেন! আপনাকে খাবেন। আসুন।

(সহসা বহুকণ্ঠে হাসি শোনা গেল। যবনিকা এতক্ষণে পূর্ণ উন্মোচিত হইল। দেখা গেল দুই পাশে মোড়া চেয়ার এবং মেঝেয় বসা দাঁড়ানো পাঁচটি তরুণ এবং একটি সুসজ্জিতা তরুণী। সকলের মুখ নায়িকার দিকে, অর্থাৎ দর্শকদের বিপরীতমুখী। ইহাদের একজনকে আমরা চিনি—সে দুর্বৃত্ত। অন্যদের একজন নায়ক, একজন সহ-অভিনেত্রী। নিচু একটি টুলে বই হাতে যুবকটিকে স্মারক বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয় না। মহিলাটি সহ-অভিনেত্রী। ইহারা সকলেই হাসিতেছে, এমন কি নায়িকা এবং দুর্বৃত্তও, এবং দুর্বৃত্তের হাসি নির্জলা আনন্দের হাসি। যে ভদ্রলোকের মুখে হাসি নাই, হতচকিত ভৃত্যের মুখোমুখি তাঁহার মারমুখী ভঙ্গীতে আন্দাজ করা যায়—তিনি পরিচালক।)

পরিচালক : পরশু থিয়েটার—মধ্যে আর একটা দিন! আজও মাকে মেয়ে খাওয়াচ্ছো? সেদিন একমাঠ লোকের সামনে কী কেচ্ছাটি হবে একবার ভেবে দেখেছো?

ভৃত্য : (দুর্বলস্বরে) সেদিন ঠিক হয়ে যাবে নিতাই-দা।

নিতাই : এই অ্যাদ্দিন ধরে তো দেখছি! এই ক'টা কথা—'মা ডাকছেন আপনাকে। খাবেন আসুন।—তা রোজই রকমফের! 'মাকে খেতে ডাকুন,' 'মা খেতে যাবেন, নিয়ে আসুন'—

ভৃত্য : কথাগুলো তো এবার ঠিক বলেছিলাম নিতাই-দা!

(নিতাই ফাটিয়া পড়িতে গিয়া হাল ছাড়িয়া একপাশে সরিয়া গেল)

নায়ক : আমি একটা কথা বলবো নিতাইদা? (নিতাই হালছাড়া সম্মতিতে হাত নাড়িল) ঐ 'আপনাকে' কথাটা বাদ দিয়ে দিন। শুধু থাক—'মা ডাকছেন, খাবেন আসুন'; তবে অন্তত মাকে কন্যাভক্ষণ থেকে বাঁচানো যাবে।

নিতাই : ঠিক আছে। প্রম্প্টার! 'আপনাকে' কাটা। দু'টো বইয়েই কেটো। অন্য বইটা কোথায় গেলো? (নিতাই এবং দু' একজন খুঁজিল।)

দুর্বৃত্ত : অন্য বইটা আপনার হাতে নিতাইদা।

নিতাই : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ! ধরো প্রম্পটার— (বই ছুঁড়িল)

ভৃত্য : (আশান্বিত) আর একবার বলবো নিতাইদা? (নায়িকাকে) আর একবার যদি—

নায়িকা : আর আমি কাঁদতে পারবো না! কতোবার কাঁদা যায় বলুন? সবশুদ্ধ চারটে সীনে ছ'টা কান্না। শেষ দৃশ্যে তো প্রায় একনাগাড়ে কেঁদে যাওয়া। নিতাইদা ভালো বই বের করেছেন বেছে—'কালবৈশাখী'।

নিতাই : বই কি সাধে বের করেছি? তুমি আর মিসেস সেন ছাড়া এই একশো ছত্রিশটা ফ্ল্যাটে তৃতীয় কেউ নামতে রাজি হোলো? দু'টি স্ত্রীচরিত্রে বাংলা ভাষায় কটা নাটক পাওয়া যায়?

নায়ক : থাক নিতাইদা, আবার শুরু করবেন না। এই 'কালবৈশাখী' দেখেই হাততালিতে সামিয়ানা উড়িয়ে দেবে দেখবেন।

ভৃত্য : (ফাঁক পাইয়া) কাঁদতে হবে না, যদি আর একবার বসেন ঐখানে, অমনি ঘাড় গুঁজে—

নিতাই : বলো। বলে নাও। অনু, বোসো আর একবার ঘাড় গুঁজে। (অনু বসিল)

ভৃত্য : দিদিমণি! মা ডাকছেন। খাবেন আসুন।

(বলিয়াই সাফল্যের আনন্দে একমুখ হাসিয়া নিতাইয়ের দিকে ফিরিল)

নিতাই : ঠিক হয়েছে। শুধু স্টেজে হাসিটা বাদ দিও, আর উইংস-এর দিকে আমাকে খুঁজো না। নাও এবার, সময় নেই বেশি—নেক্সট্!

স্মারক : দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। শশাঙ্কশেখরের বৈঠকখানা। রাত্রি আটটা। পার্টি চলিতেছে। শশাঙ্ক, প্রমীলা, বনানী, রাজীব, ধ্রুবেশ, ললিত।

(সকলে চেয়ারগুলি সারিবন্দী অর্ধচন্দ্রাকারে সাজাইতে লাগিল। টেবিলটা একপাশে গেল। নিতাই পরিচালনা করিতে লাগিল।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। রাজীব, ধ্রুবেশ, শশাঙ্ক ও বনানীর পিতৃমাতৃদত্ত নাম একটি করিয়া অবশ্যই আছে: প্রয়োজনের তাগিদে সেগুলি মাঝে মাঝে প্রকাশও হয়। কিন্তু থিয়েটারের আমলে থিয়েটারি নামগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘাড়ে এমনভাবে চাপিয়া বসে যে আসল নামগুলি লইয়া বেশি টানাটানি করিলে সকলেরই গুলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব এই চারজনের অন্তত আসল নাম লইয়া ঘাঁটাইয়া কাজ নাই, বিশেষ যখন পরশু থিয়েটার—মধ্যে মাত্র একটি দিন।)

নিতাই : প্রমীলা (অনু বসিল)। শশাঙ্ক (সহ-অভিনেতা দাঁড়াইল)। ধ্রুবেশ (দুর্বৃত্ত বসিল)। রাজীব (নায়ক বসিল)। বনানী—কই মিসেস সেন, আসুন! (বনানী হিল্লোলিত ভঙ্গীতে বসিতে গেল। নিতাই চেষ্টাকৃত ধৈর্যে) ওটা নয় মিসেস সেন। ওটা ললিতের। আপনার ধ্রুবেশের পাশে, মনে নাই বোধ হয়? (শেষ কথাটি অতিরিক্ত সুমিষ্টস্বরে—গত বহু রিহার্স্যালের দুর্ভোগ বহন করিয়া)

বনানী : (মধুর হাস্যে) ও হ্যাঁ। (যথাস্থানে)

নিতাই : ললিত! ললিত কোথায়? শম্ভুটা এখনো এলো না? অনাথ—ডাকো ডাকো, শম্ভুকে ডাকো!

(অনাথ পিছনের দ্বার খুলিয়া বারান্দায় গেল।)

বনানী, আপনি আর একটু ওপাশে—ধ্রুবেশের দিকে ঘেঁসে,—না, না, অতোটা নয়, হ্যাঁ ঠিক আছে। শশাঙ্ক আর এ-কটু ঘুরে দাঁড়াও—হ্যাঁ। কই ললিত? যাক

গে শুরু করে দাও। ললিতের কথা অনেক পরে। রেডি? (স্মারককে ইঙ্গিত করিয়া এককোণে গেল। অভিনয় চলিতে লাগিল।)

শশাঙ্ক : আপনারা যদি অনুমতি করেন, আমি একটা নিবেদন করি।

অন্য সকলে : বিলক্ষণ। নিশ্চয়। Out with it! (ইত্যাদি)

শশাঙ্ক : আমি বলছিলাম—দু একটা গান যদি হয়, তবে আসরটা জমতে পারে। অতএব আমার অনুরোধ, মহিলাদের তরফ থেকে যদি—

অনু (বর্তমানে প্রমীলা) : আমাকে আজ মাপ করতে হবে। আমার শরীরটা তেমন—বরং বনানী একটা—

বনানী : আমার গলাটা আজ—সত্যি বলছি—

ধ্রুবেশ : দেখুন, গানের অনুরোধে প্রাথমিক রীতিরক্ষাগুলো যদি বাদ দিতে পারেন, আমরা খানিকক্ষণ বেশি আনন্দ পেতে পারি।

বনানী : রীতিরক্ষা নয়, সত্যি বলছি। আচ্ছা শোনাচ্ছি না হয় একটা। পরে যেন গালমন্দ করবেন না! কেউ যদি অর্গ্যানে বসেন—

শশাঙ্ক : অর্গ্যানে বসবার তো এক বিশ্বজিৎ ছিল। সে যে এখনো কেন আসছে না—

(অনাথের প্রবেশ। হাতে নারিকেল দড়ির একটি কুণ্ডলী।)

অনাথ : বাঁশ পোঁতা শেষ না হলে আসতে পারছে না!

(সকলে স্তম্ভিত। পরে দু' একটি হাসি।)

নিতাই : অ্যাঁ?

অনাথ : দুটো বাঁশ বাকি আছে। শম্ভু বললো—চালিয়ে যাও, শেষ করে যাচ্ছি।

নিতাই : ও আচ্ছা। সরে এসো এ পাশে। আর রিহার্স্যালের সময়ে অমন হুট করে ঢুকো না। হাতে কী?

অনাথ : দড়ি (নিতাই তবু সপ্রশ্ন) নারকোল দড়ি।

নিতাই : তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন?

অনাথ : শম্ভু বললো ঘরে রাখতে। কাল সকালে লাগবে।

নিতাই : ও। রাখো ওই কোণে। রেডি! প্রম্প্‌ট্‌!

শশাঙ্ক : অর্গ্যানে বসবার তো এক বিশ্বজিৎ ছিল। সে যে এখনো কেন আসছে না—

(বাহিরের দরজায় মিঃ সেনের গলা)

নেপথ্যে মিঃ সেন : আসতে পারি কি?

নিতাই : (দাঁতের ফাঁকে) মাই গুড্‌নেস্‌!

বনানী : (উৎসাহিত) এসো এসো!

(মিঃ সেনের প্রবেশ। বিনীত, অমায়িক, নিরীহ ভদ্রলোক।)

মিঃ সেন : হেঁ হেঁ, নমস্কার। ডিস্টার্ব করলাম বোধ হয়?

বনানী : না না। এইমাত্র সেকেন্ড অ্যাক্টের ফার্স্ট সীন্‌ শুরু হোলো। কিছু মিস্‌ করো নি। বসে যাও।

মিঃ সেন : হেঁ হেঁ—

নিতাই : বসুন মিঃ সেন। ওদিকে নয়, এই চেয়ারটায়—যদি কিছু মনে না করেন। ও দিকটা স্টেজ।

মিঃ সেন : ভেরি সরি। কী রকম চলছে আপনাদের? আমি কিন্তু—

নিতাই : (সংক্ষেপে) ভালোই। রেডি? প্রম্প্ট্!

শশাঙ্ক : অর্গ্যানে বসবার তো এক বিশ্বজিৎ ছিল। সে যে এখনো কেন আসছে না—
(দুম করিয়া পিছনের দরজা খুলিয়া শম্ভুর প্রবেশ। হাতে বৃহদাকার একটি হাতুড়ি। বুক পকেটে প্লায়ার্স উঁকি মারিতেছে। বোতাম খোলা ঘর্মাক্ত হাফ্ শার্ট, ট্রাউজার ইস্ত্রীহীন এবং নিচে ভাঁজ দুই-তিন দুটানো।)

শম্ভু : সরি! বাঁশগুলো শেষ না করিয়ে আসতে পারছিলাম না। অনাথ ভাই, তুই ধাঁ করে একবার বাজারে যা দিকি, সের খানেক নারকোল দড়ি এনে রাখ এ ঘরে, কাল ভোরেই লাগবে। কোথায় বসতে হবে?

(অনাথের প্রস্থান)

মিঃ সেন : (সাহায্য করিতে উৎসুক) অর্গ্যানে বোধ হয়—

শম্ভু : অর্গ্যানে??
(নিতাই মিঃ সেনের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নীরবে ললিতের চেয়ার দেখাইয়া দিল।)

নিতাই : হাতুড়িটা রাখো। (শম্ভু পাশের টেবিলে হাতুড়ি রাখিল) রেডি? প্রম্প্ট্!

শশাঙ্ক : অর্গ্যানে বসবার তো এক বিশ্বজিৎ ছিল। সে যে এখনো কেন—
(বাহিরের দরজায় করাঘাত। নিতাইয়ের উষ্ট্রকুঞ্জে শেষ খড়। হাঁক আসিল—'টেলিগ্রাম বাবু!')

অনু : (উঠিয়া) টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম কে পাঠালো আবার—

(বাহিরের দিকে প্রস্থান)

নিতাই : (স্মারককে দুর্বলস্বরে) ও লাইনটা বাদ দিয়ে পরের লাইনটা ধরো।

অনু : (টেলিগ্রাম হাতে প্রবেশ করিয়া) এখুনি আসছি! (ভিতরে প্রস্থান। তাহার গলা শোনা গেল) বাবা টেলিগ্রাম—আমি আটকে আছি, পরে শুনে যাবো কী ব্যাপার—

(প্রায় ছুটিয়া প্রবেশ)

নিতাই : রেডি? পরের লাইন—প্রম্প্ট্!

ধ্রুবেশ : বিশ্বাস করুন, আমি অর্গ্যানে বসতাম, যদি চাবিগুলোর একটাও চিনতাম। উপস্থিত অন্য সকলের অবস্থা যদি একই রকম হয়, তবে আমি বলি—
(ভিতর হইতে অনুর পিতা যোগীনবাবুর উদ্‌ভ্রান্ত প্রবেশ। হাতে খোলা টেলিগ্রাম।)

যোগীন : অনু! বড়দি আসছে!!

অনু : (অনুরূপ উদ্‌ভ্রান্ত) বড়ো পিসী!!

যোগীন : সাড়ে সাতটায় ট্রেন ইন্ করবার কথা। সওয়া সাতটা বেজে গেছে—স্টেশনে যাবার সময়ও নেই! যাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে, যদি আমার কপালে গাড়ি লেট্ করে। পোস্ট অফিসগুলো একটু কম দেরি করে ট্রেনগুলো যদি একটু বেশি দেরি করতো—(হঠাৎ সচকিত হইয়া) ও, আয়্যাম্ অফুলি সরি—কিন্তু ব্যাপারটা হোলো, হয় তো তোমরাও, মানে তোমাদের এই থিয়েটারও—অনু, তুই বুঝিয়ে বলিস, আমার সময় নেই! (বাহিরের দিকে)

মিঃ সেন : (উঠিয়া সদালাপী হাস্যে) নমস্কার প্রফেসর চ্যাটার্জি। ইয়ে—ভালো আছেন?

যোগীন : অ্যাঁ? ও, নমস্কার (ছুটিতে ছুটিতে) হ্যাঁ ভালো—আপনি?

(প্রস্থান)

অনু : বড়োপিসী আসছে!

নিতাই : (বিপদের গন্ধ পাইয়া) কী হোলো? ব্যাপার কী অনু?

অনু : সাড়ে সাতটা! (সচকিত) কটা বাজে এখন?

দু'তিনজন একসঙ্গে : সওয়া সাতটা। সাতটা সতেরো। (ইত্যাদি)

অনু : হাওড়া থেকে এখানে আসতে কতোক্ষণ লাগে? ট্যাক্সিতে?

দু'তিনজন একসঙ্গে : আধ ঘণ্টা। মিনিট কুড়ি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কী বলছো কী? কুড়ি মিনিটের এক সেকেন্ড বেশি নয়। স্টেশন থেকে বেরুনো ট্যাক্সি ধরা—সেগুলো? হাওড়া স্টেশনে আজকাল ট্যাক্সি পাওয়া—(ইত্যাদি)

শম্ভু : আঃ! (স্তব্ধতা) আধ ঘণ্টা খানেক লাগে। কেন?

অনু : দেখছিলাম কতোটা সময় আছে হাতে। (উত্তেজিত ব্যস্ততায় বলিয়া চলিল।) শুনুন নিতাইদা, সব গোলমাল হয়ে যাবে! মানে বড়োপিসী এলে—আর এলে কী? আসছে! টেলিগ্রামে—সাড়ে সাতটায় গাড়ি ইন্ করবে, আর মোটে আধ ঘণ্টা, সব কিছু—নিতাইদা, সম—স্ত কিছু ভেস্তে যাবে—

নিতাই : (আরো ব্যস্ত হইয়া) কেন—কী—ভেস্তে যাবে কেন? কী বলছো তুমি? পরশু প্লে—মধ্যে মোটে একটা দিন—(অন্য দু' একজনের গলাও যোগ দিল)

শম্ভু : নিতাইদা! (স্তব্ধতা। শম্ভু অগ্রসর হইয়া অনুর মুখোমুখি দাঁড়াইল। শান্ত কিন্তু কর্তৃত্বময় কণ্ঠে) অনু, বোসো!

অনু : বসবো? কিন্তু আমি—বড়োপিসী যে—

শম্ভু : (পূর্ববৎ) বোসো! (অনু বসিল) প্রচুর সময় আছে হাতে। আধঘণ্টা। একটা স্টেজ বেঁধে ফেলা যায় দরকার হলে আধ ঘণ্টায়। তোমার বড়োপিসী আসছেন। তিনি তোমার থিয়েটার করা পছন্দ করবেন না, এই তো?

অনু : শুধু পছন্দ—?

শম্ভু : (বাধা দিয়া) থিয়েটার করতে দেবেন না। এই বলতে চাও তো? (অনু ঘাড় নাড়িল) শোনো। (কাটিয়া কাটিয়া) তুমি আর মিসেস্ সেন, বিশেষ করে তুমি উৎসাহ করে রাজি না হলে আমরা এই বাউণ্ডুলের দল (হাতের সাধারণ ভঙ্গী—মিঃ সেন শিহরিলেন) হাজার ইচ্ছে থাকলেও থিয়েটার করতে পারতাম না। আমরা সবাই মিলে হল্লা করেছি, স্টেজ বেঁধেছি, পাল খাটিয়েছি, চাঁদা তুলেছি, পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকেছি—এক কথায় দল বেঁধে আনন্দ পেয়েছি, পাচ্ছি, দিতে চাইছি। এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না, এবং ছেলে মেয়ে একসঙ্গে অভিনয় করলেও সবাই অধঃপাতের দিকে গড়াতে শুরু করে না—সে কথা নিতাইদা এতোদিনের রিহার্স্যালে প্রতি মিনিটে প্রমাণ করেছে। তোমার বাবা বোঝেন! আপত্তি দূরে থাক, তিনি বরাবর উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক কি না?

অনু : (অনেকটা শান্ত) হ্যাঁ, কিন্তু—

মিঃ সেন : হ্যাঁ, আমিও তো রোজই—(শম্ভুর অগ্নিদৃষ্টিতে) না, বলুন।

শম্ভু : তবে তোমার পিসীমাকে এই সাধারণ কথা কটা বুঝিয়ে বলতে পারবে না?

অনু : কিন্তু—বড়োপিসী যে! (হয় তো কেহ হাসিত, কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা নহে।)

শম্ভু : হলেই বা বড়োপিসী। বড়ো হলে তো বেশি বুঝবেন। তা ছাড়া তোমার বাবা আছেন তোমার দিকে।

অনু : (এখন প্রায় সম্পূর্ণ শান্ত) শুনুন, বলছি ব্যাপারটা গুছিয়ে। বাবা—বাবা অন্যরকম। কিন্তু বড়োপিসীকে বাবা কিছু জানান নি, জানালে কুরুক্ষেত্র হোতো। পিসেমশাই আর বাবা—দু'জনে ভীষণ বন্ধু, কিন্তু বড়োপিসী—মানে বড়োপিসী, বুঝতে পারছেন না?

শম্ভু : আন্দাজ পাচ্ছি খানিকটা। তোমার বাবাকে এতো ব্যস্ত হতে দেখি নি কখনো আগে।

নিতাই : তা বড়োপিসী আসছেন—আগে জানতে না?

অনু : কী করে জানবো? লক্ষ্ণৌয়ে থাকেন—পিসেমশাই ওখানে উকিল। মাঝে মধ্যে এরকম বিনা নোটিসে চলে আসা বড়োপিসীর স্বভাব। আমার মনে হয়, (ইতস্তত) মনে হয়—মা যাবার পর থেকে এ বাড়ির—মানে, আমার সম্বন্ধে—দায়িত্ব—একটু অতিরিক্ত রকম—

শম্ভু : হুঁ।

অনু : তা ছাড়া—

শম্ভু : তা ছাড়া?

অনু : বাবা বোঝেন। এতোদূর এগোবার পর ভেস্তে যাওয়া যে কী জিনিস—বাবা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। পিসেমশাইও আমাদের দিকে হবেন জানি, যদিও তাতে বিশেষ কিছু—কিন্তু সবচেয়ে বড়ো মুস্কিল হোলো—দাদু!

শম্ভু : দাদু?

অনু : আমার ঠাকুর্দা। কাশীতে আছেন। বাবা বিলেত যাবার পর থেকে বাবার উপর সাংঘাতিক মর্মাহত হয়ে আছেন! সেকালের গোঁড়া লোক। বাবা যতোটা পারেন চেপে যান, বাঁচিয়ে চলেন। বাবা বোধহয় আমাদের মান বাঁচাতে এই নিয়ে বড়োপিসীর সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজি হতেন, কিন্তু বড়োপিসীর শেষ অস্ত্র—দাদুকে বলে দেবার ভয়ে দেখানো। ঐখানেই বাবা কাবু। তা ছাড়া বড়োপিসীর ভয়েও কম কাবু নন বাবা।

শশাঙ্ক : আমি তো বুঝতে পারছি না, একজন—ইয়ে—মানে বড়োপিসীকে—এতো ভয় করবার কী আছে—

(বাহিরে রক্তজলকরা কণ্ঠে—'যোগীন! যোগীন!' ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। শশাঙ্ক পাংশু।)

অনু : বড়োপিসী! শিগগির!!

('শিগগির' যে কী করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কাহারও ধারণা স্পষ্ট না থাকা সত্ত্বেও ঘরে প্রচণ্ড ব্যস্ততা শুরু হইয়া গেল। স্মারক উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততায় একটি মোড়া সরাইতে গিয়া বারান্দার দরজাটি সম্মুখে পাইয়া মোড়া ফেলিয়া পলায়ন করিল। পিছনে ধ্রুবেশ। শম্ভু একমাত্র শান্ত, সে নারিকেল দড়ির কুণ্ডলীটি ডিভানের নিচে ঢুকাইল। তারপর চাপাস্বরে 'অ্যাশ্‌ট্রে!' হাঁকিয়া পিছনের দরজা ভেজাইয়া দিতে গেল। শশাঙ্ক এতক্ষণ শুধু

চেয়ার নড়াইয়া বসাইবার অর্থহীন কাজে ব্যস্ত ছিল, এখন কাজ পাইয়া দুই হাতে ছাইদানটি বাগাইয়া দিগভ্রান্ত সদরদরজার দিকে যাইতে গিয়া পিসীমার মুখোমুখি হইয়া পিছু হটিল। ছাইদানটি দুই হাতে নিজের পিছনে লুকাইয়া ধরিল বটে, কিন্তু সেকেন্ড দুই পরে। পিসীমা প্রবেশ করিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। দুইবার সমস্ত ঘরে সমস্ত অতিথিবৃন্দের উপর সার্চলাইটের দৃষ্টি ঘুরাইলেন। অতঃপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল অনুর দিকে। পিসীমার প্রবেশের দাপটে পিছনে স্যুটকেস্ হাতে পিসেমশাইয়ের প্রবেশটি যেন লক্ষ্যই করা গেল না।)

পিসীমা : এই যে অনু। ভাবছিলাম ভুল বাড়িতে ঢুকলাম না কি। যোগীন কোথায়?

অনু : (প্রণাম সারিয়া) বাবা —বাবা তোমাদের আনতে গেছেন।

পিসীমা : বটে? কোনদিকে? শেয়ালদায়?

অনু : না বাবা তো—টেলিগ্রামে—বললেন সাড়ে সাতটায় গাড়ি—

পিসীমা : গাড়ি যে দশ মিনিট আগেও এসে পড়তে পারে সে খেয়ালটা বোধহয় হয় নি। যোগীনটা বদলালো না! যাক গে। এঁরা কারা? (সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ঈষৎ কুঁকড়াইলেন)

অনু : এঁরা—মানে ইনি নিতাইদা—নিত্যানন্দ মুখার্জি—

নিতাই : নমস্কার—

পিসীমা : (অনুকে) থাক! তোমাকে আর বিলিতি কায়দায় ইনট্রোডিউস্ করে দিতে হবে না। দরকার হলে নিজেই আলাপ করে নিতে পারবো। জানতে চাইছিলাম—এঁরা পাড়া-প্রতিবেশী, না—

অনু : এঁরা সব এই ফ্ল্যাটে থাকেন—

পিসীমা : এই ফ্ল্যাটে!!

অনু : (দিশেহারা) না না, মানে—এই ম্যান্শনে—এই সব ফ্ল্যাটে—মানে আলাদা আলাদা ফ্ল্যাটে (অবশেষে যেন চূড়ান্ত বর্ণনা দিতে)— অনেক ফ্ল্যাটে।

পিসীমা : বুঝলাম। তা এঁরা এই ফ্ল্যাটে কেন?

পিসেমশাই : শোনো, তুমি—(পিসীমা তাকাইলেন না, শুধু হস্ত সঞ্চালনে পরম গুরুকে স্তব্ধ করিলেন)

নিতাই : আমরা এখানে, মানে—

অনু : (মরিয়া হইয়া) এঁদের সবাইকে বাবা চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন!

পিসীমা : নেমন্তন্ন করে বেড়াতে গেছে?

অনু : তোমাদের আনতে—

পিসীমা : আমাদের আনতে? কেন, আমরা কি ঠিকানা জানতাম না? আর তোমাকে বোধ হয় এঁদের আপ্যায়ন করবার ভার দিয়ে গেছে? (অনু দুর্বলভাবে ঘাড় নাড়িল) হুঁ। এঁদের চা খাওয়া হয়েছে?

অনু : হ্যাঁ, না, মানে, বাবা—

শম্ভু : চা থাক, আমরা বরং আজ যাই, পরে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করা যাবে—

পিসীমা : (শম্ভু এবং তাহার নিমন্ত্রণের অনুপযোগী পোশাক ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া) বোসো।

শম্ভু : আমি—

পিসীমা : বোসো! (শম্ভু হাল ছাড়িয়া বসিল) যোগীন তোমাদের ডেকেছে, যোগীন এলে তাকে বলে যাবে। বোসো সবাই। (সকলে একে একে বসিল। শুধু শশাঙ্ক পিছনে ধৃত ছাইদান সামলাইতে চেয়ারের সম্মুখে ইতস্তত করিতে লাগিল) তুমিও বোসো! (শশাঙ্ক দ্রুত বসিল, এবং অগত্যা ছাইদানের উপরেই বসিতে হইল) অনু, তুমি ভিতরে যাও, চা করোগে।

(অনুর প্রস্থান)

পিসেমশাই : তুমিও বরং যাও না ভিতরে—ট্রেনের ধকল—আমি না হয় ততোক্ষণ এঁদের সঙ্গে—

পিসীমা : তুমি থামো (পিসে থামিলেন)। বোসো ওখানে (পিসে বসিলেন)। তোমার নাম কী?

শশাঙ্ক : আজ্ঞে শশাঙ্কশেখর—না, শশাঙ্ক নয়—কিশোর—

পিসীমা : যা হয় একটা নাম বেছে নেবার সময় পাও না বোধ হয়?

শশাঙ্ক : না, হ্যাঁ, মানে—শশাঙ্কশেখর আমার থিয়ে—মানে ডাক নাম।

পিসীমা : বেশ গালভরা ডাক নাম। ভালো নামটার ওজন কতো কে জানে?

শশাঙ্ক : ভালো নাম কিশোর দত্ত—চার নম্বর—

পিসীমা : চার নম্বর? কজন কিশোর দত্ত আছে এখানে?

শশাঙ্ক : আজ্ঞে বেশি নেই। বলতে গেলে—আমি একাই। একজন কিশোর ঘোষ আছে ডি ব্লকে—

পিসীমা : তবে চার নম্বর হলে কী করে?

শশাঙ্ক : চার নম্বর ফ্ল্যাট। বলছিলাম চার নম্বর ফ্ল্যাটে থাকি। সি ব্লক।

পিসীমা : সি ব্লক?

শশাঙ্ক : ব্লক সি। ওদিকে (হাতের একটা অনিশ্চিত নির্দেশ)—তেতালায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে পড়ে।

পিসীমা : অ! (রাজীবকে) তোমার নামটা জানতে পারি কি? ঠিকানাটা এখন না বললেও চলবে, পরে দরকার হলে জিজ্ঞেস করে নেবো।

রাজীব : আজ্ঞে রা—প্রতুল কর।

পিসীমা : রাপ্রতুল?

রাজীব : শুধু প্রতুল।

পিসীমা : শুধু প্রতুল?

রাজীব : রা নেই।

পিসীমা : অ। ভাবছিলাম, 'শ্রী' বদ্‌লে 'রা' চলছে না কি আজকাল। (শম্ভুর দিকে চাহিয়া) তোমার?

(শম্ভু সহসা একগাল হাসিয়া অগ্রসর হইয়া পিসীমার পদধূলি লইল, যেন আদুরে বোনপো মাসীমার বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছে।)

শম্ভু : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পিসেমশাইকে প্রমাম করিয়া) ট্রেনে কষ্ট হয় নি? অনেকখানি রাস্তা তো! সেই লক্ষ্ণৌ থেকে—

পিসীমা : (প্রথমে চমকাইয়া, পরে চটিয়া) তুমি—তুমি—লক্ষ্ণৌ—

শম্ভু : (পূর্ববৎ) আজ্ঞে হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌ। সে কি এখানে? তারপর ট্যাক্সিতে এই টানাহ্যাঁচড়া—টেলিগ্রামটা ঠিক সময়ে এলে আমিও কাকাবাবুর সঙ্গে স্টেশনে যেতাম।

পিসীমা : (আরো চটিয়া) যেতে!

শম্ভু : আজ্ঞে হ্যাঁ যেতাম বৈ কি? অ্যাদ্দিন পরে অ্যাদ্দুর থেকে আসছেন, স্টেশনে যদি কাউকে না পাওয়া যায়, কেমন লাগে সে কি বুঝি না? তবে আমিও বলি বড়োপিসী, টেলিটা আর একটু সময় হাতে রেখে—

পিসীমা : বড়োপিসী! (ফাটিয়া পড়িলেন) জ্যাঠা ছোকরা!!

(একটা হৈ চৈ উঠিল। পিসেমশাইয়ের দুর্বল আপত্তি শোনা গেল। মিঃ সেন ও বনানী বহুক্ষণ হইতে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি সরিয়া বাহিরের পথে মিলিত হইয়াছিলেন, শেষ হুঙ্কারে ছিটকাইয়া নির্গত হইয়া গেলেন। প্রায় সকলে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। নিতাই যেন শম্ভুকে রক্ষা করিতে দুই পা অগ্রসর হইল। শশাঙ্ক উঠিয়াছিল, কিন্তু ছাইদান মনে পড়ায় তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল। শুধু শম্ভু শান্ত হাস্যমুখ।)

শম্ভু : আজ্ঞে ঠিক ঐ কথাই আমাকে প্রথম দিকে সব গুরুজন বলে থাকেন। আমাদের গ্রামের এক মাস্টার মশাই ক্লাসে এসেই আমাকে দু'ঘা বেত দিয়ে তবে পড়াতে শুরু করতেন। পরে সেই মাস্টার মশায়ের বাড়িতেই নিত্য নেমন্তন্ন হোতো পুজোপার্বনে—

পিসীমা : (চিৎকার করিয়া) তুমি—

শম্ভু : আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর মাকে পুড়িয়েছিলাম কি না? (পিসীমার বাক্‌রোধ, অন্য সকলেও স্তম্ভিত। শম্ভু ব্যাখ্যার্থে) মানে—মারা যাবার পরে—দাহ করতে গেছিলাম। ভীষণ দুর্যোগ সেদিন, লোক পাওয়া যায় না—এই দেখুন, নিজের কথাই বলে চলেছি। সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছেন পিসীমা, বসবেন না?

(শম্ভু দুই পা অগ্রসর হইল. যেন হাত ধরিয়া বসাইবে। কুরুক্ষেত্র একটা নির্ঘাৎ বাধিত, কিন্তু বাধা আসিল যোগীন প্রবেশ করায়।)

যোগীন : এই যে বড়দি! এসে পড়েছো!

(শম্ভু কিছুটা নিরাশভাবে পিছনের দিকে গেল। পিসেমশাই যেন ভাসমান কুটো পাইলেন)

পিসেমশাই : (হৈ চৈ করিয়া) এই যে যোগীন! কী খবর? আছো কেমন? আমরা ওদিকে তোমার জন্য স্টেশনে—গাড়িতে আজকে সে যা এক কাণ্ড—পাটনার পর থেকে—(পিসীমা দুজনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার পিছনে পিসেমশাইয়ের কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া থামিয়া গেল।)

পিসীমা : যোগীন, এদের যখন নেমন্তন্ন করেছিস, তখন—

যোগীন : নেমন্তন্ন করেছি? আমি? কৈ না! (ভদ্রমণ্ডলী দিশাহারা। যোগীন সহসা সামলাইলেন) ও—নেমন্তন্ন? হ্যাঁ হ্যাঁ, নেমন্তন্ন! ঠিক বটে। আজ দুপুরে খাবার নেনমন্তন্ন করেছিলাম। (আবার সবাই দিশাহারা)

পিসীমা : দুপুরে? অনু যে বললে চায়ের নেমন্তন্ন?

যোগীন : অনু বললে চায়ের? অনু বললে? (দৃঢ়স্বরে) অনু ভুলে গেছে।

পিসীমা : ভুলে গেছে? দুপুরে তোর কলেজ ছিল না?

যোগীন : ছিল তো।

পিসীমা : তবে দুপুরে নেমন্তন্ন করলি কী করে?

যোগীন : তাও তো বটে। তবে বোধ হয় আমিই ভুলে গেছি।

(চা লইয়া অনুর প্রবেশ)

অনু : বড়োপিসী, চা। বাবা, তুমি এর মধ্যে ফিরে এলে যে?

যোগীন : ট্যাক্সি পেলাম না একটাও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে—

(ইতিমধ্যে শম্ভু চায়ের ট্রে লইয়া পরিবেশনে ব্যাপৃত হইয়াছে। প্রথমে পিসীমা। রাগ এবং চা-তৃষ্ণার সংগ্রামে দুই এক মুহূর্ত কাটাইয়া পিসীমা চা লইলেন। তারপর পিসেমশাই, যোগীন, অনু এবং বাকি সকলে। কিছুক্ষণ চা পানের নীরবতা।)

শম্ভু : (চা উপভোগের আরামে) আঃ! (পিসীমার জ্বলন্ত দৃষ্টি) চা-টা দরকার ছিল, তাই না পিসীমা?

যোগীন : (তাড়াতাড়ি) তারপর বড়দি, এবার কিছুদিন থাকছো তো?

পিসীমা : (শম্ভুর দিক হইতে চোখ না ফিরাইয়া) ভেবেছিলাম দিন সাতেকের বেশি থাকবো না, কিন্তু মনে হচ্ছে আরো থাকতে হবে। তোদের বাড়িঘরের অবস্থা যা দেখছি, সাতদিনে সামলে উঠতে পারবো না। তার তিন দিন তো কোন্নগরেই যাবে।

যোগীন ও অনু : (আশান্বিত) কোন্নগর?

পিসেমশাই : মধুদা বাড়ি করে অবধি যেতে লিখছে, তা কোনোবারই হয় না। তাই ভাবছি কাল সকালে যাবো—শনি-রবিটা কাটিয়ে আসবো।

(আনন্দের বিভিন্ন চাপা অভিব্যক্তি। দুর্বৃত্ত বিষম খাইয়াছে, রাজীবের চা চলকাইয়াছে, নিতাই মনের ভুলে সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিয়া সচেতন হইয়া আবার লুকাইতেছে, অনুর বিস্ফারিত নেত্র ইত্যাদি। শুধু শম্ভু—)

শম্ভু : ওহো। আমি ভেবেছিলাম—যাক গে! ফিরে এসে কিন্তু আমাদের ওখানে একদিন খেতে হবে পিসীমা। বৌদি বড়ো খুশি হবেন।

(পিসীমার ঈষৎ সন্দেহ হইয়াছিল। শম্ভুর কথায় ক্রোধের দাপটে সেটুকু উবিয়া গেল।)

পিসীমা : বটে!

যোগীন : (তাড়াতাড়ি) তা ভালো, তা ভালো, ঘুরে এসো। কোন্নগর জায়গা ভালো—স্বাস্থ্যকর। মধুদা বিরাট বাগান করেছে।

নিতাই : ইয়ে, তাহলে এখন চলি স্যার, রাত হোলো।

(সকলেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। বিদায় গ্রহণের একটি সমবেত গুঞ্জন শোনা গেল। বাহির হইবার আগ্রহে শশাঙ্ক ছাইদান ভুলিয়াছে, অতএব সেটি চেয়ারেই রহিল। নিষ্ক্রমণে যে অতিরিক্ত ব্যস্ততা প্রকাশ পাইল, তাহার বিপরীত চেহারা শম্ভুর অমায়িকতায়।)

শম্ভু : চলি আজ তাহলে পিসীমা। যদি কখনো কোনো দরকার হয়—ডাকবেন।

দোতালায়, ঠিক এর ওপরের ফ্ল্যাটটা আমাদের। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে শম্ভু বলে একটা হাঁক দিলেই—(পিসীমা ফাটিবার পূর্বেই) পিসেমশাই চলি। কোন্নগর থেকে ফিরে কথা রইল কিন্তু—একদিন আসতে হবে।

(শম্ভুর প্রস্থান)

পিসীমা : অনু, সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

(অনুর প্রস্থান। খানিক পরে সে ঢুকিয়া একপাশে দাঁড়াইবে।)

শোনো যোগীন। তোমার সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া আছে। সব কথা এখন বলার সময় নেই, আমাদের এখুনি বেরোতে হবে।

যোগীন : বেরোতে হবে? কোথায়?

পিসীমা : মধুবাবুর সেজো মেয়ের বিয়েতে আসতে পারি নি। কিন্তু কাল কিছু হাতে করে নিয়ে যেতে হবে।

যোগীন : তা ঘুরে এসো না? তারপর ধীরে সুস্থে হবে এখন—ধীরে সুস্থে হবে—

পিসীমা : ধীরে সুস্থে বলবারও অনেক কথা আছে। তার আগে একটা সিধে কথা বলে নিই। অনু বড়ো হয়েছে। এখন এই সব বাউণ্ডুলের দল বাড়িতে জুটিয়ে হল্লা করবার বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে?

যোগীন : বাউণ্ডুলে হতে যাবে কেন? ওরা সবাই ভালো ছেলে। সবাই এখানে থাকে—এই সব ফ্ল্যাটে—

পিসীমা : এখানে থাকলেই সব ভালো ছেলে হয়ে যাবে? কেন, এটা কি পীঠস্থান না কি? আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি? ওই জ্যাঠা এঁচোড়ে পাকা ছোকরা—

যোগীন : কার কথা বলছো?

পিসীমা : চোখ থাকলে বুঝতে পারতে কার কথা বলছি! নোংরা জামা, অভদ্র ইতর—বলে কিনা পিসীমা!

যোগীন : শম্ভু? শম্ভু মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার—যাদবপুরের। খুব ভালো ছেলে, সময় অসময়ে বহু উপকার করে।

পিসীমা : তবে আর কী? উপকার করে! কে কী মৎলবে কী করে তা যদি বুঝবে, তবে আর পঁচিশ বছর কলেজে মাস্টারি করলে কী জন্যে? অন্যগুলোও সমান, নিজের নামটা পর্যন্ত ঠিক করে বলতে পারে না।

যোগীন : তুমি ভুল করছো বড়দি! এরা সবাই ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়া করেছে, চাকরি বাকরি করে। ঐ তো নিতাই—

পিসীমা : কোনটা নিতাই?

অনু : নিতাইদা—ঐ যে ভদ্রলোক এইখানটায় বসেছিলেন—

পিসীমা : তুমি থামো তো! বড়োদের কথার মধ্যে তোমাকে পাকামি করতে হবে না। (অনু চুপসাইয়া গেল) ভ-দ্র-লো-ক! কে কতোটা ভদ্রলোক আমার চেনা আছে!

যোগীন : নিতাই আমার পুরোনো ছাত্র। বুদ্ধিমান ছেলে—সেকেন্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছিলো। ফার্স্ট ক্লাস পাবে বলে আশা করেছিলাম, তা ঐ থিয়েটারের নেশাতেই সব মাটি করে দিলো—

অনু : (সতর্ক করিয়া) বাবা!

পিসীমা : থিয়েটারের নেশা! ঐ জন্যেই বলছিলুম—মানুষ চিনি! থিয়েটার করে না বেড়ালে আর—

যোগীন : (ভুল উপলব্ধি করিয়া) না না, আগে করতো, এখন করে না। সে সেই কলেজে থাকতে—

পিসীমা : এখন করে না—তুমি দেখতে গেছো? করলে কি—তুমি প্রফেসর—তোমাকে এসে শুনিয়ে যাবে?

পিসেমশাই : শোনো, এরপর সব দোকান বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু—

পিসীমা : তুমি বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকো না হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে (পিসেমশাইয়ের দ্রুত প্রস্থান)—এই সব ধিঙ্গিপনা যদি বাবার কানে যায়, কী অবস্থাটা হবে বলো তো?

যোগীন : (দুর্বলস্বরে) বাবার কানে? কেন ওরা—ওরা তো—আমি—

অনু : বড়োপিসী হাতমুখ ধোবে না কি?

পিসীমা : সময় নেই, ফিরে এসে হবে। তুই এই চাবি নিয়ে স্যুটকেস্‌টা খোল—টাকা বার করতে হবে।

যোগীন : (তাড়াতাড়ি) স্যুটকেসটা বরং ভিতরে নিয়েই একেবারে—

(স্যুটকেস্ হাতে ভিতরে প্রস্থান)

পিসীমা : পেছনের খাপে একটা ব্যাগ আছে, বার করে নিয়ে আয় অনু। আমি একটু বসে নিই। কাল থেকে দৌড়-ঝাঁপ, তার উপর এখানে এসে এই। (অনুর ভিতরে প্রস্থান। পিসীমা বসিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে ছাইদানের উপর, এবং লাফাইয়া উঠিলেন) মা গো! (ছাইদান তুলিয়া) হুঁ! ভদ্রলোক! বসে বসে বিড়ির শ্রাদ্ধ করেছে। তাও মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে বসে! (হাতুড়ি দেখিয়া হাতে তুলিলেন) এঁচোড়ে পাকা ছোকরা যতো সব! (হাতুড়িহস্তে একটি নৃশংস ভঙ্গী করিলেন এবং বারান্দার দরজা ঠেলিয়া নারিকেল দড়ি হাতে সেই উদ্যত হাতুড়ির সম্মুখে অনাথের প্রবেশ। পিসীমা ভীষণ চমকাইয়া পিছু হঠিলেন।) কে!! (অনাথ ততোধিক চমকাইয়া পিছু ফিরিল) এই খবরদার! দাঁড়াও! (অনাথ অর্ধনির্গত অবস্থায় স্থাণু) ভেতরে এসো! (পিছু হঠিয়া অনাথের প্রবেশ) এদিকে ফেরো! (অনাথ ফিরিল) কে তুমি?

অনাথ : আজ্ঞে আমার নাম অনাথ। অনাথবন্ধু চক্রবর্তী।

পিসীমা : বারান্দায় কী করছিলে?

অনাথ : বারান্দায় কিছু করি নি। শম্ভু বললে বাজার থেকে নারকোল দড়ি কিনে আনতে, তাই নিয়ে এলাম।

পিসীমা : শম্ভু—অ, সেই ছোকরা! তা এ বাড়িতে কেন? এটা কি শম্ভুর বাড়ি?

অনাথ : এখানেই সব কিছু রাখা হয় কিনা? ঐ দেখুন না—এ কী? আর দড়িগুলো গেলো কোথায়?

পিসীমা : শম্ভু কি এ বাড়িটাকে দড়ির দোকান করেছে?

অনাথ : আজ্ঞে না—এ স্টেজের দড়ি কিনা?

পিসীমা : স্টেজের দড়ি?

অনাথ : আজ্ঞে হ্যাঁ। স্টেজের আর প্যান্ডেলের। এখানে রাখাই সুবিধে।

পিসীমা : স্টেজের দড়ি! কিসের স্টেজ?

অনাথ : (এতক্ষণে জমি পাইয়া) থিয়েটারের স্টেজ! জানেন না? ভীমাপুকুর ম্যান্‌শন্‌স্‌ নাট্যসংঘের প্রথম অবদান 'কালবৈশাখী'। ঐ তো স্টেজ! (বারান্দার দরজা দিয়া স্টেজ দেখাইল) কাল সিঁড়ি তৈরি হবে।

পিসীমা : সিঁড়ি!

অনাথ : ঐ বারান্দা দিয়ে এই গ্রীন-রুমের পথ যে! এখন আমরা রেলিং টপ্‌কে ঢুকছি বেরুচ্ছি, থিয়েটারের দিন তো তা হবে না? ওখানে সিঁড়ি তৈরি হবে।

পিসীমা : অ।

অনাথ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিসীমা : থিয়েটার। থি—য়ে—টার! কে করছে থিয়েটার?

অনাথ : আজ্ঞে আমরা সবাই করছি। আমার চাকরের পার্ট। নিতাইদা ডায়রেক্টর, শম্ভু স্টেজ ম্যানেজার—

পিসীমা : নিতাই! শম্ভু!

অনাথ : আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রতুল কর হীরো। গগন ভিলেন—

পিসীমা : (ক্রমে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে) ভিলেন!

অনাথ : হ্যাঁ, খুব ভালো ভিলেন গগন! চোখ যা পাকায়। আর হাসি এক একটা কী!

পিসীমা : কবে হবে থিয়েটার?

অনাথ : পরশু—শনিবার। কেন, রিহার্স্যাল দেখেন নি? এইখানেই তো হচ্ছিলো? গেলো কোথায় সবাই? আমি তো ভাবলাম সবাইকে এখানেই পাবো—

(অনুর প্রবেশ)

অনু : এই যে বড়োপিসী—(ব্যাগ হাতে স্তব্ধ হইয়া দড়ি-হস্ত অনাথের দিকে চাহিয়া রহিল)

অনাথ : এই যে মিস্‌ চ্যাটার্জি। ওরা সব গেলো কোথায়? রিহার্স্যাল বন্ধ হয়ে গেলো না কি?

অনু : (চূড়ান্ত ঘাবড়াইয়া) কী—কী—কিসের রিহার্স্যাল?

পিসীমা : (বজ্র-নিহিত শান্ত কণ্ঠে) থাক অনু। অনেক হয়েছে। (অনাথকে) হ্যাঁ, থিয়েটারের মহলা বন্ধ হয়ে গেছে। সকলে বাড়ি গেছে। তুমিও যাও।

অনাথ : ও। (যাইতে গিয়া ফিরিয়া) কাল কটায় বসছে।

পিসীমা : কাল বসছে না। কোনোদিন বসছে না। অন্তত এ বাড়িতে নয়।

অনাথ : কিন্তু—(অনু পিসীমার পিছনে প্রাণপণে ইশারা করিতেছে দেখিয়া) ও—আমি—

(অনাথ সবেগে বাহির হইয়া গেল। যোগীনের প্রবেশে।)

যোগীন : বড়দি—

পিসীমা : (থমথমে গম্ভীর) যোগীন! বুড়ো বয়সে নিজের মেয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অনেক মিথ্যে কথা বলেছো। এখন একটা সত্যি কথা বলো। তুমি এই ঘরে থিয়েটারের আড্ডা বসিয়েছো? (যোগীন অসহায়ভাবে অনুর দিকে চাহিল, কোনও সাহায্য মিলিল না) বলো।

যোগীন : ওরা আসে—এই কটা দিন—

পিসীমা : ওসব বন্ধ করতে হবে।

যোগীন : ওদের পরশু দিন প্লে। স্টেজ বেঁধেছে, লোকজন নেমন্তন্ন করেছে—

পিসীমা : ওরা ওদের থিয়েটার করুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। শুধু এ বাড়িতে ওসব চলবে না। আজ বাড়িতে থিয়েটারের মহ্‌লা বসছে, তোমার মেয়ে দেখছে শুনছে, চ্যাংড়াদের সঙ্গে মিশছে,—এরপর কোন্‌দিন হয়তো শুনবো অনু নিজেই হিরোইন্‌ সেজে স্টেজে উঠে নাচছে!

(যোগীন ও অনু ভীষণ চমকাইল। কথাটা হজম করিতে কিছু সময় গেল। তারপর যা আসিল সেটা ভয় না আশ্বাস বলা শক্ত—সম্ভবত দুই-ই)

যোগীন : স্টেজে উঠে—না—তা—হ্যাঁ—

(পিসেমশাইয়ের প্রবেশ। হাতে জ্বলন্ত চুরুট।)

পিসেমশাই : ট্যাক্সি এসেছে।

পিসীমা : চলো।—ঐ বলে রাখলাম! ওরা নাচছে, নাচতে দাও, কিন্তু এ বাড়িতে নয়। আমার সময় নেই, ফিরে এসে আর যা বলবার আছে বলবো। (যাইতে গিয়া থামিলেন) তুমি আবার চুরুট ধরিয়েছো? তোমার ভাগের দু'টো হয়ে গেছে না?

(পিসেমশাই চুরুট নিভাইতে নিভাইতে এবং পিসীমা বকিতে বকিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুহ্যমান যোগীন আরাম কেদারায় বসিতে গিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। পিসীমা হাতুড়িটা সেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন।)

অনু : বড়োপিসী আমার কথা শোনে নি।

যোগীন : হুঁ।

অনু : কিন্তু জানতে পারলে কী হবে বুঝতে পারছো?

যোগীন : হুঁ।

অনু : কী করা যাবে বাবা?

যোগীন : উঁ? হুঁ।

(সহসা পিসীমার পুনঃ প্রবেশ)

পিসীমা : আর একটা কথা বলতে এলাম। অনু কাল আমাদের সঙ্গে কোন্নগর যাবে। যা কিছু সঙ্গে নেবার আজ রাতেই গুছিয়ে রেখো!

(পিসীমার প্রস্থান। অনু ও যোগীন চেয়ারে লুণ্ঠিত। বারান্দার দরজায় সন্তর্পিত দুটি টোকা।)

অনু : (চমকাইয়া) কে?

(অনাথের প্রবেশ। হাতে দড়ি।)

অনাথ : দড়িটা তাড়াতাড়িতে ভুলে নিয়ে গেছিলাম।

অনু : (হিংস্রভাবে) বেশ করেছিলেন! আগের বার যদি এখানে না এসে ভুল করে নিজের ঘরে যেতেন তবে ভরাডুবিটা বাঁচতো!

অনাথ : (ঘাবড়াইয়া) আমি—আমি তো—

অনু : তাও এলেন এলেন, বড়োপিসীর কাছে থিয়েটারের গল্প আহ্লাদ করে না বললেই কি চলতো না?

যোগীন : ওকে বকে কী হবে? ও বেচারা হয় তো কিছুই জানতো না?

অনু : (কিছু শান্ত হইয়া) যাক গে, যা হবার হয়েছে। আপনি এখুনি গিয়ে নিতাইদা আর শম্ভুদাকে এখানে পাঠিয়ে দিন। বলুন জরুরি দরকার।

অনাথ : শম্ভু স্টেজে পর্দা খাটাচ্ছে—

অনু : (আবার জ্বলিয়া) পর্দা চুলোয় যাক! যা বলছি করুন। (অনাথ ফিরিল) আর শুনুন। বলবেন বড়োপিসী বাড়ি নেই, বুঝলেন?

অনাথ : আমি এখুনি ডেকে নিয়ে আসছি—

অনু : নিয়ে আসতে হবে না—পাঠিয়ে দেবেন! আপনার আসবার দরকার নেই।

অনাথ : দড়িটা—

(অনু দড়িটা হাত হইতে ছিনাইয়া এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিল। অনাথ আর দেরি করিল না।)

অনু : সব মাটি হয়ে গেলো শুধু একটা—একটা ইয়ের জন্যে! থিয়েটারের গল্প করবার আর লোক পেলো না!

(অনু উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। যোগীন এ পকেট ও পকেট হাতড়াইয়া সিগারেট খুঁজিলেন, পাইলেন না।)

যোগীন : সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায় রাখলাম—

(বারান্দার দরজা দিয়া শম্ভুর প্রবেশ)

শম্ভু : কী ব্যাপার? পিসীমা কোথায়? কোন্নগর না কি?

অনু : কোন্নগর নয়। কোন্নগর যাবে কাল। আর আমিও যাবো ঐ সঙ্গে।

শম্ভু : তুমি?

অনু : হ্যাঁ আমি! নিতাইদা কোথায়?

শম্ভু : অনাথ ডাকতে গেছে, এখুনি আসবে। কিন্তু—

যোগীন : শম্ভু তোমার কাছে সিগারেট আছে?

শম্ভু : (হাসিয়া) আজ্ঞে আমি তো সিগারেট খাই না। নিতাইদা আসছে, তার কাছে থাকতে পারে। (অনুকে) কিন্তু তুমি কোন্নগর গেলে কী করে হবে?

অনু : কী করে হবে তা আমি কী করে বলবো? আমি কি সখ করে বেড়াতে যাচ্ছি না কি? (নিতাইয়ের প্রবেশ) এই যে নিতাইদা। সর্বনাশ হয়ে গেছে।

নিতাই : কেন, কী হোলো? পিসীমা কোন্নগর যাবেন না?

অনু : পিসীমা যাবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও বেঁধে নিয়ে যাবেন। আপনাদের অনাথচন্দ্র দড়ি রাখতে এসে বড়োপিসীকে একা পেয়ে থিয়েটারের গল্প শুনিয়ে গেছে মনের আনন্দে!

নিতাই : কী সর্বনাশ!

যোগীন : নিতাই তোমার কাছে সিগারেট আছে?

অনু : আঃ বাবা! সিগারেট না হলে কি চলে না এই সময়ে?

যোগীন : চলতো। যদি ব্র্যান্ডি পেতাম খানিকটা।

নিতাই : এই যে স্যার। (সিগারেট দিল) অনাথ হতভাগা সব কথা শুনিয়ে গেলো?

শম্ভু : অনাথ সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে যাচ্ছে। তোমার থিয়েটার করার কথা পিসীমার কাছে বলবার সাহস আমার হোতো না।

অনু : সাহস না কচু! বলেছে ভয়ে। তবে রক্ষে এই—আমার থিয়েটার করার কথাটা বলে উঠতে পারে নি। বললে যে কী হোতো—আর বেশি কী-ই বা হোতো? যা

হবার তো হয়েই গেছে। আমাকে যদি কোন্নগরই যেতে হয়—

শম্ভু : দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি নামছো এ কথা পিসীমা এখনো জানেন না?

অনু : না। যদি না আপনাদের অনাথ রাস্তায় ধাওয়া করে এতোক্ষণে বলে এসে থাকে! কিন্তু তাতে লাভটা কী?

শম্ভু : লাভ অনেক। তুমি কোন্নগর যাবে না।

অনু : যাবো না! কী বলছেন কী?

শম্ভু : না, যাবে না। তোমার পেটের অসুখ করবে। ভীষণ যন্ত্রণা! বিছানা ছেড়ে নড়তে পারবে না।

অনু : তবে বড়োপিসীমাও যাবেন না।

শম্ভু : হ্যাঁ যাবেন। তুমি থিয়েটারে নামছো এ কথা যখন জানেন না, তখন কালও সন্দেহ হবে না। অনাথ কদ্দুর বলেছে? এ ঘরে রিহার্স্যাল হয় বলেছে?

অনু : বলেছে।

শম্ভু . গ্রীনরুমের কথা?

অনু : জানি না।

শম্ভু : যাক, সে অনাথকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। শোনো, বড়োপিসীকে জানিয়ে দাও—(যোগীনের দিকে চাহিয়া) কাকাবাবু জানালেই ভালো হয়—এখানে রিহার্স্যাল গ্রীনরুম সব বন্ধ হয়ে গেছে। চট করে বলবেন না, একটু ওজর আপত্তি করে—যেন শেষ অবধি বাধ্য হয়ে পিসীমার কথায় রাজি হচ্ছেন—এই ভাবে বলতে হবে। কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু, এ ছাড়া এ বিপদে আর উপায় নাই।

যোগীন : ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে ভেবো না। মিথ্যে কথা জীবনে অনেক বলেছি, এ দু'টোতে নরকের গরম তেলের আঁচে কিছু বেশিকম হবে না। শুধু ভাবছি—ভালো করে মিথ্যেকথা বলার ক্ষমতাটা এতো বলেও আয়ত্ত করতে পারি নি—কাঁচিয়ে না ফেলি। (শম্ভু হঠাৎ খপ্ করিয়া যোগীনের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল) ওটা কী হোলো?

শম্ভু : (হাসিয়া) কিছু না। ভাবছিলাম, আমার ইস্কুলের মাস্টার-মশাইরা যদি আপনার মতো হতেন, তবে বেত খেতে খেতে প্রাণটা যেতো না।

নিতাই : ফাজলামি রেখে কাজের কথা বল্।

শম্ভু : তোমার আর কী নিতাইদা? পেয়েছো কাকাবাবুর মতো প্রফেসর, আর আমার মতো স্টেজ ম্যানেজার, মনের আনন্দে ডায়রেক্টর হয়ে হুকুম চালাচ্ছো।

অনু : (অল্প ক্ষুব্ধ) ও কথার কোনো মানে হয় না শম্ভুদা। নিতাইদা একমাস ধরে এই থিয়েটার নিয়ে কম করেছেন?

শম্ভু : (জোরে হাসিয়া উঠিল, তারপর হঠাৎ হাসি থামাইয়া) অপরাধ হয়ে গেছে। নিতাইদা পাকা অধিকারী। শুধু আমাকেই যা মানুষ করতে পারলো না।

নিতাই : (চটিয়া) তুই রিহার্স্যাল দিবি না মন দিয়ে, শুধু হাতুড়ি হাতে একবার দৌড়ে ঢুকবি, দু লাইন আউড়ে আবার ছুটবি—ওরকম করে অ্যাক্টিং হয়?

শম্ভু : তা কী করবো বলো? নামে স্টেজ ম্যানেজার; কাজে স্টেজ বাঁধা, পাল খাটানো,

পিসীমা সামলানো সব করতে হবে, তার উপর পার্ট্ করা! কেন, নিজে তো পার্ট নিলে না ডায়রেক্শন দিতে অসুবিধে হবে বলে। আমার বেলা সে সুবুদ্ধিটা হোলো না বুঝি?

নিতাই : চার লাইনের তো পার্ট—

শম্ভু : হোক চার লাইনের! আধখাঁচড়া ব্যাপার আমার বরদাস্ত হয় না।

অনু : আপনারা ঝগড়া করবেন, না কাজের কথা বলবেন?

শম্ভু : (ছদ্ম দুঃখে) হোলো না নিতাইদা। বিশ্বশুদ্ধু ভক্ত বানিয়ে রেখেছো, আমি একা বলে কী করবো? তার উপর হিরোইন্, চটে যদি বলে থিয়েটার করবো না— আমার এতো সাধের স্টেজ প্যান্ডেল বৃথা যাবে। যাক গে! কাজের কথা আর কিছু নেই, যা বলেছি—ঐ। আজ রাত থেকেই কাৎরাতে শুরু করে দাও।

অনু : আর যদি বড়োপিসী না যান?

শম্ভু : তা হলেও তোমার যাওয়াটা তো ঠেকাবে? তারপর ভাবা যাবে আবার নতুন করে।

নিতাই : আজকের রিহার্স্যালটা চুলোয় গেলো। মধ্যে মোটে একটা দিন!

শম্ভু : তা কাল তো সবাই ছুটি নিয়েছি। দুপুর থেকে চালাও না ঠেসে!

নিতাই : তা বলে দু'দিনের কাজ কি একদিনে হয়? তাও শেষ দিন।

(খোকা খুকুর নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)

খোকা : কাকা, মা ডাকছে খেতে, শিগ্গির এসো!

শম্ভু : ঢেকে রেখে দিতে বল্। আমার অনেক কাজ বাকি আছে। আর তোর মাকে বল্ খেয়ে নিতে।

খুকু : মা বলেছে দেরি করলে ভাতে ছাই দিয়ে রাখবে।

শম্ভু : (হাসিয়া) বেশি করে ছাই দিতে বল্ গে, রাক্ষুসে ক্ষিদে নিয়ে আসবো। আর শোন্? বলিস্ আজ যদি গিয়ে দেখি না খেয়ে বসে আছে, তবে--তবে কী করবো বল তো?

খোকা : নাক কেটে নেবে!

খুকু : দূর গাধা! নাক কেটে কান কেটে উল্টোগাধায় চড়াবে!

শম্ভু : ঠিক বলেছিস্! গিয়ে বল্। বলেই পালিয়ে যাস্!

খোকা : নিতাই কাকা, তোমরা আজ থিয়েটার করলে না?

নিতাই : অ্যাঁ? না—কাল করবো।

খুকু : আজ করছো না কেন নিতাই কাকা?

নিতাই : আজ সব নানারকম মুস্কিল হয়ে গেছে। কাল করবো।

শম্ভু : এই—যা, পালা!

(খোকা খুকুর নাচিতে নাচিতে প্রস্থান। অনেকক্ষণ পরে সকলে বিপদ ভুলিয়া খোলা হাসি হাসিল। অল্পক্ষণই। সহসা বারান্দার দরজা ঠেলিয়া অনাথের মুণ্ড সকলকে চমকাইয়া আবির্ভূত হইল।)

অনাথ : (চাপা বিপদ্জ্ঞাপক কণ্ঠে) পি—সী—মা!!

(মুণ্ড অন্তর্হিত। ঘরে হুলুস্থুলু। নিতাই পলায়নোদ্যত।)

অনু : পিসীমা! এর মধ্যে!

শম্ভু : ঐ কথা রইলো। পিসীমা রওনা হলেই খবর দিও!

যোগীন : নিতাই! একটা সিগারেট দিয়ে যাও!

(নিতাই বারান্দার দরজার নিকট ব্রেক্ কষিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে প্রায় ছিঁড়িয়া প্যাকেট বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া দিল।)

নিতাই : প্যাকেটটা আপনি রাখুন স্যার।

(অন্তর্ধান। পিছনে শম্ভু)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(একই ঘর। পরদিন সকাল। যবনিকা সরিবার সময় মঞ্চ খালি। বাহিরে হাতুড়ি পেটা ইত্যাদির আওয়াজ। অনু ভিতর হইতে পিছনে তাকাইতে তাকাইতে সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। পা টিপিয়া টিপিয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় গেল। দু'টি হাততালি এবং একটি কোকিল-সুলভ কু-উ-উ শোনা গেল। অনু ফিরিয়া আর একবার ভিতরের দিকে চাহিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়া ভিতরে আসিল। দরজায় শম্ভুর মুণ্ড দেখা গেল।)

শম্ভু : পিসীমা কোথায়?

অনু : স্নান করতে গেছেন।

(শম্ভুর পূর্ণ প্রবেশ)

শম্ভু : কী খবর বলো তাড়াতাড়ি।

অনু . সব ঠিক আছে। পিসীমা ডাক্তার ডাকবে বলে গোলমাল তুলেছিলো। বাবা, পিসেমশাই অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করেছেন।

শম্ভু : পিসেমশাইও?

অনু : হ্যাঁ, পিসেমশাইকেও দলে টেনেছি।

(ভিতরে একটা শব্দ হইল। দু'জনেই চমকাইল)

শম্ভু : শিগ্‌গির! বারান্দায়!

(দু'জনের বারান্দায় প্রস্থান। পিসেমশাই সন্তর্পণে প্রবেশ করিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া একটি চুরুট বাহির করিয়া মুখে দিয়াছেন—অনু প্রবেশ করিল। পিছনে শম্ভু।)

অনু : ও, তু—মি!

(চুরুট খসিয়া গেল। পিসে লাফাইয়া উঠিলেন)

পিসেমশাই : ওঃ! তু—ই!

অনু : তুমি এখানে কী করছো?

পিসেমশাই : (চুরুট ধরাইয়া প্রথম ধোঁয়াটি ছাড়িয়া) চুরুট খাচ্ছি। তোর পিসীমাকে বলিস নি।

অনু : (হাসিয়া) আচ্ছা।

শম্ভু : তারপর—চটপট বলো।

অনু : সব ঠিক আছে। নিতাইদাকে বলুন দুপুরে রিহার্স্যাল হবে— যেমন কথা ছিল। পিসেমশাই, কখন বেরুচ্ছো তোমরা?

পিসেমশাই : আমি কী করে বলবো? তোর পিসী জানে। আমি তো যদ্দুর জানতাম এতোক্ষণে বেরিয়ে পড়বার কথা।

অনু : রোববারের আগে ফিরছো না তো?

পিসেমশাই : না না— তোর ভয় নেই। মধুদা ছাড়লে তো? তার উপর তার সেজো মেয়ের বিয়ে গেছে এক মাস আগে। তার গয়নার ফর্দ, কাপড়ের হিসেব, জামাইয়ের কদর—ও সব কি বৌদি দু'দিনেও শেষ করতে পারবে না কি?

শম্ভু : তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গে। আবার ঘাটে এসে ভরাডুবি না হয়।

পিসেমশাই : হ্যাঁ হ্যাঁ—তুই যা ভিতরে।

অনু : তুমিও এসো।

(অনু ভিতরে গেল। শম্ভু বাহিরে—বারান্দার পথে। পিসেমশাই প্রাণপণে চুরুট টানিতেছেন। যোগীনের প্রবেশ।)

যোগীন : তুমি এখানে?

পিসেমশাই : (ভীষণ চমকাইলেন। পরে যোগীনকে দেখিয়া) তোমার এ বাড়িতে সবাই বড়ো হুট্ করে ঢোকে বেরোয়!

যোগীন : (বসিতে বসিতে) আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম। মেয়ে থিয়েটার করবে, আমার প্রাণান্ত। তোমরাও আর আসবার সময় পেলে না। অ্যাদ্দিন পরে এলে, কোথায় নিশ্চিন্দি মনে দু'হাত দাবায় বসবো, তা না, আমিই উঠে পড়ে লেগেছি কতোক্ষণে বাড়ি থেকে বেরোও।

পিসেমশাই : দুঃখ কোরো না যোগীন। আমাদের দিন গেছে। এখন যাদের দিন, তাদের দাবি সর্বাগ্রে।

যোগীন : তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না, যদি না আমাকে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হোতো। ওরা আসতো, হল্লা করতো, মেয়ে খুশি ছিল—আমিও দিব্যি ছিলাম।

পিসেমশাই : তা ছিলে। তোমার মেয়েকে নিয়ে তোমার যা চিন্তা, তার দশগুণ আমাকে করতে হচ্ছে ঠেকায় পড়ে।

যোগীন : কেন? তোমার তো মেয়ে নেই।

পিসেমশাই : থাকলে ভালো ছিল। তোমার বড়দি তাকে নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত থাকতো, আমি নিরিবিলি দু'টো চুরুট খেতে পারতাম। এখন তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কেন হচ্ছে না, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে টাক পড়ে গেল!

যোগীন : (হাসিয়া) টাক তো তোমার অনু জন্মাবার আগে থেকেই!

পিসেমশাই : এখন আরো বেড়েছে। আরো বাড়বে। তোমার বড়দি এবার প্রতিজ্ঞা করে এসেছে—অনুর বিয়ের একটা পাকা হেস্ত নেস্ত করে তবে কলকাতা ছাড়বে। তদ্দিনে আমার লক্ষ্ণৌয়ের প্র্যাক্‌টিস্ চুলোয় যায় তো যাবে!

যোগীন : অনুর বিয়ে?

পিসেমশাই : কেন? কথাটা কি এতোই দুর্বোধ্য?

যোগীন : না, মানে—অনুর বিয়ের কথাটা কখনো ভেবে দেখিনি। কলেজে পড়ছে, হল্লা করছে, সংসার চালাচ্ছে—একরকম কেটে যাচ্ছে বেশ।

পিসেমশাই : এই রকম চলতে চলতে বিয়েটাও আপ্‌সে হয়ে গেলে বোধহয় তোমার সুবিধে হয়?

যোগীন : তাও অতো ভেবে দেখি নি। অনু যদি খুশি হয়, ভাববো ভালোই হয়েছে।

পিসেমশাই : তোমাকে তাহলে একটা কথা বলি শোনো—

পিসীমা (ভিতর হইতে) : কই, তুমি আবার গেলে কোথায়?

(পিসেমশাই বিদ্যুৎগতিতে চুরুট ফেলিয়া পায়ে চাপিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমার প্রবেশ)

পিসেমশাই : কই, আর কতো দেরি করবে, চলো? আমরা গেলে তবে ওদের খাওয়া দাওয়া হবে।

পিসীমা : তা তোমার তো কোনো তাড়া দেখছি না। বসে বসে চুরুট টানছো, আর আড্ডা মারছো।

পিসেমশাই : (তোৎলাইয়া) চু-রুট কিসের? কোথায় চুরুট? কে-কে-কে চুরুট—

পিসীমা : তুমি চুরুট! গোয়াল ঘরে ধুনো দেবার মতো ঘরের অবস্থা, বলে—কে চুরুট! আজ সন্ধের চুরুট বন্ধ তোমার।

পিসেমশাই : (কাতরস্বরে) আধখানা মোটে খেতে পেরেছি—

পিসীমা : বাকি আধখানা কাল খেও। এখন যাও, তৈরি হও গে।

(পিসেমশাইয়ের প্রস্থান)

যোগীন!

যোগীন : অ্যাঁ?

পিসীমা : কোন্নগর থেকে ফিরেই আমি অনুকে দেখাবার বন্দোবস্ত করবো। সে কটা দিন ভালো চাও তো সামলে থেকো।

যোগীন : অনুকে দেখাবার? কী দেখাবার?

পিসীমা : তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে না কোনো দিন? সাধে বলে—বারো বছরের বেশি মাস্টারি করলে—বলি, অনুর বিয়ে দিতে হবে না?

যোগীন : বিয়ে? ও হ্যাঁ, তা—তা বেশ তো।

পিসীমা : তা বেশ তো! তুমি অ্যাদ্দিন বসে করেছোটা কী?

যোগীন : (ঘাবড়াইয়া) আমি—আমি অনুকে বলবো'খন। আজই বলবো।

পিসীমা : অনুকে বলবে? অনুকে কী বলবে?

যোগীন : কেন? ইয়ে—ঐ—বিয়ে—বিয়ে করবার কথা?

পিসীমা : ভগবান! অনুর কপালে কী বাবা লিখেছিলে! বলি, অনুকে বলবে—তুমি আছো কী করতে?

যোগীন : (স্তম্ভিত) আমি?? আমি এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে যাবো না কী? তুমি ক্ষেপেছো?

পিসীমা : (সপ্তমে) আমি—(হাল ছাড়িয়া) ক্ষেপেছিই বটে। নইলে তোমাকে বলতে গেছি? সব শুধু আমার ঘাড়ে। আর একজন তো বললে হুঁ হাঁ করে, আর চুরুট খাবার

তাল খোঁজে। এতোক্ষণ বোধহয় আর একখানা ধরিয়েছে—(হাঁকিয়া) বলি, হোলো?

যোগীন : (শশব্যস্তে) আমি দেখি গে, হোলো কি না—

(দ্রুত ভিতরে প্রস্থান)

পিসীমা : ভগবান!

(কপালে করাঘাত করিয়া আরাম কেদারায় এলাইলেন। খোকা-খুকুর নাচিতে নাচিতে প্রবেশ।)

খোকা-খুকু : অনুমাসী! অনুমাসী! (পিসীমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল)

পিসীমা : অনুর অসুখ। কী চাও?

(খোকা-খুকু বিন্দুমাত্র ভয় না পাইয়া নিকটে আসিয়া পিসীমাকে নিরীক্ষণ করিল।)

খোকা : তুমি কে?

পিসীমা : (হতচকিত) আমি? (তারপর হঠাৎ থামিলেন। এই প্রথম মুখের ভাব ও গলার স্বর কিছুটা কোমল হইল) আমি তোমার অনুমাসীর বড়োপিসী।

খুকু : অনু-মা-সীর ব-ড়ো-পি-সী? (চোখ বড়ো করিয়া) ওরে-ব্বাবা!

খোকা : তুমি কোথায় থাকো?

পিসীমা : কেন, এইখানে?

খোকা : এইখানে? এই বাড়িতে?

পিসীমা : হ্যাঁ গো, এই বাড়িতে।

খুকু : যাঃ! আমরা তো রোজ আসি। তোমাকে দেখিনি তো?

পিসীমা : আগে ছিলুম না। কাল এসেছি।

খোকা : কাল কখন এসেছো?

পিসীমা : বিকেল বেলা।

খোকা : আমরা তো রাত্তিরে এসেছিলুম কাকাকে খেতে ডাকতে। তখন তো দেখি নি?

পিসীমা : তখন বাড়ি ছিলুম না। কে তোমার কাকা?

খোকা : কাকা! শম্ভু! (পিসীমা চমকাইলেন)

খুকু : এই, শম্ভু বললি? মা কী বললো সেদিন, মনে নেই?

খোকা : শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিসীমা : শম্ভু তোমাদের কাকা? তোমরা এই উপরের ঘরে থাকো?

খোকা : হ্যাঁ।

পিসীমা : অ। শম্ভুকে ডাকতে এখানে এসেছিলে?

খোকা : হ্যাঁ, রোজই তো মা ডাকতে বলে। আর রোজ কাকা বলে—ঢেকে রেখে দিতে বল্।

খুকু : মা হাসে, আর বলে—থিয়েটারে আগুন দেবো!

খোকা : তুমি থিয়েটার দেখবে না?

পিসীমা : থিয়েটার? কবে হবে থিয়েটার?

খুকু : ও মা! তুমি জানো না? শনিবার। কালই তো!

খোকা : ওই মাঠে। কত্তো বড়ো স্টেজ—দেখোনি?

খুকু : (ঠোঁট উল্টাইয়া) দাদা, অনুমাসীর বড়োপিসী এখানে থাকে না রে!

খোকা : এই ঘরে তো রোজ রিহাস্‌স্যাল হয়। আমিও বড়ো হলে থিয়েটার করবো, নিতাইকাকা বলেছে।

খুকু : তুই পারবিই না!

খোকা : পারবো না বৈ কি! দেখবি? (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া 'পোজ্' লইল) "প্রমীলা। চলো। চলো আমরা পালিয়ে যাই। এ দেশ ছেড়ে অনে—ক দূরে, যে দেশে কে—উ আমাদের চেনে না, সেইখানে গিয়ে ঘর বাঁধি।" তারপর প্রমীলা বলবে—"না, রাজীবদা। তা হয় না।"

পিসীমা : (চক্ষু বিস্ফারিত হইতেছিল, এখন মৃদুকণ্ঠে) তবু ভালো।

খুকু : (খোকাকে ঠেলিয়া সরাইয়া) দূর! ঐ রকম করে বুঝি? (দুই হাত নিংড়াইয়া দুইচোখ আকাশে তুলিয়া) "না রাজীব-দা। তা হ—য় না।" এমনি করে তো অনুমাসী বলে!

পিসীমা : (ভয়ানক চমকাইয়া) কে? কে বলে?

খুকু : অনুমাসী। তারপর আরো কতো কথা বলে। কাঁদতে কাঁদতে।

পিসীমা : অনুমাসী! (উঠিলেন)

খোকা : অনুমাসীকে অনেক কাঁদতে হয়, না রে? যখন ধ্রুবেশ বলবে—(বীরবিক্রমে) "আমি তোমাকে শেষবার বলছি প্রমীলা—"

পিসীমা : অনুমাসী! (বসিলেন)

(নেপথ্যে হাঁক— খোকা! অ খোকা। খুকু!)

খুকু : ঐ রে! মা ডাকছে।

খোকা : যাই মা।

(খোকা-খুকুর নাচিতে নাচিতে প্রস্থান)

পিসীমা : (বিহ্বলস্বরে) অনুমাসী। অনু। (সহসা উঠিয়া বজ্রকণ্ঠে) অনু! অনু! এদিকে এসো।

(পিসেমশাইয়ের প্রবেশ)

পিসেমশাই : কী হোলো? অনু ঘুমুচ্ছে। ক্ষেপেছো না কি?

পিসীমা : হ্যাঁ ক্ষেপেছি। অনু! ঘুম না আরো কিছু। অনু, এলি?

পিসেমশাই : কী হোলো কী? বেচারা পেটের ব্যথায়--

পিসীমা : পেটের ব্যথা তোমার মাথা! ধিঙ্গিপনা বার করছি ওর। অনু!

(দুর্বলভাবে অনুর প্রবেশ)

অনু : (ক্ষীণকণ্ঠে) কী বড়োপিসী?

পিসীমা : পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, তৈরি হয়ে নাও। কোন্নগর যাবে আমার সঙ্গে।

অনু : কোন্নগর? আমার—আমার যে—

পিসীমা : চুপ। একটা কথা নয়। মিথ্যে কথা অনেক বলেছো কাল থেকে, আর বাড়িও না। যাও। থিয়েটার করা বার করছি তোমার।

(অনুর বিহ্বলভাবে প্রস্থান)

পিসেমশাই : কে থিয়েটার করছে?

পিসীমা : কে আবার? তোমাদের আদুরে অনু। (হাঁকিলেন) যোগী—ন!

পিসেমশাই : অনু? কী সর্বনাশ! থিয়েটার করছে? তা করে ফেলেছে যখন, এবারটার মতো—করুক না?

পিসীমা : (গর্জনে) অ! তুমিও বুঝি আছো এর মধ্যে?

(যোগীনের প্রবেশ)

আর তুমি! তোমার মেয়ে, তার দেখাশোনা করা দূরে থাক, ধিঙ্গি মেয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সমানে মিথ্যেকথা ধাপ্পাবাজি—ছি ছি, লজ্জাও করে না বুড়ো বয়সে?

যোগীন : আমি? আমি কী করেছি—

পিসীমা : তুমি কী করেছো, জানো না? একপাল বাউণ্ডুলে ছোকরার সঙ্গে মিলে এক মাঠ লোকের সামনে স্টেজে উঠে নাচবে—হরিহর চাটুজ্যের বংশের মেয়ে! বাবা ঠিকই বলতেন—কালাপানি পার হলে উচ্ছন্নে না গিয়ে যায় না।

যোগীন : কে বললো তোমাকে অনু—

পিসীমা : আর ধাপ্পা দিয়ে লাভ নেই যোগীন। শম্ভুর ভাইপো ভাইঝি-র মুখে সব শুনেছি আমি। ওরা এখনো তোমার মতো মিছে কথা বলতে শেখে নি।

যোগীন : শোনো বড়দি—

পিসীমা : কী শুনবো? আরো এক গঙ্গা মিথ্যে কথা? পাপ আর বাড়িও না যোগীন।

যোগীন : আমার কথাটা শোনো—

পিসীমা : কিচ্ছু শোনবার নেই। অনু এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে কোন্নগর যাবে। (পিসেমশাইকে) তুমি দাঁড়িয়ে কী দেখছো? ট্যাক্সি ডাকো গে। (পিসেমশাইয়ের প্রস্থান) ফিরে এসে পনেরো দিনের মধ্যে যদি অনুর বিয়ে না চোকাতে পারি তো আমি হরিহর চাটুজ্যের মেয়ে নই! অনু!

যোগীন : বড়দি, শোনো। অনু যদি যায়, এদের সব পণ্ড হবে। আমরা এখানে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। এ বাড়ি ছাড়তে হবে—

পিসীমা : ছাড়তে হবে? অত্যন্ত সুখের কথা। এ বাড়ি ছেড়ে গাছতলাতেও ভালো থাকবে। তবে তার দরকার হবে না। অনুর বিয়ে হলে তুমি তোমার চ্যালাদের জুটিয়ে মনের আনন্দে স্টেজে উঠে নেচো, আমার কিচ্ছু বলার থাকবে না।

যোগীন : (মরিয়া হইয়া) অনু, অনু যাবে না। (বসিলেন)

পিসীমা : যাবে না?

যোগীন : না, যাবে না। কালকের দিনটার পরে তুমি যা বলো শুনবো। যদি ওকে তালা বন্ধ করে রাখতে বলো—তাও শুনবো। এবারটার মতো ওকে থাকতেই হবে।

পিসীমা : যাবে না?

যোগীন : না। অনু আমার মেয়ে!

পিসীমা : বেশ। অনু থাক। আমার যা করবার আমি করবো। বাবাকে লিখে দেবো—আমার যা চেষ্টা করার করেছি, এবার তোমার ছেলে তোমার নাতনি তুমি বোঝো!

যোগীন : (আর্তনাদে) বড়দি!

পিসীমা : আমার ঐ এক কথা।

যোগীন : বাবাকে কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছো?

(অনুর প্রবেশ। হাতে ব্যাগ)

পিসীমা : না জড়াতে হলে আমি বেঁচে যেতুম। এখনো বেঁচে যাই। কিন্তু অনু যদি তোমার আহ্লাদে স্টেজে উঠে নাচে, তবে বাবাকে না লিখে আমার উপায় নেই। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।

(পিসেমশাইয়ের প্রবেশ)

পিসেমশাই : ট্যাক্সি এসেছে।

পিসীমা : কী, অনু যাবে কি থাকবে?

(যোগীন জবাব দিলেন না। দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিলেন)

চলো অনু।

(অনু ও পিসীমার প্রস্থান। পিসেমশাই চট করিয়া ফিরিলেন)

পিসেমশাই : যোগীন!

যোগীন : অ্যাঁ?

পিসেমশাই : দমে যেও না। শম্ভুকে ডাকো। যেটুকু দেখেছি, ও ছেলে ঠিক লাইনে গেলে মাস্টার ক্রিমিন্যাল হোতো।

যোগীন : শম্ভু? শম্ভু কী করবে?

পিসেমশাই : কী করবে জানা থাকলে আমি কি আর উকিল হতে যেতুম? চেষ্টা করুক, তোমার বড়দির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যদি কেউ পারে তো ওই।

পিসীমা (নেপথ্যে) : বলি, তোমার আবার হোলো কী?

পিসেমশাই . অ্যাঁ? এই যে যাচ্ছি!

(দ্রুত প্রস্থান)

যোগীন : শম্ভু? (তারপর হাল ছাড়িয়া) শম্ভু কী করবে?

(খোকা-খুকুর নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)

খোকা : যোগীনদাদু! ওরা সব কোথায় গেলো? অনুমাসী, অনুমাসীর বড়োপিসী—

যোগীন : ওরা? ওরা বেড়াতে গেলো।

খুকু : বেড়াতে গেলো? থিয়েটার করবে না?

যোগীন : না।

খোকা : কে করবে তাহলে থিয়েটার?

যোগীন : কেউ করবে না। থিয়েটার হবে না।

খোকা-খুকু (একসঙ্গে) : না, হবে! কেন হবে না? আমরা থিয়েটার দেখবো না বুঝি—বারে?

যোগীন : থিয়েটার? (ঈষৎ চাঙ্গা হইয়া) আচ্ছা, যা তবে, দৌড়ে তোদের কাকাকে পাঠিয়ে দে। আর নিতাইকাকা কী করছে দেখ। তাকেও বল্ আসতে। ছুট্টে যাবি।

(খোকা-খুকু নাচিতে নাচিতে ছুটিল। পিছনের দরজায় শম্ভুর প্রবেশ।)

শম্ভু : কাকাবাবু!

যোগীন : এই যে, তুমি নিজেই এসে পড়েছো?

শম্ভু : অনাথ বললো—অনুও পিসীমার সঙ্গে ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেলো। কী ব্যাপার?

যোগীন : ও, তুমি জেনেছো তা হলে?

শম্ভু : এতোক্ষণে সবাই জেনেছে বোধ হয়। অনাথ দিকে দিকে দৌড়োচ্ছে। কী হোলো কী?

(পিছনের দরজা দিয়া নিতাই, রাজীব ও শশাঙ্কের প্রবেশ। অবস্থা-- যেন শবানুগমনে আসিয়াছে।)

নিতাই : কী ব্যাপার স্যার? অনু কোথায় গেলো?

যোগীন : কোন্নগর।

নিতাই-রাজীব-শশাঙ্ক (একসঙ্গে) : কোন্নগর!!

যোগীন : খোকা-খুকুর কাছ থেকে বড়দি সব কথা বার করে নিয়েছে। আমি—আমি তবু জোর করে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাবা—বাবার কাছে—শম্ভু, নিতাই, বিশ্বাস করো। আমি যথাসাধ্য—

শম্ভু : (হাসিয়া) সে কথা কি আমরা জানি না কাকাবাবু?

যোগীন : তুমি, তুমি হাসছো? হাসতে পারছো?

শম্ভু : হাসতে পারবো না কেন? আধখ্যাঁচড়া কাজ করেছিলাম। উচিত শাস্তি হয়েছে। শিক্ষা হয়ে গেলো—এর পরের বার আর এমন হবে না।

নিতাই : এর পরের বার! (বসিয়া পড়িল) এর পরেও আবার থিয়েটারের কথা ভাবছিস্ তুই।

শম্ভু : এটা চুকলে তুমিও আবার ভাববে। সব অধিকারীই ভাবে।

নিতাই : এটা চুকলে? এটা চোকাবে কে?

শম্ভু : সেইটাই জানা দরকার। কাকাবাবু, কোন্নগরের বাড়ির মেয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে শুনছিলাম না?

(স্মারকের প্রবেশ)

নিতাই : তুই খোসগল্প করবার সময় পেলি নে শম্ভু?

শম্ভু : (হঠাৎ কঠিন হইয়া) নিতাইদা! তুমি যখন রিহার্স্যালে ডায়রেকশন্ দিয়েছো—আমি তার মধ্যে একটা কথাও বলতে গেছি কোনো দিন?

নিতাই : (সঙ্কুচিত) না।

(অনাথের প্রবেশ)

শম্ভু : আমি স্টেজ সামলাচ্ছি—তাতে তুমি কোনো কথা বলেছো কোনোদিন?

নিতাই : না।

শম্ভু : ঠিক। একে বলে ডিভিশন অফ্ লেবার। এবং টীমওয়ার্ক্। যা তুমি প্রতি রিহার্স্যালে দশবার শোনাও। এখন একটা কথা বলি—সিধে জবাব দাও। পিসীমা কার?

নিতাই : অনুর।

শম্ভু : তা জানি! জিজ্ঞেস করছি—পিসীমার ভার কার ওপর? তোমার না আমার? যদি তুমি নাও—আমি সাফ্ গিয়ে স্টেজের পর্দা খাটাই, একটা কথাও বলবো না। যদি আমাকে দাও—ফালতু প্রশ্ন ছাড়তে হবে। শুধু তাই নয়, যখন যা বলবো করবো—সায় দিয়ে তাল রেখে চলতে হবে। সব্বাই। এবার বলো—পিসীমা কার?

নিতাই : (চোর হইয়া) তোর।

শম্ভু : গুড্! সরি কাকাবাবু। আভ্যন্তরীন বন্দোবস্ত। (বসিল) পিসেমশাই বলছিলেন ও বাড়ির মেয়ের বিয়ে গেছে মাসখানেক আগে। কোথায় জানেন?

যোগীন : জানি বৈ কি। কলকাতাতেই।

শম্ভু : কলকাতার কোথায়? ঠিকানা কী? (পকেট হইতে নোটবুক কলম বাহির করিল)

যোগীন : ঠিকানা জানি না। কালীঘাটের কাছে কোথায় যেন—

শম্ভু : ওতেই হবে। মেয়ের নামটা জানেন?

যোগীন : অরুণা।

শম্ভু : অ-রু-ণা (লিখিল) ডাক নাম আছে না কি কিছু?

যোগীন : অরু বলে তো ডাকে শুনেছি।

শম্ভু : অরু। গুড্। জামাইয়ের নাম জানেন?

যোগীন : জামাই? জামাইয়ের নামটা তো মনে পড়ছে না।

শম্ভু : এই মরেছে! (অল্প ভাবিয়া) বিয়ের কার্ডটা আছে?

যোগীন : ঠিক বলেছো! থাকতো না, কিন্তু অনুর বিয়ের কার্ড জমানো অভ্যেস। আমি দেখছি।

(যোগীনের ভিতরের দিকে প্রস্থান)

শম্ভু : কটা বাজে এখন নিতাইদা?

নিতাই : সাড়ে দশটা।

শম্ভু : সাড়ে দশ। (বিড় বিড় করিয়া কী সব হিসেব করিতে লাগিল)

(যোগীনের প্রবেশ)

যোগীন : পেয়েছি। এই যে—কালীঘাটনিবাসী শ্রীঅঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সমরকুমার মুখোপাধ্যায়। ঠিকানাটাও পাবে এতে—

শম্ভু : দিন, ওটা আমাকে দিন। অনুকে বললেন ফেরৎ পাবে ঠিক। আর একটু বিরক্ত করবো কাকাবাবু, এইখানে কোন্নগরের বাড়ির নামধামগুলো লিখে দিন। (নোটবুক দিল। যোগীন লিখিতে লাগিলেন) ট্রেজারার! ফান্ডে কতো ঘাটতি?

স্মারক : ঘাটতি কী? টাকা বেঁচে যাবে দেখিস!

শম্ভু : বলিস কী রে? অ্যামেচার থিয়েটারের নাম ডোবালি তুই! কতো থাকবে?

স্মারক : কতো কি এখন বলা যায়? পাঁচ দশ টাকা হবে। (খাতা বাহির করিয়া) এখন অবধি একশো একান্নো টাকা—

শম্ভু : ও হরি! পাঁচ দশ! যাক গে, তোকে আর হিসেব শোনাতে হবে না। একটা নতুন লেজার খোল্।

স্মারক : (ঐ খাতারই নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া) কী নামে?

শম্ভু : পিসীমা ফান্ড।

স্মারক : পিসীমা লিখবো, না আন্ট্ লিখবো?

শম্ভু : না না আন্ট্ ফান্ট্ নয়—পিসীমা! পি-আই-এস্-এইচ্-আই-এম্-এ। এখন পিসীমাকে আন্ট্ বানালে মাথা খেলবে না— আন্ট বড়ো হাল্কা নাম। বরং লেখ্—বড়োপিসীমা।

স্মারক : বিগ্?

শম্ভু : না না—বড়ো। বানান না জানিস্ ডিক্সানারি দেখ্। নয় তো বাংলায় লেখ্। নিতাইদা, পাঁচ দশে কুলোবে না। এমার্জেন্সী! ধার করে হোক চুরি করে হোক বিশ পঞ্চাশ যা লাগে জোগাতে হবে।

যোগীন : যদি টাকা দিয়ে হয়—আমি দেবো।

শম্ভু : ব্যস্ত হবেন না কাকাবাবু, সব চাঁদার ব্যাপার, আপনার কাছেও হাত পাতবো। তবে আপনি একা নন—দায় সকলের। আচ্ছা, অনাথকে আমার চাই। নিতাইদা তোমার আপত্তি আছে?

নিতাই : কিছু না, কিছু না।

শম্ভু : অনাথের একটা বিরাট গুণ প্রশ্ন না করে কাজ করতে পারে। কিন্তু অনাথ, পিসীমার সঙ্গে আর স্পীক্‌টি নট্!

অনাথ : আবার? (কান মলিল)

শম্ভু : তোকে এখুনি একবার কালীঘাট যেতে হবে। ট্যাক্সি নিয়ে! (নোটবুক হইতে একটা পাতা ছিঁড়িয়া লিখিতে লাগিল। সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাহিল)

যোগীন : (সপ্রশংস) বড়দা ঠিক বলেছিলেন।

শম্ভু : (লিখিতে লিখিতে) কী বলেছিলেন?

যোগীন : বলেছিলেন—পারলে ঐ শম্ভু পারবে। আর—আর বলেছিলেন—

শম্ভু : কী?

যোগীন : সেটা ঠিক বুঝলাম না আমি। বলছিলেন—তুমি লাইনে গেলে মাস্টার ক্রিমিন্যাল হতে।

শম্ভু : (লেখা ছাড়িয়া ঠা ঠা করিয়া হাসিল) পিসেমশাই জজ্ চরিয়ে খান—মানুষ চেনেন। অনাথ—তুই একটু বাইরে আয় তো।

(শম্ভু ও অনাথ পিছনের বারান্দায় গেলো।)

নিতাই : কিছু বুঝলেন স্যার?

যোগীন : না। কিন্তু মনে হচ্ছে একটা কিছু হবে। একটা সিগারেট দাও। (নিতাই সিগারেট দিল)

নিতাই : এ থিয়েটার যদি হয় তবে নাক মলছি কান মলছি, আর কোনোদিন যদি—

(শম্ভুর প্রবেশ)

শম্ভু : বলে নাও এই বেলা নিতাইদা। আবার রোব্‌বার থেকে দেখবো নতুন বই বাছা হ'চ্ছে। (নিতাইয়ের উদ্যত আপত্তি থামাইয়া) যাক গে, সে পরের কথা। শোনো, যদি দুর্ঘটনা কিছু না ঘটে, অনু আজ রাত্তিরে আসবে, কি বড়োজোর কাল সকালে। কিন্তু পিসীমাও সঙ্গে আসবেন; সেটা ঠেকানো যাবে না।

সমবেত : অনু আসবে!!

শম্ভু : সেটা প্রায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু আসল কাজ তারপরে, এবং সেটা এতো সহজে হবে না। কাকাবাবু, আপনার উপব অনেক ধকল গেছে, আপনি বরং খাওয়া দাওয়া করুন গিয়ে। নিতাইদা থাকো, আর সবাই কাটো এখন। দু'টোয় রিহার্স্যাল—তখন এসো। (সকলের বিনা প্রশ্নে প্রস্থান। যোগীন ভিতরে, বাকি পিছনের দরজা দিয়া বারান্দা-পথে।)

(আপন মনে) প্রশ্ন হোলো—পিসীমা এবং অনু। অনু—এবং পিসীমা। অনু মাইনাস্ পিসীমা। অনু প্লাস—অনু প্লাস্ কী?

(বনানী ও মিঃ সেনের প্রবেশ—বাহিরের পথে)

বনানী : শুনলাম না কি মিস্ চ্যাটার্জি চলে গেছেন?

শম্ভু : হ্যাঁ। তবে ভয় নেই, আবার আসবে।

মিঃ সেন : ও, আবার আসবেন। আমি ভাবলাম বুঝি—ইয়ে—ওঁর বড়োপিসী ওঁকে—

শম্ভু : খুব ভুল ভাবেন নি।

মিঃ সেন : তবে?

শম্ভু : তবু হবে।

মিঃ সেন : হবে? কী করে হবে?

শম্ভু : সেইটাই ভাবছিলাম।

বনানী : বাব্বা! ভাগ্যিস আমার বিয়ে হয়ে গেছে! আমার একবার ঠিক এমনি হয়েছিল। কিছুতে মা করতে দিলেন না! তখন ভেবেছিলাম—আমার যদি বিয়ে হয় তো যেন এমন কারো সঙ্গে হয় যার আর্টে টেস্ট আছে।

শম্ভু : (নিজের মনে) বিয়ে! বিয়ে! অনু প্লাস্—

বনানী : তোমাকে বলি নি সে কথা? সেই যেবার বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকতে পুজোর সময়ে—

শম্ভু : হয়েছে!!

বনানী ও মিঃ সেন (একসঙ্গে) : (চমকাইয়া) কী হয়েছে?

শম্ভু : হয় নি এখনো। কিন্তু হবে। হতে পারে। হওয়া সম্ভব। বোধ হয়।

মিঃ সেন : অ্যাঁ?

শম্ভু : সরি। কিছু না। মিস্টার সেন, আপনি কিছু বলতে এসেছিলেন?

মিঃ সেন : আমি—না, তেমন বিশেষ কিছু—আমার, ইয়ে—একটা সাজেশন্ ছিল।

শম্ভু : কী বলুন।

মিঃ সেন : বলছিলাম—যদি মিস্ চ্যাটার্জি শেষ অবধি না এসে উঠতে পারেন—মানে, ইন্ কেস্ অফ্ এমার্জেন্সি, তবে—

শম্ভু : তবে কী?

মিঃ সেন : বলছিলাম—ও হয় তো প্রমীলার পার্টটা চালিয়ে নিতে পারবে। (নিতাই স্তম্ভিত) মানে ওর তো সবই দেখা আছে, প্রায় মুখস্ত—

শম্ভু : আর বনানীর পার্ট?

মিঃ সেন : বনানীটা যাকে হয় দিয়ে—

শম্ভু : কাকে দিয়ে?

বনানী : আমার এক খুড়তুতো বোন আছে, চেষ্টা করলে তাকে— (নিতাইয়ের অবস্থা শোকাবহ)

শম্ভু : সে কথা আমরা ভেবেছিলুম প্রথমেই। (বনানী ও মিঃ সেন উদ্ভাসিত, নিতাই বজ্রাহত) ইন্ ফ্যাক্ট আমিই প্রস্তাবটা করেছিলুম। কিন্তু নিতাইদা বললেন—প্রমীলা যাকে দিয়ে হয় চালিয়ে দেওয়া যাবে, তা বলে বনানীর পার্ট নিয়ে

ছেলেখেলা চলবে না। আমরা তাই ভাবছিলুম—অনু না হয়ে যদি মিসেস্ সেনের পিসীমা আসতেন তবে কী হোতো!

মিঃ সেন : ও, হ্যাঁ। বুঝেছি। তা অবশ্য—

বনানী : তা হলে কী করবেন?

শম্ভু : অনুই করবে শেষ অবধি। যদি নাই হয়—বৌদিকে দিয়ে চালিয়ে দেবো যে করে হোক।

বনানী : বৌদি??

শম্ভু : বৌদি। নিতাইদার বৌ। (নিতাইয়ের মাথায় কেহ মুগুর মারিয়াছে। কিন্তু শম্ভু তাহার চোখে তাকাইয়া আছে, যেন—কী বলেছিলুম, মনে আছে তো?) বৌদি কখন আসবে বললো?

নিতাই : অ্যাঁ? হ্যাঁ, বল্‌লো, বল্‌লো—এই—

শম্ভু : যতো তাড়াতাড়ি পারে আসবে তো?

নিতাই : হ্যাঁ হ্যাঁ যতো তাড়াতাড়ি পারে, যতো তাড়াতাড়ি পারে—

মিঃ সেন : আপনার স্ত্রী? আমার আইডিয়া ছিল আপনি আন্‌ম্যারেড্—

নিতাই : আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে—না—

শম্ভু : যদি কিছু মনে না করেন মিঃ সেন, ব্যাপারটায় কিছু পারিবারিক—(চোখ টিপিয়া) বুঝলেন না?

মিঃ সেন : ও, আয়্যাম্ অফুলি—

শম্ভু : তা হলে ঐ কথা রইলো মিসেস্ সেন। দু'টোয় রিহার্স্যাল— দেরি করবেন না যেন।

(অগত্যা বনানী ও মিঃ সেনকে বাহির হইতে হইল)

নিতাই : এটা কী হোলো হতভাগা?

শম্ভু : উঁহু নিতাইদা—ইউ আর নট্ টু কোয়েশ্চেন হোয়াই—

নিতাই : (সাংঘাতিক চটিয়া) তাই বলে আমার বৌ!! আমার চোদ্দ পুরুষ কোনোদিন বিয়ে করে নি—

শম্ভু : ছি নিতাইদা, ও কথা বলতে নেই।

নিতাই : (থতমত খাইয়া) তুই—তোর—আমি কি সে কথা বলেছি?

শম্ভু : সরি। আমিই ভুল শুনেছি।

নিতাই : আমি—আমি বলছিলাম আমি বিয়ে করেছি কোনোদিন যে বৌ থাকবে?

শম্ভু : কেন করো নি? ভেবে দেখো তো, আজ যদি তোমার বৌ থাকতো, তবে এরকম পিসীমার হাতে নাজেহাল হতে হোতো?

নিতাই : কোন্ শালা আর থিয়েটার করে!!

শম্ভু : (কানে হাত চাপা দিয়া) ছি নিতাইদা। তোমার না আর্টে টেস্ট? (নিতাইয়ের ফাটিয়া পড়া ঠেকাইয়া) না নিতাইদা, আর করবো না, তুমি গুরুজন। (গম্ভীর হইয়া) কিন্তু একটা কথা বলবো? সিরীয়াস্‌লি?

নিতাই : বল্।

শম্ভু : তোমাদের এই অনু—আমি যতোই দেখছি, আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

নিতাই : কেন, অনু কী করেছে?

শম্ভু : অনু কী করেছে? কী করে নি? থিয়েটারের আগের দিন চলে গেলো কোন্নগর—একটা দায়িত্বজ্ঞান নেই? জানে না সমস্ত পাড়ার সামনে আমাদের কী হাল হবে?

নিতাই : অনু কি সখ করে গেছে? পিসীমা—

শম্ভু : (হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে) পিসীমার দোহাই দিও না। যার দায়িত্বজ্ঞান আছে, সামান্য একটু শিরদাঁড়া বলে পদার্থ আছে, সে পিসীমার ভয়ে কেঁচো হয়ে পালায় না।

নিতাই : (অত্যন্ত ক্ষুব্ধ) দেখ্ শম্ভু। তোকে কথা দিয়েছি তোর প্ল্যানে কোনো বাধা দেবো না। তাই বলে তুই যদি মনে করে থাকিস যার নামে ইচ্ছে যা খুশি তাই বলে যেতে পারিস—

শম্ভু : (অত্যন্ত শান্ত) এক পিট হোলো।

নিতাই : (হকচকাইয়া) অ্যাঁ?

শম্ভু : আর দু পিট। তিন পিট হলেই আর এক পিট আপনি আসবে। চার পিটে গেম। (হাসিয়া) এটা প্ল্যানের হিসেব নিতাইদা, এটাতে চোটো না। শোনো, একটা কথা বলবো?

নিতাই : কী?

শম্ভু : অনু আসবে। পিসীমাও আসবে। আজ দুপুরের পর থেকে এ ঘর ছেড়ে দিতে হবে। শুধু থিয়েটারের সময়ে গ্রীন রুম হতে পারে—যদি পিসীমাকে ঠিকমতো সামলাতে পারি। রিহার্স্যালে অনুকে আর পাবে না, ওকে একেবারে স্টেজে নামতে হবে। অনুর উপর সেটুকু ভরসা আছে?

নিতাই : আছে। ওর পার্ট নিয়ে কখনো ভাবতে হয়নি আমাকে।

শম্ভু : অতি উত্তম। ক্রাইসিস্ আসবে—খুব সম্ভব প্লে চলবার মধ্যে। হয় তো এই ঘরে, এই গ্রীনরুমে দ্বিতীয় নাটক চলতে থাকবে— যবনিকার অন্তরালে না কী যেন বলে? তখন পুরো ভার তোমার উপর।

নিতাই : আমার উপর?

শম্ভু : ভয় নেই, পুরো ব্রিফ্ পাবে। কিন্তু শুধু ব্রিফ্। এ অঙ্ক নয়। এদিক ওদিক অনেক হবে— যেমন আজ খোকা-খুকু করে দিয়ে গেলো। তখন তোমার উপস্থিত বুদ্ধি এবং অভিনয়-প্রতিভা। সেন-দম্পতির সামনে যা করলে—ওটা অন্তত আমাদের ডায়রেক্টরের কাছ থেকে আশা করি নি।

নিতাই : ও রকম আচমকা বৌ আমদানি ক'রলে—

শম্ভু : ওর চেয়েও অনেক বেশি আচমকা ব্যাপার কাল ঘটবে বলে ধরে রাখো। সোজা সমস্যা—সোজা সমাধান। যথা অনু আর পিসীমাদের ফিরিয়ে আনা। কিন্তু অনুকে পিসীমা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মঞ্চে তোলা, আর পিসীমাকে দর্শকের আসনে বসিয়ে থিয়েটার দেখানো। (নিতাই শিহরিল)—বুঝতে পারছো তো—প্যাঁচালো সমস্যা। অতএব প্যাঁচালো সমাধান। এ সমাধানের প্যাঁচ কদ্দুর গড়াবে আমি জানি না। তুমি আরো জানো না। নির্ভর করছে অন্য দুই পিটের উপর।

নিতাই : অন্য দু' পিট? কি হেঁয়ালি বকছিস?

শম্ভু : কিছু না। তাস খেলার হিসেব।

নিতাই : তোর তাস খেলা নিয়ে তুই মরগে যা। আমাকে কী করতে হবে বলে দে।

শম্ভু : (ছদ্ম দুঃখে) নিতাইদা, তুমি বড়ো অকৃতজ্ঞ। তাও যদি জানতে তোমার জন্যে আমি কী না করছি। পিসেমশাই যে মাস্টার ক্রিমিন্যাল বলেছেন—

নিতাই : তুই বলবি?

শম্ভু : বলছি। তার আগে বলো তো—তোমার চেনা বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রেস আছে?

নিতাই : প্রেস?

শম্ভু : প্রেস। ছাপাখানা। যে ছোটখাটো কাজ দাঁড়িয়ে থাকতে করে দেবে, ফালতু প্রশ্ন করবে না, কথা কম বলবে এবং টাকা প্রচুর নেবে?

নিতাই : আছে।

শম্ভু : গুড্। তোমার হাতের চিঠি চাই—পত্রবাহক যাহা বলিবে তাহাই করিবে। সামান্য কাজ, তোমার থিয়েটারের নেমন্তন্নকার্ডের চেয়েও সোজা। আধ ঘণ্টার কাজও নয়। তিরিশ টাকা দেবো।

নিতাই : তিরিশ! বলিস কী রে?

শম্ভু : বেশি চাইলে তাও দেবো। থিয়েটার কোম্পানি টাকা না দেয়—আমাকে ঘড়ি বেচতে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করো—এটা না হলে নয়।

নিতাই : সে কথা নয়। ভাবছিলাম কী এমন কাজ—

শম্ভু : ভেবো না। ঘরে যাও। চিঠিটা লেখো। স্নানাহার করো। ঠিক দেড়টায় তোমার ঘরে যাবো। তখন বাকি কথা হবে।

নিতাই : তুই খাবি না?

শম্ভু : পরে। আমার কাকাবাবুর সঙ্গে দরকার আছে।

(নিতাইয়ের প্রস্থান)

নিতাইদা এক পিট। কাকাবাবু দুই। অনু তিন। পিসীমা চার। (ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল)

(পিছনের দরজা দিয়ে ব্যস্তসমস্ত এক যুবক প্রবেশ করিল, যুবকটির নাম জগৎ)

জগৎ : দড়ি শম্ভুদা! দড়ি কোথায়?

শম্ভু : (ফিরিয়া) ঐ ডিভানের নিচে আছে। (জগৎ দড়ি লইয়া ফিরিতেছিল) এই জগৎ, শোন।

জগৎ : কী?

শম্ভু : বাইরে কী অবস্থা?

জগৎ : মেরে এনেছি। উইংস ক'টা বাকি আছে।

শম্ভু : তোকে একটা কাজ করতে হবে। নীতিশ গুপ্তকে চিনিস?

জগৎ : নীতিশ গুপ্ত—বি-ব্লক? যে বিয়ে করলো সেদিন?

শম্ভু : সব খবর রাখিস দেখছি।

জগৎ : রাখবো না? সিভিল ম্যারেজ—রোমান্টিক ব্যাপার। ক'টা আছে আমাদের ম্যানশনে?

শম্ভু : বেশি নেই। উঠে পড়ে লাগ—তুই হলে একটা বাড়বে। শোন, এক্ষুনি ওর কাছে একবার যাবি। একটা জিনিস ধার করতে হবে।

জগৎ : কী জিনিস?

শম্ভু : ওদের বিয়ের সার্টিফিকেট।

জগৎ : আমাকে দেবে?

শম্ভু : আমার নাম করলে দেবে। আমি ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিলুম।

জগৎ : তুমি সাক্ষী ছিলে শম্ভুদা? কই কখনো তো—(উৎসাহিত) কী, কী রকম ব্যাপারটা শম্ভুদা?

শম্ভু : পরে শোনাবো, এখন সময় নেই, তুই যা। কাউকে বলবি না কিন্তু, খবরদার! তোর পেটে কথা থাকে?

জগৎ : তুমি দেখে নিও—

শম্ভু : আচ্ছা যা। আর শোন! দুপুরে আমাকে বেরোতে হবে একবার।

জগৎ : সে কী? তুমি গেলে এদিকে কী হবে?

শম্ভু : বেশিক্ষণ না। একবার ছাপাখানায় যেতে হবে। তোরা চালিয়ে নিতে পারবি না?

জগৎ : কখন ফিরবে?

শম্ভু : বিকেলের মধ্যে। যা, কাট্ এখন। আমি যাচ্ছি ওখানে একটু পরে।

(জগতের প্রস্থান)

দু' নম্বর—কাকাবাবু।

(শম্ভু ভিতরে যাইতেছিল—মিঃ সেন প্রবেশ করিলেন)

মিঃ সেন : নিতাইবাবু আছেন না কি?

শম্ভু : (ফিরিয়া) নিতাইদা খেতে গেছে। কেন?

মিঃ সেন : ও। না, তা—পরেই হবে এখন।

শম্ভু : আমি কিছু করতে পারি? নিতাইদা বড়ো ব্যস্ত এখন। থিয়েটার, পিসীমা—সব ওর ঘাড়ে কিনা?

মিঃ সেন : হ্যাঁ সে তো ঠিক। সে তো ঠিক। তা হলে বরং—মানে, এমন কিছু জরুরি ব্যাপার নয়। শুধু—

শম্ভু : বলেই ফেলুন না?

মিঃ সেন · বলছিলাম কী—আমি ভাবছিলাম—যদি মিস্ চ্যাটার্জিকে একটা, ইয়ে—মেডেল দেবার কথা—যদি অবশ্য আপনাদের কোনো—ইয়ে, আপত্তি না থাকে—

শম্ভু : সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু এখনো তো থিয়েটার দেখেন নি?

মিঃ সেন : তাতে কী? তাতে কী? রিহার্স্যাল তো দেখেছি।

শম্ভু : তারপর অনু প্রমীলার পার্ট না করে শেষ অবধি যদি নিতাইদার বৌ করে?

মিঃ সেন : ও, তা—তাহলে—তাহলে তাঁকেই দেবো। নিতাইবাবুর স্ত্রী যখন, নিশ্চয়ই অ্যাক্টিং ভালোই করেন।

শম্ভু : তা বটে। অতোটা আমি ভেবে দেখিনি। আপনি তাহলে ঠিক অনুকে মেডেল দিচ্ছেন না—দিচ্ছেন প্রমীলাকে।

মিঃ সেন : হ্যাঁ—না—তা, কতকটা তাই বটে। ইয়ে, হয়েছে কি—আমার দু' একজন বন্ধু

বলছিলো—ওকে—মানে বনানীকে একটা মেডেল—অবশ্য কথার কথা বলছিলো। তাই ভাবছিলাম—সেটা হয় তো ঠিক, মানে মিস্ চ্যাটার্জির—অর্থাৎ প্রমীলাকে বাদ দিয়ে—ব্যাপারটা একটু হয় তো ইয়ে—

শম্ভু : (বুঝিয়া) অ। সে তো অতি উত্তম প্রস্তাব। মিসেস্ সেনের অভিনয় রিহার্স্যালে যা দেখেছি—আমার পয়সা থাকলে আমিই একটা মেডেলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসতাম। তার উপর বনানীর মতো শক্ত পার্ট।

মিঃ সেন : (আনন্দে) আপনি ঠাট্টা করছেন।

শম্ভু : ঠাট্টা? আচ্ছা নিতাইদাকে জিজ্ঞেস করবেন, বলেছি কি না? নিতাইদাও তো বলে।

মিঃ সেন : (বিগলিত) নিতাইবাবু বলেন?

শম্ভু : কতোবার বলেছে! সেইজন্যই তো নিতাইদা বললো—বনানীর পার্ট আমি আমার বৌকে দিয়ে ডোবাতে পারবো না।

মিঃ সেন : হেঁ হেঁ—ও কলেজে থাকতে আরো ভালো—মানময়ী গার্লস্ স্কুলে চপলার পার্ট করেছিলো—

শম্ভু : দারুণ!

মিঃ সেন : অ্যাঁ?

শম্ভু : বলছিলাম দারুণ করেছিলেন।

মিঃ সেন : (বিস্মিত) আপনি দেখেছিলেন?

শম্ভু : হ্যাঁ, না—দেখি নি। তবে শুনেছি। সবাই বলে। ইয়ে, মিস্টার সেন, কাকাবাবুর সঙ্গে দু'টো কথা ছিল আমার জরুরি—

মিঃ সেন : হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই—(দু'জনে দুইদিকে গেলেন। সেন ফিরিলেন) ইয়ে—শম্ভুবাবু।

শম্ভু : বলুন।

মিঃ সেন : (অত্যন্ত কুণ্ঠিত) বলছিলাম যে—যদি কিছু মনে না করেন—মানে—যদি পয়সার জন্যই শুধু ঠেকে—তবে আমি—

শম্ভু : কী ঠেকে?

মিঃ সেন : (মাটিতে মিশিয়া গিয়া) ঐ—ঐ যে মেডেলের কথা বলছিলেন আপনি—

শম্ভু : (স্তম্ভিত) ওঃ! (সামলাইয়া) ও আচ্ছা। আচ্ছা, পরে কথা বলবো।
(মিঃ সেনের প্রস্থান। শম্ভু মাথা নাড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তারপর 'কাকাবাবু—দু'নম্বর' আওড়াইয়া ভিতরে রওনা হইল। জগতের প্রবেশ।)

জগৎ : শম্ভুদা, অনন্ত জিজ্ঞেস করছে শশাঙ্ক কোন দিকটায় মরবে?

শম্ভু : কোন দিকে মরবে?

জগৎ : শেষ দৃশ্যে প্রবেশ গুলি করবে না শশাঙ্ককে? অনন্ত বলছে বাঁদিকের পেছনটা যেন বাঁচিয়ে পড়ে। একটা তক্তপোষ কমজোর আছে ওদিকে।

শম্ভু : ও, তা সে নিতাইদা জানে। খড়ি দিয়ে দাগ দিয়ে রাখ, নিতাইদাকে দেখাবি পরে। (আবার ভিতরে যাইবার চেষ্টা)

জগৎ : আর শম্ভুদা, সি-ব্লকের বঙ্কুবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন মেয়েদের বসবার কি আলাদা জায়গা করা হবে?

শম্ভু : (ফিরিয়া এবং চটিয়া) কেন, মেয়েদের সবাইকার পিসীমা এসেছে না কি?

জগৎ : (ধাঁধা খাইয়া) পিসীমা? কই না শুনি নি তো?

শম্ভু : তবে বল গে— আলাদা জায়গা হবে না! আর যদি কারো পিসীমা এসে পড়ে তো সে যেন কোন্নগর যায়!

জগৎ : কোন্নগর? (কিন্তু শম্ভু ভিতরে চলিয়া গিয়াছে) কোন্নগর? পিসীমা?

(অনন্তর প্রবেশ)

অনন্ত : শম্ভুদা!

জগৎ : (ধমকাইয়া) শম্ভুদাকে জ্বালাস নে এখন। সারা দিন রাত খাটছে—শম্ভুদা কী—এমন খাটলে নেপোলিয়নের মাথার ঠিক থাকতো না। চল—বাইরে চল!

(বিস্মিত অনন্তকে ঠেলিয়া বাহির করিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(একই ঘর। সন্ধ্যা আন্দাজ ছয়টা। যবনিকা উঠিবার পূর্বেই দুর্বৃত্তের হাসি শোনা গেল। পিস্তলের আওয়াজ। দেখা গেল ধ্রুবেশের হাতে পিস্তল, মুখে হাসি—এবং শশাঙ্ক গুলি খাইয়া পড়িতেছে। ঘরে আর আছে নিতাই, শম্ভু, রাজীব, স্মারক, বনানী, মিঃ সেন ও অনাথ।)

নিতাই : ঠিক আছে। (শশাঙ্ক উঠিল) তবে স্টেজের পোজিশনটা আগে ঠিক করে নিও, জগৎ যেখানে খড়ি দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছে—সেটা বাঁচিয়ে। (ধ্রুবেশকে) তোমার হাসিটা এখনো—যাকগে, এখন আর ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। চালিয়ে যাও।

স্মারক : রাজীব ও প্রমীলার প্রবেশ।

নিতাই : ও, তাহলে আর চালিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। ওটুকু প্রায় সবই তো প্রমীলা। ও যা হবার স্টেজেই হবে।

রাজীব : এই শেষ তা হলে? এর পর একদম স্টেজ?

নিতাই : এর পর একদম স্টেজ। কাল সন্ধে পর্যন্ত যে যার পার্ট দেখো বাড়িতে বসে। (সুমিষ্ট কণ্ঠে) মিসেস সেন, আপনি যদি পার্টির দৃশ্যের ক্যাচ্‌গুলো একটু ভালো করে দেখে রাখেন, তবে আপনার অভিনয় আরো দুর্দান্ত হবে!

রাজীব : প্রমীলা কি করছে সত্যি সত্যি, না—

শম্ভু : প্রতুল, তোমাকে একবার বলেছি না প্রমীলার কথা নিয়ে থিয়েটারের আগে নিতাইদাকে জ্বালানো আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

রাজীব : (নাটকীয় ভঙ্গীতে) অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু! নিতাইদার ডেমোক্র্যাসিতে অভ্যাস হয়ে গেছিলো, মার্শ্যাল ল জারি হয়েছে ভুলে যাই।

শশাঙ্ক : রিহার্স্যাল যখন শেষ, তখন আমাদের আর কেন এখানে বসে থাকা? কখন হুট করে পিসীমা ঢুকে পড়বে!

শম্ভু : (হাসিয়া) ভয় নেই রে, অনন্ত পাহারায় আছে।

শশাঙ্ক : ভয় তোর না থাক, আমার আছে। কোন্নগর থেকে প্রমীলা-পিসীমাকে কী করে টেনে আনছিস—সে ভগবান জানেন আর তুই জানিস—আমার সে খবরে দরকার নেই। কিন্তু শুনে অবধি ভুলতে পারছি না। গুলি খেয়ে মরছি, তাও চোখে সর্ষে ফুল না দেখে পিসীমা দেখছি। আমি চললাম ভাই। কদিন ধরে পতন ও মৃত্যুতে বাঁ হাঁটুটায় ব্যথা ধরে গেছে—পরে ছুটোছুটি করতে পারবো না।

শম্ভু : এক মিনিট দাঁড়া, সবাই থাকতে দুটো দরকারি কথা সেরে নিই। (পকেট হইতে ফর্দ বাহির করিয়া) স্টেজের সব মাল জোগাড় হয়ে গেছে, শুধু আর গোটা দুই মদের বোতল পেলে ভালো হয়। একটা আছে—হোয়াইট হর্সের লেবেল মারা। জিন কিম্বা ব্র্যান্ডির খালি বোতল কেউ জোগাড় করতে পারবে?

মিঃ সেন : আমি বোধ হয় জোগাড় করতে পারি। আমার এক বন্ধুর দাদা মিলিটারিতে আছেন—

শম্ভু : গুড্! অনেক ধন্যবাদ মিঃ সেন। আর অনু দু'টো টেবিলক্লথ দেবে বলেছিলো। তার উপর আর ঝামেলা না চাপিয়ে আর কেউ যদি—

মিঃ সেন : টেবিলক্লথ অনেক আছে। ক'টা চাই?

শম্ভু : বহুৎ আচ্ছা। দু'টো হলেই হবে। আর কিছু নেই। কাল কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ড্রপ তুলে অ্যামেচার থিয়েটারের আইন ভঙ্গ করবার ইচ্ছে আছে। অতএব পাঁচটার মধ্যে প্রত্যেকের হাজিরা চাই। এটাও মিলিটারি আইন। মেক আপ এ ঘরে হবে না, বাইরে স্টেজের পেছনে ঘেরাটোপ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ ঘরটা শুধু থিয়েটারের মধ্যে পোশাক বদলাবার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাও পাকা কথা কাল সকালের আগে দিতে পারছি না। না হলে অন্য ব্যবস্থা হবে। আপাতত নিতাইদা আর অনাথ ছাড়া সকলে—অ্যাটেনশন্, আবাউট টার্ন এবং কুইক্ মার্চ।

(শশাঙ্কের সর্বাগ্রে প্রস্থান—পিছনে রাজীব, স্মারক, বনানী, মিঃ সেন ও ধ্রুবেশ)

অনাথ, পোস্টাপিসে কী বললো রে?

অনাথ : বললো তো ঘণ্টা তিন চারেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তা ওদের কথা তো?

শম্ভু : যাক গে, কাল অবধি সময় আছে। তুই কাল থিয়েটারের সময়ে যতোক্ষণ স্টেজের বাইরে থাকবি, আমার কাছাকাছি থাকবি। আমি যদি ছুটি, তো পেছন পেছন ছুটবি। কখন কী দরকার হয় বলা যায় না। আর প্রত্যেককে আর একবার করে মনে করিয়ে দিবি—থিয়েটারের সময়ে কাল যা কিছু ঘটুক, কেউ যেন অবাক না হয় এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখে। যদি পিসীমার পাল্লায় কেউ পড়ে যায়, তবে কথাবার্তা বেশি না বলে যেন স্রেফ মিষ্টি হাসে এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়ে।

অনাথ : আচ্ছা। আর কিছু?

শম্ভু : না। তুই এখন যা। জগৎকে বল—বারান্দার সিঁড়ি যেমন তৈরি হবার কথা ছিল, তৈরি হবে।

(অনাথের প্রস্থান)

কী অতো ভাবছো নিতাইদা?

নিতাই : বললে তুই চটে যাবি—কিন্তু আমার এ সব ভালো ঠেকছে না।

শম্ভু : কী ভালো ঠেকছে না?

নিতাই : তোর প্ল্যান—দুপুরে যা বললি। এ যেন বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

শম্ভু : বাড়াবাড়ি না করে করতে গেলেই আধখ্যাঁচড়া কাজ হয়। যদি পিসীমাকে থিয়েটারের সময়ে সরাতে পারি তবে ওসব বাড়াবাড়ির মধ্যে যেতে হবে না। কিন্তু যদি না পারি? কিম্বা যদি বে-টাইমে ফিরে আসে? না, নিতাইদা। আধখ্যাঁচড়া প্ল্যানে আর আমার ভরসা নেই। তা ছাড়া—বিশ্বাস করো নিতাইদা, যদি গোলমাল কিছু ঘটে—তোমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি মনস্তাপ হবে আমার।

নিতাই : আমার মাথায় এসব কিছু খেলে না, তাই আমার বলাও সাজে না। কিন্তু তুই বুদ্ধি করে আর কোনো উপায় বার করতে পারলি না, যাতে অনুকে না জড়িয়ে চলে?

শম্ভু : অনুকে না জড়ালে একমাত্র উপায় যা সেন সাহেব বলেছেন। বনানীকে দিয়ে প্রমীলা, আর খুড়তুতো বোনকে আমদানি করে বিনা রিহার্স্যালে বনানী!

নিতাই : এক এক সময়ে মনে হয়, তাও বোধ হয় ছিল ভালো। প্লে ডুবতো, তবু প্লে হোতো। লোকজন ডেকে ফিরিয়ে দিতে হোতো না।

শম্ভু : অতো ভেবো না নিতাইদা। কাকাবাবুর আপত্তি করবার কথা অনেক বেশি। তিনি এক কথায় রাজি হয়েছেন। কেন জানো?

নিতাই : শিবতুল্য লোক বলে।

শম্ভু : সেটা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে। এবং সেই কারণটাই আসল।

নিতাই : কী কারণ?

শম্ভু : তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র শ্রীনিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়কেও শিবতুল্য লোক মনে করে থাকেন।

নিতাই : ফাজলামি রাখ।

শম্ভু : (হাসিয়া) ফাজলামি নয় নিতাইদা। আমি বেত খেয়ে মানুষ—এসব পাইনি বলেই এক নজরে চিনতে পারি। ঘটনাটা সত্যি, এবং সত্যি বলেই আমি আরো দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লাম। অবশ্য তার আগেই ঝুলবো ঠিক করেছিলুম, সকালে তোমার কথা শুনে। সেটা হোলো প্রথম পিট।

নিতাই : তুই রহস্য খুব ভালোবাসিস, না? সকাল থেকে এক নম্বর পিট দু' নম্বর পিট করছিস, অথচ ভেঙে কিছু বলবি না।

শম্ভু : (হাসিয়া) নিতাইদা, আমি স্টেজে থিয়েটার করতে পারি না, কিন্তু স্টেজের বাইরে নাটক জমাতে আমার ভীষণ উৎসাহ। নাটকের দু'টো প্রধান অংশ—সারপ্রাইজ্ আর সাস্‌পেন্স—তোমার কাছেই শেখা।

নিতাই : স্টেজের নাটকে অন্তত অভিনেতারা রহস্যে ডুবে থাকে না। তুই আমাকে দিয়ে পার্ট করাবি, অথচ আমাকে কিছুই বলবি না।

শম্ভু : কে বললে তোমাকে কিছু বলি নি? তোমার পার্ট তো দুপুরে পুরো তালিম দিয়েছি?

নিতাই : তবে ঐ যে বললি, আমি কী বলেছি তাতে তোর এক নম্বর পিট হোলো? আমি তো আজ সকালে তোকে গালাগাল দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু বলেছি বলে মনে করতে পারছি না।

শম্ভু : ঠিক তাই। ঐ—ঐ গালাগালই। কেন গালাগাল দিয়েছিলে—মনে আছে?

নিতাই : কেন আবার? তোকে দেখলেই আমার গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে।

শম্ভু : অ্যাগ্রীড়। যদিও সেটাকে আমি গালাগাল বলে না ধরে তোমার বদস্বভাব বলে ধরে নিই। কিন্তু আজ সকালের গালাগালটা অন্য রকম ছিল—যেহেতু কারণটা আলাদা।

নিতাই : কারণটা কী শুনতে পাই?

শম্ভু : অনুর নামে দুটো কড়া কথা বলেছিলাম। তাতে জীবনে প্রথম আমার উপর তোমাকে সত্যিকারের চটতে দেখলাম।

নিতাই : তা তুই কি ভেবেছিলি—আমি শুনে আনন্দে নৃত্য করবো?

শম্ভু : উঁহু।

নিতাই : তুই না হয়ে অন্য কেউ হলে তাকে ঠাস করে একটি চড় মারতাম আমি।

শম্ভু : অতি সত্য কথা। তাতে দুটো জিনিস প্রমাণ হোলো। আমার প্রতি তোমার স্নেহ অপরিসীম, এবং আমার চার পিটের এক পিট অনিবার্যরূপে হস্তগত।

নিতাই : তোর কি ধারণা রহস্য বেশ পরিষ্কার করে দিচ্ছিস?

শম্ভু : না। করতে চাইও না। কারণ এটা অন্য নাটক। আমার প্রথম নাটকের সব পার্ট তোমাকে বলে দিয়েছি। এটা দ্বিতীয় নাটকের প্লট। (নিতাইকে থামাইয়া) না নিতাইদা, আর কোনো প্রশ্ন কোরো না। দ্বিতীয় নাটকটা নাও ঘটতে পারে। অথবা সেটা ট্র্যাজেডি হয়ে যেতে পারে—যা আমার একদম অপছন্দ। অতএব ইচ্ছে করলেও আর একটা কথাও তোমাকে বলবার উপায় নেই। দোহাই তোমার—এটা রহস্য করছি না—এই নিয়ে কী প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা আমার মাথায় চেপে আছে যদি জানতে—(সহসা থামিল। এই শেষ কয়েকটি কথায় শম্ভুর ফাজলামির আবরণ ভেদ করিয়া যেন একটি প্রচণ্ড দায়িত্বের গুরুভাব মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সেকেন্ড দুই—তারপরেই সামলাইয়া) এর পরের বার একটা সাংঘাতিক নাটক লিখে তোমার দ্বারস্থ হবো। শম্ভুনাথ ব্যানার্জির নাম মঞ্চাধ্যক্ষ থেকে নাট্যকারে চলে যাবে।

নিতাই : (খানিকটা অপ্রস্তুত, আবহাওয়া হাল্কা করিবার চেষ্টায় হাসিয়া) নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষ বল! স্টেজ বাঁধবে কে নইলে?

শম্ভু : আচ্ছা, তোমার খাতিরে না হয় নাট্যকারের মর্যাদা খানিকটা ক্ষুণ্ণ করা যাবে। তবে ঐ পর্যন্ত! অভিনেতা যেন না হতে হয়। (সদরে আওয়াজ, দু'জনে লাফাইয়া উঠিল) বড়োপিসী! নিতাইদা তুমি (বারান্দার দিকে দেখাইয়া)—না হবে না, সময় নেই—

(যোগীনের প্রবেশ)

ওঃ, কাকাবাবু! আমরা ভেবেছিলুম—যাক গে। কী হোলো ওখানে বলুন।

যোগীন : (বসিতে বসিতে) ওঃ! বুড়ো বয়সে—নিতাই একটা সিগারেট দাও। (নিতাই দিল,

দুজনে ধরাইল) বললুম অনুর মাসীকে আর তার মেয়েদের সব কথা খুলে।

শম্ভু-নিতাই (একসঙ্গে) : স—ব কথা!!

যোগীন : না না, সব মানে স—ব নয়। যেটুকু বলতে বলেছিলে। অনুর মাসী আর তার মেয়েরা আসবে কাল সকালে। সবাই বড়দিকে শুনিয়ে বলবে—অনু থিয়েটার না করলে কেউ দেখতে আসবে না। বলে অনুকে নিয়ে চলে যাবে ওদের বাড়ি। তারপর অনু চুপিচুপি এসে জুটবে ঠিক সন্ধে ছ'টায়।

শম্ভু : কোথায় আসতে হবে বলেছেন তো?

যোগীন : বলেছি। তোমার দাদা বৌদি আপত্তি করবেন না তো?

শম্ভু : না না! বৌদির তো উৎসাহ বেশি—তার ঘরে হিরোইনের মেক্ আপ্ হবে। ষড়যন্ত্র জিনিসটায় যে লোকের এতো উৎসাহ আগে ধারণা ছিল না।

যোগীন : তা, বলতে কি—আমারও মন্দ লাগছে না। অনুর মাসীমার বাড়িতে তো রীতিমতো হুল্লোড় শুরু হয়ে গেলো এই নিয়ে। তবে ভালোয় ভালোয় চুললে হয়।

শম্ভু : বাকি শুধু অনুর কাজ। ও যেন আজ রাত থেকেই গেয়ে রাখে—থিয়েটারে না নামতে পারলে ও এ পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না। তা না হলে পিসীমার চোখ ফাঁকি দিয়ে কাল সকালে মাসীবাড়ি যাওয়া মুস্কিল হবে।

নিতাই : সে অনু ঠিক পারবে।

শম্ভু : না পারলে তোমার বদনাম। অভিনয় করা তোমার কাছেই শিখেছে।

যোগীন : এখন কথা হোলো অনুকে সব গুছিয়ে বলবার ফাঁক পাওয়া। তাছাড়া আমি না বলে যদি তুমি বা নিতাই বলতে—মানে বুঝতেই পারছো—ও ধরনের কথা আমার বলাটা—

নিতাই : স্যার আপনার চেয়েও আমার পক্ষে বলা আরো শক্ত—যদিও থিয়েটারের ঝামেলাটা আমারই—

শম্ভু : যা বুঝছি, সবচেয়ে ভালো আমারই বলা। কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাবে?

যোগীন : যদি কোনো ছুতোয় বেরিয়ে তোমাদের ফ্ল্যাটে যেতে পারে একবার।

শম্ভু : পারলে ভালো, না পারলে অগত্যা আপনার উপর কাকাবাবু। (যোগীনের দীর্ঘশ্বাস) বুঝতে পারছি কাকাবাবু, কিন্তু উপায় কই? অনুকে আমার বলাটা অনেক কারণে ভালো ছিল।

যোগীন : যাক, ও আর ভেবে কী হবে? বড়দি সম্বন্ধে কী ঠিক করলে বলো। সেইটাই আসল।

শম্ভু : কাকাবাবু, আপনাকে মিথ্যে আশা দেবো না। থিয়েটারের সময়টা পিসীমাকে সরাতে পারলে বহু ঝামেলা বেঁচে যায় জানি— কিন্তু আমার ভরসা কম। ভরসা কম বলেই এতো রকম জটিল প্যাঁচের ব্যবস্থা করে রাখতে চাইছি।

নিতাই : ব্যাপারটা বড়ো বেশি জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পিসীমাকে বাদ দিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে এতোরকম পরামর্শ যে কী করে করা যাবে, আমি তো ভেবে পাচ্ছি না। তাও ওরা আজ আসবে কি কাল আসবে তার ঠিক নেই।

শম্ভু : ঘাবড়াচ্ছো কেন নিতাইদা? কাল থেকে সব কিছুতেই কপাল খারাপ যাচ্ছে। দু'

একটা সৌভাগ্য জুটে যেতে বাধ্য—স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ তাই বলে।

(সদর দিয়া অনন্তর দ্রুত প্রবেশ)

অনন্ত : ট্যাক্সি এসেছে— (বলিয়াই বারান্দার দিকে ধাবমান)

শম্ভু : ট্যাক্সি! পিসীমা?

অনন্ত : অতো দেখিনি, পিসেমশাইকে দেখেই দৌড়েছি!

(এবং এবারও দৌড়াইল—বারান্দার পথে)

শম্ভু : আমরাও কাটি কাকাবাবু।—ওদিকে নয় নিতাইদা—এইদিকে—

(নিতাইকে টানিয়া বারান্দার দিকে দ্রুত প্রস্থান। পিসেমশাই ও অনুর প্রবেশ।)

যোগীন : (ছদ্ম বিস্ময়ে) কী ব্যাপার? তোমরা এর মধ্যে?

পিসেমশাই : বলছি, দাঁড়াও। (বসিয়া চুরুট ধরাইতে লাগিলেন ধীরে সুস্থে)

যোগীন : ইয়ে (নিচু স্বরে) বড়দি?

পিসেমশাই : আসছে।

যোগীন : ও। (তটস্থ হইয়া গেলেন)

পিসেমশাই : (আড়চোখে দেখিয়া) আসছে মানে অতো তাড়াতাড়ি আসছে না।

যোগীন : অ্যাঁ? ও। (কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক হইয়া বসিলেন)

পিসেমশাই : মধুদার সেজোমেয়ে হঠাৎ খুব অসুখে পড়েছে। আজ বিকেলে টেলিগ্রাম এলো—অরু সিরীয়াস্‌লী ইল্‌, কাম্‌ শার্প।

যোগীন : (সতর্কভাবে) তাই নাকি? তারপর?

পিসেমশাই : তারপর মধুদা মধুবৌদির সবেগে প্রস্থান। আমরাও বাস্তুহারা।

যোগীন : তাই তো। কী অসুখ?

পিসেমশাই : ঐ যে বললাম—টেলিগ্রামের ভাষায় শুধু সিরীয়াস্‌লি ইল্‌।

যোগীন : ও। (দু সেকেন্ড চুপ। পিসে আড়চোখে দেখিতেছেন) তা, ইয়ে—বড়দি?

পিসেমশাই : বড়দিকে না দেখে তুমি এতো কাহিল হয়ে পড়বে তা তো ভাবি নি।

যোগীন : না। মানে—ইয়ে—

পিসেমশাই : তোমার বড়দি মধুদাদের সঙ্গে গেছে।

যোগীন : (লাফাইয়া উঠিয়া) অ্যাঁ!

(অনু আসিয়া অবধি ক্লান্তভাবে একপাশে বসিয়া ছিল। এবার সোজা হইয়া কী একটা বলিতে গেল—কিন্তু পিসে হাত নাড়িয়া নিরস্ত করিলেন।)

পিসেমশাই : হুঁ। ঠিকই আন্দাজ করেছি তাহলে। টেলিগ্রামটা কে পাঠিয়েছিলো?

যোগীন : (ধীরে ধীরে বসিয়া, দুর্বলস্বরে) শম্ভু।

পিসেমশাই : হুঁ। মাস্টার ক্রিমিন্যাল এমন ভুল করে ফেললো চালে? কোথায় সে? ডাকো তাকে।

(সহসা পিছনের দরজা দিয়া শম্ভুর প্রবেশ)

শম্ভু : আজ্ঞে ডাকতে হবে না, আমি বারান্দাতেই ছিলুম।

পিসেমশাই : তবে তো সব শুনেছো!

শম্ভু : আজ্ঞে হ্যাঁ। পিসীমা কোথায় গেছেন?

পিসেমশাই : তবে যে বললে সব শুনেছো?

শম্ভু : আপনি যা বললেন—শুনেছি। জিজ্ঞেস করছিলুম পিসীমা কোথায় গেছেন? কতোটা সময় হাতে আছে জানা দরকার। প্রচুর কাজ বাকি।

পিসেমশাই : অর্থাৎ?

শম্ভু : শুনুন পিসেমশাই, ওকথা আমিও একবার ভেবেছিলুম। তারপর দেখলুম—তা অসম্ভব।

পিসেমশাই : কেন অসম্ভব?

শম্ভু : সন্দেহ করা সোজা, পুরো নিশ্চিত হওয়া অতো সোজা নয়। যদি সত্যিই মধুবাবুর মেয়ের অসুখ হয়ে থাকে তো ওখানে গেলে পিসীমাকে আটকে যেতে হতে পারে। পিসীমা সে ঝুঁকি নিয়ে অনুকে ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাজি হতে পারেন না। এখন বলুন, পিসীমা কোথায়?

(অনু এই প্রথম হাসিল। পিসেও হাসিলেন।)

পিসেমশাই : নাঃ! যা বলছিলাম ঠিকই। তুমি মাস্টার ক্রিমিন্যাল। ভয় নেই হে যোগীন, ওর আসতে কমপক্ষে ঘণ্টা দুই। গেছে আমার মাসতুতো বোনের বাড়ি।

শম্ভু : অনুকে ছেড়ে দিলেন যে বড়ো?

পিসেমশাই : অনুকে সেখানে নিয়ে গেলে অসুবিধে হোতো। অতএব আমার উপর আদেশ, অনুকে এখানে পৌঁছে দিয়ে ওকে আনতে যেতে হবে। এই রাত্রে আবার কাশীপুর!

যোগীন : কী ব্যাপার?

পিসেমশাই : আমার ভগিনীর প্রতিবেশীর একটি পুত্র আছে। সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যায় ব্যবহারে চটে গিয়ে সম্প্রতি বাপের দোকানে গদিতে বসেছে। অর্থাৎ লায়েক হয়েছে।

অনু : (ঝাঁঝিয়া) তোমার ঐ ভাগ্নেকে আমি মরে গেলেও বিয়ে করবো না। বড়োপিসী আমার থিয়েটার করা বন্ধ করতে পারে, তা বলে যা খুশি তাই করতে পারে না—(গলা বন্ধ হইয়া আসিল)

পিসেমশাই : ছেলেটি আমার ভাগ্নে নয়। তবে সদ্বংশজাত। পরম কুলীন।

অনু : রাখো তোমার কুলীন।

পিসেমশাই : আ হা হা, আমার উপর চটছিস কেন? আমি তোর বিয়ে দিতে গেছি?

অনু : তুমি ঠেকালে না কেন?

পিসেমশাই : হা ভগবান! একদিন তুই তোর ভাইঝির বিয়ে দিতে যাবি, সেদিন তার পিসেমশাই সেটা কতোটা ঠেকাতে পারবে— সে তো তোর মেজাজ দেখেই বুঝতে পারছি।

অনু : (লজ্জিত হইয়া) আমার আজ মাথার ঠিক নেই পিসেমশাই—

পিসেমশাই : তার চেয়ে এই মাস্টার ক্রিমিন্যালকে ধর। ও একটা বুদ্ধি করে ঠেকালে ঠেকাতে পারে। কী বাবা, পারবে না?

শম্ভু : (হাসিয়া) পরে ভেবে দেখবো। আপাতত যদি অনুমতি করেন তবে উপস্থিত বিপদটা ঠেকাই।

পিসেমশাই : ঠেকাও। আমার অনুমতি সানন্দে দিলাম। যোগীন তোমার আপত্তি আছে?

যোগীন : অ্যাঁ? হ্যাঁ, না—শম্ভু তোমার সিগারেট আছে?

শম্ভু : (হাসিয়া) আজ্ঞে না, আমি তো খাই না, বলেছি।

পিসেমশাই : চুরুট খাও। (যোগীন চুরুট ধরাইতে লাগিলেন)

অনু : (শম্ভুকে) কী ঠিক করেছেন বলুন।

শম্ভু : বলছি। ইয়ে কাকাবাবু—

যোগীন : অ্যাঁ? হ্যাঁ—বড়দা, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। একবার ভিতরে এসো।

(পিসেমশাই বুঝিলেন। দু'জনের ভিতরের দিকে প্রস্থান)

অনু : কী ব্যাপার? ওদের তাড়ালেন কেন?

শম্ভু : তোমার খাতিরে।

অনু : আমার খাতিরে?

শম্ভু : কী জানি কেন মনে হোলো—যা বলবো তা তোমার ভালো লাগবে না। আর সে সময় গুরুজনরা উপস্থিত থাকলে তোমার অবস্থা আরো কাহিল হবে।

অনু : কী সব হেঁয়ালি বকছেন?

শম্ভু : শোনো, খুলে বলছি। আমরা অনেক ভেবে দেখলাম, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে—তাতে পিসীমাকে না জানিয়ে তোমার থিয়েটার করা অসম্ভব।

অনু : (পাংশুমুখে) তারপর?

শম্ভু : দু'টো উপায় আছে। এক—পিসীমার চোখের উপর করা। তা হলে [illegible] ঠাকুর্দা, তোমার বাবা, তুমি নিজে—সব্বাইকার অনেক দুঃখ। অন [illegible] তার চেয়ে সহজ, যদিও প্লেটা তাতে প্রায় ডোবে।

অনু : অন্য উপায়টা কী?

শম্ভু : তোমার থিয়েটার না করা।

অনু : কে করবে তা হলে?

শম্ভু : নিতাইদার বৌ।

অনু : নিতাইদার বৌ!!

শম্ভু : অবাক হয়ে যাচ্ছো তো? আমরাও প্রথম শুনে অবাক হয়েছিলাম। নানা কারণে নিতাইদার বৌ এখানে থাকেন না, এবং আরো নানা কারণে আমরা কেউই জানতাম না নিতাইদা বিয়ে করেছেন।

অনু : কী কারণ?

শম্ভু : তাও সব জানি না। শুধু এই জানি, নিতাইদার একটি স্ত্রী আছেন, তিনি অভিনয়ও আগে দু'চারবার করেছেন, এবং তেমন দরকার হলে আর একবার করতে পারেন। এইটুকু জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, নয় কি?

অনু : (রাগিয়া) আপনার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে— (সহসা থামিয়া গেল)

শম্ভু : (মিষ্টস্বরে) বলো, কী বলছিলে?

অনু : কিছু না। বলছিলাম—আমার বিশ্বাস হয় না।

শম্ভু : তবে কি আমি বানিয়ে বলছি?

অনু : হ্যাঁ। নয় তো নিতাইদা বানিয়ে বলেছেন।

শম্ভু : (হাসিয়া) ঠিক বলেছো। তবে নিতাইদা নয়, আমিই বানিয়ে বলেছি।

অনু : কারণটা কী?

শম্ভু : এই কথা বলে সেন দম্পতি থেকে শুরু করে তোমার পিসীমা পর্যন্ত সবাইকে ঠেকাতে হবে।

অনু : তাই বলে আমাকেও?

শম্ভু : না, তোমাকে বলার কারণটা আলাদা। সেটা আমাব প্ল্যানটা শুনলে বুঝতে পারবে?

অনু : প্ল্যানটাই তো শুনতে চাইছি তখন থেকে। তা না শুধু বাজে কথা।

শম্ভু : কাজের কথা শোনো তবে। থিয়েটার তুমিই করবে, কিন্তু পিসীমার কিছু বলবার থাকবে না। কারণ—নিতাইদার বৌ থিয়েটার করছে, অনু নয়।

অনু : ফের বাজে কথা?

শম্ভু : সবটা শোনো আগে। আগামীকাল দুপুর থেকে অনু আর অনু থাকবে না—সে নিতাইদার বৌ হয়ে যাবে।

অনু : (কড়া চোখে) তার মানে?

শম্ভু : ঘাবড়িও না। এটাও অভিনয়। পিসীমার খাতিরে।

অনু : ও। (অল্প থামিয়া) এই আপনার প্ল্যান?

শম্ভু : হ্যাঁ।

অনু : নিতাইদা জানেন?

শম্ভু : জানে।

অনু : বাবা?

শম্ভু : হ্যাঁ।

অনু : তারপর?

শম্ভু : তারপর কী?

অনু : পিসীমা কি এতোই বোকা? রাতারাতি এরকম বিয়ে হয়?

শম্ভু : হয়। সিভিল ম্যারেজ।

অনু : তাতেও তো নোটিস্ লাগে।

শম্ভু : নোটিস্ আগে দেওয়া ছিল না, তা পিসীমাকে কে বলেছে?

অনু : চলবে না শম্ভুদা।

শম্ভু : কেন চলবে না।

অনু : পিসীমা সার্টিফিকেট দেখতে চাইবেন।

শম্ভু : তোমার উপর আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিতাইদা, কাকাবাবু—কেউ এ কথা তোলেন নি।

অনু : চাইবেন কি না বলুন?

শম্ভু : নিশ্চয়ই চাইবেন!

অনু : তখন?

শম্ভু : তখন সার্টিফিকেট দেখানো হবে।

অনু : সার্টিফিকেট দেখানো হবে?

শম্ভু : (পকেট হইতে সার্টিফিকেট বাহির করিয়া) হ্যাঁ।

অনু : (চোখ বুলাইয়া) এ করেছেন কী?

শম্ভু : জালিয়াতি। একটা প্রেসের সাহায্যে। নাম দু'টো লিখতে হবে, আর স্ট্যাম্পটা জাল করতে হবে। তার জন্যে আজ রাতটা আছে।

অনু : কিন্তু কী করে করবেন?

শম্ভু : সে কথা জানতে চেও না। আমার নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে। তবে ভরসা রাখো, পিসীমার চোখ ফাঁকি দেবার মতো কাজ পাবে। যদি পিসেমশাই আমাদের দিকে না থাকতেন তবে অবশ্য এ সব চলতো না।

অনু : কিন্তু—

শম্ভু : আর কিন্তু নেই। জানি খুব জটিল ষড়যন্ত্র, জানি তোমাদের সক্কলের উপর প্রচুর চাপ পড়বে,—কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এটুকু অতিরিক্ত অভিনয় করতে পারবে না থিয়েটারের খাতিরে?

অনু : সে কথা বলছি না। অভিনয় করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। বরং মজাই লাগছে।

শম্ভু : তবে?

অনু : হবে না শম্ভুদা।

শম্ভু : কেন হবে না।

অনু : থিয়েটার হবে। কিন্তু পরে তো একদিন না একদিন পিসীমা জানবেনই। তখন সেই দাদুর কানে যাবে। বরং আরো বহু কথা সেই সঙ্গে যাবে। তার চেয়ে তো সোজা পিসীমার পরোয়া না করে থিয়েটার করা অনেক ভালো ছিল!

শম্ভু : এই দেখো। এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় এলো, অথচ নিতাইদা বা কাকাবাবুর মাথায় আসে নি একবারও!

অনু : আপনার মাথায় এসেছিলো তা হলে?

শম্ভু : (ক্ষুণ্ণ হইয়া) দেখো, তোমার উকিল পিসেমশাই আমাকে মাস্টার ক্রিমিন্যাল সার্টিফিকেট দিয়েছেন, আর তুমি ধরে নিলে আমি একটি গবেট?

অনু : (হাসিয়া) তবে তো আপনার কথায় বাবা আব নিতাইদাও এক একটি—

শম্ভু : (কানে হাত দিয়া) ছি ছি, কী বলছো যা তা? এ হচ্ছে পাপবুদ্ধির কথা। পিসেমশাই তো আমাকে বুদ্ধিমান বলেন না—বলেন ক্রিমিন্যাল। কাকাবাবু নিতাইদার মাথায় পাপবুদ্ধি আসবে কী করে?

অনু : (হাসিয়া) কিন্তু আমার মাথায় আসে, কী বলেন?

শম্ভু : (আপত্তি করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল) কিছু মনে কোরো না—তা অল্প-স্বল্প আসে। ঐ জন্যেই তো তোমাকে খাতির করি। লাইনের লোক।

অনু : আবার বাজে কথায় যাচ্ছেন? শেষরক্ষা কী ঠিক করেছেন তাই বলুন।

শম্ভু : বলছি। ইয়ে—তুমি বোসো।

অনু : কেন?

শম্ভু : না, এমনি।

অনু : কী হোলো?

শম্ভু : ভেবেছিলাম এক ঝটকায় বলে ফেলতে পারবো। কিন্তু—

অনু : কিন্তু কী?

শম্ভু : কিছু না। বলছি শোনো। (নিজেকে প্রস্তুত করিয়া প্রায় এক ঝটকায় বলিয়া চলিল) যদি সত্যি সত্যিই নিতাইদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে—

অনু : কী বললেন?

শম্ভু : (অনুর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে শম্ভুর আত্মবিশ্বাস বিচলিত হইয়া উঠিল, যদিও সে এক নাগাড়ে বলিয়া চলিল) নিতাইদার সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে নিতাইদা তোমাকে—নিতাইদার কোনো আপত্তি নেই। তোমার বাবারও আপত্তি করবার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। তুমিও নিতাইদার বৌয়ের কথা শুনে একটু আগে—

অনু : (ধমকাইয়া) চুপ করুন!! (শম্ভু থামিল। অল্পক্ষণ নিস্তব্ধতা। অনু অন্য দিকে ফিরিল। তারপর কাটিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল) সকলের কথা শুনে আমারও মনে হচ্ছিলো আপনার খানিকটা বুদ্ধি আছে। কিন্তু সব ভুল! কিচ্ছু বুদ্ধি নেই আপনার! এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই—কিচ্ছু নেই! (শেষদিকে কথাগুলি প্রায় চিৎকারে দাঁড়াইল)

শম্ভু : (দুর্বলস্বরে) কিন্তু তুমি—তুমি যে—

অনু : (কর্ণপাত না করিয়া) কিচ্ছু বোঝেন না আপনি। সব ভুল—আগাগোড়া ভুল— (ছিটকাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। শম্ভু মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিল। অল্প পরে ভিতর হইতে পিসেমশাইয়ের প্রবেশ।)

পিসেমশাই : অনু কই? (শম্ভুর কানে গেল না) বলি ও মাস্টার ক্রিমিন্যাল!

শম্ভু : অ্যাঁ?

পিসেমশাই : ষড়যন্ত্র কদ্দুর এগোলো? তোমাকে যে সাধু লোকের মতো কাহিল দেখাচ্ছে হে? ব্যাপার কী?

শম্ভু : (বিহ্বলভাবে) তিন নম্বর পিট।

পিসেমশাই : ক' নম্বর কী?

শম্ভু : না কিছু না। সব ধ্বসে গেলো।

পিসেমশাই : কী ধ্বসে গেলো?

শম্ভু : (চরম দুঃখে হাসিয়া) আপনি ভুল করেছিলেন পিসেমশাই। মাস্টার ক্রিমিন্যাল হবার মতো পদার্থ আমার ভিতর নাই।

পিসেমশাই : উঁহু। আমি ক্রিমিন্যাল কোডের লাইনে আছি সারাজীবন। ভুল হতেই পারে না। কিন্তু হয়েছেটা কী?

শম্ভু : সে আর শুনে কী হবে? তবে আমার সব প্ল্যান জাল জোচ্চুরি—সমস্ত ধ্বসে গেছে শুধু একটি হিসেবের ভুলে।

পিসেমশাই : প্ল্যানে ভুল?

শম্ভু : উঁহু। প্ল্যানে ভুল হলে শোধরানো যেতো। এ একেবারে গোড়ায় ভুল। পিটের হিসেবে ভুল। মানবচরিত্রে ভুল।

পিসেমশাই : (যেন আশ্বস্ত হইয়া) তাই বলো। ক্রাইমটা পারফেক্ট, শুধু ভুল লোক খুন হয়ে বসে আছে।

শম্ভু : আপনার উপমাটা কতোটা খাটে—

পিসেমশাই : সে নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমার উপমা, কালিদাসস্য নয়। কোন্ মানবের চরিত্র বুঝতে ভুল হয়েছে?

শম্ভু : অনুর।

পিসেমশাই : স্ত্রীচরিত্র? ও—ব্বাবা।

শম্ভু : ওব্বাবা কেন?

পিসেমশাই : এতোক্ষণ ঘাবড়াই নি, এইবার ঘাবড়াচ্ছি। অবস্থা কি খুব জটিল?

শম্ভু : জানি না। ভাবতে হবে। আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে।

পিসেমশাই : তুমি যে আমাকেও ভাবিয়ে তুললে হে! তোমার চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না সামলাতে পারবে বলে? (চুরুট ধরাইলেন)

শম্ভু : আমারও ভরসা হচ্ছে না বিশেষ।

পিসেমশাই : দমে যেও না। ভাবো। কষে ভাবো। আমি চললাম কাশীপুরে তোমাদের পিসীমাকে আনতে। দেরি করবার উপায় নেই। এই নাও, একটা চুরুট ধরিয়ে ভাবো। (চুরুট ও দেশলাই দিলেন)

শম্ভু : আমি খাই না পিসেমশাই।

পিসেমশাই : আজ খাও। কড়া চুরুট—কাজ দিতেও পারে। শক্‌থেরাপি। (যাইতে গিয়া ফিরিয়া) বৃদ্ধ উকিলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কী বলে জানো? (শম্ভু সপ্রশ্ন) স্ত্রীচরিত্র বোঝবার গোলমালে যদি কাঁচিয়ে থাকো, তবে স্ত্রীবুদ্ধির শরণাপন্ন হও।

শম্ভু : কোথায় পাবো স্ত্রীবুদ্ধি?

পিসেমশাই :তা জানি না। যা মনে হোলো বলে গেলাম, চুরুট ছিল দিয়ে গেলাম। আমার কাছ থেকে আর কিছু আশা কোরো না।

(পিসেমশাইয়ের প্রস্থান। শম্ভু বসিয়া ভাবিল। উঠিয়া ভাবিল। পায়চারি করিয়া ভাবিল। তারপর চুরুট ধরাইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিতে গিয়া প্রচণ্ড বিষম খাইল। অনুর প্রবেশ)

অনু : শম্ভুদা—(অবস্থা দেখিয়া) কী হোলো? (ছুটিয়া আসিয়া শম্ভুকে বসাইল এবং পিঠ থাবড়াইয়া বিষম থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল) কমেছে এখন? (শম্ভু ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল কমিয়াছে) কী হয়েছিলো? (শম্ভু চরুট দেখাইল) এ বুদ্ধি কে দিলো? (শম্ভু বাহিরের দরজা দেখাইল) পিসেমশাই? (শম্ভু ঘাড় নাড়িল, অনু চুরুট কাড়িয়া ছাইদানে ফেলিল) বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছিলো বুঝি?

শম্ভু : (সরলভাবে) হ্যাঁ।

অনু : কিছু মতলব বেরুলো?

শম্ভু : (পূর্ববৎ) না।

অনু : বেরুবার আশা আছে?

শম্ভু : মনে হয় না।

অনু : (সহসা যেন অহেতুক কঠিন হইয়া) তবে আর চেষ্টা করে কাজ নেই। আপনি স্টেজের ব্যাপার দেখুন। আমি পার্টটা ঝালাই।

শম্ভু : তুমি—থিয়েটার করবে?

অনু : করবো।

শম্ভু : পিসীমার চোখের উপর?

অনু : পিসীমার চোখের উপর?

শম্ভু : তোমার দাদু?

অনু : যা হয় হবে।

শম্ভু : কিন্তু—

অনু : কিন্তু কী?

শম্ভু : না, কিছু না।

(খোকা-খুকুর নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)

খোকা : কাকা, মা বলছে খেতে এসো।

খুকু : বলেছে—গিলে আমাকে উদ্ধার করুক।

শম্ভু : যা পালা এখান থেকে! সন্ধে না হতে খাওয়া। (বারান্দার দিকে যাইতে যাইতে) বল গে পরে আসছে।

অনু : আজ এর মধ্যে খাওয়া কেন রে খুকু?

খুকু : কাকা দুপুরে খায় নি যে!

শম্ভু : (ধমকাইয়া) বলছি যে উপরে যেতে! কথা কানে গেলো?

খোকা : (চেঁচাইয়া) হ্যাঁ, মা বলেছে এক্ষুনি যদি না আসো তো—

(শম্ভু তাড়া করিল, খোকা-খুকু নাচিতে নাচিতে ছুটিল। শম্ভু আবার বারান্দার দিকে গেল।)

অনু : শম্ভুদা।

শম্ভু : (ফিরিয়া) কী?

অনু : আপনি দুপুরে খান নি?

শম্ভু : খেয়েছি বৈ কি।

অনু : তবে যে ওরা বললো—

শম্ভু : বাড়িতে না খেলে বুঝি খাওয়া যায় না কলকাতা শহরে?

(শম্ভুর প্রস্থান। অনু খানিকক্ষণ এটা ওটা নাড়িল। জাল সার্টিফিকেটটা টেবিলে পাওয়া গেল। তুলিয়া দেখিল অল্পক্ষণ, ছিঁড়িয়া ফেলিতে গিয়া কী ভাবিয়া থামিল। শম্ভুকে দিবার উদ্দেশ্যে বারান্দার দিকে এক পা গিয়া থামিল। আবার টেবিলে রাখিল। তারপর ছাইদান হইতে চুরুটটা তুলিয়া নৃশংসভাবে মুচড়াইয়া ততোধিক নৃশংসভাবে ছুঁড়িয়া ফেলিল। শম্ভুর বৌদি প্রবেশ করিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে।)

বৌদি : কী হোলো কী? অতো রাগ কেন?

অনু : (সামলাইয়া) আসুন বৌদি। (চুরুটের ধ্বংসাবশেষ কুড়াইয়া আবার ছাইদানে রাখিল)

বৌদি : কী ওটা?

অনু : কিছু না, একটা চুরুট।

বৌদি : চুরুট? চুরুট কে খায় এ বাড়িতে?

অনু : পিসেমশাই। তবে এটা ধরিয়েছিলো আপনার গুণধর দেওর।

বৌদি : শম্ভু চুরুট ধরেছে না কি?

অনু : ধরে নি। ধরবার চেষ্টা করছিলো। নইলে বুদ্ধি খুলছে না।

বৌদি : বুদ্ধি না থাকলে খুলবে কোত্থেকে?

অনু : (জ্বালাধরা হাসিয়া) শম্ভুদার বুদ্ধি নেই? শম্ভুদা এ পাড়ার মগজ। যতো সমস্যা

সব সমাধানের ভার ওর উপর! থিয়েটারের দলশুদ্ধু সবাই ওর বুদ্ধিকে খাতির করে। এমন কি বাবা পিসেমশাই পর্যন্ত!

বৌদি : (হাসিয়া) তুমি বিশেষ খাতির করো বলে তো মনে হচ্ছে না?

অনু : ওব্বাবা! করি বৈ কি? শম্ভুদার বুদ্ধি না থাকলে আমার থিয়েটার করা হবে না! পিসীমাকে ঠাণ্ডা রাখা যাবে না!

বৌদি : কী বুদ্ধি বার করেছে শুনি? ও হতভাগার তো টিকি দেখতে পাই না, খেতে পর্যন্ত আসে না। ওর চ্যালাদের মুখে সকাল থেকে শুধু শুনছি—দিগ্‌গজ প্ল্যান ফেঁদেছে শম্ভু। কিন্তু কী প্ল্যান কেউ কিছু জানে না।

অনু : (সার্টিফিকেট তুলিয়া) এই যে প্ল্যান।

বৌদি : কী এটা? বিয়ের সার্টিফিকেট মনে হচ্ছে। নাম ধাম তো কিছু নেই।

অনু : জাল সার্টিফিকেট। ঐ দেখিয়ে পিসীমাকে ঠেকানো হবে।

বৌদি : বটে! পরে যখন টের পাবেন পিসীমা—তখন?

অনু : সে সব ভেবে রেখেছে। বুদ্ধি কি কম ওর?

বৌদি : কী ভেবে রেখেছে?

অনু : খুব সোজা! সত্যি সত্যি বিয়ে করে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যাবে?

বৌদি : নাঃ, একটু একটু ভক্তি হচ্ছে ওর উপর। বুদ্ধিটা মন্দ বার করে নি।

অনু : (চটিয়া) আপনিও এই কথা বললেন বৌদি? থিয়েটার করতে চাই বলে যাকে তাকে বিয়ে করতে হবে না কি?

বৌদি : আহা, শুধু থিয়েটারের জন্যে কেন? আর যাকে তাকেও তো বিয়ে করার কথা হচ্ছে না?

অনু : তা ছাড়া আর কী? আমি যেন খেলার পুতুল! পিসীমা বিয়ে দেবে এক অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে, শম্ভুদা বিয়ে দেবে নিতাইদার সঙ্গে—আমি যেন—

বৌদি : (চমকাইয়া) কী বললে? নিতাই!

অনু : আমি যেন—আমি যেন একটা—

বৌদি : (দাঁতে চাপিয়া) গাধা! গাধা একটা! মাথায় গোবর পোরা!

অনু : অ্যাঁ?

বৌদি : কিছু না। শম্ভুর কথা বলছি। গেছে কোথায় হতভাগা?

অনু : বাইরে। স্টেজ খাটাচ্ছে বোধ হয়।

বৌদি : ঐটাই জানে শুধু। (পিছনের দরজায় গিয়া) শম্ভু! শম্ভু!

শম্ভু (বাহির হইতে) : কী? আমার সময় নেই এখন।

বৌদি : সময় নেই বার করছি তোমার! এক কথায় এসো, নইলে কপালে দুঃখ আছে বলে দিচ্ছি।

অনু : কী হোলো কী বৌদি? কী বলবেন ওকে?

বৌদি : বলবো—তুমি একটা গাধা।

অনু : আর কী বলবেন?

বৌদি : আর কী বলবো? আর কিছু ঢুকবে ওর মোটা মাথায়?

(শম্ভুর প্রবেশ)

শম্ভু : কী হয়েছে কী? অতো চেঁচাচ্ছিলে কেন?
বৌদি : তুমি একটা গাধা!
শম্ভু : গাধা!
বৌদি : আস্ত গাধা! যাও খেতে যাও!
শম্ভু : আমি—
বৌদি : চু—প! কথাটি নয়। সোজা উপরে গিয়ে হাতমুখ ধোও। আমি আসছি।

(শম্ভু সুড়সুড় করিয়া বাহিরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল)

অনু : কী হোলো বৌদি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
বৌদি : (হঠাৎ হাসিয়া) তোমার বুঝেও কাজ নেই। পিসীমা কোথায়?
অনু : কাশীপুরে। আমাকে ঝোলাবার ব্যবস্থা করতে। আমি বলবো আজ পিসীমাকে।
বৌদি : কী বলবে?
অনু : বলবো—আমি থিয়েটার করবো, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।
বৌদি : (হাসিয়া) আচ্ছা বোলো। তবে আজ কিছু বোলো না, কাল যা ইচ্ছে হয় বোলো। বরং যদি মনে থাকে তো একটা কথা বোলো—কাল দুপুরে তোমার বাবা, পিসীমা আর পিসেমশাই আমার ওখানে খাবেন। তুমি তো কাল সকালে মাসীমার বাড়ি যাচ্ছো।
অনু : আর মাসীমার বাড়ি গিয়ে কি হবে?
বৌদি : না না যাও। আমার রান্না পরে অনেক খাবে।
অনু : বৌদি?
বৌদি : বলো।
অনু : আপনার মাথায় কী যেন মতলব আছে।
বৌদি : কিসে বুঝলে?
অনু : তা জানি না। মনে হচ্ছে।
বৌদি : (হাসিয়া) যদি থাকে তো সেটা ঐ গাধাটার মতলবের চেয়ে ভালো মতলব হবে। (সার্টিফিকেটা তুলিয়া) মনে করে বোলো। আমিও আসবো নিজে বলতে কাল সকালবেলা।

(সার্টিফিকেটটি ধীরেসুস্থে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে প্রস্থান। অনু তাকাইয়া রহিল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শনিবার দুপুর। শম্ভু টেবিলে কী সব নক্সা আঁকিতেছে। বারান্দা হইতে অনাথের প্রবেশ)

অনাথ : নিতাইদা বললো আসছে এখুনি।
শম্ভু : আচ্ছা। শোন, এই ফর্দ মিলিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস স্টেজের পেছনে বড়ো টেবিল

দু'টোয় সাজিয়ে রাখ। সীন বাই সীন আলাদা করে সাজাবি। আর কী কী এখনো আসেনি আমাকে বলে যাবি যতো তাড়াতাড়ি পারিস।

(অনাথের প্রস্থান। শম্ভু আঁকিতে লাগিল। খানিকটা ভাবিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। আবার আঁকিল। নিতাইয়ের সন্তর্পণে প্রবেশ—বারান্দার পথে।)

নিতাই : কী রে, এ ঘরে কেন আবার? আমার ঘরে কি তোর ঘরে গেলেই তো' হোতো?

শম্ভু : আমার ঘর নেই।

নিতাই : কেন রে? বৌদি তাড়িয়ে দিয়েছে?

শম্ভু : হ্যাঁ।

নিতাই : কী করেছিলি? সিন্দুক ভেঙেছিলি?

শম্ভু : আমি কিছু করি নি। পিসীমাদের খাওয়াচ্ছে বৌদি। এখন এই ঘরটাই নিরাপদ।

নিতাই : (আশ্বস্ত হইয়া বসিল) ভালো কথা। (সিগারেট ধরাইয়া) কী বলছিলি বল।

শম্ভু : নিতাইদা, আমার সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে।

নিতাই : (ভীষণ ঘাবড়াইয়া) সে কী রে! আর সাত ঘণ্টা মোটে বাকি!!

শম্ভু : আমার আগাগোড়া ভুল হয়েছিলো। অনু রাজি নয়।

নিতাই : অনু রাজি নয়? ঐ ক'টা কথা বলতে রাজি নয়?

শম্ভু : ঐ ক'টা কথা বললেই তো সব হোতো না।—আচ্ছা নিতাইদা!

নিতাই : কী?

শম্ভু : একটা কথা বলবো?

নিতাই : কী কথা?

শম্ভু : তুমি কি অনুকে বিয়ে করতে চাও?

নিতাই : আমি! অনুকে!! তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে?

শম্ভু : বোধ হয়। কিম্বা বৌদি যা বলে, তাই বোধ হয় সত্যি।

নিতাই : বৌদি কী বলে?

শম্ভু : বলে—আমি একটা গাধা।

নিতাই : গাধা?

শম্ভু : হ্যাঁ।

নিতাই : বাঁদর নয়?

শম্ভু : না।

নিতাই : খচ্চর নয়?

শম্ভু : না।

নিতাই : গাধা?

শম্ভু : গাধা।

নিতাই : ঠিক শুনেছিস?

শম্ভু : ঠিক শুনেছি।

(অনাথের প্রবেশ)

অনাথ : চেয়ার এসে গেছে শম্ভু।

শম্ভু : সাজাতে শুরু করে দে। স্টেজ থেকে তিরিশ ফুট ফাঁক রাখবি। বাচ্চাদের

বসবার সতরঞ্চিগুলো এসেছে?

অনাথ : এখনো আসেনি।

শম্ভু : পাল কোম্পানিতে টেলিফোন কর একটা। বল এখুনি চাই।

(অনাথের প্রস্থান)

নিতাই : তবে কী করবি?

শম্ভু : কিছু ভেবে পাচ্ছি না। পিসেমশাই যদি পিসীমাকে নিয়ে বেরুতে পারেন—তার একটা শেষ চেষ্টা।

নিতাই : সে কি হবে?

শম্ভু : বোধ হয় না।

নিতাই : অনু কী বলে?

শম্ভু : অনু বলেছে থিয়েটার করবে। পিসীমা যা করতে পারে করুক।

(খানিকক্ষণ চুপ)

নিতাই : তোর বৌদি তোকে বলেছে গাধা?

শম্ভু : এক কথা কতোবার শুনতে চাও নিতাইদা?

নিতাই : না—ভাবছিলাম কেন বললো।

শম্ভু : ঠিক কথাই বলেছে। আরো বলেছে আমি যেন এ নিয়ে আর মাথা না ঘামাই।

নিতাই : কে ঘামাবে তাহলে?

শম্ভু : বৌদি বলেছে যা করবার সে করবে।

নিতাই : 'সে' করবে? কে করবে?

শম্ভু : সে! বৌদি! আমার দাদার বৌ—খোকা-খুকুর মা। নাম—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিতাই : (আরও গুলাইয়া ফেলিয়া) কী করবে?

শম্ভু : নিতাইদা তুমি আমাকে পাগল করে দেবে। আমি আবার তোমাকে ডেকেছি পরামর্শ করতে!

নিতাই : চটছিস কেন? এই কি মাথা গরম করবার সময়?

(স্মারকের প্রবেশ)

স্মারক : নিতাইদা, আমি স্টেজের কোনদিক থেকে প্রম্পট্ করবো?

নিতাই : অ্যাঁ? বাঁদিক থেকে।

স্মারক : কার বাঁদিক?

নিতাই : তোর বাঁদিক। যা এখন যা। কাজের কথা হ'চ্ছে।

স্মারক : অ্যাক্টরদের বাঁদিক না দর্শকদের বাঁ দিক?

নিতাই : (ঝাঁঝিয়া) সব্বাইকার বাঁদিক! বললাম না এখন কাজের কথা হচ্ছে!

(স্মারকের প্রস্থান)

শম্ভু : মাথা গরম কোরো না নিতাইদা। মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে সব ডুবে যাবে।

নিতাই : হ্যাঁ। বল।

শম্ভু : পিসেমশাইকে বেরুতেই হবে।

নিতাই : পিসীমাকে নিয়ে।

শম্ভু : পিসীমাকে নিয়ে।

নিতাই : কোথায়?
শম্ভু : প্রশ্ন হোলো—কোথায়।
নিতাই : কো—থায়। (চিন্তা) হয়েছে!
শম্ভু : কোথায়?
নিতাই : ঠনঠনে কালীবাড়ি।
শম্ভু : যাবে কি?
নিতাই : যাবে না? (সন্দিহান) যাবে না বলছিস?
শম্ভু : সন্দেহ।
নিতাই : ধর্মে মতি নেই বলছিস?
শম্ভু : আছে হয় তো। তার চেয়ে বেশি মতি আমাদের সর্বনাশ করতে।
নিতাই : তবে কোথায় পাঠানো যায়? থিয়েটারে?
শম্ভু : থিয়েটারে!!
নিতাই : না না, আমাদের থিয়েটারে নয়। কোথাও পৌরাণিক কিছু হচ্ছে না?
শম্ভু : রংমহলে 'মহিষাসুর মর্দন' হচ্ছে বোধ হয়।
নিতাই : কী মনে হয়? যাবে?
শম্ভু : উঁহু। যা কিছু মর্দন করবার—এখানে বসেই করবে।

(জগতের প্রবেশ)

কী চাই আবার?
জগৎ : শশাঙ্ক যদি গুলি খেয়ে বাঁদিকে না পড়ে ডানদিকে পড়ে, তবে ও সীনে টেবিলটায় ধাক্কা খাবে যে?
শম্ভু : সে কথা জানা আছে আমার। (নক্সা তুলিয়া) নতুন ডায়াগ্রাম তৈরি হচ্ছে এখানে।

(জগতের প্রস্থান)

এক মিনিট যদি স্থির হয়ে ভাবতে দেয় কেউ!
নিতাই : এ দিকে জীবন-মরণ সমস্যা।

(অনাথের প্রবেশ)

অনাথ : দু'টো টেবিলক্লথ কম আছে। আর মদের বোতল—
শম্ভু : বাবা অনাথ! আমাকে বাদ দিয়ে কি একটা কাজও তোমরা সামলাতে পারো না?
অনাথ : (ঘাবড়াইয়া) পারবো না কেন? তুই যে বললি ফর্দ মিলিয়ে—
শম্ভু : অপরাধ হয়েছে আমার। টেবিলক্লথ না থাকে তো বিছ্‌নার চাদর পেতো টেবিলে!
অনাথ : মদের বোতল—
শম্ভু : (গর্জাইয়া) দইয়ের ভাঁড় রাখতে বলোগে বোতল না পায় তো—

(অনাথের দ্রুত প্রস্থান)

যতো সব!
নিতাই : মাথা গরম করিস নি শম্ভু।

শম্ভু : তুমি কী যেন বলছিলে?
নিতাই : মহিষাসুরমর্দন। তা তুই তো বললি হবে না।
শম্ভু : হবে। রংমহলে নয়—এইখানে। একটা সিগারেট দাও।
নিতাই : তুই তো খাস না?
শম্ভু : খেয়ে দেখি, যদি কাজ হয়। (সিগারেট ধরাইয়া কাশিতে শুরু করিল)
নিতাই : দেখিস, মরে যাস নি।
শম্ভু : (কাশিতে কাশিতে) হয়েছে।
নিতাই : কী হয়েছে?
শম্ভু : কালীঘাট।
নিতাই : সে তো আগেই বলেছিলাম—ঠনঠনে কালীবাড়ি। তুই তো বললি—
শম্ভু : না না, ঠনঠনে নয়—
নিতাই : ঠনঠনে কালীঘাট—একই তো কথা। ধর্মে যদি মতি না থাকে—
শম্ভু : (কাশি সামলাইয়া) উঁহু, কালী নয়। মধুদার মেয়ে।
নিতাই : মধুদার মেয়ে?
শম্ভু : সেজো মেয়ে।
নিতাই : সেজো—কী বকছিস তুই?
শম্ভু : ওদের মধুদার সেজো মেয়ের অসুখ না! সেখানে চলে যাক তাকে দেখতে।
নিতাই : সে তো তোর বানানো অসুখ?
শম্ভু : হোক না বানানো। পিসীমা তো জানে না?
নিতাই : গেলেই তো জানতে পারবে?
শম্ভু : জানুক না? ততোক্ষণে আমাদের থিয়েটার পার হয়ে যাবে।
নিতাই : তারপর?
শম্ভু : তারপর হাতে পায়ে ধরে যদি ঠাণ্ডা করা যায়। একবার ঢুকে গেলে হয় তো 'আর কোনোদিন হবে না' বলে ঠাণ্ডা করা যেতে পারে।
নিতাই : ঠাণ্ডা করা যাবে কি?
শম্ভু : (হাল ছাড়িয়া) জানি না। এ ছাড়া আর উপায় কী?

(বনানীর প্রবেশ—বারান্দার পথে। পিছনে মিঃ সেন।)

বনানী : এই যে নিতাইবাবু—
নিতাই : অ্যাঁ?
বনানী : শম্ভুবাবু—
শম্ভু : অ্যাঁ?
বনানী : আপনারা দু'জনেই আছেন দেখছি।
নিতাই-শম্ভু (একসঙ্গে) : হ্যাঁ।
বনানী: ওঃ আপনাদের কি কম খোঁজা খুঁজেছি? নিতাইবাবুর ঘরে গেলাম। শম্ভুবাবুর ফ্ল্যাটেও যাচ্ছিলাম—তা খোকা-খুকু বললে আনুমাসীর বড়োপিসী রয়েছেন, তাই মাঠে স্টেজের ওখানে গেলাম—
শম্ভু : ভালোই করেছেন।

বনানী : ওখানে বললে আপনারা এই ঘরে আছেন। তাই ভাবলাম—

শম্ভু : কী ব্যাপার?

মিঃ সেন : (অগ্রসর হইয়া) এই টেবিলক্লথগুলো—(এক বস্তা টেবিলক্লথ পাতিলেন) এইটা দেখুন—সবুজ চেক্, তবে রংটা একটু যাকে বলে গডি—

বনানী : কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আমার শাড়িটার সঙ্গে ম্যাচ্ করতো। আমি তাই বলছিলাম—

মিঃ সেন : অবশ্য সবুজ আরো একটা আছে—এম্‌ব্রয়ডারি—

বনানী : ওটা দূর থেকে ভালো দেখা যাবে না। তাছাড়া এই কোণটা একটু ছিঁড়ে গেছে। ধোপাগুলো যে কী হয়েছে আজকাল, নতুন নতুন জিনিসগুলোকে—অবশ্য এটা পেছন দিকে রাখতে পারলে চলে যায় বোধ হয়। কিন্তু কী দরকার? অন্যটাই তো ভালো। গডি বলছো? এমন কি বেশি? আজকাল তো কালারফুল জিনিসই চলে বেশি।

মিঃ সেন : আর অন্যটা?

বনানী : অন্য—এইটা নেবো? কী বলেন নিতাইবাবু? কিন্তু এ রঙের সঙ্গে ম্যাচ্ করবে এমন শাড়ি তো একটা দৃশ্যেও পরছি না আমি!

মিঃ সেন: কেন, তোমার সেই জর্জেটটা? যেটা সেদিন কেনা হোলো? এর সঙ্গে তো সুন্দর যেতো।

বনানী : সেটা দেখিয়েছিলাম নিতাইবাবুকে। উনি বল্লেন ওটা ঠিক মানাবে না।

মিঃ সেন : কেন? এইটার মতোই তো রং?

বনানী : না না, টেবিলক্লথের সঙ্গে নয়—আমার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাবে না বলছিলেন নিতাইবাবু।

মিঃ সেন : ও, তা অবশ্য—তা হলে তো কোনো মতেই চলে না। আচ্ছা—এইটা যদি—

(আর একখানি তুলিলেন)

শম্ভু : ইয়ে, মিস্টার সেন? অনেক ধন্যবাদ। এই দু'টোই চমৎকার হবে। (সামনে যে দুটি পাইল তুলিয়া লইল) মদের বোতল পেয়েছেন?

মিঃ সেন : পেয়েছি। সেগুলো অনাথবাবুর হাতে দিয়ে এসেছি। একটা জিন, একটা রাম, একটা ব্র্যাণ্ডি আর একটা হুইস্কীর বোতল। তবে সব ক'টাই খালি—হেঁ হেঁ হেঁ—

শম্ভু : হেঁ হেঁ হেঁ—আচ্ছা তা হলে—

(অনাথের প্রবেশ)

অনাথ : একটা লোক মিস্ চ্যাটার্জির পিসেমশাইকে খুঁজছেন। বলছে জরুরি চিঠি আছে। বাইরে তালা লাগানো দেখে বসেছিলেন সিঁড়িতে।

শম্ভু : ওরা সদর দরজায় তালা লাগিয়ে আমাদের ওখানে গেছে। নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দে।

(অনাথের প্রস্থান)

মিঃ সেন : ইয়ে, নিতাইবাবু। মিসেস্ মুখার্জি এসে গেছেন?

নিতাই : মিসেস্ মুখার্জি?

মিঃ সেন: মানে আপনার স্ত্রী—ইয়ে আপনার স্ত্রীর কথা বলছিলাম—

নিতাই : আ—মার স্ত্রী! ও—হ্যাঁ, ইয়ে না। তবে আসবে। আসবে নিশ্চয়ই। বোধ হয় আসবে।

মিঃ সেন : বোধ হয় আসবে?

নিতাই : না না, বোধ হয় নয়। নিশ্চয়ই আসবে। একজন কারো স্ত্রী নির্ঘাৎ আসবে!

মিঃ সেন : ঠিক বুঝলাম না।

শম্ভু : আপনার দোষ নয়। বড়ো জটিল ব্যাপার। ইয়ে, আর একটা উপকার করতে পারেন মিস্টার সেন?

মিঃ সেন : বিলক্ষণ, বলুন না—

শম্ভু : আপনাদের, ইয়ে—ফুলদানি আছে?

মিঃ সেন : নিশ্চয়ই! ক'টা চাই?

শম্ভু : এই—ধরুন, গোটা দুই! একটু তাড়াতাড়ি দরকার। যদি পারেন তো এখনই—

মিঃ সেন : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ফুলদানি না ফ্লাওয়ার-বোল?

শম্ভু : যা হয়। তবে তাড়াতাড়ি—

বানানী : পেতলের না কাঁচের? রূপোরও আছে। রূপো মানে অবশ্য জার্মান সিলভার—

মিঃ সেন : কোনটা?

বনানী : ঐ যে দু'টো হেনারা দিয়েছিল বিয়ের সময়ে?

শম্ভু : হ্যাঁ হ্যাঁ, চমৎকার হবে—

মিঃ সেন : যেটা শোবার ঘরে বাঁদিকের তাকে আছে?

নিতাই : হ্যাঁ হ্যাঁ—

বনানী : না গো! এ দুটো বাইরে নেই, বাক্সে তোলা। এসো দেখিয়ে দিচ্ছি—

শম্ভু : সেই ভালো। আপনি দেখিয়ে দিন।

(বনানী ও মিঃ সেনের প্রস্থান। নিতাই চেয়ারের কুশনটি তুলিয়া সজোরে মেজেতে নিক্ষেপ করিল। শম্ভু কী বলিতে গেল।)

নিতাই : (বাধা দিয়া) জানি জানি—মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। বলি, মাথা কি—মাথা কি রেফ্রিজারেটার?

(সিগারেট ধরাইতে গেল। বাহিরে তালা খোলার শব্দ। দু'জনে পাথর। নিতাইয়ের আঙুলে কাঠি জ্বলিতেছে।)

শম্ভু : নিতাইদা, শিগগির! (টানিয়া পিছনের দরজার দিকে গেল)

(পিসেমশাইয়ের প্রবেশ)

পিসেমশাই : এই যে, তোমরা এখানেই রয়েছো।

নিতাই : (বিনা শব্দে ঠোটের ভঙ্গীতে) পিসীমা?

পিসেমশাই: ভয় নেই। ওরা দুজন শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কী সব গোপনীয় আলোচনা করছে।

শম্ভু : ওরা দু'জন?

পিসেমশাই : তোমার বৌদি আর তোমাদের পিসীমা। (চুরুট ধরাইতে লাগিলেন)

শম্ভু : ভালোই হয়েছে, আপনি এসেছেন। শুনুন, আজ সন্ধেয় আপনি পিসীমাকে নিয়ে বেরুতে পারবেন? যদি ধরুন—কালীঘাটে যান?

পিসেমশাই : সেই কথাই বলতে এলাম। স্রেফ চুরুট খেতেই নামি নি।

শম্ভু : যাওয়া যাবে তা হলে কালীঘাট? আমিও তাই ভাবছিলাম আপনাদের মধুদার সেজো মেয়েকে দেখতে যদি—

পিসেমশাই : যাওয়া যাবে, তবে কালীঘাটে নয়—কাশীপুরে।

নিতাই : কাশীপুরে?

পিসেমশাই : হ্যাঁ। আর মধুদার কন্যাকে দেখতে নয়, আমার ভগিনীর প্রতিবেশী-পুত্রকে দেখতে।

নিতাই : সে আবার কী?

শম্ভু : ও, বুঝেছি। সেই পাত্র?

পিসেমশাই : এই তো তোমার মাথা এখনো খেলছে দেখছি। সেই পাত্র। কাশীপুর থেকে এই চিঠি পাঠিয়েছে এইমাত্র—পাত্রকে কাল সকালে পাটনা যেতে হবে, অতএব দেখতে হয় তো আজ রাতেই—

শম্ভু : এ তো কালীঘাটের চেয়ে অনেক ভালো—

পিসেমশাই : তোমার তাই মনে হয়? আমার তো কালীঘাট কাশীপুর দুই-ই সমান ঘিঞ্জি আর নোংরা মনে হয়।

শম্ভু : না না, বলছিলাম—মানে আমরা ভাবছিলাম পিসীমাকে কোথাও পাঠানো যাবে কি না—এ তো—মানে, এ ডাকে পিসীমার সাড়া না দিয়ে উপায় কী?

পিসেমশাই : তোমার বেশ কাব্যও আসে দেখছি। 'ডাকে সাড়া'! যাই হোক, ধরেছো ঠিকই।

শম্ভু : আপনারও মনে হয় পিসীমা যাবেন?

পিসেমশাই :যেতেই হবে। পনেরো দিনের মধ্যে অনুর বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করার ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা। চিঠিতে লিখছে—পাত্র এক মাসের মধ্যে ফিরতে পারবে না।

শম্ভু : নিতাইদা, তোমাকে বলেছিলাম না? সব দুর্ভাগ্য একটানা আসতে পারে না। স্ট্যাটিস্‌টিক্সের নিয়ম!

পিসেমশাই : তোমাদের দিক থেকে এটাকে সৌভাগ্য বলা যেতে পারে। অনুর দিক থেকে কি না জানি না।

শম্ভু : পিসেমশাই, আমি কথা দিচ্ছি—এ যাত্রা যদি উৎরোই, কাশীপুরে অনুর শ্বশুরবাড়ি হওয়া যেমন করে হোক বন্ধ করবো। সে যদি পাত্রকে গুম করতে হয় তাও স্বীকার।

পিসেমশাই : তোমার প্ল্যান তো একবার ভেস্তেছে বলছো।

শম্ভু : সে ভেস্তেছে—যা জানি না তাতে হাত দিয়েছিলাম বলে। আর ওরকম হবে না।

পিসেমশাই : গুম করাটা জানো বলছো?

শম্ভু : কখনো করিনি আগে, তবে ওটা লাইনে পড়ে—শিখে নিতে পারবো।

পিসেমশাই : হুঁ। তবে তো সব চুকেই গেলো ভালোয় ভালোয়। অন্তত তোমাদের থিয়েটারের ব্যাপারটা। অনুর অভিনয়টা দেখতে পেলাম না এই দুঃখ রইলো।

(সহসা পিসীমার প্রবেশ)

পিসীমা : এই যে! ঠিক ধরেছি—চুরুট খেতে নেবেছে!

পিসেমশাই : না না, চুরুট কেন হতে যাবে—

পিসীমা: হাতে চুরুট, মুখে ধোঁয়া—তবু বলবে চুরুট নয়?

পিসেমশাই : না না, এই দেখো না—এই চিঠি এলো, আমি তো তাই—

পিসীমা : কী চিঠি? (পড়িয়া) হুঁ। তা কিসের দুঃখ রইল বলছিলে?

পিসেমশাই : দুঃখ? ও, এই এদের কথায় কথায় বলছিলাম এদের থিয়েটারটা দেখা হোলো না—এখন আবার ছুটতে হবে কাশীপুর—তাই। এরাও দুঃখ করছিল।

পিসীমা : বটে! তা অতো দুঃখে দরকার কী? দেখলেই পারো?

পিসেমশাই : তুমি একা যাবে? না না, তা কী করে হয়?

পিসীমা : আমি যাবো কে বলেছে? আমি তো থিয়েটার দেখবো!

পিসেমশাই-নিতাই-শম্ভু (একসঙ্গে) : অ্যাঁ!

পিসীমা : হ্যাঁ।

পিসেমশাই : কিন্তু কাশীপুর?

পিসীমা : কাল গেলেই হবে।

পিসেমশাই : কাল সক্কালেই যে পাত্র চলে যাচ্ছে পাটনা!

পিসীমা : তা কী করা যাবে? আজ রাত্রেই বিয়ে দিয়ে দেবো না কি?

পিসেমশাই : না না, কিন্তু—ও যে একমাসের মধ্যে ফিরবে না?

পিসীমা : তবে একমাস পরে হবে। নয় তো অন্য পাত্র দেখতে হবে।

পিসেমশাই : কিন্তু তুমি যে বলছিলে পনেরো দিনের মধ্যে—

পিসীমা : দেখো, আমি কী বলছিলাম তা নিয়ে তোমার অতো মাথা না ঘামালেও চলবে। তোমার যদি অতো মাথাব্যথা থাকে, তুমি যেও কাশীপুরে।

(ফিরিলেন)

পিসেমশাই : আমি? আমি একা গিয়ে কী করবো?

পিসীমা : আর কিছু না হোক, টেনে চুরুট খেতে পারবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

পিসেমশাই : না না, শোনো—

পিসীমা : শোনবার কিছু নেই। ওপরের ঘরের প্রতিমা আমাকে অনেক করে বলেছে যেন থিয়েটারটা দেখি। আমি কথা দিয়েছি ওর সঙ্গে যাবো।

(পিসীমার প্রস্থান। পিসেমশাইয়ের অনুসরণ।)

শম্ভু : (আর্তকণ্ঠে) বৌদি বলেছে! বৌদি!!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সন্ধ্যা। ঘরে নানা পোশাক পরিচ্ছদ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছড়ান। একটি বড়ো আয়না আমদানি হইয়াছে। রাজীব, শশাঙ্ক ও ধ্রুবেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। তাহাদের পরিধানে ফিটফাট পোশাক, মঞ্চের উপযোগী রূপসজ্জাও আছে।)

রাজীব : **ঠিক দেখেছিস?**

শশাঙ্ক : ও কি ভুল দেখবার জিনিস?

ধ্রুবেশ : তোর বোধ হয় পিসী-ফোবিয়া হয়ে গেছে। সব জায়গায় পিসীমা দেখছিস!

শশাঙ্ক : তুই যা না, দেখে আয়!

ধ্রুবেশ : মেকআপ্ নিয়ে যাবো কী করে?

শশাঙ্ক : পর্দার ফাক দিয়ে উঁকি মেরে দেখ। বেশি খুঁজতে হবে না! একেবারে সব সামনের রোয়ে দলকে দল বসে আছে।

রাজীব : দলকে দল?

শশাঙ্ক : পিসীমা, পিসেমশাই, যোগীনবাবু, শম্ভুর দাদা আর বৌদি। খোকা-খুকু সামনে সতরঞ্চিতে নাচছে।

(নিতাইয়ের দ্রুত প্রবেশ)

নিতাই : তোমার এখানে কী এখনো? রাজীব শশাঙ্ক ওপ্ন্ করবে—দশ মিনিট মোটে বাকি। অনু কই?

রাজীব : জানি না। ভিতরের ঘরে বোধ হয়।

নিতাই : অনু! অনু আছো নাকি?

অনু : (ভিতর হইতে) হ্যাঁ, আসছি, হয়ে গেছে।

শশাঙ্ক : নিতাইদা, তোমার কাছে বই আছে? আমার একটা কথাও মনে পড়ছে না।

নিতাই : তোমার আবার কী হোলো?

ধ্রুবেশ : পিসীমাকে সামনের রোয়ে দেখে অবধি ওর অবস্থা কাহিল।

নিতাই : বাইরে প্রম্প্টারের কাছে দেখে নাও গে চট করে। ডোবাবে তোমরা!

(রাজীব, শশাঙ্ক ও ধ্রুবেশের প্রস্থা ,

এমনি জ্বালার অন্ত নেই, তার উপর সব পা ভুলতে শুরু করেছে। অনু, তাড়াতাড়ি করো!

(অনুর ভিতর হইতে প্রবেশ)

অনু : ক'টা বাজে?

নিতাই ! সাতটা বাজতে সাত।

অনু : ওঃ, তবে তো বেশি দেরি হয়নি। আমার তো অনেক পরে।

নিতাই : অনেক পরে আর কোথায়? সবাইকে তৈরি না দেখলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? শম্ভু কোথায়?

অনু : জানি না। এসে অবধি দেখি নি।

নিতাই : কখন এসেছো তুমি?

অনু : ছ'টারও আগে। এসে দেখি শম্ভুদাদের ঘরে শুধু মোতির মা আর খোকা-খুকু। আর একটা চিঠি রেখে গেছেন বৌদি।

নিতাই : কী চিঠি? কই দেখি?

অনু : সে কোথায় ফেলেছি মনে নেই।

নিতাই : কী ছিল চিঠিতে?

অনু : 'বিশেষ কারণে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, ফিরে সোজা থিয়েটারে যাবো। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে সাজপোশাক করতে পারো।'

নিতাই : আর কী?

অনু : ব্যাস। আর কিছু নেই।

নিতাই : পিসীমার কথা কিছু লেখেনি?

অনু : না। ও হ্যাঁ, শুধু লিখেছে—বেশি ভেবো না।

নিতাই : বেশি ভেবো না—মাই গড্! (সামলাইয়া) শোনো, নার্ভাস্ হোয়ো না। মাথা ঠিক রেখো।

অনু : আমাকে নিয়ে ভাববেন না নিতাইদা। আমার এখন মনে হচ্ছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

নিতাই : খবর শুনেছো?

অনু : কী খবর?

নিতাই : ওরা সবাই সামনের রোয়ে বসে আছে।

অনু : সবাই মানে—পিসীমাও?

নিতাই : হ্যাঁ। নার্ভাস্ হোয়ো না—

অনু : নার্ভাস্ হবার আর কী আছে? এ তো ধরেই রেখেছিলাম।

নিতাই : গুড্। ভেরি গুড্। নার্ভাস হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। একটু বোসো না হয় স্থির হয়ে। আমি দেখি গে—শম্ভু হতভাগা যে কোথায় গেলো—

(অনাথের দ্রুত প্রবেশ। ভৃত্যের সাজ।)

এই যে, অনাথ।

অনাথ : (পোশাক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে) বলুন নিতাইদা।

নিতাই : শম্ভুকে দেখেছো?

অনাথ : হ্যাঁ, সে তো আগাগোড়া স্টেজের ওখানেই আছে।

নিতাই : ওর মেক্‌আপ্ হয়েছে?

অনাথ : হ্যাঁ। শম্ভুর কোটটা খুঁজছি—এই যে পেয়েছি।

(কোট লইয়া অনাথের দ্রুত প্রস্থান)

নিতাই : এখনো কোট পরে নি? কী যে করছে সব? কতো দিক সামলানো যায়!

অনু : ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? শম্ভুদার আর আমার তো প্রায় একসঙ্গে এন্ট্র্যান্স। অনেক সময় আছে।

নিতাই : কোথায় অনেক সময়? আমি দেখি গে—তুমি বোসো স্থির হয়ে, ব্যস্ত হোয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। শম্ভুটা—আচ্ছা অনু?

অনু : কী?

নিতাই : তোমার কি মনে হয় পিসীমা অডিটোরিয়ামেই একটা গোলমাল তুলবেন?

অনু : মনে হয় না।

নিতাই : তবু? তোমাকে হঠাৎ স্টেজে দেখা—একটা শক্ তো!

অনু : জানি না। কী হবে আর ভেবে?

নিতাই : তা ঠিক। ভেবে লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই আসল কথা। দু' মিনিট আছে আর। আমি দেখি গিয়ে। ঠিক সময়ে কখনো আরম্ভ হয়? শম্ভু বললে কী হবে—

(বলিতে বলিতে প্রস্থান। অনু খানিকক্ষণ পার্ট মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিল। তারপর কাগজ ফেলিয়া পিছনে এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল। শম্ভুর প্রবেশ। অসম্ভব ক্লান্ত। কাঁধের কোটটা একটা চেয়ারে ফেলিয়া ঝুপ ধরিয়া বসিল দু'হাতে মাথা খামচাইয়া।)

শম্ভু : ওঃ!

(অনাথের প্রবেশ। অনুকে কেহই দেখে নাই।)

কী রে অনাথ?

অনাথ : কিছু না। তুই বলেছিলি থিয়েটারের সময়ে সর্বক্ষণ যেন তোর কাছাকাছি থাকি। তুই ছুটলে আমিও ছুটি।

শম্ভু : (ক্লান্ত হাসিয়া) সে সব ভুলে যা। সে আর দরকার হবে না।

অনাথ : আমি তবে কী করবো এখন?

শম্ভু : স্টেজ কে দেখছে?

অনাথ : জগৎ।

শম্ভু : জগতের সঙ্গে সঙ্গে তুইও থাক। সীন্ চেঞ্জের সময়ে আমি যদি কখনো না থাকতে পারি, তোরা দু'জনে চালিয়ে নিতে পারবি না?

অনাথ : কেন পারবো না? সব তো তুই ছক কষে দিয়েছিস। ছবির মতো সাজানো আছে সব।

শম্ভু : গুড্। এর পরেরবার স্টেজ ম্যানেজার তুই।

অনাথ : স্টেজ ম্যানেজার? তুই থাকতে?

শম্ভু : আমি? আমার এই শেষ।

অনাথ : ও কথা সবাই বলে। নিতাইদাও বলে।

শম্ভু : তুই বুঝবি না অনাথ। নিতাইদার বলা আমার বলা এক নয়। তুই যা এখন। আমার এন্ট্র্যান্সের আগে ডাক দিতে বলিস। অনু কোথায়?

অনাথ : জানি না। বাইরে বোধ হয়।

সম্ভু : খুঁজে রাখ। আমার আর ওর প্রায় এক সঙ্গে।

(অনাথের প্রস্থান। শম্ভু আবার ঘাড় গুঁজিয়া বসিল। অনু আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।)

অনু : প্লে আরম্ভ হয়ে গেছে?

শম্ভু : (চমকাইয়া) কে? ওঃ তুমি? চমকে দিয়েছিলে।

অনু : প্লে শুরু হয়ে গেছে?

শম্ভু : হ্যাঁ।

অনু : ঘড়ি ধরে সাতটায়?

শম্ভু : ঘড়ি ধরে। ঐ একটি কাজই করতে পেরেছি।

অনু : কী রকম হচ্ছে কে জানে?

শম্ভু : এখনো তো ইঁট পাটকেল পড়ে নি। আমি ঢুকলে পড়বে হয় তো।

অনু : কিম্বা আমি ঢুকলে। পিসীমাই আগে বোধ হয় থান ইঁট ছুঁড়বে।

শম্ভু : ভয় হচ্ছে না?

অনু : হচ্ছে বৈ কি? আপনার হচ্ছে না?

শম্ভু : আমার আর ভয়ের কী আছে? ক্ষতি যা, সব তো তোমার।

অনু : পার্ট মনে আছে?

শম্ভু : না। প্রথম লাইনটা কী যেন আমার?

অনু : 'বড়ো দেরি হয়ে গেলো, কিছু মনে করবেন না।'

শম্ভু : হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে এখন। বনানী বলবে—'দেরি যেমন করেছেন, তার খেসারত দিতে হবে।'

অনু : এই তো মাথা খুলছে!—কী হোলো?

শম্ভু : কিছু না।

অনু : মনে হোলো যেন মাথায় ডাণ্ডা মেরেছে কেউ?

শম্ভু : ঐ 'মাথা খোলা' কথাটায় আজ যেন খানিকটা ডাণ্ডার স্বাদ পাচ্ছি।

অনু : (অল্প থামিয়া) শম্ভুদা আপনি খুব রেগে আছেন, না?

শম্ভু : রেগে আছি? কেন?

অনু : কাল আপনাকে যা তা বলেছি আমি।

শম্ভু : তুমি? মনে পড়ছে না তো। বৌদি দু'কথা বলেছে বটে, কিন্তু কথাগুলা নির্জলা সত্যি।

অনু : আচ্ছা, আপনি কি সত্যি সত্যি ভেবেছিলেন নিতাইদা—মানে নিতাইদাকে আমি—আবার কী হোলো?

শম্ভু : ডাণ্ডা।

অনু : আর বলবো না।

শম্ভু : না না, কেন বলবে না? বলো। তুমি আর কতোটুকু বলতে পারবে? আমি নিজে যা বলছি—

অনু : কী বলছেন?

শম্ভু : কাল সারারাত ধরে শুধু একটি কথা জপ করেছি—গাধা গাধা গাধা গাধা গাধা।

অনু : স্বপ্নে?

শম্ভু : স্বপ্নও বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন। তবে চোখ দু'টো খোলা ছিল প্যাঁট প্যাঁট করে। (অল্পক্ষণ চুপ। অনু আসতে শম্ভুর চুলের মধ্যে হাত রাখিল। শম্ভু অল্প শিহরিয়া পাথর হইয়া বসিয়া রহিল।)

অনু : কাল সারারাত ঘুমোন নি তা হলে?

শম্ভু : সেটা বড়ো কথা নয়। এমনিতেও জাগতাম (তিক্ত হাসিয়া)—সার্টিফিকেট জাল করতে।

অনু: শম্ভুদা।

শম্ভু : কী?

অনু : আমিও ঘুমোই নি কাল রাতে।

শম্ভু : (অল্প থামিয়া) পিসীমা?

অনু : না। পিসীমার কথা আমার মাথায় আর নেই একদম।

শম্ভু : তবে?

অনু : (হঠাৎ হাত সরিয়া সরাইয়া গেল) জানি না। এমনি আজে বাজে ভেবে।—আজ বাড়িশুদ্ধু কোথায় গিয়েছিলো সবাই?

শম্ভু : কী করে জানবো? দুপুর থেকে বৌদিকে ধরবার চেষ্টা করছি, তা সব সময়ে পিসীমার সঙ্গে। তারপর বেরুলো দল বেঁধে। ফিরে সোজা মাঠে—তাও সব একসঙ্গে বসেছে।

অনু : বৌদির কী একটা মতলব আছে।

শম্ভু : (ঝাঁঝিয়া) বৌদি-ই তো ডোবালো সব!

অনু : বৌদি ডোবালো?

শম্ভু : তা না তো কী? এতোক্ষণে পিসীমা কাশীপুরে সন্দেশ খেতেন। বৌদি আদিখ্যেতা করে থিয়েটার দেখবার নেমন্তন্ন করেছেন।

অনু : বৌদি?

শম্ভু : তবে আর বলছি কী? বঙ্কুবাবু বলেছিলো মেয়েদের আলাদা জায়গা করতে। কেন যে তাই করি নি!

অনু : তাতে কী হোতো?

শম্ভু : অন্তত দাদাকে আলাদা পেতাম। কি পিসেমশাইকে।

অনু : কী লাভ হোতো?

শম্ভু : কী ঘটছে খানিকটা অন্তত আঁচ পাওয়া যেতো। এ যেন বারুদের বস্তার উপর বসে আছি সবাই। কখন তুমি স্টেজে ঢুকবে, আর বারুদে আগুন লাগবে।

(অনন্ত হাঁকিতে হাঁকিতে প্রবেশ করিল)

অনন্ত : প্রমীলা ললিত। প্রমীলা ললিত। স্টেজ কল্। প্রমীলা ললিত।—এই যে শম্ভুদা।

শম্ভু : কায়দাগুলো শিখেছিস! স্টেজ কল!

অনন্ত : (হাসিয়া) তুমিই শিখিয়েছো। (হাঁকিয়া) প্রমীলা ললিত। স্টেজ কল। লেফ্ট্ উইঙ্গ্স্ প্লীজ্।

(হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান। নিতাইয়ের প্রবেশ।)

নিতাই : আরে তোমরা এখনো এখানে? কী আশ্চর্য!

শম্ভু : ভয় নেই, অনন্ত এইমাত্র স্টেজ কল দিয়ে গেছে। তার মানে এখনো তিন মিনিট বাকি। কী রকম হচ্ছে?

নিতাই : মনে তো হচ্ছে জমছে আস্তে আস্তে। কিন্তু প্রমীলা না ঢুকলে—যাও যাও অনু, আর দেরি কোরো না।

(শম্ভু ও অনুর প্রস্থান। নিতাই কম্পিত হস্তে সিগ্যারেট ধরাইতে লাগিল। শশাঙ্কর প্রবেশ।)

শশাঙ্ক : নিতাইদা তুমি এখানে? আমি ভেবেছিলাম তুমি অডিটোরিয়াম থেকে দেখেছো।

নিতাই : তাই দেখছিলাম। প্রমীলার এনট্র্যান্স, তাই—

শশাঙ্ক : আমারটা কী রকম দেখলে?

নিতাই : ভালোই। একটু আড়ষ্টভাব রয়েছে যেন।

শশাঙ্ক : আড়ষ্টভাব একটু? পেটের ভিতর যে কী হচ্ছে আমার তা যদি জানতে! তবু তো পিসীমাদের রো-এর দিকে একদম তাকাইনি।

(ধ্রুবেশের প্রবেশ)

ধ্রুবেশ : জমে যাচ্ছে নিতাইদা! জমে যাচ্ছে! তবু তো এখনো প্রমীলা ঢোকে নি।

নিতাই (দাঁতের ফাঁকে) তবু তো এখনো প্রমীলা ঢোকে নি।

ধ্রুবেশ রাজীব জমিয়ে দিয়েছে। তুমি এখানে কেন? প্রমীলারটা দেখবে না?

নিতাই দেখবো। খানিক পরে যাবো।

ধ্রুবেশ আমি দেখি গে। প্রমীলার ড্রামাটিক্ এন্ট্র্যান্স্—মিস্ না হয়ে যায়। (ধ্রুবেশ ছুটিল)

শশাঙ্ক : নিতাইদা।

নিতাই উঁ?

শশাঙ্ক : প্রমীলা নিশ্চয় ঢুকেছে এতোক্ষণে।

নিতাই : হুঁ।

শশাঙ্ক : ললিতও।

নিতাই : হুঁ।

শশাঙ্ক: ললিতের তো প্রমীলার ঠিক পরেই।

নিতাই : হুঁ।

(অনাথ ঝড়ের মতো আসিয়া শম্ভুর কোট ছিনাইয়া ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেল) অনাথ!

অনাথ : (বাহির হইতে) আসছি!

শশাঙ্ক : কোট ফেলে গেছিলো শম্ভুটা।

নিতাই : হুঁ। (দরজার দিকে গেল, কিন্তু সাহসে কুলাইল না—ফিরিয়া আসিল)

শশাঙ্ক : নিতাইদা।

নিতাই : উঁ?

শশাঙ্ক : কিছু শুনতে পাচ্ছো?

নিতাই : উঁহু।

(অনাথের প্রবেশ)

অনাথ : কী বলছিলেন নিতাইদা?

নিতাই : প্রমীলা ঢুকেছে?

অনাথ : হ্যাঁ।

নিতাই : ললিত?

অনাথ : এই ঢুকলো। কোটটা পেয়ে গেছে ঠিক সময়ে।

নিতাই : চুলোয় যাক কোট!

অনাথ : অ্যাঁ?

নিতাই : কী—কী—কী রকম চলছে? মানে কী রকম বুঝছিস? কিছু কোনোরকম—

অনাথ : কোন্‌টা কোনরকম?

শশাঙ্ক : দর্শকদের মধ্যে কোনো রিঅ্যাক্‌শন—কোনো রকম গোলমাল—প্রমীলা ঢোকার পর থেকে?

অনাথ : কই শুনি নি তো। দেখছি আমি।

(অনাথের প্রস্থান)

শশাঙ্ক : নিতাইদা!

নিতাই : উঁ?

শশাঙ্ক : (স্পষ্ট ভয়ে) কী হবে নিতাইদা?

নিতাই : অ্যাঁ? মাথা ঠাণ্ডা রাখো। মাথা খারাপ কোরো না।

(ধ্রুবেশের ছুটিয়া প্রবেশ)

ধ্রুবেশ : জমিয়ে দিয়েছে নিতাইদা! প্রমীলা জমিয়ে দিয়েছে! জমিয়ে কী—ফাটিয়ে দিয়েছে!

নিতাই : পিসীমা?

ধ্রুবেশ : প্রমীলা প্রমীলা! শম্ভুটা পর্যন্ত ফাটাচ্ছে! রিহার্স্যালে এমন দেখিনি কোনো দিন।

নিতাই : চুলোয় যাক শম্ভু! অডিটোরিয়ামে কী হচ্ছে বলো।

ধ্রুবেশ : অডিটোরিয়াম কাঠ। একটা আওয়াজ নেই!

শশাঙ্ক : পিসীমা কী করছে?

ধ্রুবেশ : ওদিকে দেখি নি, আমি স্টেজ দেখছিলাম। আর ভয় নেই নিতাইদা।

নিতাই : আর ভয় নেই!

ধ্রুবেশ : কোনো ভয় নেই। এ সীন যদি ডুবতো, আমিও ডোবাতাম। এখন আমার দারুণ কন্‌ফিডেন্স্ এসে গেছে। সেকেন্ড সীনে ধ্রুবেশকে একবার দেখে নিও!

(ছুটিয়া প্রস্থান—অনাথের প্রবেশ)

নিতাই : ওঃ গড্!

অনাথ : দেখে এলাম।

নিতাই : কী দেখলি?

অনাথ : সবাই পাথরের মতো বসে আছে।

শশাঙ্ক : পিসীমাও?

অনাথ : পিসীমা একেবারে পাথর। অন্য সবাই তবু একটু আধটু নড়ছে।

শশাঙ্ক : কী হবে নিতাইদা?

নিতাই : পাথর মানে—পাথর হয়ে দেখছে, না রেগে পাথর?

অনাথ : তা বলতে পারবো না।

শশাঙ্ক : শুনলে না? সবাই একটু আধটু নড়ছে, পিসীমা বিলকুল পাথর!

নিতাই : যা আবার ভালো করে দেখ। দেখে তাড়াতাড়ি বলে যাবি।

অনাথ : ফার্স্ট সীন শেষ হয়ে এলো নিতাইদা, আমি আর আসতে পারবো না। শম্ভু বলে গেছে সীন চেঞ্জ আমার আর জগতের উপর। দু' মিনিটে ড্রপ তুলতে হবে।

নিতাই : ও। আচ্ছা যা।

(অনাথের প্রস্থান)

শশাঙ্ক : কিছু বুঝছো নিতাইদা?

নিতাই : সীনটা শেষ হলেই বোঝা যাবে।

শশাঙ্ক : সীনটা শেষ হলে পিসীমা এদিকে আসবে মনে হয়?

নিতাই : আসতে পারে। প্রমীলা ললিত তো এখানেই ফিরবে।

শশাঙ্ক : (ঢোক গিলিয়া) ও।

(রাজীবের প্রবেশ)

নিতাই : তোমার হয়ে গেলো?

রাজীব : হ্যাঁ। একটা সিগারেট দাও তাড়াতাড়ি নিতাইদা। সেকেণ্ড সীনের ওপ্‌নিং আমার।

নিতাই : (সিগারেট দিয়া) কী রকম বুঝছো?

রাজীব : (ধরাইয়া) কী করে বলবো? মনে তো হচ্ছে ভালোই।—আমার প্যাকেটটা যে কে মেরে দিলো!

শশাঙ্ক : ইয়ে, নিতাইদা, আমি যাই—দেখি বাইরে—একটু পার্টটা দেখে রাখি। থার্ড সীনের গোড়াতেই আমার—

(শশাঙ্কের প্রস্থান)

নিতাই : কাপুরুষ!

রাজীব : কে?

নিতাই : ঐ কিশোরটা। পিসীমার ভয়ে পালালো। যদি পিসীমা এখানে আসে।

রাজীব . পিসীমা এখানে আসবে না কি?

নিতাই : কেন তোমারও ভয় হচ্ছে না কি?

রাজীব : ভয় নয়, তবে স্টেজে ওঠার মুখে চেহারাটা না দেখাই ভালো। স্টেজ থেকে একবার পিসীমার দিকে তাকিয়ে পার্ট ভুলে যেতে বসেছিলাম। তার পর থেকে ডি-ব্লকের দোতালার বারান্দার নিচে আর চোখ নামাই নি।

নিতাই : তাকিয়ে কী দেখলে?

রাজীব : বিশেষ কিছু না। শুধু মনে হোলা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। স্টেজ থেকে বোধহয় ঐরকমই মনে হয়।

নিতাই : ইয়ে, একবার অডিটোরিয়ামের পেছন থেকে দেখবো নাকি?

রাজীব : এখন আর গিয়ে কি হবে? সীন তো শেষ হয়ে এলো।

নিতাই : হ্যাঁ। সীন শেষ হয়ে এলো।

(নেপথ্যে প্রচুর করতালি)

রাজীব : ঐ ড্রপ পড়লো! (সিগারেটে অন্তিম দুই টান দিয়া ছাইদানে ঘষিতে ঘষিতে) আমি চলি, আমার ওপ্‌নিং।

(দ্রুত প্রস্থান। নিতাই বারান্দার দিকে দুই পা যাইতে না যাইতে অনুর প্রবেশ।)

অনু : (ক্লান্ত) উঃ!

নিতাই : কিছু বুঝলে অনু?

অনু : কী বুঝবো?

নিতাই : পিসীমা?

অনু : পিসীমার দিকে তাকাইনি আমি। শম্ভুদা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছে দেখলাম। আমি চলে এসেছি।

নিতাই : শম্ভু দেখছে তাহলে? তবু ভালো। আর কারো তো সেদিকে নজর নেই।

(নেপথ্যে অনন্তর হাঁক—'বনানী, স্টেজ কল, রাইট উইঙ্গস্‌')

বনানী আবার কোন চুলায় গিয়ে বসে আছে কে জানে?

(শম্ভুর ধীরে ধীরে প্রবেশ। মুখে বিহ্বলভাব।)

শম্ভু : নিতাইদা।

নিতাই : কী, কী কী হয়েছে? তাড়াতাড়ি বল!

শম্ভু : পিসীমা—

নিতাই : পিসীমা কী?

শম্ভু : পিসীমা হাততালি দিচ্ছে। প্রাণপণে হাততালি দিচ্ছে। আর মুখে—

নিতাই : মুখে?

শম্ভু : এক মুখ হাসি!

(বসিয়া পড়িল। নিতাইও। অনুও।)

তৃতীয় দৃশ্য

(একই ঘর। ঘণ্টা দুই পরে। নিতাই টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া সিগারেট টানিতেছে। শম্ভুর প্রবেশ।)

শম্ভু : যাক! আমার স্টেজ ম্যানেজারি ফুরোলো।

নিতাই : লাস্ট সীন চালু হয়ে গেছে?

শম্ভু : এই চালু করে দিয়ে এলাম।

নিতাই : উৎরে গেলো তাহলে?

শম্ভু : থিয়েটার যা উৎরোবার উৎরেছে। হাততালি তো প্রত্যেক সীনে। প্রমীলার জয়জয়কার।

নিতাই : আর তুই কিনা ওর নামে বলেছিলি—দায়িত্বজ্ঞান নেই! (শম্ভু একবার শুধু তাকাইল, কিছু বলিল না) পিসীমা হাততালি দিচ্ছে?

শম্ভু : সমানে। জগৎ অনাথ আমি পালা করে নজর রেখেছি। একটা সীন্ও বাদ যায় নি।

নিতাই : কিছু বুঝতে পারছিস?

শম্ভু : কী করে বুঝবো? একটা গভীর যড়যন্ত্র আছে ওদের পুরো দলটায়। বৌদি নির্ঘাৎ তার পাণ্ডা।

(রাজীবের প্রবেশ)

নিতাই : এ কী, তুমি এখানে কেন?

রাজীব : ভয় নেই, অনন্ত ডাকবে ঠিক সময়ে। সিগারেট দাও একটা শিগ্‌গির।

নিতাই : (সিগারেট দিতে দিতে) বড়ো বেশি রিস্‌ক্ নাও তোমরা।

রাজীব : আর কিছু হবে না নিতাইদা। এখন গড়াতে গড়াতে চলে যাবে। রাজীব যদি ঢুকতে ভুলেও যায়—কেউ খোঁজ করবে না। থিয়েটারের এমনি মজা।

নিতাই : তা বলে ভুলে যেও না বুঝলে!

রাজিব : পাগল! শেষ দৃশ্যের হাততালি ছাড়তে পারি? তার উপর পিসীমা শুদ্ধু হাততালি দিচ্ছে। শশাঙ্ক পর্যন্ত চুটিয়ে পার্ট করেছে! অথচ পিসীমার হাততালির আগে ওর হাঁটুতে তবলার আওয়াজ শুনেছি।

নিতাই : এতো সুখ সইবে? শম্ভু, তোর স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স কী বলে?

শম্ভু : স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স বলে ঝড় আসন্ন।

রাজীব : তোমরা বড়ো পেসিমিস্টিক নিতাইদা।

(অনাথের প্রবেশ)

অনাথ : শম্ভু, তোর বৌদি এই চিঠিটা তোকে দিতে বললেন।

শম্ভু : চিঠি? এ তো প্রোগ্রাম দেখছি?

অনাথ : ওর মধ্যে লেখা আছে।

(শম্ভু পড়িয়া মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিল)

নিতাই : কী রে? কী হোলো?

শম্ভু : (পড়িয়া) 'থিয়েটারের পর কেউ যেন চলে না যায়। সবাই যেন অনুদের ঘরে থাকে। পিসীমা বলেছেন চা খেয়ে যেতে হবে। বৌদি।' (অল্পক্ষণ স্তব্ধতা)

রাজীব : তবে? বলছিলাম না তোমরা পেসিমিস্টিক্?

শম্ভু : নিতাইদা!

নিতাই : কী?

শম্ভু : এই প্রথম—এই প্রথম আমার ভয় করছে। বিশ্বাস করো, সত্যিকারের ভয়। আমি দাঁড়ালে এখন আমার হাঁটুতেও তবলা বাজবে।

রাজীব : রাবিশ্!

শম্ভু : অনাথ দাঁড়া! (খসখস করিয়া প্রোগ্রামের অন্যপিঠে লিখিতে লাগিল)

নিতাই : কী লিখছিস?

শম্ভু : বলছি। (শেষ করিয়া) 'বৌদি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি তুমি একবার এ ঘরে এসো। আর দগ্ধে মেরো না। এক্ষুনি এসো, দোহাই তোমার। শম্ভু।'—এটা বৌদির হাতে দিবি। খবরদার আর কারো হাতে যেন না পড়ে।

অনাথ : সীন চলছে, সামনে দিয়ে যাবো কী করে এখন?

শম্ভু : হামাগুড়ি দিয়ে যা।

(অনাথের প্রস্থান)

রাজীব : যতো বাজে ভয় তোমাদের।

(জগতের প্রবেশ)

জগৎ : (বত্রিশপাটি বিকশিত করিয়া) ভীমাপুকুর নাট্যসংঘ কীর্তি রাখলো নিতাইদা। সীনে সীনে হাততালি, দু'মিনিটে সীন বদল, ঘড়ি ধরে আরম্ভ। তবে ঐ ঠিক সময়ে আরম্ভ করতে গিয়ে অর্ধেক লোক ফার্স্ট সীন দেখতে পেলো না।

শম্ভু : কে তাদের ঠিক সময়ে আসতে বারণ করেছিল?

জগৎ : কী করে বুঝবে ওরা? এর পরের বার দেখো সব আধঘণ্টা আগে এসে বসে থাকবে। এবার কী বই ধরছেন নিতাইদা?

শম্ভু : যা তুই, জ্যাঠামি করিস নি।

জগৎ : জ্যাঠামি কিসের? এ যা হোলো—তিনমাসের মধ্যে দ্বিতীয় অবদান না হলে ম্যান্শন্শুদ্ধু লোক তোমাদের ফ্ল্যাট ছাড়া করবে।

শম্ভু : ফ্ল্যাট আমিই ছাড়বো তার আগে। শোন, তুই সবাইকে বলে রাখ থিয়েটারের পর এই ঘরে আসতে।

জগৎ : এ ঘরে কেন? স্টেজের উপরে বসে জমিয়ে গ্যাঁজানো যাবে। ঘনশ্যামের

দোকানে বলা আছে—ড্রপ পড়লেই চা এসে যাবে।

শম্ভু : ক্যানসেল করে দে। চা এখানে হবে।

জগৎ : এখানে? এখানে তো পিসীমা?

শম্ভু : পিসীমাই চা খাওয়াবে। নেমন্তন্ন করেছে।

জগৎ : অ্যাঁ??

শম্ভু : মুখটা বন্ধ কর—মাছি ঢুকবে।

জগৎ : পিসীমা চা খাওয়াবে! এ করেছো কী শম্ভুদা?

শম্ভু : আমি করেছি!—জগৎ, তিন গুণবো, তার মধ্যে যদি বারান্দা পার না হোস তো কপালে দুঃখ আছে তোর। এক—দুই—

জগৎ : যাচ্ছি যাচ্ছি। ঐ তো তোমার দোষ শম্ভুদা। প্যাঁচগুলো ভালো কষো কিন্তু মাথাটা ঠিক রাখতে পারো না।

শম্ভু : তিন! (জগতের দ্রুত প্রস্থান। হাঁকিতে হাঁকিতে অনন্তর প্রবেশ)

অনন্ত : রাজীব। স্টেজ কল। লেফ্‌ট্‌ উইঙ্‌স্‌। রাজীব।

রাজীব : চলো যাচ্ছি। (রাজীব ও অনন্তর প্রস্থান। নেপথ্যে হাততালি।)

নিতাই : প্রমীলা—আবার।

শম্ভু : হুঁ।

(অনাথের প্রবেশ)

কি বললো? আসছে?

অনাথ : বললেন—বলোগে থিয়েটার ভীষণ জমেছে, শেষ দৃশ্য, এখন যেতে পারবো না।

শম্ভু : থিয়েটার জমেছে! আমরা এদিকে—শোন অনাথ, তোকে আর একবার হামাগুড়ি দিতে হবে। (লিখিয়া) এইটা নিয়ে যা।

অনাথ : আবার গেলে লোকে মাথা ফাঠিয়ে দেবে।

শম্ভু : না গেলে আমি তোর মাথা ফাটাবো।—দোহাই তোর, যা!

(অনাথের প্রস্থান)

নিতাই : কী লিখলি এবার?

শম্ভু : লিখলাম—আমার গোবরপোরা মাথার চোদ্দ কোটি দিব্বি। যে যা ভাষা বোঝে।

নিতাই : ঠিক করেছিস।

(বনানীর প্রবেশ)

বনানী : ও মা—নিতাইবাবু, আপনি এখানে? আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি প্লে দেখছেন ওদিক থেকে।

নিতাই : দেখছিলাম এতোক্ষণ, এইমাত্র এসেছি।

বনানী : কী রকম দেখলেন? কী রকম হচ্ছে আমারটা?

নিতাই : খুব ভালো, কিন্তু আপনার তো আরো আছে?

বনানী : আর একটুখানি—শশাঙ্ক গুলি খাবার পর। জানেন আমার প্রথমে যা নার্ভাস্ লাগছিলো, প্রত্যেকবার থিয়েটারের সময়ে আমার এমনি হয়, কলেজে মানময়ী

গার্লস্ স্কুলে চপলা করবার সময়ে ঠিক এমনি, কিন্তু স্টেজে একবার উঠলেই—কী আশ্চর্য জানেন—সব ঠিক হয়ে যায়। অন্তত মানময়ী গার্লস্ স্কুলের বেলায় তাই হয়েছিল। এবারে কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কী—পুরো প্রথম দৃশ্যটা আমার হাত ঠিক এইরকম ভাবে কাঁপছিলো—আপনি বিশ্বাস করবেন না বললে—

নিতাই : না না, করবো বৈ কি—

বনানী : যা কাণ্ড হোলো থিয়েটারের আগে! আমাকে বনানী করতে হবে, না প্রমীলা করতে হবে কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছি না। উনি বল্লেন—তুমি প্রমীলার পার্টটাও দেখে রাখো ভালো করে, এমার্জেন্সির ব্যাপার, কী হয় না হয় কিছু বলা যায়? আমি বললাম—এ কি মুখের কথা? প্রমীলার পার্ট শক্ত না হোক কতোখানি লম্বা ভেবে দেখেছো, প্রায় প্রত্যেক সীনে আছে! উনি বললেন—তবু একবার তুমি—তারপর যখন শম্ভুবাবু বললেন—না, আপনার স্ত্রী আসবেন—

শম্ভু : মিসেস্ সেন, আপনি কিন্তু লাস্ট সীনটা মিস্ করে যাচ্ছেন!

বনানী : না না, মিস্ করলে চলবে না, এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে—বুঝলেন শম্ভুবাবু, তারপর তবু নিশ্চিন্ত হয়ে বনানীর পার্টে কন্‌সান্‌ট্রেট্ করা গেলো, অবশ্য উনি বলছিলেন—পিসীমার ব্যাপার, কখন কী হয়—পিসীমার কথায় মনে পড়লো—প্রথম দৃশ্যে কেন হাত কেঁপেছিলো জানেন? ঐ পিসীমার চোখে চোখ পড়ে গিয়েছিলো। অথচ কী আশ্চর্য জানেন—উনি প্লে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। আমার কী মনে হয় জানেন, আর্টে একটা গভীর টেস্ট ওঁর ভিতরে লুকিয়েছিলো—

নিতাই : আপনার সময় হয়ে এলো মিসেস সেন। শশাঙ্ক কিন্তু এইবার মরবে—

বনানী : না না, দেরি আছে মরতে। মরবার আগে বহু কথা বলতে হবে ওকে। তাই বলছিলাম, বুঝলেন শম্ভুবাবু—কী বলছিলাম বলুন তো?

শম্ভু : ইয়ে, আর্টের কথা বোধ হয় —

(অনাথ বৌদিকে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল)

বৌদি : কোনো মানে হয় এ রকম করে—

বনানী : এই যে মিসেস্ ব্যানার্জি, কী রকম দেখছেন, ভালো হচ্ছে আমার—মানে আমাদের সকলের—

বৌদি : আপনারটা খুব ভালো হয়েছে।

বনানী : না না, কী বলছেন, আজকাল পারিই না মোটে, কলেজে থাকতে তবু খানিকটা, সে সব কতোদিনের কথা,—আমি করতামই না, তা নিতাইবাবু ধরলেন অনেক করে, আর উনিও বললেন—

অনন্ত : (নেপথ্যে)। বনানী স্টেজ কল, লেফ্‌ট্ উইঙ্গস্, বনানী স্টেজ কল—

নিতাই : ঐ আপনার ডাক পড়েছে, শিগ্‌গির যান!

বনানী : এ কী, এর মধ্যে? হ্যাঁ এই যে যাচ্ছি, আচ্ছা মিসেস ব্যানার্জি, পরে কথা হবে, এখনো শেষ হয় নি বুঝলেন না, লাস্ট সীন পর্যন্ত একেবারে। আর এই দৃশ্যটাই সব চেয়ে শক্ত লাগে আমার—

নিতাই : দেরি করবেন না মিসেস্ সেন—

বনানী : হ্যাঁ এই যে, আচ্ছা মিসেস্ ব্যানার্জি, —নিতাইবাবু, শম্ভুবাবু আপনারা উইঙ্গ্‌সে আসুন না, দেখতে পাবেন বেশ—

শম্ভু : হ্যাঁ এই যাচ্ছি, আপনি এগোন— (প্রায় ঠেলিয়া বনানীকে বাহির করিল)

বৌদি : কী চাই তাড়াতাড়ি বলো। শেষ দৃশ্যটা দেখা হোলো না, কোনো মানে হয়?

শম্ভু : বৌদি, কী ব্যাপার খুলে বলো, দোহাই তোমার, আমরা মরে যাচ্ছি যন্ত্রণায়!

বৌদি : তোমাদের আবার যন্ত্রণা কী? যতো যন্ত্রণা সব তো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছো।

শম্ভু : বৌদি, তাড়াতাড়ি বলো, নয় তো শশাঙ্ক মরবে এখুনি, দেখতে পাবে না—

বৌদি : শশাঙ্ক মরবে? আমি যাই—

শম্ভু : (ফিরাইয়া) বলে যাও বৌদি, আমার চোদ্দ দুগুণে আঠাশ কোটি মাথার—

বৌদি : খুব হয়েছে থামো। কী বলবো?

নিতাই : পিসীমা হাততালি দিচ্ছেন কেন?

বৌদি : দেবেন না, বাঃ! অনু কী রকম করছে দেখেছো? না শুধু এই ঘরে বসে আড্ডা মারছো।

শম্ভু : আঃ বৌদি, আমার আঠাশ দু'গুণে ছাপ্পান্নো কোটি—

বৌদি : চু—প্!

শম্ভু : তা হলে বলো।

বৌদি : কী বলবো?

শম্ভু : পিসীমাকে কী করেছো?

বৌদি : কী আবার করবো? একটা প্রস্তাব দিলাম, পিসীমাও রাজি হলেন—

শম্ভু : প্রস্তাব? কী প্রস্তাব?

বৌদি : সে এখন হবে না, কাল বলবো—আমি যাই!

শম্ভু : বৌদি আমার ছাপ্পান্নো দুগুণে—

বৌদি : এই খবরদার!

শম্ভু : ছাপ্পান্নো দুগুণে—

নিতাই : একশো বারো—

শম্ভু : একশো বারো কোটি মাথার—

বৌদি : বলছি বলছি! প্রস্তাব করেছি অনুর বিয়ের।

নিতাই : অনুর বিয়ে!

শম্ভু : কার সঙ্গে?

বৌদি : তোমার সঙ্গে বোকচন্দ্র—আবার কার সঙ্গে! (নেপথ্যে গুলির আওয়াজ) ও মাগো, ওটা কী?

নিতাই : শশাঙ্ক মরলো—

বৌদি : মরে গেলো? দেখেছো! আমার দেখা হোলো না—

(প্রস্থানোদ্যত)

শম্ভু : (গুলি যেন সেই খাইয়াছে) বৌদি!

বৌদি : না আর না—

শম্ভু : বৌদি, তুমি—আমি—অনু—

বৌদি : হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই সবাই! কিন্তু আমি যাচ্ছি—

শম্ভু : অনু—অনু আমাকে বিয়ে করবে কেন?

বৌদি : সে ও-ই জানে। সুস্থ মাথায় কেউ তোমাকে পছন্দ করে?

শম্ভু : তুমি ভুল করেছো—

বৌদি : (ফিরিয়া) থাক! তুমি অন্তত আর আমাকে শেখাতে এসো না। তোমার কীর্তিটা রাগের মাথায় ছিঁড়ে ফেলেছি, নইলে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা উচিত ছিল তোমাদের বাসরঘরে।

(প্রস্থান। নিতাই সহসা হাসিতে শুরু করিল। অট্টহাস্য।)

শম্ভু : নিতাইদা থামো। থামো বলছি—নইলে তোমাকে খুন করবো আমি—

নিতাই : হা হা হা—বৌদি—হো হো—সাবাস বৌদি—

শম্ভু : নিতাইদা!

নিতাই : হা হা হা—বৌদি জিন্দাবাদ—

(অনন্তর হাঁকিতে হাঁকিতে প্রবেশ)

অনন্ত : ডায়রেক্টর, কার্টেন কল, ডায়রেক্টর, কার্টেন কল—নিতাইদা, ড্রপ পড়বে এখুনি, শিগ্‌গির আসুন!

নিতাই : হো হো হো—চলো—হা হা হা—

(নিতাইয়ের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

অনন্ত : কই শম্ভুদা চলো? কার্টেন কল!

শম্ভু : আমি—অনন্ত, আমি কার্টেন কলে থাকতে পারবো না, তুই নিতাইদাকে বলে দিস।

অনন্ত : তা কি হয় না কি? তুমি ললিত, তার উপর মঞ্চাধ্যক্ষ—

শম্ভু : না না শোন—

(জগৎ ও অনাথের প্রবেশ)

জগৎ : কই শম্ভুদা, তুমি এখনো এখানে?

অনন্ত শম্ভুদা বলছে যাবে না।

জগৎ : যাবে না? মাথা খারাপ না কি?

শম্ভু : আমার যাবার উপায় নেই—

জগৎ : খুব উপায় আছে। হাঁটতে না পারো চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবো। অনাথ! অনন্ত!

(পলায়নোদ্যত শম্ভুকে তিনজনে পিছনের দরজা দিয়া হিঁচড়াইয়া বাহির করিল)

যবনিকা

(যবনিকা পড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিতাই বাহির হইয়া নমস্কার করিল)

নিতাই : **ভীমাপুকুর ম্যান্‌শন্‌স্‌ নাট্যসংঘের উদ্যোগে অভিনীত 'কালবৈশাখী' এইখানেই শেষ হোলো। যাবার আগে আপনাদের কাছে দু'একটি কথা নিবেদন করতে**

চাই। আমাদের এই প্রথম প্রচেষ্টা। যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন। আপনারা হয় তো জানেন—একটা নাটক পরিকল্পনা থেকে মঞ্চ পর্যন্ত টেনে আনতে কতো বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। আমরাও সে সব বাধাবিপত্তি এড়িয়ে যেতে পারি নি। বরং—যাই হোক, আমরা যে এ নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ করতে পেরেছি, সেজন্য যাঁরা এতে অংশ গ্রহণ করেছেন, যাঁরা বাইরে থেকে সাহায্য করেছেন, এবং যাঁরা—অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অন্য যাঁরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন—তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আপনারা সকলে আমাদের যে সাহায্য করেছেন—চাঁদা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, শেষ পর্যন্ত বসে থেকে, এবং—ইয়ে, হাততালি দিয়ে, তার জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(নিতাইয়ের কথা শেষ হইতে পর্দা সরিল। দেখা গেল মঞ্চে অর্ধচন্দ্রের আকারে দাঁড়াইয়া আছে যথাক্রমে স্মারক, ধ্রুবেশ, রাজীব, খোকা-খুকুকে লইয়া বৌদি, অনু, পিসীমা, পিসেমশাই, যোগীন, শশাঙ্ক, বনানী, মিঃ সেন ও অনন্ত। মঞ্চের পিছনের দিকে অনু এবং বৌদি-দের মাঝে খানিকটা ফাঁক। ইহাদের সমবেত অভিবাদনের পর বারান্দার দরজা দিয়া অনাথ ও জগৎ শম্ভুকে টানিয়া সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, এবং অভিবাদন করিয়া জগৎ গেল স্মারকের পাশে, অনাথ অনন্তর পাশে। ইতিমধ্যে নিতাই পিছনে বৌদিদের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। শম্ভু পিছন দিকে পলায়নের চেষ্টা করিবামাত্র নিতাই তাহাকে ধরিয়া নিজের ও অনুর মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিল। অতঃপর সমবেত অভিবাদন ও যবনিকা।)

১৯৫৮

শনিবার

মুখবন্ধ

আমার নাট্যরচনার ইতিহাসে আদিযুগের রচনা এই নাটকটা। কেউ কেউ বলেছেন Thurber রচিত গল্প 'The secret of Walter Mitty' অবলম্বনে এটি রচিত। হলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু হলে আমি স্বীকৃতি দিতাম। সত্যতার খাতিরে বলা দরকার ও গল্পটি আমি তখন পড়ি নি। আসলে দিবাস্বপ্ন একটি পরিচিত ব্যাপার, এ নিয়ে একাধিক রচনা বিচিত্র কিছু নয়।

বাদল সরকার

শনিবার

ভূমিকালিপি
(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

নবু	দিব্যেন্দুর ছোট ভাই
মা	দিব্যেন্দুর মা
বাবা	দিব্যেন্দুর বাবা
সুনন্দা	দিব্যেন্দুর ছোট বোন
দিব্যেন্দু	কেরানি
পরিতোষ	কেরানি
বিশু	টাইপিস্ট
বাসু	দিব্যেন্দুদের অধিকর্তা
বেয়ারা	অফিসের
সাগরিকা	সুনন্দার বান্ধবী

(ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে একটি লিখিবার টেবিল ও চেয়ার। একপাশে আর একটি চেয়ার। অন্যপাশে অল্প দূরে একটি ছোট চৌকা টেবিল এবং একটি চেয়ার। কোনও টেবিলেই আচ্ছাদন নেই। পিছনে একটি ছোট শেল্‌ফ্—তাহার নিচের তাকে জুতা এবং অন্যান্য তাকে হরেক রকম বস্তু। পিছনে একপাশ ঘেঁসিয়া একটি দরজা। তাহাতে পর্দা ঝুলিতেছে। আসবাব পুরাতন ও সাধারণ। সব মিলাইয়া একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাহিরের ঘর, যাহা অন্দরের নানাবিধ কাজেও লাগাইতে হয়।

পর্দা সরিবার কয়েক সেকেন্ড পরে খেলোয়াড়ের পোশাকে নবেন্দু ভিতরের দিক হইতে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে মায়ের ডাক আসিতে লাগিল।)

মা : (নেপথ্যে) নবু! ও নবু! চলে গেলি নাকি?

(নবেন্দু কর্ণপাত না করিয়া তাক হইতে এক জোড়া খেলোয়াড়ি জুতা তুলিয়া লইল। মা প্রবেশ করিলেন এক গ্লাস দুধ হাতে। নবেন্দু ধাক্কা বাঁচাইয়া আবার ছুটিয়া ভিতরে গেল।)

মা : ও নবু!

(পিছন পিছন মা ভিতরে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবেন্দু জুতা ও একটি হকি স্টিক হাতে প্রবেশ করিল। পিছনে স-গ্লাস মা।)

মা : নবু জ্বালাসনে বাবা। দুধটা খেয়ে যা। খালি পেটে এতো দৌড়ঝাঁপ চলে?

নবেন্দু : (জুতা পরিতে পরিতে) খালি পেট কোথায়? এই তো একপেট হালুয়া গেলালে?

মা : ও মা, সে কতোটুকু? দুধটা খেয়ে নে। দুধ না খেলে শরীর থাকে কখনো?

নবেন্দু : দুধ খাবো? ইন্ডিয়া এবার অলিম্পিকে হেরে গেছে খবর রাখো?

মা : তা কে কোথায় হেরে গেলো, তা বলে তুই দুধ খাবি নে?

নবেন্দু : আরে হারলো তো ঐ দুধ খেয়ে! ভুঁড়ি নিয়ে কি হকি খেলা হয়?

(স্টিক লইয়া নবেন্দু বাহির হইয়া গেল। ভিতর হইতে বাবার প্রবেশ। পরিধানে বাহিরের পোশাক।)

মা : তুমি আবার এই অসময়ে চললে কোথায়?

বাবা : অসময় হবে কেন?

মা : অসময় নয়? বেলা দুটো অসময় নয়?

বাবা : আহা, শনিবার—

মা : শনিবার তো তোমার কী? দেড় বছর হোলো রিটায়ার করেছো, এখনো শনি রবি জ্ঞানটা টনটনে রেখেছো!

বাবা : গণেশ মিত্তির তো রিটায়ার করেনি এখনো? গণেশ বলেছিলো শনিবার যেতে। ওর মেয়ের এক সম্বন্ধ এসেছে, তার দু'টো শলা পরামর্শ—

মা : সে জানি! জমির মামলা, মেয়ের বিয়ে—সব পরামর্শ তোমাদের হয় দাবার ছক পেতে। ফেরা হবে কখন?

বাবা : এই তো—ধরো ঘণ্টা খানেক—

মা : তোমার ঘণ্টাখানেক চিনি আমি। এই দুধটা খেয়ে নাও দেখি দয়া করে?

বাবা : সে কী? এই তো ভাত খেয়ে উঠলাম!

মা : ভাত খেয়েছো দু'ঘণ্টা আগে। কতো রাত্তির অবধি দাবার আড্ডা চলবে তার ঠিক আছে?

বাবা : আরে বলছি যতো দাবা নয়—

মা : আচ্ছা দাবা হোক না হোক আমি কিছু বলেছি? আমি শুধু বলছি দুধটুকু খেয়ে উদ্ধার করে দিয়ে তারপর যেখানে ইচ্ছে যাও।

(সুনন্দার বাহির হইতে প্রবেশ। বাবা নিরুপায় হইয়া দুধ লইতে হাত বাড়াইয়াছিলেন। সুযোগ পাইয়া হাত পিছাইয়া লইলেন।)

কী রে, তোর কলেজ এতোক্ষণে শেষ হোলো?

সুনন্দা : (টেবিলে বই আছড়াইয়া) কলেজ হয়ে গেছে কখ—ন। সাগরিকা টেনে নিয়ে গেলো ওদের বাড়ি।

মা : যা কাপড় ছাড়। আমি গিয়ে খাবার দিচ্ছি।

সুনন্দা : খাবো না মা কিছু। সাগরিকাদের বাড়ি চা খেয়েছি। তাছাড়া এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে।

(বাবা নিঃশব্দে হাঁটিতেছিলেন। এতোক্ষণে বাহির হইয়া গেলেন।)

মা : এই তো এলি, আবার এক্ষুনি কোথায় যাবি?

সুনন্দা : সিনেমায় যাবো মা। সাগরিকা গাড়ি নিয়ে আসবে আধ ঘণ্টার মধ্যে।

মা : এই তো গত শনিবার সিনেমা দেখলি। আবার এর মধ্যে?

সুনন্দা : কী করবো? ও আমাকে না জিজ্ঞেস করেই টিকিট কেটে রেখেছে। নইলে এটা দেখবার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। বিশ্বজিৎটাকে দু'চোক্ষে দেখতে পারি না আমি।

মা : বিশ্বজিৎ আবার কে? বললি যে সাগরিকার সঙ্গে যাবি?

সুনন্দা : (হাসিয়া) বিশ্বজিৎ ফিল্মস্টার মা। তার 'সঙ্গে' যাচ্ছি না, তাকে দেখতে যাচ্ছি।

(সুনন্দা ভিতরে গেল।)

মা : কই তুমি—এ কী, চলে গেলো? দেখেছো!

(সুনন্দা বই লইতে ফিরিল।)

এই, তোর তো ফিরতে অনেক রাত হবে।

সুনন্দা : বাঃ, অনেক রাত কোথায়? ছ'টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবো।

মা : ছ'টা অবধি উপোস করে থাকবি নাকি? খেয়ে যাবি।

সুনন্দা : বললাম না খেয়েছি? চা, কেক, সন্দেশ—

মা : আচ্ছা, তাহলে এই দুধটুকু খেয়ে নে শুধু।

সুনন্দা : দুধ!! আমি দুধ খাই কোনোদিন?

মা : এ—কটুখানি আছে। নবু খেলো না, তোর বাবা খেলো না, কী করবো এটা নিয়ে বল্?

সুনন্দা : বড়দা এলে দিও।

মা : সে আপিস থেকে কখন ছাড়া পায় তার ঠিক আছে?

সুনন্দা : তবে তুমি খেয়ে নাও।

(সুনন্দা ভিতরে চলিয়া গেল।)

মা : শোনো মেয়ের কথা! আমি দুধ খাবো! ও সুনী! শোন্—লক্ষ্মী মেয়ে—

(মা ভিতরে গেলেন। অল্প পরে দিব্যেন্দু ও পরিতোষ বাহির হইতে প্রবেশ করিল। দিব্যেন্দুর হাতে পেটমোটা অফিস ব্যাগ। বয়স ত্রিশ ছাড়াইয়াছে কয়েক বছর আগে। অতি সাধারণ অফিস-চাকুরে চেহারা। মুখে সব সময়েই কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত ভাব। পরিতোষ সমবয়সী।)

দিব্যেন্দু : বোসো, বোসো।

পরিতোষ : বসা সেফ্ নয় ভাই। দু'টো বেজে গেছে।

দিব্যেন্দু : তাতে হয়েছে কী? শনিবার তো।

পরিতোষ : কী হয়েছে তুমি বুঝবে কোত্থেকে? দিন এলে বুঝবে।

দিব্যেন্দু : (হাসিয়া) আমার দিন আসবে না।

পরিতোষ : ও কথা আমিও বলতুম। বেশি দিন নয়—দু'বছর আগেও বলেছি। (বসিয়া পড়িল) যাক গে, কী বলছিলে বলো।

দিব্যেন্দু : বলছি। একটু চা খাবে তো?

পরিতোষ : (শঙ্কিত হইয়া) চা মানে—মাসীমা তো? না ভাই, থাক। গতবার মাসীমার 'চা' খেয়ে রাত্তির অবধি ভালো করে খেতে পারি নি বাড়িতে। তাই নিয়ে অনেক পারিবারিক হেনস্থা গেছে। তাছাড়া সময়ও নেই। তুমি বলো—বাসু সাহেব কী বললো।

দিব্যেন্দু : ওর যা চিরকেলে কায়দা। বললো—আপনার বাড়িতে কাজ আছে—আই কোয়াইট্ অ্যাপ্রিসিয়েট্। কিন্তু এই টেন্ডারটি সোমবার এগারোটার মধ্যে দাখিল না হলে বিশ লাখ টাকার কনট্র্যাক্ট মিস্ হয়ে যাবে। সেটা আপনার আমার দু'জনেরই ইন্টারেস্টকে হিট করবে।

পরিতোষ : অর্থাৎ সিধে ভাষায়—করবে তো করো, নয় তো রাস্তা দেখতে হবে।

দিব্যেন্দু : যা বলেছো।

পরিতোষ : তা এতো জরুরি টেন্ডার লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত পড়ে থাকে কেন?

দিব্যেন্দু : অই! সে কথা শুনছে কে? এস্টিমেটিং সেকশনে তিন মাস পড়ে থাকবে, আর আমাদের বেলা—ফাইল নিয়ে বাড়ি যাও, রোববার অফিসে এসো—যতো সমস্ত! আর কাজ কি সোজা! দেখবে? (ব্যাগ খুলিয়া এক তাড়া কাগজ বাহির করিল) এই—এই—এই—এই—এই এতোগুলো কম্পুটেশন্ রাত জেগে চেক করো, করে রোববার এগারোটার মধ্যে অফিসে ছোটো নাকে মুখে গুঁজে। আর বোনাসের বেলা, প্রমোশনের বেলা (ভ্যাংচাইয়া) ডায়রেক্টরস্ আর সিরীয়াস্‌লী কনসিডারিং, বাট ইউ সী—ব্যস্ হয়ে গেলো!

পরিতোষ : তুমি বেশি কাজ করো বলেই তোমার ঘাড়ে চাপে বেশি।

(মায়ের প্রবেশ)

মা : ও মা, দিবু কখন এলি? কে, পরিতোষ? তা দিবুর আক্কেল কী? আপিস্ থেকে এলি, ডাকবি তো আমাকে?

দিব্যেন্দু : পরিতোষ বললো চা খাবে না।

মা : চা ছাড়া আর কিছু খাবার জিনিস কি নেই ভূভারতে? পরিতোষ, বোসো বাবা, আমি আসছি।

পরিতোষ : (শশব্যস্তে) না না, মাসীমা, আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে!

মা : ও মা, সে কী?

পরিতোষ : হ্যাঁ মাসীমা, বাড়িতে ভীষণ জরুরি কাজ। দিব্যেন্দু চলি ভাই। আসি মাসীমা।

(পরিতোষের প্রস্থান)

মা : আপিস্ থেকে এসে কিছু মুখে না দিয়ে চলে গেলো। তোর খাবার আনি?

দিব্যেন্দু : (জামা খুলিতে খুলিতে) কী খাবার?

মা: লুচি ভেজে দি গোটা কয়েক? আর—

দিব্যেন্দু : লুচি? না থাক! ক্ষিদে পায় নি। অফিসে খেয়েছি কিছু।

মা : তবে একটু দুধ খাবি বাবা?

দিব্যেন্দু : দুধ?

মা : সামান্য একটু। খা না?

দিব্যেন্দু : আচ্ছা নিয়ে এসো।

মা : (খুশি হইয়া) আমি গরম করে আনি, তুই হাত মুখ ধো।

(মায়ের প্রস্থান)

দিব্যেন্দু : হাত মুখ ধোয়া! (কাগজের তাড়া টেবিলে পাতিয়া বসিল) পড়ো নি তো বাসু সাহেবের পাল্লায়—মনের আনন্দে শুধু হাত মুখ ধুয়ে যাচ্ছো!

(দিব্যেন্দু কাজ আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ। কোথা হইতে তবলার বাদ্য ভাসিয়া আসিল। প্রথমে মৃদুস্বরে, ধীর লয়ে। পরে স্পষ্ট এবং ক্রমে দ্রুত হইয়া উঠিতে লাগিল। দিব্যেন্দু চেয়ারে এলাইয়া বসিল। ঘরের আলো কমিয়া আসিতেছে। পরিতোষ আসিয়া দিব্যেন্দুর টেবিলের পাশের চেয়ারটিতে বসিল। বিশু ছোট টেবিলটায় একটা টাইপরাইটার পাতিয়া বসিল। একটি উর্দি পরা বেয়ারা পিছনের দরজার পর্দা সরাইয়া দিয়া পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া গেল। দেখা গেল পর্দার পিছনে স্প্রিঙের হাফ্ ডোর। প্রত্যেকের গতিবিধি যন্ত্রের মতো এবং নিঃশব্দে। সহসা তবলা থামিয়ে গেল। ঘরে নীলাভ আলো। দিব্যেন্দু, পরিতোষ ও বিশু যেন প্রাণ পাইয়া কাজ শুরু করিল। তবলার বদলে টাইপরাইটারের দ্রুতধ্বনি চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে বিশু টাইপ করা থামাইয়া ইংরাজি পত্রিকা ও পেন্সিল লইয়া মাথা গামাইতে শুরু করিল।)

বিশু : পরিতোষদা।

পরিতোষ : উঁ?

বিশু : Dogs love to chase this animal—ক্যাট্ হবে না র‍্যাট্ হবে, বলতে পারো?

পরিতোষ : (ভাবিয়া) র‍্যাট বলেই তো মনে হচ্ছে। ক্যাট এক একটা এমন থাকে—ডগ্‌কেই তাড়া করে।

বিশু : র‍্যাট বলছো? (ভাবিয়া) র‍্যাটই হবে।

পরিতোষ : ওটা কোন্‌টা হে বিশু?

বিশু : উইক্‌লী সার্চলাইট। Twentyfive thousand must be won. ফার্স্ট প্রাইজ ষোলো হাজার। রানার্স আপ ন'হাজার।

(ঘণ্টা বাজিল। বেয়ারা হাফ ডোর ঠেলিয়া ভিতরে গেল। বিশু পত্রিকা লুকাইয়া সবেগে টাইপ করিতে লাগিল। বেয়ারা আসিয়া পরিতোষকে ফাইল দিয়া যথাস্থানে বসিল।)

পরিতোষ : প্লীজ্ রিপ্লাই। দিস্ ইজ্ আর্জেন্ট। আর পারা যায় না বাবা।

বিশু : আর্জেন্ট মানে তো পরশু?

পরিতোষ : আর্জেন্ট মানে এক সপ্তা। কতোবার শেখাবো তোমাকে? পরশু হোলো—রিপ্লাই ইমিডিয়েটলী।

বিশু : (অল্প পরে) আচ্ছা, a bad ড্যাশ্ can spoil your evening —বুক হবে না কুক হবে?

পরিতোষ : বুক হবে। কুক্ রাখবার পয়সা আছে ক'জনের?

বিশু : উঁহু। এটায় গোলমাল আছে। দিব্যেন্দুদা কী বলো?

দিব্যেন্দু : উঁ?

বিশু : বুক্ না কুক?

দিব্যেন্দু : কে কুক?

বিশু : A bad ড্যাশ can spoil your evening, বুক না কুক?

দিব্যেন্দু : পরে বলবো ভাই, এই এস্টিমেটটা নইলে— (কাজে ডুবিয়া গেল)

বিশু : কী হবে অতো খেটে দিব্যেন্দুদা? কোম্পানি রাজা করে দেবে?

পরিতোষ : কেন জ্বালাচ্ছো ওকে বিশু? ও যদি কাজ করে আনন্দ পায়—তোমার কী বাপু? (সহসা বাসু সাহেব প্রবেশ করিলেন। বেয়ারা লাফাইয়া উঠিল। বিশু ও পরিতোষ উর্ধ্বশ্বাসে কাজ করিতে লাগিল। দিব্যেন্দু পূর্ববৎ।)

বাসু : (দিব্যেন্দুর কাছে আসিয়া) চৌধুরী।

দিব্যেন্দু : (কোনও ব্যস্ততা না দেখাইয়া) ইয়েস্ স্যার?

বাসু : ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের টেন্ডারটা করছেন?

দিব্যেন্দু : না।

বাসু . সে কী? অপানাকে বললাম না—দ্যাট্স্ এক্সট্রিমলী আর্জেন্ট?

দিব্যেন্দু : হ্যাঁ, বলেছিলেন।

বাসু : তবে? তবে করছেন না কেন?

দিব্যেন্দু : ওটা হয়ে গেছে বলে।

বাসু : হয়ে গেছে? আমি তো পাই নি?

দিব্যেন্দু : আপনার টেবিলেই আছে নিশ্চয়। ভালো করে খুঁজলে পাবেন।

বাসু : কান্ট বি! ইম্পসিব্ল!

(প্রস্থান)

পরিতোষ : করছো কী হে?

দিব্যেন্দু : কী আবার করবো? যা জানতে চেয়েছে বলেছি।

বিশু : ভুল হয়ে থাকলে সায়েব যে কাঁচা চিবিয়ে খাবে!

দিব্যেন্দু : ভুল আমি করি না।

(বাসু ফাইল হাতে প্রবেশ করিলেন)

বাসু : ইয়েস্ ইয়েস্, হিয়ার ইট্ ইজ্। (বেয়ারাকে ধমকাইয়া) কোথায় কোন্ ফাইল রাখতে হয় এখনো শেখো নি?

বেয়ারা : সাব্, হামি তো—

বাসু : শাট্ আপ! (দিব্যেন্দুকে) আপনি তাহলে এখন কোন্‌টা করছেন?

দিব্যেন্দু : ইস্টার্ন রেলওয়েরটা।

বাসু : ওটা তো অনেক সময় আছে এখনো। আপনি বরং পাবলিক হেলথেরটা ধরুন আগে।

দিব্যেন্দু : সেটা করে দিয়েছি। এস্টিমেটিং সেকশন থেকে নিয়ে গেছে একবার—কী সব ওমিশন্ আছে দেখবে।

বাসু : (স্তম্ভিত) আই সী। রেলওয়েরটা কতোটা হয়েছে?

দিব্যেন্দু : কালকের মধ্যে হয়ে যাবে।

বাসু : কালকের মধ্যে? আর ইউ শিওর?

দিব্যেন্দু : হ্যাঁ স্যার।

বাসু : (মুহ্যমান) দ্যাট্‌স ফাইন্। থ্যাঙ্ক ইউ।

(প্রস্থান)

পরিতোষ : এ করেছো কী হে দিব্যেন্দু?

(ঘণ্টা বাজিতে বেয়ারা ভিতরে গেল। পরবর্তী কথাবার্তার মধ্যে এক গ্লাস জল আনিয়া বাসু সাহেবের ঘরে দিয়া আবার যথাস্থানে আসিয়া বসিল।)

দিব্যেন্দু : কী করেছি?

পরিতোষ : কখন করলে এতো সব?

দিব্যেন্দু : নিয়ে বসলে কতোক্ষণ আর লাগে?

বিশু : কিন্তু করে লাভ কী দিব্যেন্দুদা? যতো খাটবে, ততো খাটাবে। পয়সার বেলা—এই! (একজোড়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল)

দিব্যেন্দু : ও সব জানি না। কাজ করে যাই—হবার হলে একদিন হবেই।

বিশু : হবে মরলে। তার চেয়ে ক্রস্‌ওয়ার্ড করো—একেবারে ষোলো হাজার।

পরিতোষ : ওটার লাস্ট ডেট কবে হে?

বিশু : এখনো সাতদিন আছে। করবে? এক টাকায় দু'টো এন্ট্রি। দু'টাকায় পাঁচটা। দু'জনে মিলে পাঁচটা পাঠিয়ে দিই, পেয়ে গেলে হাফ এ্যান্ড হাফ্। কী বলো? পাঁচটা পাঠালে শিওর হিট্। কুক্, বুক—দু'টোই দিয়ে দেবো।

পরিতোষ : দিব্যেন্দু, করবে না কি একটা?

দিব্যেন্দু : কী? ক্রসওয়ার্ড? নাঃ আমার লাক্ ভালো না।

বিশু : লাকের কী আছে এতে? এ তো যুক্তির ব্যাপার। ভেবেচিন্তে যদি করো—ঠিক হতে বাধ্য!

দিব্যেন্দু : তোমার ক'বার ঠিক হয়েছে?

বিশু : দু'একটা বেটারা ইচ্ছে করে আনরিজনেবল আন্‌সার রাখে। তাও এবার ওদের কায়দাগুলো ধরে ফেলেছি। পাঁচটা এন্ট্রিতে রানার্স আপটা লাগবেই। ন'হাজার কম নয় দাদা! ল্যাম্‌ব্রেটা স্কুটার একটা কিনে সিধে চলে যাবো ধানবাদে দিদির

বাড়ি। ঘর্ র্ র্! পিপ!

(স্কুটার চালাইবার ভঙ্গী করিল। সহসা বাসু সাহেব প্রবেশ করায় আবার টাইপরাইটার চলিতে লাগিল।)

বাসু : চৌধুরী।

দিব্যেন্দু : ইয়েস স্যার?

বাসু : মিস্টার টমলিন্‌সন্ ট্রাঙ্ক কল করছিলেন হেড অফিস থেকে। কানপুর ব্র্যাঞ্চের নায়ার বদলি হয়ে যাচ্ছে, অফিসিয়েট করতে এখনকার একজনকে চায়। আমি আপনার নাম রেকমেন্ড করে দিলাম। এখন ছ'মাস—পরে ফাইন্যাল সিলেক্‌শনের সময়—you stand a fair chance.

দিব্যেন্দু : থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এতোটা আমি আশা করতে পারি নি।

বাসু : প্লীজ ডোন্ট্ মেন্‌শন্। কাজ নিয়ে কথা, ওরা কাজের লোক চায়।

(বাসুর প্রস্থান। পরিতোষ ও বিশু দিব্যেন্দুকে ঘিরিয়া ফেলিল। বেয়ারাও।)

পরিতোষ : কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্ দিব্যেন্দু! একেবারে তিন ধাপ টপকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডায়রেক্টর?

বিশু : ছপ্পড় ফুঁড়কে একেই বলে দাদা। সন্দেশ দাদা, সন্দেশ চাই।

বেয়ারা : হাঁ বাবু, মিঠাই খিলাতে হোবে। বোলেন তো লিয়ে আসি লঞ্চ্ টাইমে।

দিব্যেন্দু : আরে সবুর—এ তো শুধু ছ'মাস—

বিশু : কিসের ছ'মাস? ছপ্পড় একবার ফুঁড়েছে, এখন বারোমাস ঝন্ ঝন্ আওয়াজে কানে তালা ধরে যাবে। ক্রসওয়ার্ডটাও এই তালে লাগিয়ে দাও দিব্যেন্দুদা।

(ঘন্টা বাজিল। বেয়ারা ছুটিল। বিশু আবার ক্রস্ ওয়ার্ডে মন দিতে গিয়া কী ভাবিয়া পত্রিকাটি রাখিয়া দিল। তারপর একতাড়া চিঠি সাজাইয়া নিষ্ঠার সহিত টাইপ করিতে লাগিল। পরিতোষেরও কাজে অতিরিক্ত মনোযোগ দেখা গেল। তবলার বাজনা আবার ভাসিয়া আসিল। দিব্যেন্দু এলাইয়া বসিল। বেয়ারা, পরিতোষ ও বিশু টাইপরাইটার লইয়া ছায়ার মতো সরিয়া গেল। তবলা থামিয়া আলো আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিল। সুনন্দার প্রবেশ। সাজিয়াছে, কিন্তু এখনো প্রসাধন কিছু বাকি।)

সুনন্দা : বড়দা! (সাড়া নাই) ও বড়দা!

দিব্যেন্দু : (ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া) অ্যাঁ? কে? কী?

সুনন্দা : আবার তুমি জেগে জেগে ঘুমোচ্ছো?

দিব্যেন্দু : ফাজলামি করিস না। ঘুমোবে! চাকরি তো করো না! (সুনন্দার সাজ লক্ষ্য করিয়া) যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

সুনন্দা : সিনেমায়। তুমি এখন এ ঘরে থাকবে?

দিব্যেন্দু : কেন?

সুনন্দা : সাগরিকা এলে ডেকে দিও আমায়।

দিব্যেন্দু : কে সাগরিকা?

সুনন্দা : আহা, চেনো না যেন!

দিব্যেন্দু : ঐ যে চালিয়াৎ মেয়েটা মোটরে চড়ে ঘোরে?

সুনন্দা : চালিয়াৎ মোটেই নয়। বরং ঠিক উল্টো। অতো বড়োলোক, অতো সুন্দর দেখতে—তবু একফোঁটা অহঙ্কার নেই।

দিব্যেন্দু : কে সুন্দর দেখতে? সাগরিকা? চশমা নে।

সুনন্দা : আচ্ছা, আচ্ছা। তোমার বৌ ওর চেয়ে সুন্দর হয় কি না দেখবো।

দিব্যেন্দু : (রাগিয়া) বেশি ইয়ার্কি কোরো না, বুঝলে? মা আবদার দিয়ে দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়েছে!

সুনন্দা : খেয়েছেই তো। বাকিটা খেয়েছো তুমি। এলেই ডেকে দিও, গল্প করতে বোসো না আবার।

(দিব্যেন্দু কিছু বলিবার পূর্বেই সুনন্দা চলিয়া গেল।)

দিব্যেন্দু : ফাজিল।

(দিব্যেন্দু কাজে মন দিল। তারপর সচকিত হইয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া ছাড়া জামাটা পরিয়া ফেলিল। অল্প ইতস্তত করিয়া শেলফের উপর হইতে আয়না লইয়া মুখটাও দেখিল। সন্তোষজনক কিছু চোখে পড়িল না। চিরুনির সাহায্যে খানিকটা মার্জিতভাব আনিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছে—মা প্রবেশ করিলেন দুধের গ্লাস হাতে।)

মা : কী রে, আবার বেরোচ্ছিস না কি?

দিব্যেন্দু : (চমকাইয়া আয়না চিরুনি রাখিয়া) না না, কোথায় বেরুবো?

মা : তবে জামা পরলি যে?

দিব্যেন্দু : জামা? এই একটু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল, তাই পরে ফেললাম।

মা : ঠাণ্ডা? জ্বরটর হয় নি তো? (কাছে আসিয়া কপালে হাত দিয়া দেখিলেন)

দিব্যেন্দু : (মাথা সরাইয়া) জ্বর কেন হতে যাবে? জ্বর হবার ফুরসৎ আছে?

মা : ও মা, জ্বর কি ফুরসৎ বুঝে আসে? গা তো ঠাণ্ডা। যাক্‌গে দুধটা খেয়ে ফেল গরম গরম।

দিব্যেন্দু : কিসের দুধ?

মা : কিসের আবার? গরুর দুধ!

দিব্যেন্দু : তা আমাকে কেন?

মা : বললি যে খাবি?

দিব্যেন্দু : বলেছি না কি? আচ্ছা রাখো।

মা : (টেবিলে দুধ রাখিয়া) ফেলে রাখিস নি, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। লুচি ভেজে দেবো দু'টো?

দিব্যেন্দু : না না, বললাম তো খাবো না।

মা : গরম গরম দু'টো খেলে সর্দিটা টেনে যেতো।

দিব্যেন্দু : সর্দি হয়নি তো টানবে কী?

মা : হয় নি, হতে কতোক্ষণ? শীত করছে বলছিস।

দিব্যেন্দু : উঃ! (জামা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল)

মা : না না, জামা খুলিস নি, জামা খুলিস নি! থাক্‌ তোর লুচি খেয়ে কাজ নেই। দুধটা খেয়ে নে।

(মায়ের প্রস্থান। দিব্যেন্দু জামাটা ঠিকভাবে পরিল। এদিক এদিক চাহিয়া চুলটাও আঁচড়াইয়া ফেলিল। তারপর গুছাইয়া কাজ করিতে শুরু করিল। কিন্তু করিলে কী হইবে? সেই তবলা, সেই আলোর কারসাজি। সাগরিকা প্রবেশ করিল। পরিধানে

স্বপ্নের সাজ, চলাফেরায় স্বপ্নের ছন্দ, কথায় স্বপ্নের সুর; এমন কি দিব্যেন্দুর কথাতেও।)

দিব্যেন্দু : কে?

সাগরিকা : আমি সাগরিকা। সুনন্দা কোথায়?

দিব্যেন্দু : সুনন্দা কাপড় পরছে। আপনাকে বসতে বলে গেছে। না কি ভিতরে গিয়ে বসবেন?

সাগরিকা : না, এখানেই ভালো। (বসিয়া) আপনার কাজে অসুবিধে করলাম না তো?

দিব্যেন্দু : কাজ? না না, কোনো কাজ নেই।

সাগরিকা : নেই? এই যে দেখলাম কী সব কাজ করছেন কাগজপত্র নিয়ে?

দিব্যেন্দু : দেখেছেন? তবে বলি—কাজটা এখন বন্ধ থক। অসুবিধেটাই হোক।

সাগরিকা : (কলহাস্যে) কাজ বন্ধ থাকলে যে পেট ভরে না?

দিব্যেন্দু : মন তো ভরে।

সাগরিকা : আপনার মন বুঝি শুধু অসুবিধেতেই ভরে?

দিব্যেন্দু : না। আসলে আমরা মন কাজেই ভরে। তবে কাজটা সেইরকম হওয়া চাই।

সাগরিকা : কী রকম কাজ?

দিব্যেন্দু : এই ধরুন, আপনার সঙ্গে কথা বলছি—এই রকম।

সাগরিকা : তাই না কি? আমি তো রোজই এসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

দিব্যেন্দু : পারেন, কিন্তু আসেন না।

সাগরিকা : আচ্ছা, এবার থেকে আসবো। কিন্তু একটা শর্তে।

দিব্যেন্দু : কী শর্ত।

সাগরিকা : আমাকে 'আপনি' বলতে পারবেন না। 'তুমি' বলতে হবে।

দিব্যেন্দু : 'তুমি' বলতে ভয় করে।

সাগরিকা : কিসের ভয়?

দিব্যেন্দু : পুরীতে সমুদ্র দেখেছেন?

সাগরিকা : দেখেছি।

দিব্যেন্দু : আমার চোখ নিয়ে দেখেননি। দেখলে বুঝতেন—কেন তুমি বলতে ভয় করে।

সাগরিকা : আপনি কী দেখেছেন?

দিব্যেন্দু : নীল অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ছুটে আসে যে ঢেউ—তাতে অপরিচয়ের রহস্য. সে 'আপনি'। তীরে এসে সাদা ফেনায় ভেঙে পড়ে যে প্রকাশ তাতে রহস্য নেই, কিন্তু দীপ্তি আছে, সান্নিধ্য আছে। সে 'তুমি'।

সাগরিকা : আপনি নিশ্চয়ই কবিতা লেখেন।

দিব্যেন্দু : কবিতা লিখি না, কবিতা ভাবি।

সাগরিকা : কী রকম?

দিব্যেন্দু : মনের মধ্যে কবিতা জমে ওঠে মেঘের মতো। যদি আঘাত পায়, ঘন বর্ষার ধারায় নেমে আসে।

সাগরিকা : কী রকম আঘাত?

দিব্যেন্দু : আপনাকে 'তুমি' বলতে পারার মতো আঘাত।

সাগরিকা : তবে তাই বলুন। আপনার কাব্যধারার একটু ভাগ আমাদের দিন।

দিব্যেন্দু : 'তুমি' বলবো? তবে শোনো—নীল স্বপ্ন চূর্ণ ক'রে উর্মি কালোচ্ছ্বাস / শুভ্রতার জাগরণে দীপ্ত করে তোমার প্রকাশ / নিঃস্ব আমি তটে বসে ভিক্ষা মাগি প্রসাদকণিকা / —অয়ি সাগরিকা।

(সাগরিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। দিব্যেন্দু এক পা অগ্রসর হইল। দু'জনে মুখোমুখি। সাগরিকা চোখ ফিরাইয়া লইল।)

সাগরিকা : আমাকে যেতে হবে।

দিব্যেন্দু : কোথায়?

সাগরিকা : সুনন্দার সঙ্গে সিনেমায়।

দিব্যেন্দু : জানি।

সাগরিকা : সিনেমায় যেতে আর একটুও ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে— (থামিল)

দ্যিবেন্দু : তার চেয়ে?

সাগরিাক : ইচ্ছে করছে ইডেন গার্ডেনে ঘাসের উপর বসে কবিতা শুনি।

দিব্যেন্দু : আজ আর তা কী করে হবে?

সাগরিকা : জানি হবে না। আজকের সন্ধেটা মিথ্যেই হয়ে যাবে।

(সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা সাগরিকা, এসেছিস?

সাগরিকা : হ্যাঁ। চল্ যাই।

সুনন্দা : ভাই, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবি নে?

সাগরিকা : কী?

সুনন্দা : আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আমি আজ সিনেমায় যেতে পারছি না। আজ তোকে একাই যেতে হবে।

সাগরিকা : একা? সিনেমায়? না ভাই, তার চেয়ে আমি বাড়ি ফিরি।

সুনন্দা : না না, তাহলে ভীষণ বিচ্ছিরি লাগবে আমার। আচ্ছা দাঁড়া, বড়দা ভাই, লক্ষ্মীটি, তুমি যদি যাও আমার বদলে!

দিব্যেন্দু : বাঃ? আমার কাজ?

সুনন্দা : আমি রাত জেগে বসে তোমায় সাহায্য করবো। লক্ষ্মীটি বড়দা।

সাগরিকা : আচ্ছা—ওঁকে কেন আবার বিরক্ত করা?

সুনন্দা : কিসের বিরক্ত? আমার বড়দা বড়ো ভালো বড়দা—সব কথা শোনে। যাও আর দেরি কোরো না, আমি মাকে বলে রাখছি।

(সুনন্দার প্রস্থান। পরস্পরের দিকে তাকাইয়া উভয়ে হাসিল।)

সাগরিকা : আমি গাড়িতে রইলাম। তুমি এসো।

(সাগরিকা যেন ভাসিয়া চলিয়া গেল। দিব্যেন্দু চেয়ার ফিরিয়া স্বপ্নময় চোখে কাগজ গুছাইতে লাগিল।)

দিব্যেন্দু : তুমি এসো!

(তবলা আবার বাজিয়া থামিল। আলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিল। সুনন্দার প্রবেশ।)

সুনন্দা : বড়দা, সাগরিকা এসেছে? হর্ন শুনলাম যেন?

দিব্যেন্দু : (স্বপ্নের ঘোর) এসেছিলো।

সুনন্দা : এসেছিলো? কোথায় গেলো?
দিব্যেন্দু : (চমকাইয়া) কে কোথায় গেলো?
সুনন্দা : কে আবার? সাগরিকা।
দিব্যেন্দু : আসে নি—দেখতেই তো পাচ্ছিস!
সুনন্দা : তুমিই তো বললে এসেছে?
দিব্যেন্দু : তবে খুঁজে দেখগে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি আমি! কাজের সময় শুধু জ্বালাতন (কাগজে ঝুঁকিল)।
সুনন্দা : বড়দা।
দিব্যেন্দু : বলে ফেলো।
সুনন্দা : একটা টাকা দেবে?
দিব্যেন্দু : কী করবি?
সুনন্দা : সাগরিকা সিনেমার টিকিট কেটেছে। আমার এমনি করে দেখতে খারাপ লাগে। তাই ভাবছি অন্তত বাদাম বা পোট্যাটো চিপ্‌স্ কিছু যদি কিনি—
দিব্যেন্দু : (টাকা দিয়া) নে।
সুনন্দা : দু'টাকা? দু'টাকা লাগবে না।
দিব্যেন্দু : নিয়ে যা না যা পাচ্ছিস। যদি দরকার হয়, তখন কোথায় পাবি?
সুনন্দা : থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ! তোমার জন্যে কী আনবো বলো। চানাচুর? সল্টেড্ বাদাম? পোট্যাটো চিপস্?
দিব্যেন্দু : কী হবে ও সব? বাসু সাহেবের মাথাটা যদি কেটে নিয়ে আসতে পারতিস তো হোতো।
সুনন্দা : বাসু সাহেবের মাথা? আমি কালই যাবো বঁটি নিয়ে। মাকে বলে রাখি 'ছুরি শা—ন কাঁচি শা—ন এলে ডাকতে।
(সুনন্দার প্রস্থান। দিব্যেন্দু শূন্য দৃষ্টিতে কাগজপত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। মাথায় কিছুই প্রবেশ করিল না। শুধু আবার তবলা শুরু হইল। তবলা আলোর ব্যাপার চুকিলে পর্দা ঠেলিয়া বাসু সাহেব প্রবেশ করিলেন।)
বাসু : চৌধুরী।
দিব্যেন্দু : (শশব্যস্তে উঠিয়া) ইয়েস্ স্যার?
বাসু : কাজটা শেষ করে এনেছেন?
দিব্যেন্দু : সবটা হোলো না স্যার, বাড়িতে—
বাসু : হোলো না? কেন হোলো না?
দিব্যেন্দু : স্যার বাড়িতে মায়ের অসুখ—
বাসু : (গলা চড়িতেছে) কেন হোলো না?
দিব্যেন্দু : বোনের অসুখ—
বাসু : কেন হোলো না?
দিব্যেন্দু : বাবার অসুখ—ভাইয়ের—
বাসু : (গলা চিৎকারে দাঁড়াইয়াছে) কেন হোলো না?
দিব্যেন্দু : (আর্তনাদে) স্যার বাড়ি শুদ্ধ সকলের অসুখ—বাবা মা ভাই বোন—

বাসু : *(গর্জন করিয়া) শাট্ আপ্! (দিব্যেন্দু নিস্তব্ধ। অল্প থামিয়া) আপনার জন্যে কোম্পানি বিশ লাখ টাকার কনট্রাক্ট হারালো। অতএব কর্তৃপক্ষের নির্দেশ* অনুসারে আপনাকে এই মুহূর্তে বরখাস্ত করা হোলো। এ মাসের পাওনা মাইনেও এই সঙ্গে না-মঞ্জুর করা হোলো।

(বাসু ভিতরে চলিয়া গেলেন। দিব্যেন্দু মঞ্চের মধ্যস্থলে মুহ্যমান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই দিক হইতে পরিতোষ ও বিশুর প্রবেশ।)

পরিতোষ : কী হোলো দিব্যেন্দু?

বিশু : কী হোলো দিব্যেন্দুদা?

দিব্যেন্দু চাকরি চলে গেলো।

(দুজনে দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া দুইদিকে প্রস্থান করিল। ভিতর হইতে মা ও বাহির হইতে বাবা প্রবেশ করিলেন।)

বাবা ও মা (একসঙ্গে) : কী হোলো দিবু?

(ভিতর হইতে সুনন্দা ও বাহির হইতে নবেন্দুর প্রবেশ।)

নবেন্দু ও সুনন্দা (একসঙ্গে) : কী হোলো বড়দা?

দিব্যেন্দু : চাকরি চলে গেলো।

বাবা, মা, নবেন্দু, সুনন্দা (একসঙ্গে) : আমরা তবে কী খাবো?

দিব্যেন্দু : জানি না।

(দিব্যেন্দু দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। মাথা নিচু করিয়া ধীরপদে সকলে বাহির হইয়া গেল, বাবা ও নবেন্দু বাহিরে, মা ও সুনন্দা ভিতরে। বেয়ারা একটি প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঘাড়ে করিয়া মঞ্চ পার হইয়া গেল, তাহাতে লেখা—No vacancy, তবলা ও আলো। দিব্যেন্দু চটকা ভাঙিয়া উঠিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া ঢক ঢক করিয়া খাইয়া আবার বসিল। বাহির হইতে বিশুর প্রবেশ।)

দিব্যেন্দু : আরে কী খবর? এসো এসো। তুমি তো এদিকে আসোই না।

বিশু : অনেক দূরে বাড়ি দিব্যেন্দুদা, হয়ে ওঠে না আসা।

দিব্যেন্দু . তা আজ এ পাড়ায় কী মনে করে?

বিশু : পরিতোষদার বাড়ি গেছিলাম, তাই ভাবলাম এসেছি এদিকে, একবার ঘুরে যাই।

দিব্যেন্দু : পরিতোষের বাড়ি? কী, কোনো কাজে না কি?

বিশু : হ্যাঁ, না, কিছুটা কাজেই বটে। মানে—পরিতোষদা বলছিলো এবারকার সার্চ-লাইটের ক্রসওয়ার্ডটা জয়েন্টলি পাঠাবে। পাঁচটা এন্ট্রি দু'টাকা। পাঁচটা না পাঠালে পাবার চান্স্ কম।

দিব্যেন্দু : দিলে পাঠিয়ে?

বিশু : কই আর হোলো? বৌদি দেখলাম থমথমে। পরিতোষদাও বেশ একটু ইয়ে মতন হয়ে আছে। মানে, আবহাওয়াটা সুবিধের নয়। কথাটা পাড়তেই পারলাম না। এদিকে আজ লাস্ট ডেট।

দিব্যেন্দু : তাহলে একাই পাঠিয়ে দাও পাঁচটা।

বিশু : কী করে আর দিচ্ছি? মা বলছে মাসের শেষ। মেরে কেটে একটি টাকা আদায় হোলো। দু'টো এন্ট্রিতে হওয়া মুস্কিল। Shape, shame রয়েছে, তারপর ধরো

match আর catch. Cook, book তো আছেই।

দিব্যেন্দু : আমার সঙ্গে শেয়ার করবে?

বিশু : তুমি করবে? মাইরি? তুমি তো লাইফে করো না।

দিব্যেন্দু : দেখি করে একবার। (টাকা দিয়া) এই নাও, ধরো।

বিশু : করে দেখো, ঠকবে না। (পকেট হইতে ছক বাহির করিয়া) এই দেখো, আমি এইটে করেছি—match রেখে। থ্রি ডাউনটা তাহলে হোলো গে—

দিব্যেন্দু : ও তুমিই দেখো ভাই, আমি ওসব বুঝি না। মোদ্দা পেলে আদ্দেক দেবে তো?

বিশু : আলবাৎ। বলো তো লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

দিব্যেন্দু : না না, পাগল না কি? লিখবে কী আবার?

বিশু : দিব্যেন্দুদা! এবার ষোলো হাজার—কি নিদেন পক্ষে ন'হাজার আমাদের বরাতে নাচছে।

দিব্যেন্দু : চা খাবে?

বিশু : না দাদা, আমি এইটে জমা করে দি আগে। অনেকদূর যেতেও হবে! আর একদিন এসে চা খেয়ে যাবো।

(বিশুর প্রস্থান। দিব্যেন্দু কাজ করিতে শুরু করিল। তবলা এবং আলোর ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। বাহির হইতে নবেন্দুর প্রবেশ।)

নবেন্দু : বড়দা, কলেজ থেকে এক্সকার্শন হচ্ছে টাটানগরে। চল্লিশ টাকা লাগবে। যাবো?

দিব্যেন্দু : টাকা কোথায়?

(নবেন্দুর প্রস্থান। ভিতর হইতে সুনন্দার প্রবেশ।)

সুনন্দা : বড়দা, সুরলহরীর ব্র্যাঞ্চ খুলেছে পাড়ায়। গান শিখতে ভর্তি হয়ে যাবো?

দিব্যেন্দু : টাকা কোথায়?(সুনন্দার প্রস্থান। বাহির হইতে বাবার প্রবেশ।)

বাবা : দিবু, দেশের বাড়িটা এই বেলা সারিয়ে নিতে না পারলে ছুটিছাটাতে মাথা গোঁজা মুস্কিল হবে।

দিব্যেন্দু : টাকা কোথায়?

(বাবার প্রস্থান। ভিতর হইতে মায়ের প্রবেশ।)

মা : দিবু, এবার সুনীর জন্মদিনে দু'চারজনকে নেমন্তন্ন করা যায় না? অনেকদিন বাড়িতে খাওয়ান দাওয়ান হয় নি।

দিব্যেন্দু : টাকা কোথায়?

(মায়ের প্রস্থান)

বিশু : (নেপথ্যে) দিব্যেন্দুদা! ও-ও-ও দিব্যেন্দুদা!

দিব্যেন্দু : কে?

(বিশুর প্রবেশ। উচ্ছ্বসিত অবস্থা।)

বিশু : মেরে দিয়েছি দিব্যেন্দুদা—মেরে দিয়েছি! বলেছিলাম কি না তোমাকে? বলো—বলেছিলাম কি না?

দিব্যেন্দু : কী? কী হয়েছে কী?

বিশু : (টেবিলে পত্রিকা আছড়াইয়া) ষোলো হাজার দিব্যেন্দুদা, ষোলো হাজার! ফার্স্ট প্রাইজ! (দিব্যেন্দুকে জাপটাইয়া এক পাক নাচিয়া লইল) তোমার আট আমরা আট।

উঃ কী দুর্দান্ত লাক্ তোমার দিব্যেন্দুদা! আমি আজ ছ'বছর ক্রসওয়ার্ড করছি—বারো আনার একটা ফাউন্টেন পেন শুধু পেলাম একবার। আর তোমার সঙ্গে এই একবার করেই ফার্স্ট প্রাইজ!

দিব্যেন্দু : ফা-র্স্ট প্রা-ইজ্!

বিশু : সাতদিনের মধ্যে চেক পৌঁছে যাবে। তুমি কী কিনবে দিব্যেন্দুদা? আমি তো একটা স্কুটার কিনে তবে অন্য কথা! ঘ র্ র্ পীপ!

দিব্যেন্দু : আমি কী কিনবো! না হে, শোনো বিশু। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো দিকি।

বিসু : মাথা ঠাণ্ডা করা কি সোজা এখন?

দিব্যেন্দু : কিন্তু এইটাই মাথা ঠাণ্ডা করবার সময়। শোনো, ওড়াতে শুরু করলে আট হাজার আর ক'দিন? তার চেয়ে ধরো তোমার আট আমরা আট দিয়ে যদি কিছু ব্যবসা ট্যাবসা ফাঁদা যায়? আচ্ছা আট না হোক—সাত সাত চোদ্দো? হাজার টাকা করে না হয় এদিক ওদিক সখের জিনিসেই দেওয়া গেলো।

বিশু : কথাটা মন্দ বলো নি দিব্যেন্দুদা। তাহলে বছরে বছরে চোদ্দো দুগুণে আঠাশ, তিন চোদ্দোং বিয়াল্লিশ, চার চোদ্দোং—চার চোদ্দোটা কতো যেন?

দিব্যেন্দু : ছাপ্পান্নো।

বিসু : হ্যাঁ হ্যাঁ ছাপ্পান্নো। ছাপ্পান্নো হাজার, অ্যাঁ! কিন্তু কিসের ব্যবসা করা যায়?

দিব্যেন্দু : কনট্রাকটারিতে নেমে পড়া যাক। ওটা তো এ অফিসে দেখা গেছে খানিকটা। চোদ্দো হাজারে বেশ জমিয়ে শুরু করা যাবে।

বিশু : হ্যাঁ, গোড়াতেই বেশ জমকালো এস্টাব্লিশমেন্ট খুলে বসলে—টাকায় টাকা আনে, বুঝলে দিব্যেন্দুদা? কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং যে জানি না কিস্যু?

দিব্যেন্দু : আরে ও আর জানবার কী আছে? ইট চুন সিমেন্ট দিয়ে বানিয়ে দিলেই হোলো। আর পয়সা ফেললে এঞ্জিনীয়ারের ভাবনা কী?

(দু'জনে সম্মুখে ফিরিয়া বসিয়া, চোখ স্বপ্নময়। টেলিফোন বাজিল। দিব্যেন্দু কাল্পনিক রিসিভার তুলিয়া লইল।)

হ্যালো, চৌধুরী স্পীকিং...ইয়েস্ চৌধুরী সেন অ্যান্ড কোম্পানি...ও আই সী...আই সী। আচ্ছা...হ্যাঁ...হ্যাঁ, এখন একটা প্রভিশন্যাল এস্টিমেট করে দেবো। নমস্কার।

(দিব্যেন্দু ফোন রাখিয়া দিল। বিশু কাল্পনিক বোতাম টিপিয়া ঘণ্টা বাজাইল। পুরাতন বেয়ারাটি প্রবেশ করিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।)

বিশু : এই চিঠিখানা এখুনি টাইপ করে দিতে বলো টাইপিস্ট বাবুকে।

বেয়ারা : জী।

(কাল্পনিক চিঠি লইয়া বেয়ারার প্রস্থান)

বিশু : দিব্যেন্দুদা, আমাকে একবার সুবর্ণ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর কনস্ট্রাকশন্ সাইটে যেতে হবে। তোমার কি গাড়িটা লাগবে?

দিব্যেন্দু : না, তুমি নিয়ে যাও। আমার যদি দরকার পড়ে, জীপটা তো আছেই।

(বিশুর প্রস্থান। দিব্যেন্দু ফাইল সই করিতে লাগিল। তবলা ও আলোর ব্যাপার। সাগরিকার প্রবেশ। স্বপ্নের সাজ নয়, তবে যথেষ্ট সাজ। চলন বলন গদ্যময়।)

সাগরিকা : সুনন্দা!

দিব্যেন্দু : (ধড়মড় করিয়া উঠিয়া) কে? ও, ও—আপনি? ইয়ে সুনন্দা, মানে—আপনি বসুন? (চেয়ার আগাইয়া দিল)

সাগরিকা : বসবো? কেন, সুনন্দা নেই না কি?

দিব্যেন্দু : না—হ্যাঁ, আছে—মানে—এক্ষুনি আসছে। আপনাকে বসতে বলে গেছে!

সাগরিকা : বসতে বলে গেছে? কোথায় গেলো? আমার তো আসবার কথা ছিল?

দিব্যেন্দু : কোথাও যায় নি—মানে আছে, ভিতরেই আছে।

সাগরিকা : আছে? একটু ডেকে দেবেন দয়া করে?

দিব্যেন্দু : হ্যাঁ, হ্যাঁ দিচ্ছি। দিচ্ছি। ইয়ে—আপনি বসবেন না?

সাগরিকা : (অবাক হইয়া) ঠিক আছে, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওকে বলবেন একটু তাড়াতাড়ি করতে, বড়ো দেরি হয়ে গেছে।

দিব্যেন্দু : সুনন্দা কাপড় ছাড়ছে বোধ হয়। এক্ষুণি আসবে। আপনি বসুন না?

সাগরিকা : ও।

(বসিয়া একবার দিব্যেন্দুর দিকে চাহিল। দিব্যেন্দু একটু সরিয়া গেল।)

দিব্যেন্দু : (গলা পরিষ্কার করিয়া) আপনি—আপনারা—সিনেমায় যাচ্ছেন বুঝি?

সাগরিকা : হ্যাঁ। কেন, সুনন্দা বলে নি?

দিব্যেন্দু : হ্যাঁ বলেছিলো। বলছিলো—সিনেমায় যাবে। এই একটু আগে বলছিলো। (গলা শুকাইয়া আসিল) ইয়ে—চা খাবেন?

সাগরিকা : না, চা খেয়েছি। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আপনি খেয়ে নিন।

দিব্যেন্দু : আমি? আমি কী খাবো?

সাগরিকা : ঐ যে দুধ রয়েছে আপনার টেবিলে? আপনি খেয়ে নিন।

দিব্যেন্দু : দুধ? ওঃ!

(দিব্যেন্দু লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া দুধের গ্লাস পিছনের শেলফে সরাইয়া ফেলিল।)

সাগরিকা : ও কী, সরিয়ে রাখলেন কেন? আপনি খান। আমি না হয় ভিতরে গিয়ে বসছি।

(উঠিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার প্রবেশ)

সুনন্দা : ও মা, তুই কখন এলি? আমি সেজেগুজে সেই থেকে ঘর বার করছি—এতো দেরি করবার কোনো মানে হয়?

সাগরিকা : তা তুইও তো রেডি ছিলি না?

সুনন্দা : রেডি ছিলাম না? বললেই হোলো? বড়দাকে জিজ্ঞেস কর্ না? বড়দা আমি সেই কোন্‌কালে এসে বলে গেছি না—সাগরিকা এলেই আমায় ডেকে দিও?

(সাগরিকার চোখে বিস্ময়, এবং খানিকটা সন্দেহ দিব্যেন্দুর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে। দিব্যেন্দুর অবস্থা সুবিধার নহে।)

দিব্যেন্দু : হ্যাঁ, না—ইয়ে—তোরা বেরিয়ে পড়—আরম্ভ হয়ে যাবে নইলে—

সুনন্দা : চল্ চল্!

(সুনন্দা বাহির হইল। সাগরিকা যাইবার সময়ে আড়চোখে একবার দিব্যেন্দুকে দেখিয়া গেল। সে দৃষ্টির সামনে দিব্যেন্দু কুঁচকাইয়া গেল। ওরা যাইবার পর খানিকটা স্তব্ধ থাকিয়া দিব্যেন্দু সহসা টেবিলে একটি হিংস্র মুষ্ট্যাঘাত করিল। মা প্রবেশ করিয়াছিলেন, চমকাইয়া উঠিলেন।)

মা : কী রে, কী হোলো?

দিব্যেন্দু : (সামলাইয়া) না, কিছু না। এই অফিসের সাহেবের কথা ভেবে হঠাৎ বড়ো রাগ ধরে গেলো।

মা : কেন রে? সায়েব কী করেছে?

দিব্যেন্দু : শনিবার বিকেলে বসে অফিসের কাজ করো, রবিবার অফিসে ছোটো।

মা : কাল অফিস যাবি না কি?

দিব্যেন্দু : তবে আর বলছি কী?

মা : মুখপোড়া সাহেবের একটু আক্কেল নেই? হপ্তায় একটা দিন ধীরে সুস্থে একটু ভালো করে খাবে, তা না সেই নাকে মুখে গুঁজে ছোটো? মুখপোড়া সাহেবের মরণ হয় না?

দিব্যেন্দু : আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম।

(কাজ লইয়া বসিল)

মা : কই, গেলাসটা কী করলি?

দিব্যেন্দু : গেলাস?

মা : দুধের গেলাসটা?

দিব্যেন্দু : ঐ যে ওখানে আছে।

মা : (শেলফের কাছে গিয়া) ও মা, খাস নি? এ যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম হয়ে রয়েছে রে? ছি ছি ছি। দাঁড়া, গরম করে আনি।

দিব্যেন্দু : আর আনতে হবে না। দরকার নেই দুধ। আর শোনো, তোমার মেয়েকে একটু দেখাশোনা কোরো।

মা : কেন রে? সুনী আবার কী করলো?

দিব্যেন্দু : করে নি কিছু, কিন্তু যা সব বন্ধুবান্ধব জুটেছে ওর—

মা : কই কী—আমি তো কিছুই জানি না। আমি তো শুধু দেখি ঐ গীতাকে, আর কী যেন নামটা ওর—রুবীকে, আর সাগরিকাকে। আর মাঝেমধ্যে—

দিব্যেন্দু : ঐ সাগরিকার কথাই বলছি।

মা : যাঃ সাগরিকা বেশ মেয়ে। মাসীমা মাসীমা করে আসে। সেদিন নারকেল নাড়ু খেয়ে গেলো, চিঁড়েভাজা—

দিব্যেন্দু : থাক গে। আমরা গরিব মানুষ—ওসব বড়োলোকদের সঙ্গে মেলামেশার দরকারটা কী? ওরা আসে, মেশে, খায়—আবার আড়ালে হয় তো হাসে!

মা : তা সে বড়োলোক আছে, নিজের বাড়িতে আছে! আমার বাড়ি এলে আমি চিঁড়ে মুড়ি যা ঘরে থাকবে দেবো! তারপর কে কী বললো না বললো আমার মাথাব্যথা নেই।

(মায়ের প্রস্থান। দিব্যেন্দু একটা নিষ্ফল উত্তেজনায় দুইবার পায়চারি করিল। তারপর জামাটা হিঁচড়াইয়া খুলিয়া ফেলিল। দুই হাতে চুলের বিন্যাস নষ্ট করিয়া কাজ লইয়া বসিল। খানিকটা কাজ করিয়া বাকি পাতাগুলি গুনিল। অনেক পাতা। দিব্যেন্দু একটা ভয়ার্ত আক্রোশে সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তবলা ও আলো। বাসু সাহেব আসিয়া দিব্যেন্দুর পিছনে দাঁড়াইলেন।)

বাসু : (প্রায় ভৌতিকস্বরে) চৌ—ধু—রী। ক—জটা—হ—য়েছে?

দিব্যেন্দু : (না ফিরিয়া ভয়ার্ত চিৎকারে) কে?

বাসু : (পূর্ববৎ) কা—জটা হ—য়েছে?

(দিব্যেন্দু ধীরে ধীরে উঠিয়া বাসু সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়াইল। তাহার মুখে হিংস্র অর্ধ-উন্মাদ ভাব)

দিব্যেন্দু : না হয় নি। হওয়া সম্ভব নয়। (ওজস্বিনী বক্তৃতার সুরে) অফিসে চাকরি করি বলে কি আমি আপনার চাকর? আপনি অফিসার বলেই কি যা খুশি তাই অত্যাচার করে যেতে পারেন? সপ্তায় একটা দিন ছুটির অধিকার কি আমাদের নেই? আমরা কী যন্ত্র? আমরা কি রক্তমাংসের মানুষ নই? (গলা চিৎকারে দাঁড়াইয়াছে) আমাদের কি ঘরের কাজ নেই? আমোদ আহ্লাদ নেই?

বাসু : (অবিচলিত) কা—জটা হ—য়েছে?

দিব্যেন্দু : (শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে) না, একটু বাকি আছে। সেটুকু এখুনি শেষ করে দিচ্ছি।

(দেরাজ হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া দিব্যেন্দু গুলি করিল। একবার, দুইবার, তিনবার। বাসু যন্ত্রবৎ তিন পা পিছাইয়া চেয়ারে এলাইয়া মরিয়া রইলেন। নির্জীব দুই বাহু দুই দিকে দুলিতে লাগিল। বেয়ারা ছুটিয়া আসিল।)

বেয়ারা : (দুই হাত উপরে ছুঁড়িয়া) খুন! খুন! খুন! (তারপর সহসা পুলিসের ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া দিব্যেন্দুর হাতে কাল্পনিক হাতকড়া পরাইয়া দিল) চলো থানামে।

(বেয়ারা দিব্যেন্দুকে ঠেলিয়া পিছনে লইয়া গেল। দুজনে পাশাপাশি পিছনে ফিরিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল। বাসু চাঙ্গা হইয়া টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।)

বাসু : Order. Order in the court ! (বেয়ারা দিব্যেন্দুকে লইয়া বাসুর নিকট দাঁড় করাইয়া দিল)

বাসু : (বিচারকী কণ্ঠে) টমলিনসন, জেন্‌কিন্‌সন্ অ্যান্ড কোম্পানির ক্যালকাটা ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার মিস্টার এন্, সি, বাসুকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবার অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হোলো। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে?

দিব্যেন্দু : (শহীদী গাম্ভীর্যে) না।

বাসু : সাগরিকা রায় তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। দেখা করবে?

দিব্যেন্দু : না।

বাসু : সাগরিকা রায় কাল রাত থেকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এইখানে বসে আছে। তবু দেখা করবে না?

দিব্যেন্দু : না। ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

বাসু : আসামীকে সেলে বন্ধ করে রাখো। কাল ভোরে ফাঁসি হবে। বিচারসভা এখানেই শেষ হোলো।

(বাসু ধীরপদে বাহির হইয়া গেলেন। বেয়ারা দিব্যেন্দুকে তাহার চেয়ারে ঘাড় ধরিয়া বসাইয়া দিল। তারপর প্রস্থান করিল। দিব্যেন্দু শূন্যদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। আবার তবলা এবং আলো।)

বেয়ারা : (নেপথ্যে) চাউধুরীবাবু। চাউধুরীবাবু ঘোরে আছেন?

দিব্যেন্দু : (সভয়ে) কে? কে?

(বেয়ারার প্রবেশ)

দিব্যেন্দু : (ভয় তখনও যায় নাই) তুমি? কী, কী ব্যাপার?

বেয়ারা : বাসুসাব বোললেন কি কাল কাম্ হোবে না।

দিব্যেন্দু : সে কী?

বেয়ারা : কাল আপিস বন্ধ্ থাকবে। বাসুসাব বোম্বাই যাবেন।

দিব্যেন্দু : কেন, কী হোলো?

বেয়ারা ক্রোড়ো রুপেয়াকা কোনট্রাক মিলছে কোম্পানিকা। বাসুসাব কাল হাওয়াই জাহাজসে বোম্বাই যাবেন—হেড আপিস।

দিব্যেন্দু : কিন্তু এই টেন্ডার? (কাগজ দেখাইল) এ যে সোমবার দিতে হবে?

বেয়ারা : (দাঁত বাহির করিয়া) উ সব ওয়েস্ট পিপার বাস্কিটমে ফেক দিতে বোলিয়েছেন। ছোটা কাম কোম্পানি এখোন লিবে না। ইস্টাফ্ লাই। (দিব্যেন্দু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল) হামি চোলছে বাবুজী। সোমবার আপিস যেতে কুছ দের হোবে। এখন তো দো চার রোজ এ আপিসে কাম কম হোবে।

দিব্যেন্দু : (সচকিত হইয়া) একটু দাঁড়াও। (ছাড়া জামার পকেট ঘাঁটিয়া একটি আধুলি বার করিল)—এই নাও, জলপানি খেও।

বেয়ারা : (দাঁত বাহির করিয়া সেলাম ঠুকিল) সেলাম হুজুর।

(দিব্যেন্দু প্রসন্ন হাস্যে এ সম্মান গ্রহণ করিল। বেয়ারার প্রস্থান। মায়ের প্রবেশ। হাতে দুধের গ্লাস।)

মা : এই নে। এবার আর ফেলে রাখিস নি বাবা। অনেকক্ষণ খালি পেটে আছিস।

দিব্যেন্দু : মা, কাল অফিস যেতে হবে না। অফিসের লোক এসে বলে গেলো।

মা : যেতে হবে না? যাক বাবা। কাল তাহলে নবু বাজার থেকে মাংস আনুক, কী বলিস?

দিব্যেন্দু : আনুক। মা, এখন কিছু খেতে দিতে পারো? বড়ো ক্ষিদে পাচ্ছে।

মা : (খুশি হইয়া) তা পাবে না? সেই কখন বেলা ন'টায় খেয়েছিস। লুচি ভাজি?

দিব্যেন্দু : ভাজো!

মা : হালুয়া দিয়ে খাবি, না বেগুন ভাজবো?

দিব্যেন্দু : দুই-ই করো।

মা : (উচ্ছ্বসিত আনন্দে) তুই দুধটা খা ততোক্ষণ, আমি দশ মিনিটে করে দিচ্ছি সব। (দুধ রাখিয়া মায়ের দ্রুত প্রস্থান। দিব্যেন্দু দুধ হাতে কাগজগুলি বাতাসে ছড়াইতে লাগিল।)

অক্টোবর ১৯৫৯

রাম শ্যাম যদু

মুখবন্ধ

একটি বিদেশী ছবি দেখিয়া ভাল লাগিয়াছিল। বাংলায় তাহার মঞ্চোপযোগী রূপ দিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলাম ১৯৫৭ সালে। তখন শেষ করিতে পারি নাই।

চার বৎসর পরে 'চক্র' যখন আমার 'বড়োপিসীমা', 'সলিউশন এক্স' ইত্যাদি নাটক লইয়া মঞ্চে হৈ চৈ আরম্ভ করিলেন, তখন কিছুটা নূতন উৎসাহে, কিছুটা তাগাদায় পড়িয়া পুরাতন লেখাটি ধরিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম। ১৯৬২ সালে 'চক্র' নাটকটিকে রংমহল, মিনার্ভা এবং আরও দুই এক স্থানে মঞ্চস্থ করেন। চক্রের মঞ্চসাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অন্য দুইটির মতো এই নাটকটিকেও প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। কাজটি ভাল হইল কি না জানি না। আপনারা থিয়েটার দেখিতে নিমন্ত্রণ করিলে বুঝিব—মন্দ করি নাই।

আর একটি কথা—নাটকের শেষ গানটি সম্বন্ধে। এটি কলেজ হোস্টেলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া—উৎস জানা নাই। গানটির সুর ভালো, উৎসাহ থাকিলে শিখিয়া যাইতে পারেন। নতুবা অন্য কোনও জমাটি গান লাগাইয়া লইবেন।

বাদল সরকার

রাম শ্যাম যদু

ভূমিকালিপি
(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

নবো মিত্তির	কালীগঞ্জের চায়ের দোকানদার
রাম	ক্রমশ প্রকাশ্য
শ্যাম	রামের সঙ্গী
যদু	রামের সঙ্গী
ভদ্রলোক	কালীগঞ্জে আগন্তুক
গোবিন্দ চক্রবর্তী	কালীগঞ্জের বাসিন্দা
অরু	ভবানীর কন্যা
ভবানী চৌধুরী	কালীগঞ্জে দোকানদার
গৃহিণী	ভবানীর স্ত্রী
শুকদেব	ব্যবসায়ী
জয়দেব	শুকদেবের পুত্র

প্রস্তাবনা

(ছোট চায়ের দোকান। পিছনে ঝাঁপ-তোলা দরজা ও জানালা দিয়া স্টিমার ঘাটের পথ দেখা যায়। দূরে নদীতীরের আভাস। খান দুই টেবিল। বেঞ্চি, চেয়ার, টুল ইত্যাদি। পিছনে খানিকটা অংশ দর্মার আড়াল। সেখানে রান্নার স্থান। চটের পর্দা দেওয়া একটি যাতায়াতের পথ সেদিকে।

ভোররাত্রি। এখনও কেহ আসে নাই। দোকানী নবো মিত্তির দোকান চালু করিবার কাজে ব্যস্ত। সে যখন রান্নাঘরে, তখন তিন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। পোশাক পরিচ্ছদে বিশেষ সামঞ্জস্য নাই, যেন কোনও রকমে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাম বয়োজ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয় শ্যাম, ভিজা বিড়ালের মতো চেহারা। যদু যুবক, ছিপছিপে এবং চঞ্চল। তাহার হাতে একটি সুদৃশ্য বেতের চুবড়ি—ডালাবন্ধ। তিনজনে জমাইয়া বসিল, যেন নিত্যই এখানে চা পান করিয়া থাকে।)

যদু : কই হে কত্তা, একটু চা খাওয়াবে না?

শ্যাম : বলি উনুনে আঁচ পড়েছে তো?

(চটের পর্দা সরাইয়া নবো উঁকি মারিল। মনে হয় এই সময়ে এই ধরনের খরিদ্দার পাওয়া তাহার অভ্যাস নহে।)

নবো : আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন দিচ্ছি। এই জলটা চড়ালুম, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।

রাম : আর কিছু আছে?

নবো : বিস্কুট দেবো? ভালো বিস্কুট আছে।

শ্যাম : বি-স্কুট! আর কিছু হবে না?

নবো : এতো সকালে আর কিছু তো হবে না বাবু? বাসি জিনিস এখেনে পাবেন না। মটনচপ হয় দুপুরবেলা—তা সে সন্ধের ইস্টিমার এলে দশ মিনিটে ফর্সা হয়ে যায়। ইস্টিমার ঘাটে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন—নবো মিত্তিরের চায়ের দোকান বললে একমুখে সবাই বলবে—হ্যাঁ।

যদু : আর তো দোকানই দেখলাম না এ তল্লাটে?

নবো : ছিল বাবু, বিস্তর ছিল। কালীগঞ্জের ঘাট জমজম করতো। তখন বিস্তর শৌখিন চায়ের দোকান খুলেছিলো এইখেনে। টিঁকতে পারলে না কেউ। এক আমি বলে—(জল ফুটিতেছে কিনা দেখিয়া লইয়া) আপনাদের আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

রাম : তা অতো জমজমাট গেলো কোথায় মিত্তির মশায়?

নবো : ('মিত্তির মশায়' সম্বোধনে প্রীত) নদীর ধারের গঞ্জ—এই আছে, এই নেই। এদিকে পাড় ভাঙতে লাগলো—জেটি থাকে না। ইস্টিমার কোম্পানি বড়ো জেটি সরিয়ে নে' গেলো ছ'কোশ দূরে—হরিনারাণগঞ্জে। কের্‌মে কের্‌মে ব্যবসাপত্তরও মার খেয়ে উঠে গেলো। এখন শুধু ঐ একটি ইস্টিমার যেতে আসতে ধরে। (উঁকি মারিয়া দেখিয়া) আসছি বাবু, জল হয়ে গেছে।

(পর্দার আড়ালে প্রস্থান)

যদু : দাদা।

রাম : উঁ?

যদু : কেউ তো এলো না এখনো? দোকান যে ফাঁকা?

শ্যাম : (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) নবো মিত্তিরেরই গেলো তা হলে। আহা বেচারা বেশ লোক।

রাম : তোরা বড়ো অল্পে ব্যস্ত হোস। স্টিমারটাকে আসতে দে। ক'টা বাজে জানতে পারলে হোতো।

(যদু পকেট হইতে একটি হাতঘড়ি বাহির করিল। বন্ধনীটি কাটা।)

যদু : পাঁচটা চল্লিশ। (কানের কাছে ধরিয়া চলিতেছে কি না দেখিল। তারপর সযত্নে দম দিতে লাগিল)

শ্যাম : ঘড়ি পেলি কোথায়?

যদু স্টিমার থেকে নামবার সময়ে।

রাম : টাইম হয়ে গেছে। লেট করছে স্টিমার।

শ্যাম : পয়সা সরাতে পারলি নে কিছু? ঘড়ি কী হবে?

যদু : পয়সার ভাবনা কী? ঘড়িটা ভালো। আমার অনেকদিনের সখ।

রাম : (হাই তুলিয়া) ভালো ঘুম হয়নি রাতে। এতো মশা।

শ্যাম : মশায় আমার কিছু হয়না। আমার ঘুম হয়নি এইটির জন্যে। (আঙুল দিয়া চুবড়িটি দেখাইল)

যদু : (হাসিয়া চুবড়ির উপর হাত বুলাইয়া) কেন দাদা? ঘরের লোকের উপর এতো আক্রোশ কেন?

শ্যাম : তোর ঘরের লোক তুই সামলে রাখ! আমার অতো কুটুম্বিতা সইবে না।

(স্টিমারের ভোঁ শোনা গেল। দূরে কলরব।। নবো চা লইয়া প্রবেশ করিল।)

নবো : বিস্কুট দেবো?

রাম : দিন।

শ্যাম : কী আর করা যাবে? চপ তো নেই।

নবো : কী বিস্কুট দেবো—নেড়ে না মিষ্টি?

রাম : যা ইচ্ছে। যেটা ভালো হবে।

(নবোর প্রস্থান)

যদু : জন চার পাঁচ মোটে। সব সিধে হাঁটছে, চা খাবার তাল আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

শ্যাম : ঐ যে এক কাপ্তেনবাবু আছেন পেছনে। এদিক ওদিক চাইছেন।

যদু : (চাপা উৎসাহে) ফেঁসেছে!

(রাম নির্বিকার। শ্যাম যদু জুৎ হইয়া বসিল, যেন বহু দিনের বাঁধা খরিদ্দার। এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়স বছর পঁচিশ। স্যুটটি মোটামুটি ভাল, যদিও স্টিমারযাত্রায় কিঞ্চিৎ পর্যুদস্ত। হাতে একটি ব্যাগ। ভদ্রলোক ঈষৎ লাজুক।)

ভদ্রলোক : ইয়ে, এখানে ভবানীবাবুর বাড়িটা কোনদিকে হবে বলতে পারেন?

রাম : কোন ভবানীবাবু বলুন তো? বসুন না?

শ্যাম : ও মিত্তির মশাই, কোথায় গেলেন? চা দিন।

(নবো বিস্কুট লইয়া প্রবেশ করিল)

নবো : বসুন স্যার।

ভদ্রলোক : না মানে ইয়ে—আমি শুধু—(বসিয়াই পড়িলেন)

নবো : বিস্কুট দেবো কি? ভালো বিস্কুট আছে।

ভদ্রলোক : বিস্কুট? না থাক, শুধু চা এক কাপ—

(নবোর প্রস্থান)

ইয়ে, আপনারা কেউ বলতে পারেন, ভবানী চৌধুরী—

রাম : আপনি কোত্থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক : কলকাতা থেকে।

রাম : ভবানীবাবু আপনার কে হন?

ভদ্রলোক : আমার কেউ না। মানে বলতে কী—আমি কোনোদিন দেখিইনি তাঁকে। একটু দরকারে শুধু—মানে একটা চিঠি তাঁকে—

শ্যাম : একটা চিঠি দিতে কলকাতা থেকে আন্দুর চলে এলেন?

ভদ্রলোক : না না, মানে আমি হরিনারায়ণগঞ্জে যাচ্ছি চাকরিতে জয়েন করতে। স্টিমার এখানে আধঘণ্টার উপর দাঁড়ায়। কাছাকাছি হলে চিঠিটা দিয়ে যেতাম।

রাম : একটা চিঠি দিতে এতো কাণ্ড? কেন, ডাকে পাঠানো চলতো না?

ভদ্রলোক : (লজ্জিত সুরে) আমার মামা। বললেন জরুরি চিঠি—না বলতে পারলাম না।

রাম : তা তো বটেই। বিয়ে করেছেন?

ভদ্রলোক : সে কথা কেন? সে কথায় আপনার—

রাম : আমার কোনো দরকার নেই। বলছিলাম কী—বিয়ে করে থাকলে ভবানীবাবুর বাড়ি যাবেন না।

ভদ্রলোক : সে কী? কেন?

রাম : ইনসিওরেন্স করা আছে?

ভদ্রলোক : ইনসিও—

রাম : ইনসিওরেন্স করা থাকলে আলাদা কথা। কিম্বা যদি শ্বশুরের টাকা থাকে। নইলে খামোখা—

ভদ্রলোক : কী বলছেন আমি তো কিছুই—বিয়ে করিনি—শ্বশুরের টাকা—

রাম : বিয়ে করেন নি? তবে আর কী বলবো বলুন? সংসারের চাপ নেই, প্রাণের মায়া কম, আমি বললে কি আর শুনবেন?

ভদ্রলোক : প্রাণের মায়া?

রাম : প্রাণের মায়া থাকলে কেউ সেধে ভবানীবাবুর বাড়ি যেতে চায়? ওর উঠোনে যে কতো লাস পোঁতা আছে।

ভদ্রলোক : অ্যাঁ!

রাম : (নিম্নস্বরে) এই যে দোকানদার। নাম করা রাহাজান এ তল্লাটের। একবার যদি টাকার গন্ধ পায়—

ভদ্রলোক : আ-আপনি জানলেন কী করে?

রাম : আমাদের জানতে হয়। তা না হলে কি কালীগঞ্জে করে খাচ্ছি?

ভদ্রলোক : (উঠিয়া) করে খাচ্ছি। আপনারাও কি—

রাম : আজ্ঞে না। আমার ওসব আসে না। আমি মাথা খাটিয়ে খাই, যাকে আজকাল চ্যাংড়া ছেলেরা চারশো বিশ বলে। (যদুকে দেখাইয়া) এই ভদ্রলোক চোর, আর ইনি (শ্যামকে দেখাইয়া)—খুনে।

(শ্যাম ও যদু ইতিমধ্যে নিঃশব্দে ভদ্রলোকের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রলোক ঘুরিতেই শ্যামের সহিত ধাক্কা খাইলেন। শ্যাম ধরিয়া আস্তে ঘুরাইয়া দিল। যদু গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া।)

শ্যাম : সে কী, চললেন? চা খাবেন না?

রাম : আপনার ব্যাগটা ফেলে যাচ্ছেন যে?

(ভদ্রলোক রামের হাত হইতে ব্যাগ ছিনাইয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান করিলেন। নবো চা লইয়া প্রবেশ করিল। ইহারা নির্বিকার বসিয়া।)

নবো : একটু দেরি হয়ে গেলো স্যার—সে কী? কোথায় গেলেন?

রাম : উনি থাকতে পারলেন না। বল্লেন দেরি হয়ে গেছে।

নবো : তাই তো, চা-টা—

যদু : এদিকে দিন মিত্তির মশাই। এককাপে গলা ভেজে নি?

শ্যাম : আমাদের জন্যেও করুন দু'কাপ। বেশ ভালো করে—কড়া মিষ্টি।

(নবোর প্রস্থান)

কই দেখি? (যদু পকেট হইতে একটি মানিব্যাগ ও একটি খাম বাহির করিল। মানিব্যাগ ঝাড়িয়া দু'টি নোট ও কিছু খুচরা পাওয়া গেল।)

যদু : দু'টাকা সাড়ে পাঁচ আনা! যা-ব্বাবা, শুধু কোঁচার পত্তন!

রাম : উহুঁ, সাবধানী লোক। টাকাকড়ি ব্যাগে রাখে না। (চিঠিটা দেখিয়া) ভবানী চৌধুরী, গ্রেট ইস্টার্ন স্টোর্স, কালীগঞ্জ।

শ্যাম : বেশ মোটা দেখছি। টাকাকড়ি আছে?

(যদু খামটি কানের কাছে মুড়িয়া দেখিল)

যদু : নাঃ, নোটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

রাম : সরিয়ে রাখ। আসছে।

(ব্যাগ, খাম অদৃশ্য হইল। নবোর চা লইয়া প্রবেশ।)

হ্যাঁ মিত্তির মশাই, ভবানীবাবুর দোকানটা কোন দিকে হবে?

নবো : ভবানীবাবুর দোকান? এই তো শহরের ভেতর, বড়ো রাস্তার ওপরেই। ঐ একটাই দোকান এখেনে নাম করবার মতো। তা ওটা তো ভবানীবাবুর নয়? ভবানীবাবু ম্যানেজার।

রাম : কার দোকান? মাড়োয়ারির?

নবো : না মাড়োয়ারি নয়, বাঙালিরই। শুকদেব রায় ওর মালিক। এখেনকার লোকে বলে—শকুনি।

যদু : খুব কিপ্টে বুঝি?

নবো : (গল্পের সুযোগ পাইয়া) চামার মশাই—চামার। খেতে পেতো না, ভবানীবাবুর

বাপ ছেলের মতো মানুষ করেছিলো। ভবানী চৌধুরী ভালোমানুষ, বাপের মতো স্বভাব—তাকে ঠকিয়ে তারই টাকায় ব্যবসা ফাঁদলে। প্রথমে ঐ দোকান, তার পরে হরিনারাণগঞ্জ—সেখেন থেকে কলকাতা। এখন বহু টাকার মালিক। ভবানীকে শুধু এই দোকানটার ম্যানেজার রেখেছে নামমাত্র মাইনেয়। তাও বাড়িটা ভবানীরই।

রাম : ভবানীবাবুর দোকানে অংশ নেই?

নবো : কী জানি বাবু আছে কি নেই? তবে শুকদেবের ছেলের সঙ্গে নাকি ভবানীর মেয়ের বিয়ে হবে শুনি। ভবানীর ঐ এক মেয়ে। সবই তা হলে শুকদেবের ছেলেরই হবে।

শ্যাম : অতো যার টাকা তার আর ঐটুকু দোকানে কী হবে?

নবো : কী জানি? বোধহয় জন্মস্থানের মায়া। সবাই জানে ঐ বাড়িটি আর দোকানটির দিকে শুকদেবের খুব নজর।

যদু : কিসের দোকান?

নবো : সব কিছুই আছে। চাল ডাল থেকে শুরু করে তেল সাবান হাঁড়ি কুঁড়ি মায় কাপড় জামা পর্যন্ত। এসব মফঃস্বলের দোকান এমনিই হয়।

যদু : দাদা, উঠবে নাকি?

রাম : হ্যাঁ, চল। কতো হোলো মিত্তির মশাই?

নবো : আজ্ঞে চা ছ'কাপ ছ'আনা, আর বিস্কুট তিন আনা—ন'আনা।

(যদু মানিব্যাগটি হইতে একটি নোট দিল)

তাইতো খুচরো তো নেই? এতো সকালে—

যদু : খুচরো থাক মিত্তির মশাই।

নবো : না না, তা কী করে হবে?

রাম : জমা রাখুন। আবার আসবো আমরা, পালিয়ে তো যাচ্ছি না।

নবো : আজ্ঞে পায়ের ধুলো দেবেন মাঝে মাঝে দয়া করে। বসুন মশলা নিয়ে আসি।

(নবোর প্রস্থান)

রাম : এবার?

শ্যাম : শহর দেখা যাক। কাল ভোরের স্টিমারে না হয় জয়হরিগঞ্জ না কী বললো—

রাম : রাতে থাকবি কোথায়?

শ্যাম : কাল রাতে যেখানে ছিলাম—আবার কোথায়?

রাম : ঐ জাহাজঘাটার মালশেডে? না বাবা, আমি আর মশার কামড় খেতে পারবো না। পুরো রাতটা ঘুম হয়নি কাল।

যদু : দাদার এখানে কুটুমবাড়ি আছে নাকি?

রাম : (উঠিয়া) আছে। চল্।

শ্যাম : কোথায়?

রাম : গ্রেট ইস্টার্ন স্টোর্স।

যদু : সেখানে কী?

রাম : দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। চিঠিটা দে তো।

শ্যাম : হ্যাঁ, ভদ্রলোকের চিঠিটা তো পৌঁছে দেওয়া দরকার। ভালো খবর থাকলে হয়তো বকশিশ দিতে পারে কিছু।

যদু : না যদি দেয়, আমরাই নিয়ে নেবো। (নবো মশলা লইয়া আসিল)

রাম : (মশলা লইয়া) আচ্ছা চলি মিত্তির মশাই। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

নবো : আসবেন মধ্যে মধ্যে।

(রাম শ্যাম যদুর প্রস্থান। বাহির হইবার মুখে প্রবেশ করিলেন গোবিন্দ চক্রবর্তী। কাশির ধাক্কা সামলাইতে সামলাইতে সন্দেহী-চক্ষে নজর করিয়া তিনজনকে দেখিলেন। তারপর জুৎ করিয়া বসিলেন। নবো তখন কাপ ডিশ লইয়া ভিতরে গিয়াছে।)

গোবিন্দ : কই মিত্তির। ভাল করে চা করো দিকি এক কাপ। একটু আদা দিও।

নবো : (উঁকি মারিয়া) বসুন চক্কোত্তি মশাই। দু'দিন দেখি নি যে?

গোবিন্দ : এই কাশিটা বড়ো বেড়েছিলো। শরীরেও বেদনা। বয়স তো হচ্ছে? এবার গেলেই হয়।

নবো : (আড়াল হইতে) না না, কী বলেন? এমন কী বয়স আপনার?

গোবিন্দ : (খুশি হইয়া) হয়েছে মিত্তির, অনেক হয়েছে। তোমরা বুঝতে পারো না। রোজ শেষরাত্তিরে উঠে মর্নিং ওয়াকটা করি বলে এখনো খাড়া আছি। নইলে আজকালকার ছোঁড়াগুলোকে দেখেছো তো? টিংটিঙে হাড্ডিসার! সব মাঝরাত অবধি রকবাজি করবে, আর বেলা ন'টার ইদিকে বিছানা ছাড়বে না। হ্যাঁ হে মিত্তির—ঐ যে তিন ছোকরা বেরুলো দোকান থেকে—কে হ্যা? এখানকার বলে তো মনে হোলো না?

নবো : (চা লইয়া বাহির হইল) আজ্ঞে আমিও দেখিনি আগে। বাইরে থেকে আসছেন বোধ হয়।

গোবিন্দ : ভোরের স্টিমারে এলো বুঝি?

নবো : আজ্ঞে না। আগেই এসেছিলেন।

গোবিন্দ : সে কী? অতো ভোরে? কোন বাড়িতে উঠেছে?

নবো : তা তো বলতে পারবো না। তবে এখানে নতুন বটে। কথাবার্তায় বুঝলুম।

গোবিন্দ : চা-টা একটু কড়া হয়ে গেছে হে। একটু দুধ দাও দিকি?

(নবো মুচকি হাসিয়া দুধ আনিতে গেল। মনে হইল রোজই তাহাকে এই কথা শুনিতে হয়।)

গোবিন্দ : কবে এসেছে কিছু বললো?

নবো : (দুধ আনিয়া) আজ্ঞে না। তবে নতুন এসেছেন মনে হোলো। ভবানীবাবুর খোঁজ করছিলেন।

গোবিন্দ : ভবানীর খোঁজ? একটু চিনি দাও তো ভাই, সামান্য একটুখানি।

(নবো ভিতরে গেল)

ভবানীর খোঁজ? ভবানীর কেউ হয় নাকি?

নবো : (চিনি আনিয়া) আজ্ঞে না, তা তো মনে হোলো না।

গোবিন্দ : (চামচ চায়ে দিবার পব) আ-হা-হা—অতোটা দিলে কেন? ভবানীর কেউ নয়? তা কী খোঁজ নিলে?

নবো : এই কোথায় দোকান কিসের দোকান—এই সব।

গোবিন্দ : তাই তো—বেশি মিষ্টি হয়ে গেলো যে? ঝপ করে অতোটা চিনি দিয়ে দিলে! একটু লিকার দেবে না কি? অ্যাঁ? অল্প একটু?

(নবো হাসি চাপিয়া ভিতরে গেল। গোবিন্দ খানিকটা কাশিয়া লইলেন।)

কোথায় দোকান? কিসের দোকান?

(নবো এবং লিকার আসিল)

বাস বাস—আর না। এইবার ঠিক হয়েছে। ভোরের স্টিমারে আসেনি বলছো?

নবো : আজ্ঞে না, ভোরের স্টিমার ধরবার দশ মিনিট আগেই এলেন চা খেতে।

গোবিন্দ : ভালো ঠেকছে না হে ব্যাপারটা। আজ না এলে কাল সন্ধেয় এসে থাকতে পারে হরিনারাণগঞ্জ থেকে। তা শহরে ঢুকলে শুকদেবের দোকান কাণাতেও দেখতে পায়। আর এখানে বসে খোঁজ করছে কিসের দোকান, কার দোকান?

নবো : হয় তো নৌকো ভাড়া করে এসেছেন হরিনারাণগঞ্জ থেকে?

গোবিন্দ : এই তো ঘাট ঘুরে এলাম। একটি নৌকো নেই। আমি কি আর না ভেবেচিন্তে বলছি?

নবো : তা, কী দরকার অতো ভাবনা চিন্তার?

গোবিন্দ : দরকার নেই? বলো কী মিত্তির? তিন তিনটে উটকো লোক ভোর রাত্তিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

নবো : আপনার মতো মর্নিংওয়াকের অভ্যেস আছে বোধ হয়।

গোবিন্দ : (চটিয়া) আরে রেখে দাও। আজকালকার ছেলে ছোকরার যদি মর্নিংওয়াকের অভ্যেস থাকতো তবে দেশটা এমন উচ্ছন্নে যেতো না। যেতো? বলো তুমি?

নবো : সে তো ঠিক কথা।

গোবিন্দ : তাই তো বলছি হে—ভাববার কথা। কী মতলব কে জানে?

নবো : মতলব আবার কী থাকবে?

গোবিন্দ : যে দিনকাল। অচেনা লোক খোঁজ খবর নিচ্ছে শুনলেই বুকটা দুর দুর করে।

নবো : না না, কী বলেন? ভদ্দরলোক—

গোবিন্দ : ঐ তোমার দোষ মিত্তির। কেউ মিষ্টি কথা বললেই তুমি ভুলে যাও। এই যে ভবানী চৌধুরী—মুখে মিষ্টি কথা ছাড়া কেউ কোনোদিন শুনেছে?

নবো : ভবানীবাবু আবার কী করলেন?

গোবিন্দ : ঐ তো! সবাই ভোলে, শুধু এই গোবিন্দ চক্রবর্তীর চোখে ধুলো দেওয়া অতো সহজ নয়। তলে তলে শুকদেবের দোকানটিকে ফাঁক করে এনেছে, খবর রাখো?

নবো : না না, চক্কোত্তি মশাই, এ আপনি—

গোবিন্দ : বিশ্বাস হোলো না তো বুড়োর কথাটা? আচ্ছা দেখবে একদিন। ভরাডুবি হবে। শুকদেব কাঁচা ছেলে নয়। এক যদি ঐ ছুঁড়িটাকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে।

নবো : কাকে দিয়ে?

গোবিন্দ : ন্যাকা সেজে গেলে যে মিত্তির? (চোখ টিপিয়া) ভবানীর মেয়ে গো! হটর হটর করে পাড়া মাড়িয়ে বেড়ায়, চিনতে পারছো না?

নবো : (সঙ্কুচিত হইয়া) থাকগে চক্কোত্তি মশাই। আমি গরিব লোক, আমার কাজ কী ওসব কথায়?

গোবিন্দ : সে কথা একশো বার। আমি তো কানই দিইনে ওসব কথায়! শুকদেবের ছেলেকে নিয়ে যখন কানাঘুষো চলতো, তখনো আমি ওসবে থাকতুম না; আর এই যে এখন বীরেন বোসের ভাগ্নে—

নবো : বীরেনবাবুর ভাগ্নে? কে. পল্টু? সে তো ছেলেমানুষ চক্কোত্তি মশাই? ভবানীবাবুর মেয়েকে দিদি বলে!

গোবিন্দ : (মুচকি হাসিয়া) বটেই তো, বটেই তো। আমিও তো সেই কথাই বলি। তা ওরা বলে—দিদি বলা নাকি আজকাল সুবিধে—(নবোর আপত্তির ভঙ্গী দেখিয়া) যাক গে যাক। লোকের মুখে তো লাগাম দিতে পারবো না? তা নিজের সরে থাকাই ভালো। চলি হে মিত্তির।

নবো : ইয়ে—আজ কালীপুজো, আপনার বাকি পয়সাটা—

গোবিন্দ : ঐ দেখো! আনবো বলে ভুলে গেলুম একেবারে বেরুবার সময়। কাল দিয়ে দেবো—হিসেব করে রেখো।

(গোবিন্দ কাশিতে কাশিতে বাহির হইলেন।)

প্রথম অঙ্ক

(ভবানী চৌধুরীর বসিবার ঘর। পিছনে মঞ্চের প্রায় অর্ধেক অংশে একটি ছয় সাত ফুট উঁচু পার্টিশন। পার্টিশনের পিছনে গ্রেট ইস্টার্ন স্টোর্স, পার্টিশনে একটি পর্দা দেওয়া দরজা দিয়া সেখানে যাতায়াত চলে। পিছনে অন্যদিকে একটি দরজা, অন্য একটি ঘরে যাইবার। সম্মুখের দিকে দুই পাশে দরজা, দোকানের দিকের দরজাটি বাগানে যাইবার, অন্যটি অন্দরে। ঘরের আসবাবপত্র মিশ্রিত। একটি বড়ো র‍্যাকে দোকানের কিছু মালপত্র জমা রহিয়াছে। একটি পুরাতন সোফা, টেবিল, চেয়ার খানকয়েক। ইজি চেয়ার অথবা তক্তপোষও থাকিতে পারে। সাজাইবার ব্যবস্থায় আধুনিক শহুরে ড্রইংরুমের কায়দা নাই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। অন্দর হইতে ভবানী-গৃহিণীর গলা পাওয়া গেল।)

গৃহিণী : (নেপথ্যে) অরু। অরু!

(বাগান হইতে অরুর প্রবেশ। হাতে কিছু ফুল)

ও অরু!

অরু : যাই মা!

(অরু ছুটিয়া ভিতরে গেল। দোকান হইতে ভবানী প্রবেশ করিলেন। র‍্যাক হইতে খুঁজিয়া গোটা দুই কৌটা লইলেন। অরুর প্রবেশ।)

অরু : বাবা।

ভবানী : দাঁড়া আসছি।

(ভবানী দোকানে গেলেন। অরু পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল। ভবানী দুইটি কৌটার একটি লইয়া ফিরিয়া র‍্যাকে রাখিতে গেলেন।)

অরু : বাবা, মা জিজ্ঞেস করছে—মিস্ত্রীর কী হোলো?

ভবানী : মিস্ত্রী? মিস্ত্রী তো খুঁজছি, পাই কোথা? রহিমটা গেলো আটকে—

গৃহিণী : কী গো, মিস্ত্রী পেলে?

ভবানী : সেই কথাই তো বলছিলাম। ললিত কুণ্ডু কলকাতা থেকে থিয়েটার এনেছে—তা স্টেজ প্যান্ডেল সব রহিমের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

গৃহিণী : তা রহিম ছাড়া কি মিস্ত্রী নেই শহরে?

ভবানী : আছে তো। আমি কি চিনি ছাই কাউকে? রহিমের কাছে খোঁজ নিয়ে গেলাম একজনের কাছে। তা সে ছুতোর মিস্ত্রী—শুধু মেরামত করবে, রং ফং পারবে না। তাই দিন আড়াই টাকা চায়। রহিম যেমন সব দিকে ওস্তাদ ছিল—

গৃহিণী : তবে আর কী? রহিমের গুণ-ব্যাখ্যান করে দিও তোমার শুক-দার কাছে—সাত খুন মাপ হয়ে যাবে।

ভবানী : এই সময়টা কালীগঞ্জে মিস্ত্রী পাওয়া কি সোজা কথা?

গৃহিণী : সেই জন্যেই তো পই পই করে বলেছিলাম—সময় থাকতে দোকান ঘরটা ঠিক ঠাক করে রাখো। কবে এসে পড়বে—রক্ষে রাখবে না। তা তোমার তো আঠারো মাসে বচ্ছর।

(গৃহিণী কথা কহিবার সময়ে পার্টিশনের মাথায় যদুর মাথা দেখা দিয়াছে—অতি সন্তর্পণে। তারপর শ্যামের ও রামের।)

ভবানী : ভেবেছিলাম পুজোর মরশুমটা চুকলে একেবারে ভালো করে সারিয়ে ফেলবো। শুকদা যে এতো তাড়াতাড়ি আসবে তা তো তখন—

গৃহিণী : তুমি এক কাজ করো। ঐ ছুতোর মিস্ত্রীকেই ডেকে আনো।

ভবানী : আড়াই টাকা রোজ দিয়ে!

গৃহিণী : আর কী করবে?

ভবানী : আর রং?

অরু : রং আমরা করতে পারবো না বাবা?

গৃহিণী : তুই বাজে বকিস্‌নি তো। আলমারিতে মার্কিন আছে ছ'গজ—নিয়ে এসে দোকানের তাকের মাপে কেটে ফেল। দুটো পর্দা করে দিই—চেহারাটা একটু ফিরবে।

(অরুর ভিতরে প্রস্থান)

তুমি আর দেরি কোরো না গো—বেরিয়ে পড়ো। (ভবানী ফিরিতেই তিন মাথা নিমেষে ডুব দিল) দেখো আমার কী রকম ভয় ভয় করছে।

ভবানী : ভয়? ভয় কিসের?

গৃহিণী : মনে হচ্ছে এখানকার বাস এবার উঠলো। তুমি যাই বলো—তোমার শুক-দাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

ভবানী : ক্ষেপেছো নাকি? গত বছর যখন এসেছে, তখনো অরুর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে।

গৃহিণী : আবার দোকানের অবস্থা নিয়ে ট্যারা ট্যারা কথাও হয়েছে। (পার্টিশনে আবার মাথা—রাম শ্যাম যদু)

ভবানী : দোকান নিয়ে শুকদা চিরকালই একটু ওরকম। তাছাড়া লোকসানটাও একটু বেশি—

গৃহিণী : অতো বাকি রাখলে লোকসান হবে না? এই শহরের লোক তো? একবার যখন বুঝেছে যে তুমি বাকি আদায় করতে পারো না—অমনি সব পেয়ে বসেছে।

ভবানী : তা কী করবো বলো? বলে দিয়ে দেবো। দু'টাকা বাকি পড়েছে বলে চাল ডাল বন্ধ করা—সে আমার দ্বারা—

গৃহিণী : কিন্তু এদিকে যে নিজেদের চালডালে টান পড়বার যোগাড়। এ সম্বলটুকু গেলে কি আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে?

(গলা ভারি হইয়া আসিল। ভবানী অগ্রসর হইয়া কাঁধে হাত রাখিলেন। শ্যাম জিভ কাটিয়া ডুব দিল, রাম ও যদুও।)

ভবানী : অতো ভাবছো কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। জয়দেব ছেলেটি ভালো। অরুর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে আর ভাবনাটা কী?

গৃহিণী : না, আর ভাববো না। তুমি যাও, আর দেরি কোরো না।

রাম (নেপথ্যে) : ভবানীবাবু। ভবানীবাবু আছেন?

(গৃহিণীর দ্রুত প্রস্থান)

ভবানী : কে? আসুন।

(রাম শ্যাম যদুর প্রবেশ)

রাম : আপনিই ভবানীবাবু?

ভবানী : আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা—?

রাম : নমস্কার। আপনার একটা চিঠি আছে।

ভবানী : (বিস্মিত হইয়া চিঠি লইলেন) আপনারা কোত্থেকে—

রাম : স্টিমারে এক ভদ্রলোক দিলেন। হরিনারাণগঞ্জে যাচ্ছিলেন। বললেন—যদি দিয়ে দিতে পারেন আর নামতে হয় না।

ভবানী : ও, এই ভোরের স্টিমারে এলেন বুঝি?

রাম : হ্যাঁ, ভাবলাম একটু ঘুরে দেখি। সুবিধে না হলে কাল চলে যাবো হরিনারাণগঞ্জে।

ভবানী : সুবিধে? কিসের সুবিধে?

রাম : এই কাজকর্মের আর কী? ইনি ক্যাবিনেট মেকার—কাঠের কাজ করেন। (শ্যাম বিনীত হাসিল) আর ইনি হচ্ছেন কালারিং এক্সপার্ট—রং নিয়ে কারবার। আমি হচ্ছি ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন স্পেশালিস্ট। অফিস দোকান বাড়িঘরের সাজসজ্জার ভোল পাল্টে দেওয়া আমার পেশা।

ভবানী : (অতি উৎসাহে) তাই না কী? তাহলে তো—(সহসা উৎসাহ নিভিয়া গেল) তা ইয়ে—আপনাদের চার্জ কী রকম?

রাম : সে কাজ বুঝে। কেন বলুন তো?

ভবানী : না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। মানে আমার এই দোকানঘরটা একটু—অবশ্য এক্সপার্ট বা স্পেশ্যালিস্ট লাগাবার মতো আমার—

রাম : ও, এই কথা? তা কী রকম চান আপনি? হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন টাইপ, না কমলালয় টাইপ?

ভবানী : না না, অতো কিছু নয়! এই—জানলাগুলো রং করা, আর আলমারি, শেল্‌ফগুলো একটু মেরামত—

রাম : (অধৈর্য সুরে) সে সব তো হবেই। ওটুকু তো যে কোনো ছুতোর মিস্ত্রী রং মিস্ত্রীর কাজ। ও সমস্ত সেরে তবে আমাদের আসল কাজ শুরু—মানে আর্টিস্টিক কাজটা।

ভবানী : দেখুন, খুলেই বলি। আমি বড়ো বিপদে পড়েছি বলেই কথাটা তুলেছিলাম। শুকদা—মানে দিন দুত্তিন মাত্র বাকি, সময় মোটে নেই। তা ছাড়া আমার সঙ্গতিও—

রাম : বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি। (অল্প ভাবিয়া) শ্যাম!

শ্যাম : বলো দাদা।

রাম : (আরও অল্প ভাবিয়া) যদু!

যদু : হুকুম করো।

রাম : তোমরা কী বলো?

শ্যাম : তুমি যা বলবে।

যদু : আমারও ঐ কথা।

রাম : ইনি ভদ্রলোক।

শ্যাম : তা তো বটেই।

যদু : সে কথা একশোবার।

রাম : বিপদে পড়েছেন।

শ্যাম : তাই তো বললেন।

যদু : আমিও যেন তাই শুনলাম।

রাম : এখন আমাদের কী করা উচিত?

শ্যাম : আমাদের সাধ্যে যেটুকু কুলোয়—

যদু : সে আর বলতে?

রাম : টাকার কথা কি তোলা উচিত?

শ্যাম : (জিভ কাটিয়া) ছি ছি!

যদু : (মর্মাহত) টাকা কি সঙ্গে যাবে?

রাম : তা হলে সেই কথাই রইলো ভবানীবাবু।

(ভবানী এতোক্ষণ হাঁ করিয়া শুনিতেছিলেন। এখন সচকিত হইলেন।)

ভবানী : অ্যাঁ? কিন্তু—না না, তা কী করে হবে? আপনারা—

রাম : ভালো কথা, কাছাকাছি হোটেল আছে ভবানীবাবু?

ভবানী : হোটেল? হোটেল কী হবে?

রাম : আমরা এখানে নতুন তো, কাউকে চিনি না। হোটেল থাকে তো খাওয়া থাকার একটা ব্যবস্থা করে আসি। তারপর কাজে লেগে যাওয়া যাবে।

ভবানী : (আহত সুরে) সে কী কথা? আমার বিপদ শুনে আপনারা বিনা পয়সায় খাটতে রাজি হলেন, আর আমি আপনাদের হোটেলে পাঠাবো? কী দুর্ভাবনা যে মাথা থেকে নামিয়ে দিলেন—

রাম : না না, এ সব কী বলছেন আপনি? সামান্য এইটুকু ভদ্রলোকের বিপদে আপদে কে না করে বলুন?

শ্যাম : এটুকু না করলে পরলোকে জবাব দেবো কি?

যদু : (গম্ভীর স্বরে) মনে রেখো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। অন্যে কথা কবে, কিন্তু তুমি রবে—নিরুত্তর!

(পায়ের গোছায় শ্যামের পদাঘাত খাইয়া 'নিরুত্তর' কথাটি সরুগলার আর্তনাদে বাহির হইল।)

ভবানী : তবে আর হোটেলের কথা তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আজ ভবানী চৌধুরীর এই অবস্থা—নইলে বাইরে থেকে এসে এ বাড়িতে কেউ কোনোদিন না খেয়ে যেতে পায় নি।

(তিনজনের অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টি বিনিময়)

রাম : আপনি যখন বলছেন এতো করে, তখন—কী বলো শ্যাম?

শ্যাম : কী আর করা যাবে?

যদু : ওঁকে কষ্ট দেওয়া হোলো। তবে হ্যাঁ, সময়টা বেশি পাবো, রাত্তির অবধি কাজ করা চলবে।

ভবানী : (খুশি হইয়া) আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি।

(ভিতরে প্রস্থান। চিঠিটা মনের ভুলে টেবিলেই রহিয়া গেল।)

রাম : ইতি আদি-পর্ব সমাপ্ত। যদু!

যদু : ইয়েস্ স্যার।

রাম : সিগ্রেট দে।

(যদু চুবড়িটি টেবিলে রাখিয়া দোকানে চলিয়া গেল। রাম শ্যাম জুৎ করিয়া বসিল। সামনে চুবড়িটি শ্যাম লক্ষ্য করে নাই।)

শ্যাম : কত্তা গিন্নি মেয়ে। বেশ ছিমছাম সংসারটি।

রাম : তোর আবার কী হোলো রে?

শ্যাম : ঘর সংসার দেখলে মনটা কেমন হু হু করে ওঠে।

(যদু ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হাতে সিগারেটের প্যাকেট—ভবানীবাবুর দোকান ভাঙা মাল।)

যদু : আমারও হু হু করে—পেটটা।

(রাম ও যদু সিগারেট ধরাইল)

শ্যাম : এই রকম একটা নদীর ধারে, এই রকম একটি ছোট্ট শহরের এক কোণে, এই রকম একটি ছোট্ট সংসার, আর—

রাম : সেই রকম একটি বৌ।

শ্যাম : (ভাব ছুটিয়া গেল) তুমি দাদা অসময়ে বড়ো বেখাপ্পা কথা বলো। বৌয়ের কথা আসে কোত্থেকে?

(চুবড়িটির উপর চিবুক রাখিয়া গুম হইয়া রহিল)

রাম : (নিরীহসুরে) সংসার বললি কিনা?

শ্যাম : সংসার কি বৌ ছাড়া হয় না? সংসার মানেই কি বৌ? ধরো—এই রকম একটি মেয়ে। কিম্বা ছোট্ট একটি ছেলে—(আবার ভাব আসিল) ছোট্ট হাত-পা—মিষ্টি মুখ—(সস্নেহে চুবড়িটির উপর হাত বুলাইতে লাগিল) আধো আধো কথা—দেখলেই কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে—(চুবড়িটি তুলিয়া মুখের কাছে লইয়া ভীষণ চমকাইয়া নামাইয়া দিল) যদু!!

যদু : অ্যাঁ?

শ্যাম : তোকে কতোবার বলেছি না—এটাকে আমার সামনে রাখবি নে।

যদু : (ভাল মানুষ) তুমি ছোট ছেলেপিলে ভালোবাসো, তাই—

শ্যাম : (ভয়ানক চটিয়া) বড়ো বেশি ফাজিল হয়ে যাচ্ছিস তুই দিনকে দিন!

রাম : বয়সের দোষ।

শ্যাম : গোড়াতেই বলেছিলাম এ সব ছেলেছোকরা জুটিও না!

রাম : আমি ওকে জোটালুম, না ও-ই আমাদের জোটালে? ও দড়িটা যোগাড় না করলে ঐ আট হাত পাঁচিল টপ্‌কাতিস্‌ কী করে? আর এই সব জামা কাপড়ই বা জোটাতো কে?

যদু : মেজদা রাগ কোরো না। সরিয়ে রাখছি। (কোণের টেবিলে সরাইয়া রাখিল) মেজদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

শ্যাম : (রাগ সম্পূর্ণ পড়ে নাই) বল্‌।

যদু : মেজো বৌদির কথা তুমি যা বলেছো—সবটাই কি সত্যি? না তুমি বাড়িয়ে বলেছো?

শ্যাম : ওরে, ও জিনিস বাড়িয়ে বলা যায় না। বরং যেটুকু ছিলেন তার সামান্যই বলেছি।

যদু : সত্যি তোমাকে ঝাঁটাপেটা করেছিলো?

শ্যাম : তেত্রিশবার।

যদু : ঘটি ছুঁড়ে মারতো?

শ্যাম : ঘটি ক'বার মনে নেই। হামান দিস্তে আঠারোবার, নোড়া সাতাশবার। আর দুবার শিল ছুঁড়েছিলো—লাগাতে পারে নি।

যদু : শিল ছুঁড়েছিলো?

শ্যাম : শিল।

রাম : পাথরের শিল?

শ্যাম : না তো কি সেলুলয়েড? পরে ওজন করে দেখেছি—আঠারো সের। এ ছাড়া ডেক্‌চি গামলা হাতা খুন্তি থালা বাটির হিসেব নেই। শেষ দিনটা তোলা উনুন।

রাম-যদু (একসঙ্গে) : উনুন!!

শ্যাম : উনুন। সবে ধরিয়েছিলো। (রাম সভয়ে শিস দিয়া উঠিল। যদু শ্যামের পায়ের ধুলা লইল।)

যদু : পায়ের ধুলো দাও দাদা।

শ্যাম : তোর আবার কী হোলো রে?

যদু : ঐ খাণ্ডারনিকে তুমি নিকেশ করেছো, আর আমার ঐ ছোট্ট খোকাটিকে তোমার এতো ভয়?

শ্যাম : ওরে নিকেশ কি আর সাধে করেছি? করেছি ভয়ে।

যদু : ভয়ে?

শ্যাম : না হলে তো আমাকেই নিকেশ করতো।

রাম : তুই পালিয়ে গেলি নে কেন?

শ্যাম : দাদা, তুমি কিছুই চেনো না তা হলে। কামস্কাটকা গেলেও ঠিক খুঁজে বের করতো। পতি-অন্ত প্রাণ।

যদু : এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো মেজদা।

শ্যাম : সাতবার পালিয়েছিলুম—জানিস? সাতবারই ধরে এনেছে!

রাম : বলিস কিরে? তারপর?

শ্যাম : চোরের মার। বয়স হয়ে যাচ্ছে তো? কতো আর সয়?

(রাম কান পাতিয়া শুনিয়া সতর্ক করিয়া দিল। তিনজনে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল দোকানে। অরু প্রবেশ, হাতে পর্দার সাদা কাপড়। দোকানে যাইতে গিয়া নজর পড়িল টেবিলে চিঠিটির দিকে। অল্প ইতস্তত করিয়া অবশেষে খুলিয়াই ফেলিল। ইতিমধ্যে তিনটি মাথা দেখা দিয়াছে পার্টিশনে। খানিকটা পড়িয়া অরুর মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে উহাদের তিনজনেরও।)

অরু : জয়দেবদা আসছে! কালকেই! মা. ও মা! (আরও খানিকটা পড়িতেই চমকাইয়া উঠিল) বিয়ে!

(মুহ্যমান অরু অল্পক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তিনজনের মুখভাব বদলাইয়া গেল সঙ্গতি রাখিয়া। তারপর অরুর পতন ও মূর্চ্ছা। কাছাকাছি একটি চেয়ার থাকায় পতনটা গুরুতর হইল না। রামই আগে আসিল। তারপর শ্যাম। যদু অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করিয়া পার্টিশনের উপর দিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নড়বড়ে অবস্থা দেখিয়া সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ফলে সে প্রবেশ করিল সর্বশেষে। শ্যাম এক হাতে অরুর নাড়ি ধরিয়া অন্যহাত যদুর দিকে বাড়াইয়া দিল। যদু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দিল। রাম ইতিমধ্যে চিঠি পড়িয়া ফেলিল।)

রাম : বাপুনে গোলি মার দিয়া।

যদু : কার বাপু? কাকে গোলি মেরেছে?

রাম : জয়দেবের বাপ শুকদেব। কথিত ভাষায় শকুনি।

যদু : গুলি মেরেছে কাকে? মহাজনকে না বৌকে?

রাম : সে গুলি নয়। তুই মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ না করে জল নিয়ে আয় তো! কচি মেয়েটা মরছে, আর তোর এখন গপ্পো শোনবার ইচ্ছে হোলো।

(যদু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল ঘরে জল নাই। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সোজা চলিয়া গেল অন্দর মহলে।)

শ্যাম : কী ব্যাপার দাদা?

রাম : মুহব্বত। প্রেম।

শ্যাম : বটে? কী রকম?

রাম : রোমিও-জুলিয়েট। লায়লা-মজনু। জয়দেব-অরু।

শ্যাম : তারপর?

রাম : শাদি। বিবাহ।

শ্যাম : সে তো ভালো কথা। তবে ভির্মি গেলো কেন?

রাম : এ উল্টো শাদি। শুকদেব রায় বিখ্যাত ব্যবসাদার। রণধীর মল্লিক কয়লা খনির মালিক। দু'টো খনি, একটা মেয়ে। নগদে গয়নায় মিলিয়ে মোটা দাঁও।

শ্যাম : (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আহা। (খাম দিয়া অরুর মাথায় হাওয়া করিতেছিল, এখন মনের ভুলে নিজেই হাওয়া খাইতে লাগিল। যদু এক ঘটি জল লইয়া প্রবেশ করিল। পিছনে ক্রুদ্ধ গৃহিণী।)

গৃহিণী : এসব কী? কে তুমি?—অরু!

(যদু অরুর মুখে জল ছিটাইতে লাগিল। শ্যাম তৎপর হইয়া খাম চালাইতে শুরু করিল। রাম ডাক্তারি ভঙ্গীতে পথ আটকাইয়া)

রাম : না না, হাওয়াটা বন্ধ করবেন না। ভাববার কিছু নেই। নার্ভাস শক।

গৃহিণী : আপনি কে? কী করছেন এখানে?

রাম : স্মেলিং সল্ট আছে? থাকে তো তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন।

গৃহিণী : (স্তম্ভিত) আমি তো—

রাম : দেরি করবেন না!

গৃহিণী : কিন্তু—

রাম : কোনো ভয় নেই, আমরা আছি। তাড়াতাড়ি যান।

(গৃহিণী মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভিতরে গেলেন। শ্যাম যদু ঘটি খাম রাখিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। গৃহিণী প্রবেশ করিবার পূর্বেই সকলে পুনরায় শুশ্রূষায় ব্যস্ত।)

গৃহিণী : এই যে স্মেলিং সল্ট। কী হয়েছে অরুর?

রাম : এমন কিছু নয়। ঐ চিঠিটা পড়তে পড়তে হঠাৎ ফেন্ট হয়ে পড়েছে। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

(রাম স্মেলিং সল্ট অরুর নাকের কাছে ধরিল। গৃহিণী চিঠি পড়া আরম্ভ করিলেন।)

শ্যাম : এদিকে নয়—ও পাতাটা দেখুন।

(গৃহিণী শ্যামের দিকে একটি দৃষ্টিপাত করিয়া পাতা উল্টাইয়া পড়িলেন।)

গৃহিণী : বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! মিথ্যেবাদী শয়তান!

(অরু চোখ মেলিয়াই যদুর আকর্ণবিস্তৃত দন্তপংক্তি দেখিল, ফলে মাগো বলিয়া আবার চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।)

কী হোলো? অরু!

রাম : ও কিছু না, ব্যস্ত হবেন না।

(যদুর দিকে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। আবার স্মেলিং সল্ট। অরু চোখ খুলিল।)

অরু : মা!

গৃহিণী : অরু!

রাম : ওকে ভেতরে নিয়ে যান। নইলে আবার হয় তো—

(আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি। যদু বেচারা যথাসম্ভব অরুর দৃষ্টির আড়ালে সরিয়া গেল। ভবানী ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন।)

ভবানী : এই যে আলাপ টালাপ হয়ে গেছে দেখছি। বড়ো উপকার করেছেন এঁরা—এ কী! অরুর আবার কী হোলো?

গৃহিণী : ঐ যে।

(চিঠি দেখাইয়া দিয়া অরুকে লইয়া ভিতরে গেলেন।)

ভবানী : (পড়িয়া) শুকদা কাল ভোরে আসছে! সে কী? তবে তো আপনাদের এখনি কাজে লেগে যেতে হয়!

রাম : সে তো বটেই। সবটা পড়ুন।

ভবানী : ও হ্যাঁ। অ্যাঁ! রণধীর মল্লিকের একমাত্র কন্যার সহিত জয়দেবের বিবাহ স্থির করিয়াছি। আশা করি আগামী মাসেই শুভকার্য সমাধা করাইতে পারিব। না না—এ হতেই পারে না! এ কি সম্ভব! (সপ্রশ্ন দৃষ্টি যদুর উপর)

যদু : আজ্ঞে, আমাকে বলছেন?

ভবানী : আপনার যদি ছেলে থাকতো—

যদু : তা হলে খুব নিন্দে হোতো। এখনো বিয়ে করবার ফুরসৎ পাই নি কি না?

রাম : আঃ যদু! আমি বুঝেছি ভবানীবাবু। আমার ছেলের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুর মেয়ের বিয়ে দেবো বলে কথা দিতাম—

ভবানী : (উত্তেজিত) শুধু কথা দেওয়া? আজ তিন বচ্ছর ধরে—

রাম : ঠিক বলেছেন। টাকার লোভে এরকম একটা কথা ভাঙা কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভবানী : (উৎসাহিত) বলুন তো? তা হলে?

রাম : তাহলে প্রমাণ হয়—শুকদেব রায় ভদ্রলোক নয়।

ভবানী : অ্যাঁ? তা—তা হবে। বোধ হয় আমিই ভুল করেছিলাম। শুকদা ভদ্রলোক নয়। শুকদা একটা—একটা—

শ্যাম : শকুনি?

ভবানী : ঠিক! শকুনি। লোকে ঠিকই বলে।—কিন্তু, জয়দেব?

রাম : তাই তো। জয়দেব?

যদু : শকুনির বাচ্—(রামের দিকে চাহিয়া সামলাইয়া লইল)

ভবানী : জয়দেব কখনো এমন প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। ওকে তো আমি চিনি! বড়ো ভালো ছেলে।

রাম : ভালো ছেলেদের আবার একটা গুণ খুব প্রবল থাকে অনেক সময়।

ভবানী : কী গুণ?

রাম : আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।

ভবানী : (বিহ্বলভাবে) তাই বলছেন?

রাম : আমি বলছি—ওঁরা যখন কালকেই আসছেন, তখন এতো মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

ভবানী : (ব্যস্ত হইয়া) তাই তো, দোকানের কাজগুলো তা হলে—

রাম : আমরা এখুনি লেগে যাচ্ছি।

(গৃহিণীর প্রবেশ)

ভবানী : এই যে—অরু কেমন আছে?

গৃহিণী : ভালোই আছে। তবে মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু এখন আর ওসব ভেবে কী হবে? ওরা যে কাল ভোরের স্টিমারেই আসছে?

ভবানী : হ্যাঁ, সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এঁরা সব এই লাইনের এক্সপার্ট, দয়া করে সব কিছু ঠিক ঠাক করে দেবেন বলেছেন। সেই কথা বলতেই তো তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

গৃহিণী . কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলে? তুমি তো দোকানের হিসাব নিয়ে পড়েছিলে!

ভবানী : (লজ্জিত) না না, হিসেব নিয়ে পড়বো কেন? হঠাৎ খাতাগুলোর উপর নজর গেলো—ভাবলাম বড়ো গোলমাল হয়ে রয়েছে—শুকদা তো—নইলে আমি তো তোমায় বলতে গিয়েছিলাম এঁদের আজ এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—

গৃহিণী : ছি ছি, তুমি যে কী? এতো উপকার করলেন, আর এক কাপ চা পর্যন্ত এখনো এঁদের—

যদু : আপনি ব্যস্ত হবেন না বৌদি। আমাদের ঘরের লোক বলে মনে করে নিন।

গৃহিণী : সে তো বটেই। ঘরের লোক না হলে কেউ এতো করে? আপনারা না থাকলে অরুকে নিয়ে কি ভাবনাতেই যে পড়তাম! উনি তো কতো কাজে লাগেন দেখতেই পাচ্ছেন—

ভবানী : কেন, কী? আমি তো—

গৃহিণী : থাক অনেক হয়েছে। তুমি হিসেব সামলাও গিয়ে, আমি চা নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

রাম : হিসেবের কথা কী বলছিলেন ভবানীবাবু?

ভবানী : এই দোকানের হিসেব। অনেক গোলমাল হয়ে রয়েছে। বাকিও পড়ে গেছে অনেক। শুকদা আবার হিসেবের গোলমাল একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কী করে যে সামলাবো এই একদিনে—

রাম : আপনাকে কিছু করতে হবে না। খাতাগুলো এনে দিন।

ভবানী : আপনি হিসেবও বোঝেন না কী?

রাম : শুধু বুঝি না, বোঝাতেও পারি। তেরো বছর ঐ ছিল আমার পেশা।

ভবানী : আপনি তো গুণী ব্যক্তি! কিন্তু এ হিসেব একদিনে ঠিক করা আপনার কাজ নয়। দু'মাস খাতায় ঠিক মতো ওঠেনি। বাকি বকেয়া আলগা কাগজে—তাও বোধহয় দু'একটা হারিয়েছে।

রাম : ভবানীবাবু! একরাত্রের মধ্যে একবার আমি তিনটে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির হিসেব তৈরি করে দিয়েছিলাম।

ভবানী : বলেন কী? এক রাত্রে তিন তিনটে চালু ফ্যাক্টরি—

রাম : আজ্ঞে না, চালু নয়। কাগজ পত্রের বাইরে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। চালু কারখানার হিসেব তো অনেক সোজা!

শ্যাম : আপনি ভাববেন না ভবানীবাবু। এঁর উপর পুরো ভরসা করতে পারেন। এঁর হিসেবের নাম ডাক শুনে গভর্নমেন্ট ডেকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলো।

যদু : পাঁচ বছরের জন্যে। উনি অবশ্য থাকলেন না। ভালো লাগলো না বলে ছেড়ে চলে এলেন। আমরাও ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম ভালো করে কাজ শিখবো বলে।

ভবানী : আপনারাও হিসেবের লাইনে ছিলেন না কি?

শ্যাম : আজ্ঞে না, আমাদের লাইন আলাদা। সে সব বলবো এখন আপনাকে আস্তে আস্তে। এখন বরং কাজগুলো সেরে নেই।

ভবানী : ঠিক ঠিক, সে পরে হবে'খন। আমি চায়ের কথা বলি।

রম : চা বৌদি দেখছেন। আপনি বরং খাতাগুলো দিয়ে যান।

ভবানী : খাতা ও? ও, আচ্ছা আচ্ছা—

(ভিতরে প্রস্থান)

যদু : দাদা। একবার হিসেবে ডুবলে তোমার তো পাত্তা পাবো না। তার আগে দুটো কাজের কথা বলে নেবো?

রাম : বলে নাও।

যদু : আজ কালীপুজো।

রাম : সুখের কথা।

যদু : মহাপ্রসাদের কথা কি ভবানীবাবুর মাথায় আসবে বলে মনে হয়?

শ্যাম : মাথায় এলেও ট্যাকে কুলোবে না।

রাম : অতএব—?

যদু : যদি হুকুম করো—

রাম : করলাম। বেরিয়ে পড়। বেশি দেরি করিসনি।

শ্যাম : ওরা তিন, আমরা তিন, টোটাল ছয়। বুঝে আনিস।

রাম : ধরা পড়িস নি যেন।

যদু : পাঁঠা চুরিতে ধরা? আরে রামোঃ।

শ্যাম : আজ কালীপুজো বলছিস্?

যদু : সেই রকমই বোধহয় পাঁজিতে লিখছে।

শ্যাম। তবে তো কিছু আলো আর বাজির ব্যবস্থা করতে হয়।

যদু : হবে ব্যবস্থা।

(যদুর প্রস্থান)

শ্যাম : দেওয়ালির রাত্তিরে একটা ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়ে হেসে হেসে নেচে নেচে প্রদীপ সাজাচ্ছে—ভাবতে বেশ লাগে, না দাদা?

রাম : তা লাগে। তবে এবাড়ির মেয়েটা শাড়ি ধরেছে অনেকদিন।

শ্যাম : (বদান্য উদারতায়) ধরুক। ও সাজালেই হবে।

(একতাড়া খাতা কাগজপত্র লইয়া ভবানীর প্রবেশ)

ভবানী : এই যে দেখুন। এইটে হোলো গত মাসের—এখনো তোলা হয়নি—

রাম : ঠিক আছে ভবানীবাবু, আমি বুঝে নেবো।

ভবানী : বুঝে নেবেন? ভালোই হোলো, বাজারটা ঘুরে আসি তাহলে, নইলে ওদিকে—

রাম : (খাতায় ঝুঁকিয়া) মাংস আনবেন না। যদু মাংসের ব্যবস্থা করছে।

ভবানী : সে কী? আপনারা আবার পয়সা খরচ করে—

শ্যাম : কিচ্ছু ভাববেন না। যদু পয়সা খরচা করবার ছেলে নয়।

ভবানী : তবে যে বললেন—

রাম: (হঠাৎ মুখ তুলিয়া) হিসেব! একে হিসেব বলেন আপনি? আজ পর্যন্ত সাঁইত্রিশটা কোম্পানির হিসেব সামলেছি আমি—মোট মূলধন তিরাশি কোটি ছত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার সাতশো টাকা চার আনা—এরকম হিসেব রাখা কখনো দেখলাম না!

ভবানী : (লজ্জিত) মানে, কী জানেন—

শ্যাম : দাদা, চটছো কেন? দাও না সামলে।

রাম : সামলে দেবো? তার চেয়ে আগাগোড়া নতুন হিসেব তৈরি করা ঢের সোজা।

শ্যাম : তবে তাই করে দাও না?

ভবানী : নতুন হিসেব তৈরি করে দেবেন? সে কী?

শ্যাম : তাতে হয়েছে কী? আপনার তো শকুনি—মানে শুকদেববাবুকে বোঝানো নিয়ে কথা।

(গৃহিণীর চা লইয়া প্রবেশ)

গৃহিণী : তুমি এখনো যাও নি বাজারে? কখন রান্না হবে?

ভবানী : হ্যাঁ, এই তো যাচ্ছি।

(ভবানীর প্রস্থান)

গৃহিণী : কই, আর একজন কোথায় গেলেন?

রাম : মাল মশলা আনতে গেছে। ওর চা-টা আমরাই খেয়ে নেবো। নষ্ট হবে না।

গৃহিণী : ফিরলে আমাকে একটু খবর দেবেন, চা করে দেবো।

(গৃহিণীর প্রস্থান। রাম হিসাব লইয়া পড়িল। শ্যাম ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘর সাজাইবার কায়দা ভাবিতে লাগিল।)

শ্যাম : দাদা, এইখানটা এক সারি পিদীম সাজালে কেমন দেখাবে?

রাম : আটশো সাতান্নো!

শ্যাম : অ্যাঁ?

রাম : আটশো সাতান্নো টাকা পাঁচ আনা বাকি পড়েছে।

শ্যাম : (সহসা সচকিত হইয়া) দাদা!

রাম : (চমকাইয়া) কী রে?

শ্যাম : আমরা এখানে বসে কী করছি?

রাম : কেন এই হিসেব—

শ্যাম : হিসেব? তুমি হিসেব দেখছো। আমি দেওয়ালি সাজাচ্ছি। যদু বাজার করছে। এই সব করার জন্যে কি আট হাত পাঁচিল টপকেছিলুম?

রাম : (ধীরে ধীরে খাতা বন্ধ করিয়া) ঠিক বলেছিস।

শ্যাম : আমি খুনে।

রাম : আমি চারশো বিশ।

শ্যাম : যদু চোর। আর আমরা কী করছি?

রাম : ভবানীবাবুর সংসার সামলাচ্ছি!

শ্যাম : না, এ হবে না। চলো ওঠো। এখুনি বেরিয়ে পড়ি।

রাম : যদু?

শ্যাম : যদুকে পথে ধরে নেবো।

(অরুর প্রবেশ)

অরু : কাকাবাবু, মা জিজ্ঞেস করছেন—আপনারা কি কচুর শাক খান?

রাম : কী বললে?

অরু : কচুর শাক।

শ্যাম: তার আগে কী বললে?

অরু : তার আগে কিছু বলি নি তো?

শ্যাম : ভুল শুনেছি তা হলে। আমার যেন মনে হোলো তুমি বললে—কাকাবাবু।

অরু : হ্যাঁ বলেছি তো।

শ্যাম : (তাকাইয়া থাকিয়া) ও।

অরু : খান কচুর শাক?

শ্যাম : খাই বোধ হয়।

অরু : বোধ হয়?

রাম : ঠিক জানা নেই আর কি। কখনো তো খাই নি আগে?

অরু : তবে খেয়ে দেখুন। মা কচুর শাক খুব ভালো রাঁধে।

শ্যাম : ও।

অরু : আর একটা কথা ছিল মেজো কাকা।

শ্যাম : (মুহ্যমান) মেজো কাকা!

অরু : আমি গেলো বছরের প্রদীপগুলি বাঁচিয়ে রেখেছি। আজ সন্ধ্যায় দেওয়ালি সাজাবো। আপনারা যদি সময় পান, আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন? আমি ঠিক বুঝি না কেমন করে সাজালে ভালো দেখাবে। (রাম ও শ্যামের দৃষ্টি বিনিময়)

রাম ও শ্যাম : (একসঙ্গে) মানে আমরা— হয়েছে কী—

অরু : আপনারা তো আজ রাত্রে থাকছেন এখানে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

(অরুর প্রস্থান)

শ্যাম : এটা কী রকম হোলো?

রাম : (অল্প চুপ করিয়া থাকিয়া) কী রকম আবার হবে? থাকবো, ঘাড় ভেঙে খাবো, রাত্রে টাকা কড়ি নিয়ে সরে পড়বো।

শ্যাম: টাকা কড়ি কাঁচকলা আছে।
রাম : গয়না তো আছে গায়ে? তাই চেয়ে নিয়ে যা'বো।
শ্যাম : ঠিক বলেছো। না দিলে গলা কেটে রেখে যাবো।
নেপথ্যে কণ্ঠস্বর : কই ভবানীবাবু! দোকান বন্ধ না কি?
শ্যাম : খদ্দের।
রাম : দেখি দাঁড়া।

(রাম দোকানে গেল। গৃহিণীর প্রবেশ।)

গৃহিণী : কেউ ডাকলো না কি?
শ্যাম: খদ্দের বোধ হয়। দাদা দেখছে, আপনি ভাববেন না।

(রামের প্রবেশ)

রাম: চারুবিলাস তেলের দাম কতো?
গৃহিণী : ছোট না বড়ো?
রাম: বড়োই বলুন।
গৃহিণী : বড়ো একটা সাত আনা।

(রাম যাইতে গিয়া ফিরিল)

রাম : ওর চেয়ে দামী মাথার তেল নেই কিছু?
গৃহিণী : না—হ্যাঁ আছে। অনেকদিন আগে ব্লু-বেল বলে একটা বিলিতি তেল তিন শিশি এসেছিলো। কেউ কেনে না বলে উপরের তাকে পড়ে আছে।
রাম : কতো করে?
গৃহিণী : দু'টাকা ছ'আনা।

(রামের প্রস্থান)

এ সব জায়গায় অতো দামী তেল বিক্রি হয় কখনো?
শ্যাম : দোকান কি এই রকম খোলাই পড়ে থাকে?
গৃহিণী : না. সব সময়ে নয়। মাঝে মধ্যে উনি বেরুলে আমিই সামলে দিই। আর ক'টাই বা খদ্দের আসে এ সময়ে?

(দশ টাকার নোট হাতে রামের প্রবেশ)

রাম : চেঞ্জ দিন তো। সাত টাকা দু আনা কেটে নেবেন।
গৃহিণী : সা—ত টাকা দু আনা!!
রাম : তিন শিশি ব্লু-বেল।

(বিস্মিত গৃহিণীর প্রস্থান)

শ্যাম : এক শিশি রাখলে পারতে। অনেকদিন গন্ধ-তেল মাখা হয় নি।
রাম : চারুবিলাস মাখ। তেলটা ভালো। তা ছাড়া স্বদেশী জিনিস।
শ্যাম : গ্লিসারিন সাবান আছে কি না একটু দেখো তো দাদা। আজ একটু ভালো করে চান করতে হবে।

(খুচরা লইয়া গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী : এই নিন, দু'টাকা চোদ্দ আনা ফেরৎ।

(রামের প্রস্থান)

তিন শিশি ব্লু-বেল! ও তেল আজ তিন বছর কেউ কেনে নি। আমি কতো বকাবকি করেছি ঐ তেল আনবার জন্যে।

শ্যাম : দাদা খুব পাকা সেলস্‌ম্যান। একবার আধঘণ্টা কথা বলে একটা হোটেল বেচে দিয়েছিলো একজনকে।

গৃহিণী : বলেন কী?

শ্যাম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৃহিণী : ওঁর হোটেল ছিল বুঝি?

শ্যাম : না, নিজের হোটেল নয়—আর একজনের। পরে সে খুব রাগারাগি করেছিলো।

গৃহিণী : কেন? ভালো দাম পাওয়া যায়নি বুঝি?

শ্যাম : না দাম ভালোই পাওয়া গেছিলো।

গৃহিণী : তবে?

শ্যাম : লোকটি দাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো—ধন্যবাদ জানাবে বলে। দাদা আবার খুব বিনয়ী কি না? তাই তার সঙ্গে আর দেখাই করেনি।

(রামের প্রবেশ)

দাদা, ইনি জিগ্যেস করছেন—তিনি শিশি ব্লু-বেল কী করে বেচলে?

রাম : নিতে চাইছিলো না। চালান বন্ধ হয়ে এর দাম ডবল হয়ে গেছে শুনে ফেললো। এই নিন— (কিছু খুচরো দিল)

গৃহিণী : কিসের পয়সা?

রাম : একটা তোয়ালে রয়েছে দেখলাম ব্লু-বেলের পাশে—বেচে দিয়েছি।

গৃহিণী : ওটা যে পোকায় কেটেছিলো?

রাম : সে দেখেছে ও। সেই জন্যেই সস্তায় দিলাম—এক টাকা ছ' আনা।

গৃহিণী : ওটার নতুন দামই যে চোদ্দ আনা?

রাম : তা হোক। ওসব সেকেলে ভালো জিনিস আজকাল পাওয়া যায় না।

গৃহিণী : (অল্প থামিয়া কুণ্ঠিতভাবে) দেখুন—একটা কথা—আমি—

রাম : বলুন না?

গৃহিণী : কী করে যে বলবো, ভেবে পাচ্ছি না। আমি—(থামিয়া গেলেন)

শ্যাম : কচুর শাক তো? শুনেছি আমরা।

গৃহিণী : কচুর শাক?

রাম : না, ও কিছু না। আপনি বলুন।

গৃহিণী : আমি একটা ভারি অন্যায় করেছিলাম।

রাম : অন্যায়?

গৃহিণী : আমি প্রথমে—আমার প্রথমে সন্দেহ হয়েছিলো—মানে, আমি ভেবেছিলাম—আপনারা হয়তো—চোর ডাকাত।

শ্যাম : ভেবেছিলেন?

গৃহিণী : এখন ভাবতে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। কিন্তু না বলেও পারলাম না। আমাদের—মেয়েদের—মন বড়ো ছোট।

শ্যাম : ও।

গৃহিণী : আমি—আপনারা আমাকে—
(কথা বলিতে না পারিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। রাম ও শ্যাম পরস্পরের দিকে চাহিল। তারপর মুখ ফিরাইয়া গুম হইয়া রহিল।)

শ্যাম : দাদা?

রাম : বল্।

শ্যাম : না, কিছু না। (নেপথ্যে পাঁঠার ডাক। তাহার পরেই যদুর হাঁক।)

যদু : (নেপথ্যে)। দাদা।

শ্যাম : পাঁঠা।
(যেন অনুমতির জন্য রামের দিকে চাহিল)

রাম : (অল্প থামিয়া) যা, হাত লাগা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(একই ঘর। রাত্রি। যবনিকা উন্মোচিত হইবার পূর্বেই হাসি হল্লার আওয়াজ পাওয়া যাইবে। ঘরে আলো কম। শেলফ্ টেবিল ইত্যাদিতে প্রদীপ সাজানো। অরুর দুই হাতে দুইটি জ্বলন্ত ফুলঝুরি। যদু প্রদীপের আগুনে ফুলঝুরি জ্বালাইয়া শ্যামকে দিল, শ্যাম রামকে, রাম ভবানীবাবুকে। এইভাবে রাম ও শ্যামের হাতেও ফুলঝুরি আসিল। গৃহিণীর প্রবেশ, হাতের রেকাবিতে মশলা।)

গৃহিণী : এই যে মশলা!
(যদু রেকাবিটি লইয়া গৃহিণীর হাতে একটি জ্বলন্ত ফুলঝুরি ধরাইয়া দিল। ঘরভরা হাসি। অরু নাচিতেছে বলিলেও চলে। ফুলঝুরি শেষ হইলে যদু আলো জ্বালিয়া মশলা পরিবেষণ করিতে লাগিল।)

অরু : ফুলঝুরি আর নেই ছোটকাকা?

যদু : আর গোটা তিনেক আছে। দেবো?

অরু : না, ওগুলো থাক। আমি জমিয়ে রাখবো। আসছে বছর দেওয়ালিতে আবার আপনারা আসবেন। তখন ঐ তিনটে দিয়ে আপনারা শুরু করবেন।

ভবানী : ওরা শহরের লোক—এ পাড়াগাঁয়ে আসবে কী করতে?

অরু : তাতে কী হয়েছে? শহরের লোকের বুঝি গাঁয়ে আসতে নেই।

গৃহিণী : কাজকর্ম ফেলে এতোদূর কী আসতে পারবে?

অরু : কাজ থেকে ছুটি নেওয়া যায় না বুঝি? পুজোর সময় তো। কী কাকাবাবু, আসবেন না?

রাম : আসবো বই কি, নিশ্চয়ই আসবো। তবে মধ্যে মধ্যে আটকে যেতে হয় কি না?

অরু : কেন, আপনাদের তো স্বাধীন ব্যবসা?

রাম : আজ স্বাধীন, কাল হয়তো জুড়ে যাবো কোন্ ঘানিতে।

যদু : গভর্নমেন্ট তো আমাদের পেলে লুফে নেয়।

ভবানী : তা তো বটেই। কাজ জানা লোক তো আর পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় না।

অরু : যেখানেই থাকুন, পুজোতে তো ছুটি পাবেন?

শ্যাম : মাঝে মাঝে এমন জায়গায় আটকে যাই, পুজো ফুজো মানে না। এবারও তো তাই হয়েছিল। যদু অনেক কষ্টে ছুটি যোগাড় করে দিলো—তাই।

যদু : সরকারি চাকরি কি না?

ভবানী : আমার দু-একজন বন্ধু গভর্নমেন্টে চাকরি করে। তারা তো ছুটি পায় পুজোতে?

রাম : সরকারি চাকরি হরেক রকম আছে। কিছু আরামের; আর কিছু, বললে বিশ্বাস করবেন না—স্রেফ জেলখানা!

অরু : না, ও সব কথা শুনবো না। যেমন করে পারেন, ছুটি যোগাড় করতেই হবে। উঃ, এরকম ফুর্তি কোনো বছর হয়নি।

গৃহিণী : এই, কতো রাত হযেছে জানিস? শুতে যাবি না? কাল ভোরেই তো আবার ওরা সব আসবে।

অরু : না মা, লক্ষ্মীটি—এক্ষুনি না। আমার এতো ভাল লাগছে আজ, কী বলবো! ইচ্ছে করছে—ইচ্ছে করছে চিৎকার করে গান গাই!

রাম : গাইছো না কেন?

অরু : গাইতে পারলে তো গাইবো? আচ্ছা আপনারা কেউ গান জানেন না?

যদু : আমি ছোটবেলায় ঐ গানটা ভালো গাইতাম। ঐ যে—চল্ কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই—

শ্যাম : চুপ কর! ও সব গান চলবে না।

রাম : কালীপুজোয় কী গায়? শ্যামাসঙ্গীত?

শ্যাম : দাদা, তবে সেই যে গানটা আমরা গাইতাম ইয়েতে—মানে আমাদের কোয়ার্টার্সে?

যদু : ঐ যে—ডাকছে শেয়াল বাঁশবনে?

শ্যাম : ধ্যাৎ! ওটা তো কীর্তন! শ্যামাসঙ্গীত ছিল না একটা?

যদু : হ্যাঁ হ্যাঁ—মা আমায় ঘুরাবি কতো!

রাম : হয়ে যাক্। শ্যাম, তুই ধর। (শ্যাম চোখ বন্ধ করিয়া রামপ্রসাদী সুরে ধরিল)

শ্যাম : হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—এক দুই তিন চার—
মা আমায় ঘুরাবি কতো

রাম-শ্যাম-যদু : মা আমায় ঘুরাবি কতো
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো
মা আমায় ঘুরাবি কতো।

রাম : কেউ বা বাঁচে কাঁঠাল ভেঙে মাথা পেলে মাথার মতো।
(আবার) ভবের খেলা চুকলে চলে ঘানির মেয়াদ অবিরত॥

রাম-শ্যাম-যদু : মা আমায় ঘুরাবি কতো!

শ্যাম : কারো থাকে বিবাগী মন, সংসারে নয় অনুগত।
(তবু) সংসারীকে মারলে ছুরি ঘানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥

রাম-শ্যাম-যদু : মা আমায় ঘুরাবি কতো।

যদু : কারো বিদ্যা পরম বিদ্যা, ধর্মত্যাগে অসম্মত।
(কিন্তু) ধর্মপথে ঘটলে ত্রুটি ঘোরায় ঘানি অনবরত॥

রাম-শ্যাম-যদু : মা আমায় ঘুরাবি কতো
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো
মা আমায় ঘুরাবি কতো।

(গানের গলা একজনেরও নহে, কিন্তু সেজন্য গানে নানাবিধ প্যাঁচের কোনো অভাব হইল না। শেষ দিকে কোরাসে অরুও যোগ দিল। গান শেষ হইল একটি মিলিত হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে।)

ভবানী : বাঃ খাসা গান। কথাগুলো একটু গোলমেলে, ভালো বোঝা গেলো না।

অরু : আর একটা করুন না।

গৃহিণী : অনেক রাত হয়ে গেছে রে। কাল ভোরে ওরা আসবে, একটু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতে হবে না? তারপর এদের শোবার ব্যবস্থা—

রাম : আমাদের শোবার ব্যবস্থা নিয়ে ভাববেন না। আজ আর শোবার দরকার হবে না।

গৃহিণী : শোবার দরকার হবে না?

রাম : সারাদিন তো হৈ চৈ করেই গেলো। দোকানের হিসাবটা দেখতে হবে না?

ভবানী : (ব্যস্ত হইয়া) তাই তো, হিসেবটা তো একেবারেই—শুকদা যে ভোরেই পৌঁছে যাবে! তারপর দোকানের মেরামত—

শ্যাম : ব্যস্ত হবেন না। আমরা স—ব পরিষ্কার করে দেবো। কিচ্ছু বাকি থাকবে না।

রাম : আপনারা শুয়ে পড়ুন গে, কোনো ভাবনা নেই।

ভবানী : না, আর ভাববো না। কাল আমার জীবন-মরণ সমস্যা। কিন্তু কেন জানি না, মনে হচ্ছে তোমাদের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। (রাম শ্যাম যদুর দৃষ্টি বিনিময়। তিনজনেই অস্বস্তি বোধ করিতেছে।)

গৃহিণী : আমি তোমায় বললাম না—ভগবান এদের পাঠিয়ে দিয়েছেন?

অরু : সত্যি, এতো ভালো লাগছে আজ! মনে হচ্ছে কতো—কতো বছর এতো আনন্দ করিনি! আর একটা গান করবেন না মেজোকাকা?

শ্যাম : না, আজ আর নয়, অনেক রাত হয়েছে।

অরু : আর এ—কটা! লক্ষ্মীটি মেজোকাকা।

রাম : (আর অস্বস্তি সহ্য করিতে না পারিয়া) না, আর না। তুমি শুতে যাও তো! (অরুর চেহারা দেখিয়া ঈষৎ নরম সুরে) যাও, শুয়ে পড়ো গে। দেখছো না আমাদের কতো কাজ বাকি?

গৃহিণী : হ্যাঁ, সত্যি কথা। অরু, আর জ্বালাস নে ওদের। আয়, বিছানা বার করি গে।

রাম : (অধৈর্য হইয়া) বিছানা লাগবে না বললাম যে!

গৃহিণী : (সহজ সুরে) জানি ভাই, লাগবে না। তোমরা আমাদের জন্যে সারারাত খেটে মরবে। তা বলে বিছানাটুকুও না পেতে দিয়ে আমি কোন মুখে গিয়ে ঘুমোই বলো তো?

(গৃহিণী অরুকে লইয়া ভিতরে গেলেন। রাম গোঁজ হইয়া হিসাবের খাতা লইয়া বসিল। শ্যাম প্রদীপগুলি ফুঁ দিয়া নিভাইতে লাগিল। যদু শুরু করিল এটা ওটা গুছাইতে।)

ভবানী : আমি—আমি বেশি কথা বলতে পারি না। কিন্তু তোমরা—তোমাদের—আমরা কোনোদিন ভুলবো না।

(ভবানীর দ্রুত প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত তিনজন স্থানু। হঠাৎ রাম হিসাবের খাতা সশব্দে বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।)

রাম : কী পেয়েছে এরা আমাদের? মাখনের ড্যালা?

শ্যাম : তুমি তো আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তুলেছো! দোকান মেরামত করবে, হিসেব সামলাবে—

রাম : (ঝাঁজিয়া) আর তুমি কি করছো শুনি পিদীম হাতে? ঘর সাজাচ্ছো?

শ্যাম : (হাতের প্রদীপটা আছড়াইয়া) সাজাচ্ছি ঘর! (ভাঙা ঠুকরোগুলিতে একটি হিংস্র পদাঘাত করিয়া) মেজোকাকা! আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কারো মেজোকাকা ছিল না।

যদু : রাগারাগি করে লাভ কী? কী করতে চাও বলো।

রাম : বিছানাটা দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ুক। তারপর তুই গিয়ে দেখিস আলমারি বাক্স খুলে—কি পাওয়া যায়।

শ্যাম : আমিও সঙ্গে যাবো। কেউ উঠে গোলমাল করলে নিকেশ করে দেবো একেবারে।

যদু : (আহত সুরে) লোকে ঘুম ভেঙে উঠে গোলমাল করবে—এমন কাজ আমার বাবা শিখিয়ে যায় নি মেজদা।

(রাম হিসেবের খাতা রাখিয়া দিতে টেবিলে গিয়াছিল, সেখানে যদুর চুবড়িটি তাহার চোখে পড়িয়াছে।)

রাম : তার চেয়ে এক কাজ কর। যাবার আগে এইটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো।

শ্যাম : ঠিক বলেছো দাদা। শোধও তোলা হবে, আপদও বিদেয় হবে। শান্তিতে ঘুম হয় না ওটার জ্বালায়।

যদু : (করুণস্বরে) ছেড়ে দিয়ে যাবো? বড়ো সখের জিনিস দাদা!

শ্যাম : যা যাঃ। জাত কেউটের বাচ্চা ওনার সখের জিনিস! তাও যদি বিষ দাঁত গালা থাকতো।

যদু : কী করবো দাদা, এটা তো পৈত্রিক বিদ্যে নয়—সখ করে শেখা। শুধু সাপ-ধরা শিখতেই বেদে ব্যাটাকে গাঁজা খাওয়াতে খাওয়াতে ফতুর হয়ে গেলাম।

শ্যাম : ভালো বিদ্যে শিখেছো। এখন ওটিকে বিদেয় করো। পরে হেলে সাপটাপ ধরে বিদ্যেচর্চা কোরো।

(নেপথ্যে দোকানের দরজায় ধাক্কা। সেই সঙ্গে কড়াগলায় হাঁক—"ভবানী! ভবানী!")

যদু : কে রে বাবা?

শ্যাম : খদ্দের?

রাম : ভাগ! ঐ খদ্দেরের গলা?—কে?

শুকদেব : (নেপথ্যে)। দরজা খোলো। আমি শুকদেব।

যদু : শকুনি!

শ্যাম : বাড়ি নেই বলে দেবো?

রাম : বাড়ি নেই বললে শুনবে? (যদুকে) যা, খুলে দে।

(যদুর প্রস্থান)

শ্যাম : তারপর?

রাম: তারপর কী?

শ্যাম : কী করবে?

রাম : কিসের কী করবো?

শ্যাম : যদি জিজ্ঞেস করে—তোমরা কে?

(শুকদেব ও জয়দেবের প্রবেশ, পিছনে যদু)

শুকদেব : (কড়া চোখে চাহিয়া) তোমরা কে?

শ্যাম : বললাম।

শুকদেব : কী বললে?

শ্যাম : দাদাতে আমাতে কথা হচ্ছিলো।

শুকদেব : কী কথা?

শ্যাম : এমন কিছু না। এই বলছিলাম—আপনি বোধ হয় এসেই জিজ্ঞেস করবেন—তোমরা কে?

শুকদেব : জিজ্ঞেস তো করেছি। জবাবটা পাইনি এখনো।

রাম : আমার নাম রাম।

শ্যাম : আমার নাম শ্যাম।

যদু : (পিছন হইতে) আমি যদু!

(শুকদেব চমকাইয়া যদুর দিকে ফিরিলেন। জয়দেব হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।)

শুকদেব : তোমার আবার কী হোলো?

জয়দেব : যাদব চক্রবর্তীর অঙ্ক মনে পড়ে গেলো বাবা—রাম শ্যাম যদু তিনজনের একত্রে দু'শো পঁচাত্তর টাকা থাকিলে—

যদু : হ্যাঁ হ্যাঁ আছে বটে! বড়ো শক্ত অঙ্কটা। হরেক রকম উত্তর বেরোয়, কোনোটা বইয়ের সঙ্গে মেলে না।

শুকদেব : (চটিয়া) আমি জানতে চাই—এতো রাত্তিরে তোমরা এখানে কী করছো? ভবানী কোথায়?

রাম : ভবানীবাবু শুতে গেছেন।

শ্যাম . অনেক রাত হয়েছে কি না?

যদু : কাল ভোরেই তো আবার—ও না, সে তো হয়েই গেলো।

শুকদেব : (প্রায় চিৎকার করিয়া) কিন্তু তোমরা কে?

রাম : আজ্ঞে, আমরা কারিগর।

শ্যাম : মেরামত, রং, সাজসজ্জা।

যদু : ক্যাবিনেট, কালার, ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

(ভবানীর শশব্যস্ত প্রবেশ)

ভবানী : এ কি, শুকদা? এ সময়ে—স্টিমার তো—

শুকদেব : স্টিমারে আসি নি।

ভবানী : সে কী? তবে কিসে এলে?

শুকদেব : সে কথা পরে হবে। আগে বলো দেখি—দোকানে আজকাল মাসে ক'হাজার লাভ হচ্ছে?

ভবানী : হাজার? কালীগঞ্জের দোকানে হাজার কী বলছো?

শুকদেব : তবে একেবারে তিন তিনটে কারিগর লাগিয়ে দিয়েছো দোকানের চেহারা ফেরাতে—ব্যাপারটা কী? পয়সা কি আজকাল খুব সস্তা হয়ে গেছে? (নেপথ্যে গাড়োয়ান হাঁকিল—"বাবুজি"!)

জয়দেব : মালপত্রগুলো নামিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দি?

শুকদেব : হ্যাঁ নামিয়ে ফেলো।—বলি তোমরা হাঁ করে কী দেখছো? যাও না একটু হাত লাগাও না? না কি শুধু বসে বসে পয়সা খেতেই শিখেছো?

ভবানী : (ব্যস্ত হইয়া) না না শুকদা, ওরা—

রাম : ঠিক আছে ভবানীবাবু, ব্যস্ত হবেন না। সব ঠিক করে দিচ্ছি।

(রাম, শ্যাম, যদু ও জয়দেব বাহিরে গেল)

শুকদেব : তুমি মনের আনন্দে দোকানের পয়সা ওড়াচ্ছো, আর ক'টা টাকা বাঁচাতে আমাদের কী হালটা আজ গেছে! মোটর ট্রাকে করে আনন্দপুর থেকে শালতিয়া—পুরো একশো সাতাশ মাইল—ধুলো, গ্যাসের গন্ধ, আর সে কী রাস্তা!

ভবানী : মোটর ট্রাক?

শুকদেব : হরিশ নন্দীর ট্রাক আসবে শুনেছিলাম। ভাবলাম কেন আর স্টিমারে গাঁটগচ্চা দি। আগেও আসা যাবে। তখন কে জানতো এমন রাস্তা?

ভবানী : তারপর শালতিয়া থেকে?

শুকদেব : নৌকো। ব্যাটা দাঁও বুজে বেশ মোটা আদায় করে নিলো। জোচ্চোরের ধাড়ি! সন্ধের ভেতর পৌঁছোবার কথা, আনাড়ি ব্যাটা চড়ায় আটকে—কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম আজ সকালে?

(গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী : (প্রণাম করিয়া) এই এতো রাত্রে কিসে এলেন?

শুকদেব : সে কথা একবার হয়ে গেছে এইমাত্র। আর বলবার দম নেই।

(অরু আসিয়া প্রণাম করিল)

অরু : ভালো আছেন জ্যাঠামশাই? পথে কষ্ট হয় নি?

শুকদেব : গুরুজনদের সঙ্গে রসিকতা করবার অভ্যেসটি তো তোমার আগে ছিল না?

(অরু চুপসাইয়া গেল। রাম শ্যাম যদুর প্রবেশ। হাতে মোটঘাট।)

রাম : কোথায় রাখবো স্যার?

শুকদেব : সে কথা বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? আমাদের তো এখনো বসবারই অবসর ঘটে নি।

ভবানী : (ব্যস্ত হইয়া) এসো এসো ভিতরে এসো। ইয়ে, মালগুলো—

রাম : ঠিক আছে, বলুন কোথায় রাখতে হবে, নিয়ে যাচ্ছি।

শুকদেব : ঐ স্যুটকেসটা আমার কাছে রাখবে।

ভবানী : হ্যাঁ, এই ঘরে—

(ভবানী ও শুকদেব মঞ্চের পিছনের দরজা দিয়া পাশের ঘরে গেলেন। পিছনে শুকদেবের স্যুটকেস হাতে রাম গেল। গৃহিণীর ইঙ্গিতে শ্যাম ও যদু অন্য মাল লইয়া তাঁহার সহিত অন্দরের দিকে বাহির হইয়া গেল। রামও মঞ্চে প্রবেশ করিয়া অবশিষ্ট মাল লইয়া অন্দরে গেল। অরু দোকানের দরজার পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। তারপর ফিরিয়া কাপড় ও চুল ঠিকঠাক করিয়া লইল। জয়দেবের প্রবেশ। প্রথমে অরুকে দেখে নাই।)

অরু : জয়দেব দা।

জয়দেব : (অস্বস্তি বোধ করিতেছে) কে, অরু? কী খবর? মানে—কেমন আছো?

অরু : ভালো। তুমি?

জয়দেব : আমি? হ্যাঁ ভালো। মানে—ঐ—একরকম আর কি?

অরু : অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোলো।

জয়দেব : হ্যাঁ তা অনেক দিন। অনেক দিন।

অরু : তুমি বোধহয় আমার কথা ভুলেই গিয়েছিলে?

জয়দেব : না না ভুলবো কেন? আমার তো—আমি তো প্রায়ই ভাবতাম—ইয়ে—(থামিয়া গেল)

অরু : কী ভাবতে?

জয়দেব : (চোখ সরাইয়া) ভাবতাম—ঐ—তোমার কথা আর কি?

অরু : (উন্মুখ) সত্যি জয়দেব-দা?

জয়দেব : হ্যাঁ সত্যি।

অরু : (আশ্বস্ত) আমি জানতাম জয়দেব-দা। আমি জানতাম—আমার ভুল হয়নি। চিঠিতে তোমার বিয়ের খবর পাবার পরে আমার খানিকক্ষণ যে কী ভাবে কেটেছে! আমি—আমি ভেবেছিলাম বুঝি সত্যি সত্যিই তুমি আর কাউকে বিয়ে করছো।

জয়দেব : কিন্তু, অরু—সত্যিই আমার—

অরু : জানি জয়দেবদা, সত্যিই তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। জ্যাঠামশাই ঠিক করেছেন। কিন্তু বুঝতে পারছো না, আমি কী প্রচণ্ড অবিচার করেছিলাম তোমার উপর? আমি ধরে নিয়েছিলাম—তুমি বিয়ে করছো! খানিকক্ষণের জন্যে আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। এমন কি সেদিনের কথাও আমার মনে পড়ে নি।

জয়দেব : কোন্‌দিনের কথা?

অরু : যেদিন সন্ধেবেলা ভীষণ বৃষ্টি এলো, আমরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম খাঁড়ির বাঁকের ঐ অশ্বত্থগাছটার নিচে। তুমি বলেছিলে—

জয়দেব : (প্রসঙ্গটি বন্ধ করিতে পারিলে বাঁচে) অরু!

অরু : আমি জানি জয়দেবদা। কিন্তু কী করবো, চিঠিটা পড়ে আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে গেলো। সেদিনের কথাও মনে পড়লো না।

জয়দেব : অরু, তুমি—

অরু : কিন্তু বিশ্বাস করো, একটু পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তখন ভাবলাম—কী করে আমি ভাবতে পারলাম—জয়দেবদা টাকার জন্যে বিয়ে করবে একটা বড়োলোকের আদুরে মেয়েকে! নিজের উপর ভীষণ রাগ হোলো। কিন্তু জানো জয়দেবদা—সেই সঙ্গে কী যে প্রচণ্ড ভার নেমে গেলো বুক থেকে, তোমাকে কী করে বোঝাবো। জানো, আজ সমস্ত সন্ধেটা আমি কী দারুণ হেসেছি, হল্লা করেছি, গান করেছি—আমার এতো ভালো লাগছিলো—

(ভিতর হইতে রাম শ্যাম যদুর প্রবেশ। দু'পক্ষেই একটি আড়ষ্ট আত্মসচেতন নীরবতা। তিনজনে মাথা নিচু করিয়া দোকানে সরিয়া পড়িল। অরু আবার জয়দেবের নিকট সরিয়া আসিল।)

অরু : জয়দেবদা।

জয়দেব : কী?

অরু : তুমি রাগ করেছো?

জয়দেব : রাগ? না না রাগ করবো কেন?

অরু : তবে কথা বলছো না যে?

জয়দেব : কথা? না, হয়েছে কী—এই সমস্ত দিনটা লরীতে আর নৌকোয়, মানে—শরীরটা ঠিক—

অরু : (অনুতপ্ত) ছি, ছি, আমি কী? নিজের কথা বলবার ঝোঁকে সব ভুলে বসে আছি। এসো ভিতরে এসো।

(অরু জয়দেবকে লইয়া ভিতরে গেল। রাম শ্যাম ও যদু সন্তর্পণে প্রবেশ করিল।)

রাম : প্রেম।

শ্যাম : মুহব্বৎ।

যদু : শাদি?

রাম : (মাথা নাড়িয়া) উঁহু!

শ্যাম : হবার নয়।

যদু : শকুনির বাচ্চা শকুনি। এক নজরে চেনা যায়।

শ্যাম : (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আহা।

রাম : তুই লম্বা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ছিস কী? একটু আগে তো গলা কাটতে গিয়েছিলি?

শ্যাম : তাতে তোমারও তো বিশেষ আপত্তি দেখলাম না?

যদু : গলা যদি একান্ত কাটতেই হয়, তবে ঐ শ—

(থামিয়া গেল। কথা কহিতে কহিতে ভবানী ও শুকদেবের প্রবেশ।)

ভবানী : পুজোর আগে অবশ্য বিক্রি একেবারে খারাপ হয়নি, তবে ব্যাপারটা হোলো—

শুকদেব : ভূমিকা তো অনেকক্ষণ থেকে শুনছি। আসল কথাটা বলো দেখি এক কথায়—গতমাসে সবশুদ্ধু বিক্রি হয়েছে কতো? মেরামতের নাম করে তিন তিনটে কারিগর লাগিয়ে আমার গলাটি যে কাটবার বন্দোবস্ত করেছো—সেটার কারণটা বুঝি।

ভবানী : গতমাসে? তা মোটামুটি—

শুকদেব : মোটামুটি নয়—কতো টাকা কতো আনা।

ভবানী : মানে, হয়েছে কী—

শুকদেব : আবার বাজে কথা?

ভবানী : গতমাসে—বিক্রি—

রাম : আটশো সাতান্নো টাকা পাঁচ আনা।

শুকদেব ও ভবানী : (একসঙ্গে) অ্যাঁ?

রাম : গতমাসে বিক্রি।

শুকদেব : তুমি জানলে কী করে?

রাম : আজ্ঞে ভবানীবাবুতে আমাতে আজ দুপুরে হিসেব মিলিয়েছি।

শুকদেব : সত্যি কথা? ভবানী?

ভবানী : মানে আটশো সাতান্নো টাকা পাঁচ আনা আমি তো জানতাম বাকি—

রাম : (তাড়াতাড়ি) আজ্ঞে হ্যাঁ, বাকি বাদ দিয়ে। বাকি ধরলে হবে গে আপনার আটশো তিয়াত্তর টাকা তেরো আনা।

শুকদেব : হতেই পারে না! কালীগঞ্জে আটশো সাতান্নো টাকা—

রাম : পাঁচ আনা, আজ্ঞে হ্যাঁ। কালীগঞ্জের সে চেহারা নেই আজকাল। লোকে টাকা হাতে করে শকুনির মতো বসে আছে, মাল আসতে না আসতে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে।

(ইতিমধ্যে খাতা খুলিয়া ফেলিয়াছে। নিপুণ হাতে অপ্রয়োজনীয় তথ্য আড়াল করিয়া টাকার অঙ্কটা দেখাইয়া দিয়াছে।)

এই যে আসুন--আটশো-সাতান্নো—পাঁচ (খাতা বন্ধ করিয়া) তবে ভবানীবাবুকে বলছিলাম আমি—এতো বাকিতে দিলে চলে না। ষোলো টাকার ওপর বাকি!

শুকদেব : ঠিক কথা! তোমাকে আমি একশোবার বলেছি ভবানী, ধারে কখনো—(সচেতন হইয়া) তা তোমার এতো মাথাব্যথা কিসের হে? তোমাকে কি দোকানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট করা হয়েছে নাকি?

রাম : আজ্ঞে না।

শুকদেব : তবে?

(অরুর প্রবেশ)

অরু : জ্যাঠামশাই, মা জিজ্ঞেস করছেন আপনি ভাত খাবেন, না লুচি?

শুকদেব : খাওয়াটা তোমাদের ভরসায় বাকি রাখি নি। তোমার মাকে বলো—বেশি আদিখ্যেতা না দেখালেও চলবে।

অরু : (থতমত খাইয়া) আচ্ছা।

শুকদেব : বরং পারো তো বিছানাটা করে দাও।

(অরুর প্রস্থান)

(আপনমনে) আটশো সাতান্নো টাকা—

রাম : পাঁচ আনা।

শ্যাম : বাকি বাদ দিয়ে।

যদু : বাকি ধরলে আটশো তিয়াত্তর—

শুকদেব : থামো! নিজের কাজ করোগে। এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছো?

যদু : আপনাকে।

(যদুর দোকানে প্রস্থান)

শুকদেব : কী??

শ্যাম : এমনটি আর দেখিনি কখনো।

(শ্যামের দোকানে প্রস্থান)

শুকদেব : *(রুখিয়া) কী বললে?*

রাম : *(কায়দা করিয়া পথ আটকাইয়া)* ভবানীবাবু তা হলে ওটা ঠিক করে ফেলুন—ক্রোম ইয়েলো না হুকার্স গ্রীন?

ভবানী : কিসের গ্রীন?

রাম : জানলাগুলোর কথা বলছিলাম। ক্রোম ইয়েলোই ভালো—স্কার্লেট বর্ডার দিয়ে দেবো। (শুকদেবকে) আপনি কী বলেন? তাই ভালো হবে না?

শুকদেব : আমি বলি কথা কম বলে একটু কাজ দেখাতে। এসে অবধি তো কিছু করতে দেখলাম না।

ভবানী : শুকদা, ওরা—

শুকদেব : তুমি থামো দিকি! ওরা তোমার গুরু-পুত্তুর সব! কতো করে রোজ দিচ্ছো এদের, শুনি?

(শ্যাম ও যদুর মাথা পার্টিশনে)

ভবানী : রোজ? রোজ দিচ্ছি?

রাম : আজ্ঞে আমার পাঁচ—ওদের তিন তিন।

(দোকানে প্রস্থান। অল্প পরে তাহার মাথাও পার্টিশনে দেখা দিল।)

শুকদেব : এগারো টাকা দিন!! তুমি পেয়েছো কী ভবানী? ব্যবসা লাটে ওঠাবে?

ভবানী : শুকদা, এরা আমার কাছে এক পয়সা নেয় নি। আমার বিপদ শুনে নিজে থেকে বিনা পয়সায় খেটে দিতে রাজি হয়েছে।

শুকদেব : বিপদ? কিসের বিপদ?

ভবানী : না—ঠিক বিপদ নয়। মানে—ভেবেছিলাম তোমরা আসার আগে দোকানটাকে একটু ভালো করে—

শুকদেব : অর্থাৎ আমাদের আসাটা তোমার কাছে একটা বিপদ?

ভবানী : না না, তা কেন হতে যাবে?

শুকদেব : অতো না না করবার দরকার নেই ভবানী। আমি শুনে খুশিই হয়েছি। এখন কতকগুলো স্পষ্ট কথা জানিয়ে দেবার সুযোগ হোলো।

ভবানী : শুকদা—তুমি—আমি মোটেই—

শুকদেব : তোৎলামি না করে যা বলছি একটু মন দিয়ে শোনো। এ ব্যবসাটা আমার। তুমি ম্যানেজার, সে কথাটা মনে আছে?

ভবানী : আছে।

শুকদেব : ম্যানেজারি তুমি কীরকম করছো আমি কিছু কিছু খবর রাখি। কাল সকালে

সমস্ত হিসেব আমি দেখবো। আটশো সাতান্নো টাকার যদি সত্যি সত্যি বিক্রি হয়ে থাকে গতমাসে—তো ভালো কথা। তোমার ম্যানেজারি টিঁকবে। আর যদি গোলমাল কিছু দেখি তো সত্যিই বিপদ।

ভবানী : শুকদা, তোমাকে সত্যি কথা খুলে বলছি—আটশো সাতান্নো—

শুকদেব : সত্যি কথা খাতা দেখলেই বুঝতে পারবো। আর একটা কথা জেনে রাখো। যদি মতলব করে থাকো—তোমার মেয়ের সঙ্গে জয়দেবের বিয়ে দিয়ে সব দিক সামলাবে, তবে খুব ভুল করেছো।

ভবানী : মতলব?

শুকদেব : ন্যাকা সেজো না। বুঝি সবই। শুধু আমি কেন, জয়দেবও বোঝে। ও অতো কাঁচা ছেলে নয় যে, দু'খানা কয়লা খনি ছেড়ে দিয়ে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে। অতএব ও আশা ছাড়ো।

(শুকদেবের প্রস্থান। রাম শ্যাম যদুর প্রবেশ।)

ভবানী : মতলব? আমি মতলব করেছি?

রাম : আজ্ঞে না।

ভবানী : (চমকাইয়া) অ্যাঁ?

রাম : মতলব করেছে শুকদেব রায়। কাল সকালে আটশো সাতান্নো টাকা পাঁচ আনা বিক্রির খাতে না দেখে বাকির খাতে দেখলে আপনাদের বাস্তুহারা করবে।

ভবানী : বাস্তুহারা করবে? বাড়ি তো আমার!

রাম : তাতে ঠেকাবে না।

ভবানী : তবে উপায়?

রাম : খুব সোজা। টাকাটাকে বাকি থেকে বিক্রিতে আনতে হবে।

ভবানী : তা কেমন করে হবে?

রাম : ভাববেন না। আমার উপর ছেড়ে দিন। আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

(রাম খাতা লইয়া বসিল। যদু চেয়ার আগাইয়া দিল। শ্যাম কলম।)

ভবানী : তার মানে—হিসেব সব অদল বদল করবে?

রাম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভবানী : যা নয়, তাই দেখিয়ে দেবে?

রাম : ঠিক ধরেছেন। এবং এমন ভাবে দেখাবো যে তার মধ্যে একটি খুঁত বের করা শুকদেব রায়ের পিতার সাধ্য হবে না।

শ্যাম : আপনাকে তো আগেই বলেছি—ইনি এক্সপার্ট।

ভবানী : কিন্তু এ তো—এ তো—জালিয়াতি!

রাম : জালিয়াতি নয়, অঙ্ক। হায়ার ম্যাথামেটিক্স্। ওদিকে গেলো ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস, আর এ ব্র্যাঞ্চটা হোলো ইন্টারন্যাল ম্যানিপুলাস্। (রাম খাতায় ডুবিয়া গেল)

শ্যাম : কিছু ভাববেন না ভবানীবাবু। দুনিয়াটাই অঙ্ক। বাড়িঘর বানাতেও অঙ্ক, রাখতেও অঙ্ক।

যদু : মেজদা অনেক অঙ্ক কষে ঠিক উত্তরটি পেয়েছিলো বলে আজ দেখতে পাচ্ছেন। নইলে কবে শিল চাপা পড়ে মরতো।

শ্যাম : তাতেও দেখা পেতেন না, যদু দড়ি আর দেওয়ালের অঙ্কটা ঠিক মতো করতে না পারলে—

ভবানী : আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

(সহসা শুকদেবের প্রবেশ)

শুকদেব : ভবানী, ভেবে দেখলাম হিসেবটা আজ রাতেই দেখে ফেলা ভালো। এ কী? তুমি খাতা নিয়ে কি করছো?

রাম: তিন শিশি ব্লু-বেল বিক্রি হয়েছে আজ, খাতায় তোলা হয় নি।

শুকদেব : (খাতা টানিয়া) কাল তুলো।

রাম : (খাতা আঁকড়াইয়া) কিন্তু—নগদ বিক্রি, গোলমাল হয়ে যাবে—

শুকদেব : (কাড়িয়া লইয়া) হোক। তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

(শুকদেবের খাতা লইয়া প্রস্থান। অল্পক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর রাম টেবিলে একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল।)

রাম : শ্‌-শালা।

ভবানী : (শান্তকণ্ঠে) ভালোই হোলো।

রাম : ভালোই হোলো?

ভবানী : হ্যাঁ ভাই, ভালোই হোলো। আমি চিরদিন সাদা লোক, সাদা পথে চলে এসেছি। আর কিছু বুঝি না। তোমাদের পথ হয়তো ঠিক পথ, তাতে হয়তো বিপদ বাঁচে। কিন্তু ও রাস্তায় চলা যে আমার মতো লোকের কর্ম নয় ভাই।

(অক্ষমতার এমন সরল স্বীকারোক্তির পর রামের কিছু বলিবার রহিল না। শ্যাম-যদুও গুম হইয়া রহিল।)

ও নিয়ে আর ভেবো না। তোমরা আমাদের জন্যে যা করেছো, চিরদিন মনে রাখবো। কাল যা হবার হোক।

(ভবানীবাবুর প্রস্থান। অল্পক্ষণ চুপচাপ।)

রাম : আর একটি মাত্র উপায় আছে।

শ্যাম : আমিও তাই ভাবছিলাম।

যদু : কিন্তু কী করে হবে? সে যে শকুনির বাচ্চা?

রাম : শেষ চেষ্টা। তোমার আমার দ্বারা হবে না। অরুকে দরকার। শ্যাম!

শ্যাম : বলো।

রাম : অরুকে ডাকতে হবে এখানে। তার পাঁচ মিনিট পরে জয়দেবকে চাই। যদু, পারবি?

যদু : খুব পারবো। বলবো—অরুর হঠাৎ খুব শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে, তোমাকে খুঁজছে।

রাম : তাই বলিস। শ্যাম, অরুকে ডাক।

(শ্যাম অন্দরের দরজা অবধি গিয়া ফিরিয়া আসিল)

শ্যাম: অরু নিজেই আসছে।

রাম : এখানে আসছে? ভালোই হয়েছে। যদু তুই জয়দেবকে ম্যানেজ করবি, অরুকে আমরা দেখছি।

(অরুর প্রবেশ)

অরু : কাকাবাবু, আপনারা কিছু মনে করেন নি তো?

(যদুর ভিতরে প্রস্থান)

রাম : কিসের জন্যে?

অরু : এই—জ্যাঠামশাইয়ের ব্যবহারে? জ্যাঠামশাই ঐ রকমই, ভালো করে কথা বলতে জানেন না। আমি তো দু' চক্ষে দেখতে পারি না। আগে তবু পারতাম, কিন্তু এখন—

রাম : এখন কী হয়েছে?

অরু : জানেন? জয়দেবদার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন এক বড়োলোকের আদুরে মেয়ের সঙ্গে। স্রেফ টাকার লোভে—ভাবতে পারেন?

রাম : ভাবা শক্ত। জয়দেব কী বলে?

অরু : জয়দেবদা কক্ষনো ওখানে বিয়ে করবে না।

রাম : ঠিক জানো?

অরু : (চমকাইয়া) ও কথা বলছেন কেন?

রাম : অরু, আমরা সবাই জানি তুমি জয়দেবকে বিয়ে করতে চাও। না না, লজ্জা পাবার কিছু নেই এতে।

অরু : না, লজ্জা করবো না। আপনি বলুন কেন জিজ্ঞেস করলেন—ঠিক জানি কি না?

রাম : জয়দেব তার বাবাকে খুব ভয় করে। ঠিক কি না?

অরু : (ধীরে ধীরে) তা বোধহয় করে।

রাম : ওর বাবা যদি জোর করে ওর বিয়ে দেয়?

অরু : (পাংশু মুখে) না—না, এ হতেই পারে না।

রাম : হতে পারে। যদি না তুমি একটি কাজ করো।

অরু : কী কাজ?

রাম : জয়দেবকে বলতে হবে—ওর বাবা যাই বলুক, যাই করুক ও যেন তোমাকেই বিয়ে করে।

অরু : কিন্তু জয়দেবদা তো আমাকে অনেকবার বলেছে—

রাম : আবার বলাও।

অরু : বড়ো গাঙের জল ছুঁয়ে, অশ্বত্থপাতা হাতে করে, চন্দ্র সূর্য সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছে—

রাম : আবার প্রতিজ্ঞা করাও। বড়োগাঙ দরকার নেই, ঐ বাগানে পুকুর ঘাটে চলে যাও। ওখানে অশ্বত্থগাছ আছে?

অরু : না।

রাম : কী আছে?

অরু : পেয়ারা গাছ।

রাম · ওতেই হবে। বেশি করে পেয়ারা পাতা ছিঁড়ে নাও। চন্দ্র সূর্য আকাশ বাতাস ঘাস জল সব কিছু সাক্ষী করাও। মোট কথা, এমন একটা ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা গেঁথে ফেলো যা শুকদেব রায় এক ইঞ্চিও না টলাতে পারে।

শ্যাম : ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা? দাদা, ভীষ্ম যে বিয়ে করবে না বলে—

রাম : আঃ চুপ কর! অরু বুঝেছে ঠিক। যাও অরু—

অরু : কিন্তু কাকাবাবু—

রাম : সময় নষ্ট কোরো না অরু, চলে যাও।

(বাগানের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল)

অরু : কিন্তু জয়দেবদাকে কোথায় পাবো?

রাম : সে আমরা দেখছি। তুমি পুকুর ঘাটে বসে থাকো।

(অরুর বাগানে প্রস্থান)

অ্যাটমোসফীয়ার দরকার। শ্যাম তুই তো বাঁশি বাজাতে পারিস?

শ্যাম : পারি তো অল্পস্বল্প। কিন্তু বাঁশি পাবো কোথা?

রাম : দোকানে আছে দেখেছি। দাঁড়া নিয়ে আসছি।

(রামের প্রস্থান। যদু ও জয়দেবের প্রবেশ।)

জয়দেব : কই কোথায় অরু?

শ্যাম: বাগানে গেলেন। পুকুরঘাটে।

জয়দেব : পুকুরঘাটে? শরীর খারাপ বল্‌লে যে?

শ্যাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন শরীর খুব খারাপ লাগছে, আপনাকে ডেকে আনতে। বলে পুকুর ঘাটে গেলেন। তা আমরা কারিগর মানুষ, অতো তো বুঝি না? যেমন বলেছেন, তেমন করেছি।

জয়দেব : ও আচ্ছা, ঠিক আছে। (বাগানের দরজায় গিয়া) বড়ো অন্ধকার যে?

যদু : এই যে আসুন—

(একটি দিয়াশলাই বাড়াইয়া দিল। জয়দেবের প্রস্থান। রামের বাঁশি লইয়া প্রবেশ।)

রাম : গেছে?

শ্যাম : গেছে।

রাম : এই নে। একটা সুবিধেমতো ঝোপ দেখে বসে তান ছাড়বি।

(শ্যামের বাঁশি লইয়া বাগানে প্রস্থান)

যদু : মেজদা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেবে? বাঃ!

রাম : একখানা চাঁদ বড়ো দরকার ছিল।

যদু : কালীপুজোর রাতে চাঁদ আর পাচ্ছো কোথায়?

রাম : যাক্‌গে। শ্যামের বাঁশি আছে, পুকুরের জল আছে, পেয়ারাপাতা আছে, ওতেই চলে যাবে।

যদু : পেয়ারাপাতা? পেয়াবাপাতা কী হবে?

রাম : ও সব সূক্ষ্ম জিনিস তুই বুঝবি নে। তুই বরং গিয়ে কাছেপিঠে ঘাপটি মেরে বোস। কদ্দূর এগুলো রিপোর্ট করে যাবি।

(বাগানে শ্যামের বাঁশি শুরু হইল)

যদু : আড়ি পেতে শুনবো? সেটা কি ভাল হবে?

রাম : এখন এতো ভাবতে গেলে চলে না। তেমন তেমন কিছু শুনলে কানে হাত চাপা দিস্।

যদু : আর যদি তেমন তেমন কিছু দেখি? আমার চোখ যে অন্ধকারেও চলে দাদা!

রাম : চোখ বন্ধ করে ফেলিস। যা চলে যা।

(যদুর প্রস্থান। রাম পায়চারি করিতে লাগিল। গৃহিণীর প্রবেশ।)

গৃহিণী : তোমাদের বিছানার ব্যবস্থা আর করতে পারলাম না ভাই। যা ছিল ওদের দিয়ে দিতে হোলো।

রাম : তাতে কী হয়েছে? আপনি শুয়ে পড়ুন গে। আমরা বেশ আছি।

গৃহিণী : যা ভেবেছিলাম তাই হোলো শেষ পর্যন্ত। ভিটেটা গেলো।

রাম : আমারই দোষ। সারাদিন ফাঁকি না দিয়ে হিসেবটা সামলে রাখলেই হোতো।

গৃহিণী : না ভাই, সে হোতো না। উনি যে রকম লোক, নিজেই সব বলে দিতেন।

রাম : ভাবছেন কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

গৃহিণী : কী করে আর হবে?

রাম : জয়দেব যদি অরুকে বিয়ে করে—

গৃহিণী : করবে না। জয়দেবকে আমি চিনে গেছি।

রাম : জয়দেব কি অরুকে একটুও ভালবাসে না?

গৃহিণী : বাসে হয়তো। তার চেয়ে বেশি ভালবাসে টাকা। বাপের রক্ত।

রাম : হুঁ।

গৃহিণী : ভালো কথা, অরুকে দেখেছো?

রাম : না তো? শুয়ে পড়েছে বোধহয়।

গৃহিণী : কই দেখলাম না তো?

(মহা উৎসাহে যদুর দ্রুত প্রবেশ)

যদু : দাদা, জমে গেছে (গৃহিণীকে দেখিয়া সামলাইয়া) জমে গেছে, মানে গলাটা জমে গেছে—দাদা তোমার কাছে লবঙ্গ আছে?

গৃহিণী : আমি দিচ্ছি। এই হিমে বাগানে ঘুরছিলে বুঝি?

রাম : আপনাকে দিতে হবে না। ঐ ডিশে মশলা আছে দেখ। আপনি শুয়ে পড়ুন।

(গৃহিণীর প্রস্থান)

যদু : কেল্লা ফতে দাদা? জয়দেব বলছে—দুনিয়ার যতো টাকা কয়লাখনি শকুনি ফকুনি সব যদি এক দিকে থাকে, আর অরু যদি অন্য দিকে থাকে, তবে সে মালকোঁচা মেরে অরুর দিকেই লাফ দেবে।

রম : এই কথা বলেছে?

যদু : ঠিক এই ভাষায় বলেনি, তবে মোদ্দা কথাটা এই। (বাঁশি থামিয়া গেল)

রাম : কী হোলো, বাঁশি থামলো যে?

যদু : ফিরে আসছে বোধহয়।

রাম : এদিকে চলে আয়।

(রাম ও যদুর দোকানে প্রস্থান। অল্প পরে হাত ধরাধরি করিয়া জয়দেব ও অরুর প্রবেশ। রাম ও যদুর মাথা পার্টিশনে।)

অরু : মনে থাকবে তো জয়দেবদা?

জয়দেব : নিশ্চয়ই।

অরু : যদি জ্যাঠামশাই বলেন (শুকদেবের গলা নকল করিয়া) বাজে বোকো না জয়দেব। আমি যা ঠিক করেছি তাই হবে।

জয়দেব : আমি বলবো—না বাবা, আমাকে মাপ করো। আমি অরুকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

অরু : আরো জোর দিয়ে বলতে হবে!

জয়দেব : (বীরদর্পে) না বাবা, আমাকে মাপ করো। আমি অরুকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।

অরু : (জয়দেবের দুইহাত ধরিয়া) জয়দেবদা!

(সহসা শুকদেবের প্রবেশ)

শুকদেব : জয়দেব! (অরু ও জয়দেব ছিটকাইয়া সরিয়া গেল) জয়দেব, শুতে যাও!

জয়দেব : বাবা—

শুকদেব : শুতে যাও। (জয়দেব ভিতরের পথে এক পা অগ্রসর হইল)

অরু : জয়দেবদা! (জয়দেব দাঁড়াইয়া গেল)

শুকদেব : কথা কানে গেছে জয়দেব? (জয়দেব ইতস্তত করিতে লাগিল)

অরু : বলো জয়দেবদা!

(জয়দেবের ঠোঁট নড়িল, আওয়াজ বাহির হইল না)

শুকদেব : কী বলবে? কিছু বলবার নেই ওর।

অরু : (মরিয়া হইয়া) হ্যাঁ আছে। জয়দেবদা বলেছে—ও কিছুতেই রণধীর চৌধুরীর মেয়েকে বিয়ে করবে না।

শুকদেব : তবে কাকে বিয়ে করবে? তোমাকে?

অরু : হ্যাঁ।

শুকদেব : মিছে কথা বোলো না। জয়দেব ওকথা বলতেই পারে না।

অরু : জয়দেবদা।

জয়দেব : (দুর্বলস্বরে) বাবা, আমাকে মাপ করো—আমি—আমি ইয়ে—

শুকদেব : বাজে বোকোনা জয়দেব। আমি যা ঠিক করেছি তাই হবে। যাও শুতে যাও।

(জয়দেব অরুর দিকে না চাহিয়া সুড়সুড় করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল)

অরু : জয়দেবদা!

শুকদেব : বাপ মা অনেক কিছু শিখিয়েছে দেখছি।

অরু : জ্যাঠামশাই!!

শুকদেব : চেঁচিও না। ভেবেছিলে জয়দেবকে ভুলিয়ে আমার সম্পত্তিটি হাতাবে? সে তোমার মতো একরত্তি মেয়ের কম্মো নয়। বুঝলে? জয়দেব অতো বোকা ছেলে নয়।

অরু : (চিৎকার করিয়া) আপনার চালাক ছেলেকে নিয়ে আপনি থাকুন! কে চায় আপনার ছেলেকে বিয়ে করতে? ভীতু কাপুরুষ কেঁচো একটা—

শুকদেব : দ্রাক্ষাফল টক বলে যদি বুঝে থাকো—তোমারই মঙ্গল। এখন যাও ঘুমোও গে। আর বেশিদিন বোধহয় ঘুমোতে হবে না এ বাড়িতে। হিসেবের খাতায় ভালো ভালো জিনিস পাচ্ছি আমি।

(শুকদেবের প্রস্থান)

অরু : শকুনি কোথাকার! পিশাচ!

(রাম ও যদুর প্রবেশ। শ্যামও আসিল বাগান হইতে।)

কাকাবাবু, ঐ—ঐ কেঁচোর সঙ্গে আপনারা আমার বিয়ে দেবেন?

রাম : আমরা বিয়ে দেবো?

অরু : আপনিই তো বললেন পুকুর ঘাটে যেতে, প্রতিজ্ঞা করাতে। কী হোলো তাতে? আপনারা ভালো লোক—মানুষ চেনেন না?

রাম মানুষ চিনি না?

অরু : কিচ্ছু চেনেন না! সবাইকে মনে করেন ভালো। ওর বাবা শকুনি, ও হচ্ছে—ও হচ্ছে শকুনির বাচ্চা!

রাম : অরু!

অরু : না আমি বলবো। যা ইচ্ছে তাই বলবো! আপনারা যা খুশি ভাবুন আমাকে। কী ইচ্ছে হচ্ছে আমার জানেন?

রাম কী ইচ্ছে?

অরু : শুনলে আপনারা চমকে যাবেন!

শ্যাম : তবু শুনি?

অরু : ইচ্ছে করছে ঐ শকুনিকে গলা টিপে খুন করে ফেলি! শুনলেন তো? সত্যি কথা বললাম। এখন যতো ইচ্ছে নিন্দে করুন আমাকে—আমার কিচ্ছু এসে যায় না!

(অরুর ঝড়ের মতো ভিতরে প্রস্থান)

যদু : যাব্বাবা!

রাম : শ্যাম।

শ্যাম: উঁ?

রাম : শুনলে তো?

শ্যাম : হুঁ।

রাম : তাহলে বিচার হোক। (রাম বিচারের ভঙ্গীতে টেবিলের সামনে চেয়ার পাতিয়া বসিল। দুইদিকে দুইজন।) যদু, প্রসিকিউশন শুরু করো।

যদু : আসামী হাজির? হাজির—ও ঘরে। ধর্মাবতার। আসামী শুকদেব রায়, ওরফে শকুনি ছোটবেলা থেকেই সরল সিঁধকাঠির পথে না গিয়ে অসৎ পথে বহু অর্থ অপহরণ করেছে, বহু লোককে সর্বস্বান্ত করেছে। তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে অন্যায়ভাবে চুক্তি ভঙ্গ করে নিজের ছেলের সাহায্যে দু'টো কয়লার খনি আয়ত্তের চেষ্টায় আছে। উপরন্তু বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায় নিরীহ ভবানীবাবুকে সপরিবারে বাস্তুহারা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে অবৈধভাবে হিসেবের খাতা নিয়ে দেখছে। আশা করি, ধর্মাবতার আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে সুবিচারে পরাকাষ্ঠা দেখাবেন।

রাম : প্রতিবাদী পক্ষের কী বক্তব্য?

শ্যাম: ধর্মাবতার। আসামী যা কিছু করেছে, মতিভ্রমে করে ফেলেছে। অতএব আমার অনুরোধ—ধর্মাবতার যেন আসামীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। এবং আর যাতে সে এরকম মতিভ্রমে কষ্ট না পায়, তার জন্য আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

রাম : আসামীর কিছু বলবার আছে? (কান পাতিয়া শুনিয়া) কিছু বলবার নেই। আসামীর প্রাণদণ্ড হোলো।—কী পদ্ধতি?

শ্যাম: ছুরি।

যদু : ফাঁসি।

রাম : উঁহু। অরু যা বলেছে। গলা টেপা। নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার। চল।

(তিনজন চলিল। দরজা অবধি গিয়া রাম ফিরিল।)

যদু : কী হোলো দাদা?

রাম : হবে না।

শ্যাম : কেন?

রাম : পুলিসে এদের ধরবে। (তিনজনে বসিল)

শ্যাম : তাহলে?

যদু : দাদা, হয়েছে! (চুবড়িটি আনিয়া সামনের টেবিলে রাখিল)

রাম : কী আশ্চর্য! এইটা মাথায় আসেনি এতোক্ষণ?

শ্যাম : দুর্ঘটনা! কালীগঞ্জের বিশেষ সংবাদ-দাতা প্রেরিত তারে প্রকাশ বিখ্যাত ব্যবসায়ী শুকদেব রায় কালীপূজার রাত্রে সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

(তিনজনে মহোৎসাহে যাত্রা করিল। কিন্তু রাম আবার থামিয়া গেল।)

যদু : আবার কী হোলো?

রাম : গোলমাল আছে।

শ্যাম : কিসের গোলমাল? কালীগঞ্জের বিশেষ সংবাদদাতা—

রাম : ও কথা নয়। বিবেকের প্রশ্ন।

শ্যাম : (অত্যন্ত গম্ভীর) বিবেকের প্রশ্ন?

যদু : (অনুরূপ গম্ভীর) বোসো মেজদা। —বলো দাদা।

রাম : যদি পেশার খাতিরে খুন করি— সেটা ন্যায্য। যদি আত্মরক্ষায় খুন করি—সেটা ন্যায্য।

শ্যাম : আলবাৎ।

রাম . ভবানীবাবুর বাড়ি লুঠ করতে যদি সপরিবারে তাদের গলা কাটতে হোতো— ন্যায্য হোতো।

যদু : ঠিক কথা।

রাম: কিন্তু ভবানীবাবুদের উপকার করা আমাদের পেশার বাইরে। সেটা সখ। যদুর সাপ ধরা, শ্যামের বাঁশি বাজাবার মতো সখ। সখের জন্য খুন করতে গেলে বিবেকে আটকায়।

শ্যাম : তাই তো।

রাম : বিবেক না থকলে আর আমাদের রইলো কী? আমরা তো আর পাঁচটা লোকের মতো হয়ে গেলাম?

শ্যাম: বটেই তো।

যদু : (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, যদি শুকদেবের জিনিসপত্র চুরি করি—তাহলে?

রাম : (অবজ্ঞাভরে) ছেলেমানুষের মতো কথা বললি যদু। শুকদেবের জিনিস চুরি

আগে তোর মাথায় এসেছিলো? ওরকম করে নিজেকে ঠকাতে যদি পারিস তো এ সমাজে আছিস্ কেন? চলে যা না—ঐ সমাজে!

যদু : (সঙ্কুচিত) ভুল হয়ে গেছে দাদা। আর কখনো বলবো না।

শ্যাম : তবে উপায়?

রাম : (অল্প থামিয়া) আর কোনো উপায় নেই।

(তিনজনে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা হিসাবের খাতা লইয়া শুকদেবের প্রবেশ।)

শুকদেব : এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। আটশো সাতান্নো টাকা পাঁচ আনা বিক্রি, না? জোচ্চোরের ধাড়ি! কদ্দিন এ ব্যবসা চালাচ্ছো, শুনি?

রাম : (অবিচলিত) তিন পুরুষ। আপনি?

শুকদেব : (থমকাইয়া) কী বললে?

রাম : বলছিলাম—তিন পুরুষ ধরে এই ব্যবসা চালাচ্ছি। এটা আমার জাতধর্ম।

শুকদেব : তুমি—তোমরা সব তাহলে পেশাদার চোর!

শ্যাম : আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি—শৌখিন?

শুকদেব : মুখ সামলে কথা বোলো বলে দিচ্ছি!

শ্যাম : ভুল হয়ে গেছে। আপনি পেশাদার 'সাধু'!

('সাধু' কথাটিতে একটি চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা ঢালিয়া দিল)

শুকদেব : তোমাদের—তোমাদের আমি পুলিসে দেবো!

যদু : দিয়ে ফেলুন।

শুকদেব : কী কী চুরি করেছো আমার দোকান থেকে—তার হিসেব দাও!

রাম : আপনি তো ভালো হিসেব বোঝেন, নিজে দেখে নিন না?

শুকদেব : এই তো! এই তো! নিশ্চয়ই আমার দোকান থেকে চুরি। (চুবড়িটি তুলিয়া লইলেন। ইহারা নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, এক ইঞ্চি নড়িল না।)

রাম : (ভারি গলায়) ওটায় হাত দেবেন ননা।

শুকদেব : কেন শুনি? (খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন)

রাম : ওটা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

শুকদেব : বটে! (চেষ্টা করিতে করিতে) খোলে কী করে!

রাম : শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি—যেখানে ছিল রেখে দিন। নইলে ভালো হবে না।

শুকদেব : চোপরাও! চোর কোথাকার! সব ব্যাটাকে পুলিসে দেবো আমি! বামাল সমেত ধরা পড়েছে—আবার চোখ রাঙায়।

(চুবড়ি লইয়া নিজের ঘরে প্রস্থান)

যদু : (অল্প পরে) দাদা?

রাম : উঁ?

যদু : আর কি আমাদের কোনো দায়িত্ব আছে?

রাম : সেই কথাটাই ভাবছিলাম।

শ্যাম: একবার সাবধান করে দেওয়া উচিত।

যদু : সে তো দাদা করেছে?

শ্যাম : না, সব কিছু খুলে বলে—মানে ওটা খুললে কী হবে বলে—সাবধান করার কথা বলছি। তুমি কী বলো দাদা?

রাম : ঠিক। তা না হলে বিবেক থাকে না। কে যাবে?

যদু : তুমি যাও দাদা—তুমি বড়ো।

রাম : আমার কোনো কথা বিশ্বাস করছে না। তুই যা না?

যদু : আমাকে বোধহয় ওর ভালো লাগেনি। দেখলেই চটে যায়। মেজদা যাও না?

শ্যাম : যাবো? (উঠিল) আমার কেমন যেন লজ্জা করছে। লজ্জা পেলে আমার আবার কথা আটকে যায়।

রাম : বুঝেছি। যদু, যা দোকান থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়ে আয়।

(যদুর দোকানে প্রস্থান)

শ্যাম : আচ্ছা যদি—

রাম : কী?

শ্যাম : না, কিছু না। একটা কথা ভাবছিলাম।

(তাস লইয়া যদুর প্রবেশ)

যদু : এই যে দাদা।

(রাম তাস ভাঁজিয়া টেবিলে রাখিল। শ্যাম কাটিয়া দিল। যদু প্রথম তাসটি তুলিল। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল তাসটি নিচু দরের। শ্যাম বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই তুলিল। কিন্তু মুখের ভাব বদলাইয়া গেল—তাহার তাসটি আর এক ধাপ নিচে। রাম প্রায় হাসিমুখে তাস তুলিয়া একেবারে চুপসাইয়া গেল।)

যদু : দাদা। (রাম গিয়া দরজা ঠেলিল)

রাম : বন্ধ যে?

শ্যাম : যদু।

(যদু উঠিয়া একটি দগ্ধ ফুলঝুরির তার দরজার খাঁজে গলাইয়া মুহূর্তে দরজা খুলিয়া ফেলিল। রাম এক পা গিয়া ফিরিয়া আসিল।)

রাম : কী বলবো গিয়ে?

শ্যাম : বলো—ও চুবড়িটা খোলা—আপনার পক্ষে—ভালো হবে না। যদি খোলেন—তবে হয়তো একটা—একটা অপ্রীতিকর এবং—দুঃখজনক ঘটনা—ঘটে যেতে পারে। যাও? জানিয়ে দাও?

(রামের প্রস্থান। রাম কমপক্ষে এক মিনিট মঞ্চে থাকিবে না। এই সময়টা একটি কথাও হইবে না। শুধু শ্যাম ও যদুর উৎকণ্ঠিত মূকাভিনয় চলিবে। তারপর রামের প্রবেশ, ধীরে ধীরে, চিন্তিত মুখে।)

শ্যাম : জানিয়ে দিয়েছো?

রাম : (অল্প থামিয়া) ও নিজেই জেনে গেছে। (অল্পক্ষণ চুপচাপ)

যদু : দাদা, বিবেক?

রাম : বিবেক পরিষ্কার। আমাদের কর্তব্য যথাবিধি করেছি। শুকদেব রায়ের প্রাণদণ্ড ন্যায়শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কার্যকরী হয়েছে।

শ্যাম : (পবিত্র গাম্ভীর্যে দুই হাত তুলিয়া) ওঁ শান্তি। (তার পরেই দুই হাত ঘষিয়া) এবার?

রাম: শকুনির স্যুটকেসটা দরকার।

(শ্যাম শুকদেবের ঘরে গেল)

যদু : স্যুটকেস কী হবে?

রাম : একজনের এন্তেকাল হলে তার বিষয় আশয়ের ব্যবস্থা করতে হবে না?

যদু : কী ব্যবস্থা করবে?

রাম : সেটা তোর ডিপার্টমেন্ট নয়। তুই শুধু স্যুটকেসটা খুলে দিবি।

(স্যুটকেস লইয়া শ্যামের প্রবেশ)

যদুকে দে। (শ্যাম টেবিলে স্যুটকেসটি রাখিল। যদু বসিয়া সাবধান হাত বুলাইল। তারপর চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।)

শ্যাম : চোখ বন্ধ করলি যে?

যদু : অন্ধকারে কাজ করা অভ্যেস যে?

(যদু আরও একটু হাত বুলাইয়া ডালায় আস্তে এক ঘা মারিল। ডালাটি খুলিয়া গেল।)

শ্যাম : বাঃ! (রাম ভিতরে ঘাঁটিয়া একটি কাগজ বাহির করিল)

রাম : এই যে।

যদু : কী?

রাম : কী আবার? উইল। (পড়িয়া) শালা!

শ্যাম : কী হোলো?

রাম : নতুন উইল। রণধীর মল্লিকের মেয়েকে বিয়ে না করলে জয়দেব পুরো সম্পত্তি পাবে না।

শ্যাম : ঐ কেঁচোর সঙ্গে বিয়ে দেবে অরুর?

রাম : তা কী করবো? মুহব্বৎ যে? তার উপর সম্পত্তির ব্যাপার!

শ্যাম : কিন্তু যদি জয়দেবের ব্যবহারে অরুর মুহব্বৎ ছুটে গিয়ে থাকে?

যদু : অরু জয়দেবকে শকুনির বাচ্চা বলেছে—মনে আছে?

রাম : যাব্বাবা! তোরা আবার মনস্তত্ত্ব এনে ফেললি! অতো বুঝি না বাবা, কী করতে হবে বলে দে।

শ্যাম: যদু কী বলিস?

যদু : আমি কী বলবো? থিয়েটার সিনেমায় বিয়ে দু'একটা হয় শেষ দিকে—দেখেছি।

শ্যাম : তবে দাও লাগিয়ে।

যদু : বাড়িটা আর দোকানটার একটা পাকা ব্যবস্থা করে দিও।

রাম : তথাস্তু।

(রাম উইল লইয়া বসিল)

তৃতীয় অঙ্ক

(একই ঘর। শেষ রাত্রি। শ্যাম সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিতেছে এবং হাতের ছাতা দিয়া আসবাবপত্র ঠুকিয়া দেখিতেছে। ছাতাটি নূতন, ভবানীবাবুর দোকান হইতে লওয়া। পার্টিশনের ওপারেও ঐরূপ ঠুকিবার আওয়াজ। যদু প্রবেশ করিল শুকদেবের ঘর হইতে—পিছু হাঁটিয়া। তাহার হাতে চুবড়ি—ডালা খোলা। শ্যামের সহিত ধাক্কা লাগিতেই শ্যাম আঁতকাইয়া লাফাইয়া উঠিল।)

যদু : দেখতে পাইনি মেজদা।

শ্যাম: পেলি?

যদু : উঁহু।

শ্যাম : গোড়া থেকে বলে আসছি—সাপ নিয়ে খেলা করিস নি! এ-সব খেলা করবার জিনিস নয়।

যদু : খেললো তো শকুনি? খেলা হয়ে গেলে জিনিসটা যে গুছিয়ে রাখবে—সে জ্ঞানটুকুও নেই।

(রামের প্রবেশ। হাতে আর একটি ছাতা অথবা অনুরূপ কোনও বস্তু।)

রাম : পাওয়া গেলো?

শ্যাম: ও আর পেয়েছো। যখন পাবে তখন সঙ্গে আর একটি বস্তু পাবে।

রাম : কী বস্তু?

শ্যাম : অক্কা।

যদু : তুমি বড়ো অলক্ষুণে কথা বলো মেজদা!

রাম : ক'টা বাজে রে যদু?

যদু : (ঘড়ি বাহির করিয়া) চারটে সাতাশ।

রাম : ভোর হয়ে এলো, সাপ খোঁজা ছেড়ে একটু কাজের কথা ভাবতে হয়।

(একটি চেয়ার ভালো করিয়া ঠুকিয়া দেখিয়া বসিল)

শ্যাম : বলো। (আর একটি চেয়ার ঐভাবে দেখিয়া বসিল)

রাম : লাসটা একজনের খুঁজে পাওয়া দরকার।

শ্যাম : এই নিয়ে ভাবছো তুমি? লাস একটা হতে না হতেই ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মাছির মতো ছেঁকে ধরে। তা না হলে অতো কায়দা করেও বিশ বছর মেয়াদ হোলো কেন?

যদু : একটা লাস গায়েব করার থেকে দশটা জ্যান্ত দারোগা গুম করা সোজা।

রাম : তবু একটু ভেবে রাখা দরকার।

শ্যাম : ভাবাভাবির কী আছে? যে পয়লা ঘুম থেকে উঠবে, সেই বার করে ফেলবে, দেখো।

যদু : পয়লা নম্বর উঠেছে মনে হচ্ছে। আওয়াজ পাচ্ছি।

শ্যাম : তবে তো হয়েই গেলো।

যদু : অক্রু। এ দিকেই আসছে।

(অক্রুর প্রবেশ। হাতে ফুলের সাজি।)

অরু : আপনারা এর মধ্যে উঠে পড়েছেন?

রাম : আমরা ঘুমোই নি। কাজকর্ম সারছিলাম।

অরু : কাজকর্ম? কাজকর্ম সেরে কী হবে? বাড়ি তো ছাড়তেই হচ্ছে। (বাগানের দিকে গেল)

রাম : কোথায় চললে?

অরু : বাগানে।

রাম : বাগানে? বাগানে কেন?

অরু : ফুল তুলবো। যতো ফুল আছে সব মুড়িয়ে তুলবো আজ। কাল ফুলগাছগুলোকে মুড়োবো।

শ্যাম : সেটা কি ভালো হবে? হাজার হোক ফুলগাছ। তার চেয়ে বরং—

ারু : ঐ স—ব ফুলগাছ নিজের হাতে লাগিয়েছি, জানেন? ওসব কি শকুনিদের জন্যে রেখে যাবো না কি?

যদু : শকুনিদের?

অরু : হ্যাঁ শকুনিদের। শকুনি আর শকুনির বাচ্চা। (আবার চলিল)

রাম : দাঁড়াও দাঁড়াও। শোনো, ইয়ে—

অরু : কী?

রাম : বাগানে যেও না।

অরু : কেন?

রাম : বাগানে এখন, মানে এ সময়টায়—

যদু : সাপ-খোপ থাকতে পারে আর কি?

শ্যাম: হ্যাঁ, কী দরকার যাবার?

রাম : তার চেয়ে দেখো না, তোমার জ্যাঠামশাই উঠেছেন কি না?

অরু : ওঠে নি। শকুনিরা এ সময়ে ঘুমোয়।

স্যাম : ভোর হয়ে গেছে, উঠিয়ে দেওয়া ভালো।

অরু : ভালো? কেন?

শ্যাম : ভালো—মানে, প্রাতঃকাল তো! একটু বেড়ানো—মুক্ত হাওয়া—

যদু : হ্যাঁ—প্রাকৃতিক শোভা। গাছ। ফুল।

অরু : ফুল? ওহো—দাঁড়ান, ফুলগুলো তুলে আনি।

(বাগানে প্রস্থান)

রাম : অরু, শোনো!—যাচ্চলে!

শ্যাম : ভালোই হয়েছে। কচি মেয়ে, ভয় টয় পেতে।

যদু : হ্যাঁ, ওর আবার ফিটের রোগ।

রাম : কিন্তু শ্যাম?

শ্যাম : কী দাদা?

রাম : শুনলি?

শ্যাম : কী?

রাম : এখনো শকুনির বাচ্চা বলছে যে?

শ্যাম : তাই তো! তুমি তো উইলে পাকা বন্দোবস্ত করে দিলে!
রাম : তোরাই তো বললি—দাও লাগিয়ে! যদু বললে—সিনেমায় বিয়ে হয় দেখেছে।
যদু : হয়ই তো! তবে তার আগে প্রেম হয়।
রাম : প্রেম তো এখানেও হয়েছিলো!
শ্যাম : হ্যাঁরে যদু, প্রেম ছুটে গেলে কী হয়—দেখেছিস্ সিনেমায়?
যদু : সে তখন আর একজন আসে—আসল হিরো। তার সঙ্গে প্রেম হয়।
রাম : আসল হিরো মাঝ রাত্তিরে কোথায় পেতিস? তাও এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে?
শ্যাম : চুপ, অরুর মা আসছে।
রাম : এইবার।

(গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃহিণী : এ কী, তোমরা ঘুমোওনি নাকি সারারাত?
যদু : আজ্ঞে না।
গৃহিণী : কেন?
রাম : যদু বাগানে একটা সাপ দেখেছে।
গৃহিণী : সাপ? এ সময়ে তো সাপ বেরোয় না বড়ো একটা? কী সাপ?
যদু : আমি তো ঠিক চিনি না। কেউটে বোধ হয়।
গৃহিণী : কেউটে?
রাম : হ্যাঁ। তাই ভাবলাম যদি ঘরে-টরে ঢোকে, না ঘুমোনোই ভালো।
শ্যাম : (শুকদেবের ঘর দেখাইয়া) ঐ ঘরের জানলার কাছে দেখেছিলো যদু।
রাম : একবার দেখবেন না কি?
গৃহিণী : কী দেখবো?
রাম : ওঁর ঘরটা? যদি কিছু হয়ে-টয়ে থাকে?
গৃহিণী : হলেই ভালো।
রাম : সে কী?
গৃহিণী : আমারও সারারাত ঘুম হয়নি কাল। শুয়ে শুয়ে কী ভেবেছি জানো?
রাম : কী?
গৃহিণী : শুনলে তোমরা চমকে যাবে। দু'দিন আগে আমিও ভাবতে লজ্জা পেতাম। আজ কিন্তু এক ফোঁটা লজ্জা হচ্ছে না আমার।
শ্যাম : কী, ভেবেছেন কী?
গৃহিণী : ঐ শকুনিটাকে কতো রকম ভাবে খুন করা যায়—তাই ভেবেছি।
রাম : বলেন কী?
গৃহিণী : এখন দেখছো তো? তোমাদের বৌদিকে দেখে যতো ভালো মানুষ মনে হয় আসলে তা নয়।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাম : চললেন কোথায়?
গৃহিণী : ঘরে তিষ্ঠোতে পারছি না। মুখুজ্জে-পাড়ায় আমার সই থাকে, তার বাড়ি গিয়ে মনটা একটু হাল্কা করে আসি।

শ্যাম : কিন্তু শুকদেব রায়?
গৃহিণী : শুকদেব রায় কী?
শ্যাম : তাঁকে তো ঘুম থেকে তোলা দরকার!
গৃহিণী : কেন?
শ্যাম : কেন? মানে—সকাল হয়েছে তো? সকালেই তো ঘুম থেকে ওঠে সবাই।
গৃহিণী : তা যখন উঠবে তখন উঠবে। আমি ঘুম ভাঙিয়ে সংসারের জ্বালা বাড়াই কেন? (আবার প্রস্থানোদ্যত)
রাম : শুনুন শুনুন। যদি সাপটা সত্যি সত্যি ঘরে ঢুকে পড়ে থাকে?
গৃহিণী : সে আশা নেই ভাই। ও শকুনিকে সাপেও ছোঁবে না।
যদু : সাপের যদি অতো বাছবিচার না থাকে?
গৃহিণী : তেমন সাপ আমার ভিটেয় নেই। সে তাহলে বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে।

(দোকানের পথে প্রস্থান)

শ্যাম: দু' নম্বর গেলো।
রাম : তুই যে বলছিলি—লাস একটা হলেই মাছির মতো ছেঁকে ধরে লোকে?
শ্যাম : তাই তো বরাবর হয় দাদা।
যদু : আসল কথা কী জানো দাদা? যেটি চাইবে, সেটি হবে না।
শ্যাম : ঠিক বলেছিস্। এইটাই বাগানে পুঁতে ফেলো—দেখবে গন্ধ শুঁকে শুঁকে সাত হাত মাটি খুঁড়ে বার করে ফেলেছে।
রাম : কিন্তু এ যে বাগানে পোঁতবার লাস নয়?
শ্যাম : সেই কথাই তো বলছি।

(ভবানীর প্রবেশ)

ভবানী : এই যে, তোমরা উঠে পড়েছো?
রম : আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি চললেন কোথায়?
ভবানী : একটু ঘুরে আসি।
শ্যাম : আপনি রোজ মর্নিংওয়াক করেন বুঝি?
ভবানী : সাত বচ্ছর করিনি।
শ্যাম : তবে আজ হঠাৎ?
ভবানী : মর্নিংওয়াক নয় ভাই। জাহাজঘাটায় যাচ্ছিলাম। মালশেডের কেরানিবাবু শুনছিলাম হরিনারায়ণগঞ্জে চাকরি পেয়েছেন। দেখি যদি ওখানে কিছু সুবিধে হয়।
রাম : এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দেখুন না যদি এদিকে সব ঠিকঠাক হয়ে যায়!
ভবানী : এদিকে আর ঠিক হবার কিছু নেই ভাই।
শ্যাম : তা কি বলা যায়? ধরুন যদি শুকদেব রায়ের মতিগতি বদলে যায়।
ভবানী : শুকদেব রায়ের মতিগতি বদলাবে মরলে।
যদু : ধরুন তাই যদি—
ভবানী : কী যদি?

যদু : যদি মরেই যায় হঠাৎ। হার্টফেল তো হয় লোকের? ঘুমের মধ্যেই ফেল হয়ে যায়।

ভবানী : শুকদেবের হার্ট নেই ভাই, ফেল করবে কোত্থেকে?

শ্যাম : তবু অপঘাত মৃত্যু বলে একটা জিনিস আছে তো?

রাম : একবার দেখবেন না কি।

ভবানী : কী দেখবো?

রাম : ওঁর ঘরটা? অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কিন্তু।

ভবানী : জাগলেই সাড়াশব্দ পাবে। বেশ ভালোরকম পাবে।

শ্যাম : কিন্তু যদি না জাগেন? যদি সত্যিই অপঘাত মৃত্যু হয়ে থাকে?

ভবানী : অতোটা বিশ্বাস শুকদেবকে আমি করি না ভাই। চললাম দেরি হয়ে গেছে।

রাম : দেরি কিসের? এই তো সবে ভোর হোলো?

ভবানী : চাকরির ব্যাপার। শুভস্য শীঘ্রম।

(দোকানের পথে প্রস্থান)

রাম : এ তো মহা ঝামেলা হোলো দেখছি? সমস্ত দিন ধরে লাস পাহারা দেবো না কি?

শ্যাম : বাগান থেকে অরুকে ডেকে নিয়ে আসবো না কি?

রাম : ও তো ফিট হয়ে পড়ে?

শ্যাম . তা কী করা যাবে?

যদু : এক ঘটি জল বরং এনে রাখি, চোখে মুখে দেবো।

শ্যাম : স্মেলিং সল্টটাও তো ছিল যেন কোথায় এইখানে। (খুঁজিতে লাগিল)

রাম : ঠিক আছে। তাই ডাক।

গোবিন্দ : (নেপথ্যে)। ভবানী! ভবানী আছো নাকি?

রন্দ্বাম : কে?

গোবিন্দ : (নেপথ্যে)। আমি চক্রবর্তী হে! গোবিন্দ চক্রবর্তী।

রাম: গোবিন্দ চক্কোত্তি? এই ব্যাটার দোকানে বাকি আছে বাষট্টি টাকা তেরো আনা। (যদু পার্টিশনের উপর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল। এখন নামিয়া আসিল।)

যদু : এ সেই বুড়ো দাদা!

রাম : কোন্ বুড়ো?

রাম : ঐ যে কাল চায়ের দোকান থেকে বেরুবার সময়ে দেখেছিলাম? চোখ পাকিয়ে দেখছিলো আমাদের?

রাম : একে দিয়েই হবে।—আসুন গোবিন্দবাবু, ভিতরে আসুন।

(গোবিন্দের সন্তর্পণে প্রবেশ। হাতে তেলের টিন। তিনমূর্তিকে দেখিয়া দঁড়াইয়া গেলেন।)

গোবিন্দ : আপনারা—আপনারা এখানে? ভবানী কোথায়?

রাম : ভবানীবাবু বেরিয়েছেন একটু, এখুনি ফিরবেন। বসুন না?

গোবিন্দ : না বসবো না—কিন্তু আপনারা?

রাম : আমরা মিস্ত্রী। দোকান মেরামতের কাজ করছিলাম।

গোবিন্দ : দোকান মেরামত? তিনজনে?

রাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

শ্যাম : দোকান মেরামত।

যদু : তিন জনে।

গোবিন্দ : এতো বিক্রি হচ্ছে ভবানীর দোকানে? একেবার তিনজন?

রাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, পুজোর মরশুম তো? আপনাকে কী দেবো?

গোবিন্দ : আমাকে? না, সে ভবানীর সঙ্গে—

রাম : বলুন না? ভবানীবাবু আমাকে বলে গেছেন—খদ্দের না ফেরে। কী লাগবে বলুন?

গোবিন্দ : লাগবে না কিছু। এই তেলটা ফেরৎ দিতে এলাম। একেবারে পচা মাল।

রাম: ফেরৎ দেবেন? টিন তো কেটে ফেলেছেন?

যদু : তেলও তো আদ্দেকের উপর সাফ?

গোবিন্দ : তা ব্যাভার না করে বুঝবো কী করে ভালো না খারাপ? টিন বাজিয়ে বুঝবো?

রাম : (গন্ধ শুঁকিয়া) তেল তো খারাপ নয়? টিনের তেল—

গোবিন্দ : খারাপ নয়? টিনের তেল বলেই খারাপ নয়? গোবিন্দ চক্কোত্তিকে শেখাবে তুমি? এই পচামাল চালিয়ে চালিয়ে শুকদেব রায়ের এমন চালু ব্যবসা প্রায় লাটে তুললো ভবানী!

রাম : শুকদেববাবুকে আপনি চেনেন না কি?

গোবিন্দ : চিনবো না? কালীগঞ্জে আছি আর শুকদেব রায়কে চিনবো না?

রাম : তিনি এসেছেন।

গোবিন্দ : তাই নাকি? কখন এলেন?

রাম : কাল রাত্তিরে।

গোবিন্দ : তবে তো একবার দেখা করতে হয়।

রাম : দেখা করে যান না? ঐ তো ওঘরে রয়েছেন।

গোবিন্দ : না না, এতো ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে দরকার নেই। পরে আসবো এখন।

শ্যাম : এতোক্ষণে উঠে পড়েছেন বোধহয়। যান না?

যদু : তেলের কথাটাও বলে যেতে পারবেন অমনি।

গোবিন্দ : (শশব্যস্তে) না না, এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে ওঁকে জ্বালাতন করবার কী দরকার? হয়তো ভবানীর উপর রাগ করবেন।

রাম : করলেই বা? ভবানীবাবু খারাপ মাল চালাচ্ছেন—সেটা বলবেন না?

গোবিন্দ : না না, কী দরকার? একটা লোকের ক্ষেতি করা। কে জানে হয়তো ভবানী না জেনেই দিয়েছে। আমি যাই।

রাম : দেখাটা করে যান। এলেন যখন। তেলের কথাটা না হয় নাই বললেন?

গোবিন্দ : না না, পরেই আসবো। এসেছেন যখন, এখুনি তো আর চলে যাচ্ছেন না?

শ্যাম : তা কি বলা যায়? মানুষের ব্যাপার—কখন আছে, কখন নেই।

গোবিন্দ : ও আবার কেমনধারা কথা?

শ্যাম : না বলছিলাম—হঠাৎ জরুরি ডাক এলো হয় তো, চলে গেলেন।

যদু : ব্যবসাদার লোক তো?

গোবিন্দ : হ্যাঁ, তা বটে। তবে এই সকালে আর কোথায় যাচ্ছেন? আমি না হয় মর্নিং ওয়াকটা সেরে ফেরবার সময়ে ঘুরে যাবো।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাম : (আশাভঙ্গের আক্রোশে) আপনার বাকি টাকা কিছু দেবেন না কি?

গোবিন্দ : কিসের বাকি?

রাম : ভবানীবাবু বলছিলেন আপনার দোকানে বাষট্টি টাকা তেরো আনা বাকি।

গোবিন্দ : তাতে তোমার কী হ্যা? সে আমি ভবানীর সঙ্গে বুঝবো।

রাম : ভবানীবাবু আমাকেই বলে গেছেন। টাকা যখন রয়েছে সঙ্গে, দিয়ে যান না কিছু? (গোবিন্দ নিজের অজান্তে ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়া ফেলিলেন।)

গোবিন্দ : টাকা আছে কে বল্‌লে?

রাম : কেউ বলে নি, এমনি মনে হোলো। সব দেবার দরকার নেই। বিশ ত্রিশ যা পারেন।

গোবিন্দ : টাকা থাকলেও এখন দেবার উপায় নেই। (প্রস্থানোদ্যত। কিন্তু শ্যাম ও যদু পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া।)
কী চাও কী, শুনি?

রাম : আজ্ঞে বাকি টাকা।

শ্যাম : যতোটা পারেন।

গোবিন্দ : তোমাদের হাতে দেবো কেন? তোমরা যদি টাকা মেরে দাও?

রাম : (বিনীতকণ্ঠে) আজ্ঞে দিলে আর কী করছেন?

শ্যাম : (অমায়িক) আপনার জানটাই যদি মেরে দি, কে কী করছে?

গোবিন্দ : তোমরা—তোমরা খুনে!

রাম : আজ্ঞে না, আমরা সবাই নই।

শ্যাম : খুনে হলেও সামান্য কিছু বাকি টাকার জন্যে আপনাকে খুন করবার ইচ্ছেটা ছিল না। লাস নিয়ে বড়ো ঝামলা হয়।

যদু : তবে যদি আপনি নিতান্ত অপারগ হন, তা হলে—

গোবিন্দ : (তাড়াতাড়ি টাকা বাহির করিয়া) না না, অনেকদিন হয়ে গেলো, দিয়ে দেওয়াই ভালো।

শ্যাম : আমরাও সেই কথাই বলছিলাম।

রাম : চৌত্রিশ। তাহলে আপনার বাকি রইল আঠাশ টাকা তেরো আনা। খুচরোটা দিয়ে দিন না, হিসেব রাখার সুবিধে হয়। (গোবিন্দ ভুলিয়া ট্যাঁকে হাত দিয়া ফেলিলেন)

গোবিন্দ : খুচরো?

রাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, তেরো আনা। দেখুন না ট্যাঁকে আছে হয় তো? (গোবিন্দ তেরো আনা গুনিয়া দিলেন) ব্যাস, তা হলে আঠাশ টাকা বাকি রইলো। সুবিধামতো দেবেন।

যদু : (পথ ছাড়িয়া) যখন পারবেন, তাড়াহুড়ো নেই।

রাম : আপনার তেলটা নিয়ে যান। পয়সা দিয়ে কিনেছেন।
(তেলের টিন ছিনাইয়া লইয়া গোবিন্দর দ্রুত প্রস্থান। রাম দেরাজে টাকা রাখিল।)

শ্যাম : যথা লাভ। ভবানীবাবুর কিছু বাকি আদায় হোলো।

রাম : তা তো হোলো, ওদিকে যে লাস ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

শ্যাম : অরুকেই ডাকা যাক। আর তো কেউ বাকি নেই।

যদু : বাকি আছে।

রাম : কে?

যদু : যিনি আসছেন।

(জয়দেবের প্রবেশ)

রাম : আরে ভুলেই গিয়েছিলাম!

জয়দেব : কী ভুলে গিয়েছিলেন?

রাম : আপনার কথা।

জয়দেব : তার মানে?

রাম : আপনার বাবা আপনাকে খুঁজছিলেন।

জয়দেব : কখন?

রাম : কাল রাত্তিরে। বলে গেছেন—সকালে উঠেই যেন আপনি দেখা করেন। খুব জরুরি দরকার। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আপনাকে দেখে মনে পড়লো।

জয়দেব : কোথায় আছেন বাবা?

রাম : ঘরেই আছেন।

(জয়দেব শুকদেবের ঘরের দরাজর দিকে গেল। তিনজনের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। জয়দেব ফিবিয়া অসিল।)

কী হোলো?

জয়দেব : ইয়ে—বাবা কি রাগারাগি করছিলেন?

রাম : রাগারাগি? কিসের জন্যে?

জয়দেব : এই—এই অরুর ব্যপার নিয়ে?

রাম : না না! বরং ঠিক উল্টো। বলছিলেন—ভালো করিনি। হাজার হোক ওদের যখন ইচ্ছে—

শ্যাম : হ্যাঁ, বলছিলেন জোর করে বিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। তা সে কযলাখনিই থাক আর হীরের খনিই থাক।

জয়দেব : (অল্প উৎকণ্ঠিত) তাই না কি?

যদু : হ্যাঁ, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। চলে যান।

জয়দেব : ভাববো না?

রাম : ভাববার কিচ্ছু নেই। অরুর সঙ্গেই বিয়ে হবে। আপনার বাবার শেষ—মানে পাকা কথা তাই।

জয়দেব : (রীতিমতো উৎকণ্ঠিত) কিন্তু বাবা তো—

শ্যাম : মানুষের তো পরিবর্তন হয়? যান, আর দেরি করবেন না।

(জয়দেবের প্রস্থান)

ররাম: বাব্বা! বাঁচা গেলো।

যদু : কিন্তু দাদা—

রাম : আবার কিন্তু কিসের? ঐটুকু ঘরে একটা জলজ্যান্তো লাস দেখতে পাবে না?

যদু : সে কথা নয়। বলছিলাম—জয়দেবের ভাবটা সুবিধের ঠেকছে না।

রাম : কিসের ভাব?

যদু : কয়লাখনির সঙ্গে বিয়ে হবে না শুনে খুব খুশি হোলো বলে তো মনে হচ্ছে না?

শ্যাম : হ্যাঁ রে। আমারও কেমন কেমন ঠেকছে।

রাম : বয়ে গেলো। উইলের প্যাঁচ। অরুকে বিয়ে না করে যাবে কোথা?

(জয়দেবের উদ্‌ভ্রান্ত প্রবেশ)

জয়দেব : বাবা—বাবা বোধহয় বেঁচে নেই!

রাম : অ্যাঁ? বলেন কী?

শ্যাম : ঠিক দেখেছেন?

জয়দেব : নড়ছেন না, নিশ্বাসও পড়ছে না, নাড়িও খুঁজে পেলাম না!

যদু : তবে তো সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে!

জয়দেব : গা-ও ঠাণ্ডা হিম!

শ্যাম : চোখ বোঁজা?

জয়দেব : চোখ দেখা যাচ্ছে না। বিছানায় নেই। চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন।

শ্যাম : মাথা তুলে দেখুন না?

জয়দেব : আমি পারবো না! আপনারা কেউ আসুন না?

রাম : চলুন, দেখি।

(রাম ও জয়দেবের প্রস্থান)

শ্যাম : একটা পাট চুকলো। এবার উইলটা পেলেই হয়ে যায়।

যদু : হ্যাঁ, আর পারা যাচ্ছে না। বিকেলের স্টিমারে কাটতে হবে।

শ্যাম : ঠিক বলেছিস। নইলে এখানেই সংসার পেতে বসে যাবো হয় তো। পায়ে শেকড় গজিয়ে গেলো!

যদু : যাই বলো, বেশ ভালোয় ভালোয় চুকলো মনে হচ্ছে।

শ্যাম : দাদা উইলের বুদ্ধিটা খুব জোর বার করেছে।

যদু : হ্যাঁ, ও ব্যাটাকে টাকা ছাড়া অন্য কিছুতেই আটকানো যেত না।

(রামের প্রবেশ, পিছনে জয়দেব)

রাম : সর্পাঘাত! কোনো সন্দেহ নেই।

শ্যাম : তা হলে সত্যিই?

রাম : নির্ভুল।

শ্যাম : (দীর্ঘশ্বাস) আহা! বড়ো ভালো লোক ছিলেন!

রাম : ভেঙে পড়বেন না জয়দেব বাবু।

(জয়দেবের ভাঙিয়া পড়ার কোনো লক্ষণ ছিল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া কী যেন ভাবিতেছিল। রামের কথায় তাড়াতাড়ি টেবিলে মুখ গুঁজিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তিনজনে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।)

জয়দেব : বাবা!

রাম : অমন উতাল হবেন না জয়দেব বাবু।

শ্যাম : নশ্বর জীবন—পদ্মপত্রে জল। আজ আছে, কাল নেই।

যদু : দিন এলে সবাইকেই যেতে হয়।

জয়দেব : বাবা! তুমি আমার উপর রাগ করে চলে গেলে বাবা!

রাম : না না, জয়দেববাবু, অতো আকুল হলে কি চলে? শোক তাপ মানুষের জীবনে আছেই।

শ্যাম : আপনার উপর কতো দায়িত্ব এখন।

রাম : এতো বড়ো বিষয়-সম্পত্তি—সব ভার তো এখন আপনার উপর?

(জয়দেব মুখ তুলিল। তাহার চোখে লোভ। তারপরেই আবার মুখ গুঁজিয়া পড়িল।)

জয়দেব : বিষয় সম্পত্তি! বাবা, তুমিই যদি চলে গেলে—সম্পত্তি নিয়ে আমার কী হবে?

রাম : তা বললে কি চলে? যার উপর যে ভার, তা বইতেই হবে।

জয়দেব : ঠিক বলেছেন। নইলে মানুষ মানুষ কেন? না, আমি ভেঙে পড়বো না। বলুন কী করতে হবে?

রাম : বাবার কাগজপত্রগুলো দেখুন। বিচক্ষণ লোক ছিলেন, হয় তো সব ব্যবস্থা নিজেই করে গেছেন।

শ্যাম : হ্যাঁ, স্যুটকেসটা দেখুন।

জয়দেব : হ্যাঁ যাই।

রাম : সঙ্গে যাবো?

জয়দেব : না না, দরকার নেই। আমি—আমি নিজেকে শক্ত করে নিয়েছি।

(প্রস্থান)

যদু : ব্যাটা শয়তানের জাসু!

শ্যাম : ফূর্তিতে ডগমগ করছে—কেমন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে!

যদু : এই মক্কেলের সঙ্গে তুমি অরুর বিয়ে দিলে দাদা!

রাম : যা যাঃ! বড়ো বড়ো কথা বলিস্ নি। হিরো খালি সিনেমাতেই দেখলি, জোটাতে তো পারলি নে একটাও।

যদু : চটছো কেন দাদা? জোটাবার কি সময় পেলাম?

রাম : তবে চুপ করে থাক।

শ্যাম : দেরি হচ্ছে কেন এতো?

রাম : কে জানে? সামনেই তো রেখেছিলাম।

(বাগান হইতে অরুর প্রবেশ। হাতে সাজিভরা ফুল।)

অরু : যে ক'টা হাতে পেলাম—তুলে নিয়েছি। উঁচু ডালগুলোর নাগাল পাচ্ছি না। ছোটকাকা, আপনি গাছে উঠতে পারেন?

যদু : তা তো পারি, কিন্তু এদিকে যে—

অরু : আচ্ছা থাক এখন। পরে সময় পেলে যাবেন। (ভিতরের দিকে ফিরিল)

রাম : কোথায় চললে?

অরু : কাটারিটা নিয়ে আসি। ছোট গাছগুলো কেটে ফেলি ততোক্ষণে।

রাম : আরে শোনো শোনো—

অরু : কী?

রাম : গাছ কেটো না।

অরু : না কাটবো না! রেখে যাবো ঐ শকুনির জন্যে—

রাম : আরে শোনোই না আগে। এক কাণ্ড হয়ে গেছে।

অরু : কী কাণ্ড?

রাম : শকুনি—মানে, ইয়ে—শুকদেববাবু আর নেই।

অরু : নেই? কোথায় গেছে?

রাম : মারা গেছেন। সর্পাঘাতে।

অরু : কেন মিথ্যে আশা দিচ্ছেন কাকাবাবু?

(প্রস্থান)

যদু : সবাই দেখছি শকুনি মরলে বাঁচে। অথচ মরলো কিনা কেউ খোঁজ করবে না।

শ্যাম : খামোখা ফুলগাছগুলো গেলো। যদু, দেখ না ভেতরে গিয়ে—যদি ঠেকাতে পারিস।

রাম : থাম্। ফুলগাছ গেলে আবার হবে। বরং জয়দেব কী করছে দেখ।

(যদুর শুকদেবের ঘরে প্রস্থান)

শ্যাম: চমৎকার বাগানটা ছিল দাদা।

রাম : তুই চুপ কর দিকি? বাগান থাকে কি না, তাই দেখ।

শ্যাম : আহা, সেই জন্যেই তো যদুকে বলছিলাম—অরুকে যদি কোনোরকমে—

(যদুর দ্রুত প্রবেশ)

যদু : দাদা! পোড়াচ্ছে!!

রাম : অ্যাঁ?

শ্যাম : কী পোড়াচ্ছে রে?

যদু : দাদার উইল!

শ্যাম : সর্বনাশ!

যদু : ও ব্যাটাকে আমি খুন করবো দাদা, বিবেক থাক আর না থাক!

রাম : চুপ কর, মাথা গরম করিস নি। ভাবতে দে।

(জয়দেবের প্রবেশ)

জয়দেব : নাঃ!

রাম : কী হোলো?

জয়দেব : বিশেষ কিছু পাওয়া গেলো না। হরিনারায়ণগঞ্জের কারবারের কিছু কাগজপত্র শুধু রয়েছে স্যুটকেসে। আর টেবিলে এই দোকানের হিসাবের খাতা।

রাম : উইল-টুইল কিচ্ছু না?

জয়দেব : কিচ্ছু না।

রাম : সে কী?

জয়দেব : এতে আর অবাক হবার কী আছে? উইল করবার তো কোনো দরকার ছিল না বাবার।

রাম : দরকার ছিল না?

জয়দেব : কী দরকার? আমিই তো একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমার তো ভাইবোন নেই।

শ্যাম : তবু যদি শেষ ইচ্ছে কিছু—

জয়দেব : বাবা জানতেন তাঁর ইচ্ছে আমি এমনিতেই পালন করবো।

রাম : (ক্রুদ্ধ যদুকে ঠেকাইয়া) সে তো বটেই। তবু—মানুষের ইচ্ছেও তো বদলায়? কালকেই যেমন হোলো।

জয়দেব : কী হোলো?

রাম : উনি তো আপনার বিয়ে অন্য জায়গায় ঠিক করেছিলেন। অথচ কাল রাত্রে বললেন—আপনাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না!

জয়দেব : বাবার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে রামবাবু।

রাম : সেই কথাই তো বলছি। কাল রাত্রে তাঁর ইচ্ছে ছিল—

জয়দেব : না রামবাবু। কাল রাতে যদি বাবা আপনাকে কিছু বলে থাকেন, সে তাঁর মুহূর্তের দুর্বলতা। আমি তো জানি তাঁর মনের আসল ইচ্ছে কী ছিল? নিজের সুখের জন্যে সে ইচ্ছে তো আমি অমান্য করতে পারি না, রামবাবু।

(আবার মাথা গুঁজিয়া পড়িল। শ্যাম না ঠেকাইলে যদু জয়দেবের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িত।)

রাম : কিন্তু জয়দেববাবু—

জয়দেব : না না, এমন করে আমাকে দুর্বল করে দেবেন না। বুক ফেটে গেলেও ঐ রণধীর চৌধুরীর মেয়েকেই আমার বিয়ে করতে হবে।

রাম : কিন্তু তাই বলে—

জয়দেব : বাবা যে আমাকে বড়ো ভালোবাসতেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে পালন করতে যদি এইটুকু স্বার্থত্যাগ না করতে পারি—তবে মানুষ বলে পরিচয় দেবো কী করে?

(যদুকে ধরিয়া রাখিতে শ্যাম রীতিমত বেগ পাইতেছে)

রাম : তাই যদি আপনার মনে হয়, তবে আর কী করা যায় বলুন? অরু কিন্তু বড়ো কষ্ট পাবে।

জয়দেব : অরু বুঝবে। সে জানে আমার কাছে সেন্টিমেন্টের চেয়ে কর্তব্য বড়ো। অরু আমাকে চেনে।

শ্যাম : চিনলেই ভালো।

রাম : এখন তা হলে কী করবেন?

জয়দেব : বাবার শেষ কাজ।

রাম : তা তো করতেই হবে। ভবানীবাবু আসুন।

জয়দেব : শেষ কাজ শুধু ঐটুকুই নয় রামবাবু। বাবা যে কাজ করতে এখানে এসেছিলেন—তাও আমাকে শেষ করে যেতে হবে।

রাম : কী কাজ?

জয়দেব : এই দোকানটার একটা পাকা ব্যবস্থা করা।

রাম : সে নিয়ে এ অবস্থায় আপনি কেন মাথা ঘামাচ্ছেন? সে তো ভবানীবাবুই রয়েছেন।

জয়দেব : আপনি জানেন না রামবাবু। অরুকে আমি ভালোবাসি, ভবানীবাবু আমার পিতৃতুল্য লোক। তবু যে প্রিন্সিপ্‌ল্ নিয়ে বাবা চিরকাল চলেছেন—তার তো আমি অমর্যাদা করতে পারি না।

রাম : আপনি কি বলতে চান—

জয়দেব : ভবানীবাবু তাঁর দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বাবা তো নরম হতে পারতেন না। তাঁর কাছে কর্তব্যের চেয়ে বড়ো আর কিছুই ছিল না। আমাকেও সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

রাম : আপনি—আপনি কি এঁদের ভিটেছাড়া করতে চান?

জয়দেব : আমাকে দুর্বল করে দেবেন না রামবাবু! বাবা! বাবা! তুমি আমাকে শক্তি দাও! (কর্তব্যের নিপীড়ণে কাতর জয়দেব প্রায় ছুটিয়া শুকদেবের ঘরে চলিয়া গেল। যদুকে সামলাইতে এবার রামকেও হাত লাগাইতে হইল।)

যদু : দাদা—ছেড়ে দাও আমাকে! ও শালাকে একবার দেখে নেবো আমি!

শ্যাম : আঃ যদু! চুপ করে বোস!

যদু : চুপ করে বসবো? তোমরা যে কী করে ঠাণ্ডা হয়ে আছো—

রাম : আঃ! ঘরের মধ্যে খুনখারাবি করে লাভ কী? আমরা তো চলে যাবো, তারপর এরা কী করবে?

শ্যাম : বাড়ি শুদ্ধু ফাঁসি যায়, তাই চাস?

(যদু কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। অরুর প্রবেশ।)

অরু : কাকাবাবু, মাকে দেখেছেন?

রাম : তোমার মা তাঁর সইয়ের বাড়ি গেছেন। কেন?

অরু : কাটারিটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। যাক্ গে, ফুলগুলোই—ছোটকাকা, এখন আপনার সময় হবে?

রাম : হবে। কিন্তু অরু! এক কাপ চা না খেলে তো কিছু করা যাচ্ছে না?

অরু : ছি ছি, দেখেছেন? নিজের দুঃখ নিয়েই আছি। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

(ভিতরে প্রস্থান)

রাম : যাক খানিকক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। যা হয়, খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করতে হবে।

শ্যাম : কী আর ঠিক করবে দাদা? সব ভেস্তে গেছে।

রাম : আর একটা উইল যদি তৈরি করি?

শ্যাম : আর কি হয়? সে উইল কোর্টে যাবে। ও যদি সত্যি সত্যি অরুকে বিয়ে করতে চাইতো তবে জাল উইল নিয়ে ঘাঁটাতো না।

রাম : তা ঠিক। আসল জায়গাতেই গণ্ডগোল।

যদু : শকুনির বাচ্চা শকুনি!

শ্যাম : সব গিয়ে বাড়িটাও যদি বাঁচতো!

(জয়দেবের প্রবেশ)

জয়দেব : একটা কিসে যেন কামড়ালো! এই আঙুলটায়।

রাম : কামড়ালো?

জয়দেব : হ্যাঁ, বড়ো জ্বলছে। বিছে বোধহয়।

শ্যাম : বিছে? দেখতে পেয়েছেন?
জয়দেব : না, কিছু দেখতে পেলাম না।
রাম : হাতের আঙুলে কামড়ালো—দেখতে পেলেন না?
জয়দেব : না, পকেটের মধ্যে ছিল তো?
শ্যাম : পকেট? কোন্ পকেট?
জয়দেব : বাবার জামার পকেট—
রাম : পকেটে কী দেখছিলেন?
জয়দেব : (লজ্জিত হইয়া) মানে—দেখছিলাম কোনা জরুরি কাগজপত্র যদি—উঃ! রামবাবু!
রাম : কী হোলো?
জয়দেব : বড়ো জ্বলছে! (তিনজনে উদগ্র আশায় ঘিরিয়া ধরিল)
রাম : জ্বলছে?
জয়দেব : মাথাটা ঘুরছে!
শ্যাম : ঘুরছে?
জয়দেব : গা-টা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে!
যদু : করছে? (উৎফুল্ল চিৎকারে) দাদা ঝিমঝিম করছে!
রাম : ঝিমঝিম করছে—হাঃ হাঃ হাঃ—
শ্যাম : হো হো হো—ঝিমঝিম করছে!
জয়দেব : (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) ভাববার কিছু নেই বোধহয়, কী বলেন, অ্যাঁ?
যদু : কিচ্ছু ভাববার নেই। এক ফোঁটা ভাবার নেই।
জয়দেব : কিসে কামড়ালো বলুন তো?
শ্যাম : কিসে কামড়ালো শুনলে সব চিন্তা ঘুচে যাবে জয়দেববাবু! হাঃ হাঃ হাঃ—
জয়দেব : তা হলে এই জ্বলুনিটা?
রাম : জ্বলতে দিন। বেশিক্ষণ জ্বলবে না।
জয়দেব : মাথা ঘোরা—
শ্যাম : এক্ষুনি থেমে যাবে।
জয়দেব : গা ঝিমঝিম—
যদু : সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে জয়দেববাবু, একটু সবুর করুন—
(জয়দেব ঢলিয়া পড়িল। দুই বাহু ধরিয়া রাম ও শ্যাম দেহটাকে খাড়া রাখিল।)
শ্যাম : কোথায় রাখবো দাদা?
রাম : বাগানে নিয়ে যা। পুকুরঘাটে বসিয়ে রাখ। হাতটা একটা ঝোপটোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিস্।
শ্যাম : যদু, ধর ঠ্যাং দু'টো।
(যদু নিঃশব্দে হাসিতেছিল এবং নাচিতেছিল। নাচ থামাইয়া দুই ঠ্যাং বাগাইয়া ধরিল। শ্যাম ও যদু চ্যাংদোলা করিয়া লইয়া গেল বাগানে।)
রাম : (আপন মনে) আমরা পুত্র জয়দেব রায়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে আমার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি শ্রীভবানী চৌধুরীতে বর্তাইবে—

ভদ্রলোক : (নেপথ্যে) ভবানীবাবু!

রাম : কে?

(চায়ের দোকানের সেই ভদ্রলোকটির প্রবেশ)

ভদ্রলোক : এ কী, আপনি?

রাম : আজ্ঞে হ্যাঁ আমি। ভয় পাবেন না।

ভদ্রলোক : (হাসিয়া) খুব বোকা বানিয়েছিলেন কাল, অ্যাঁ? ভবানীবাবু খুনে? যে শুনছে, সেই হেসে অস্থির!

রাম : কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোক : মাঝখান থেকে আমার মানিব্যাগটি গেলো।

রাম : সে কী?

ভদ্রলোক : তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে কোথায় যে পড়ে গেলো!

রাম : ছি ছি ছি! কী অন্যায় করে ফেলেছি বলুন তো? বুড়ো হয়ে গেলাম—তবু ঠাট্টা করার রোগটা গেলো না।

ভদ্রলোক : তাতে কী হয়েছে? ব্যাগে কিছুই ছিল না বলতে গেলে। তবে চিঠিটাও পড়ে গিয়েছিলো বোধহয় ঐ সঙ্গে।

রাম : চিঠিটাও গেছে?

ভদ্রলোক : হ্যাঁ। সেই জন্যেই ভাবলাম বলে যাই একবার ভবানীবাবুকে।

রাম : এই ভোরে এলেন কিসে?

ভদ্রলোক : নৌকোয়। বেশিদূর তো নয়? ভোরবেলা বেশ লাগে নৌকোয়। একটা কল্‌ও আছে, সেরে যাবো অমনি।

রাম : কিসের কল্‌?

ভদ্রলোক : কল্‌—মানে পেশেন্ট। এদিকে তো ডাক্তার নেই?

রাম : আপনি ডাক্তার না কি? তবে যে বললেন চাকরিতে জয়েন করতে যাচ্ছেন?

ভদ্রলোক : হ্যাঁ, ওখানে নতুন হাসপাতাল হয়েছে। লিমিটেড প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ অ্যালাওড। এইটাই বৌনি বলতে পারেন।

রাম : আসতে না আসতেই কল্‌? তা হলে তো প্র্যাকটিস্ ভালোই হবে মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক : তা কি এখন বলা যায়? দেখি কদ্দূর কী হয়—

(শ্যাম ও যদুর প্রবেশ)

আরে আসুন আসুন। খুব মজাটা করে নিলেন মশাই, অ্যাঁ?

যদু : না, মানে ইয়ে—

ভদ্রলোক : অতো কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমি হোস্টেলে মানুষ। নিজের ওপর দিয়ে হলেও ভালো লেগ-পুলিং এঞ্জয় করতে জানি। তবে চিঠিটা—ইয়ে, ভবানীবাবু নেই?

রাম : না, বেরিয়েছেন একটু।

ভদ্রলোক : তাই তো। বেশিক্ষণ তো বসবার উপায় নেই। মামার চিঠির কথাটা—

রাম : মামা??

ভদ্রলোক : আমার মামা। কাল বলছিলাম না? মামা বলেই তো কথাটা ঠেলতে পারলাম না।

রাম : শুকদেব রায় আপনার মামা?

ভদ্রলোক : আপনি নাম জানলেন কী করে?

রাম : আপন মামা?

ভদ্রলোক : আপন মামা। যদিও সত্যি কথা বলতে কী, আমার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। মা যাবার পর থেকে বিশেষ করে। বড়ো, মানে কী বলবো—ইয়ে লোকটা!

রাম : সম্পর্ক নেই তবু আপনাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন?

ভদ্রলোক : আর কাকে দিয়ে পাঠাবে? তিনকূলে নেই তো কেউ? এক ছেলে জয়দেব, আর এক ভাগ্নে আমি।

রাম : আপনি তো ভাগ্যবান ব্যক্তি মশাই! শুকদেববাবুর শুনেছি বিরাট সম্পত্তি।

ভদ্রলোক : (হাসিয়া) তাতে আমার কী?

রাম : আপনিই তো পাবেন?

ভদ্রলোক : আমি পেতে যাবো কেন? জয়দেব পাবে। জয়দেব না থাকলেও মামা আমাকে এক পয়সাও দিতো কিনা সন্দেহ!

রাম : কিন্তু জয়দেবের অবর্তমানে?

ভদ্রলোক : জয়দেব খুব গভীরভাবে বর্তমান মশাই।

রাম : তবু? ধরুন যদি জয়দেব হঠাৎ মরে যায়—

ভদ্রলোক : জয়দেব হঠাৎ মরবার ছেলে নয় মশাই। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি—বাপকা বেটা।

শ্যাম : বাঁচা মরা কি চরিত্রের উপর নির্ভর করে?

ভদ্রলোক। তা অবশ্য করে না। তবে ওর যা চরিত্র—উইল করে সম্পত্তি আর কাউকে দিয়ে যাবে—যাতে আমি না পাই। কিন্তু এসব কথা কেন?

রাম : না, এমনি। আমি একটু আধটু জ্যোতিষচর্চা করি। আপনার কপালের রেখা দেখে মনে হচ্ছে অর্থলাভ আছে।

ভদ্রলোক : (হাসিয়া) বলেন কী? তাহলে আমার কপাল বলছে—মামা মরবে, জয়দেব মরবে—তার স্ত্রী-পুত্র মরবে—

রাম : জয়দেব তো বিয়ে করে নি?

ভদ্রলোক। দু'দিন পরেই করবে। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বিরাট বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে।

রাম : বিয়ের আগে যদি মরে?

ভদ্রলোক : কোনো চান্স নেই মশাই! জয়দেব দূরে থাক, আমার মামাকে তো আপনি দেখেন নি—তাঁরও মজবুত হাড়। দু'পাঁচ বছরে কিছু হবে না।

(চা লইয়া অরুর প্রবেশ)

অরু : কাকাবাবু— (ভদ্রলোককে দেখিয়া থামিয়া গেল)

রাম : এসো এসো অরু।

অরু : আমি বাগানে যাচ্ছি। আপনারা কেউ আসবেন?

রাম : বাগানে যাচ্ছো?

অরু : হ্যাঁ, কেন?

শ্যাম : পুকুর ঘাটে?

অরু : ঠিক পুকুর ঘাটে নয়, তবে ঐখান দিয়েই যাবো। কেন বলুন তো?

যদু : না, কিছু না। তুমি যাও, আমি চা খেয়ে যাচ্ছি।

(অরুর প্রস্থান। ভদ্রলোক মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন।)

রাম : যদু!

যদু : বলো দাদা।

রাম : কী রকম মনে হচ্ছে?

যদু : ঠিক সিনেমার মতো।

রাম : শ্যাম?

শ্যাম : বিলকুল।

ভদ্রলোক : আপনারা কী বলছেন—কিছু বুঝতে পারছি না।

রাম : ঐ মেয়েটিকে চেনেন?

ভদ্রলোক : না, কে উনি?

রাম : ভবানীবাবুর মেয়ে, বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে, সুন্দর স্বভাব।

শ্যাম : অমন মেয়ে আর হয় না।

যদু : হীরের টুকরো মেয়ে।

রাম : আপনার কী মনে হয়?

ভদ্রলোক : (লজ্জা পাইয়া) আমার—আমার আবার কী মনে হবে—আমি তো—

রাম : ব্যাস্ ব্যাস্ ওতেই হবে! কী বলো শ্যাম?

শ্যাম : সে আর বলতে?

যদু : সিনেমা!

ভদ্রলোক : কী ব্যাপার—আপনারা—

রাম : শুনুন। শুকদেব রায় কাল রাত্রে সর্পাঘাতে মারা গেছেন।

ভদ্রলোক : আবার আজ শুরু করলেন?

রাম : ঠাট্টা নয় মশাই। ঐ ঘরে তিনি শুয়ে আছেন।

শ্যাম : (সংশোধন করিয়া) বসে আছেন।

যদু : তবে বেঁচে নেই।

ভদ্রলোক : (অবিশ্বাসে) বটে? তারপর? বলে যান।

রাম : আজ সকালে পুকুরঘাটে জয়দেবকেও সাপে কেটেছে।

ভদ্রলোক : (পূর্ব্ববৎ) বা বা বা—তারপর?

রাম : অরু এখুনি তাকে দেখতে পাবে। তখন ডাক্তার হিসেবে আপনাকে দরকার হবে।

ভদ্রলোক : (হাসিতে হাসিতে) কেন, ডাক্তার কী করবে?

রাম : অরু ও দৃশ্য দেখলেই একটি আর্তনাদ করে মূর্ছা যাবে।

ভদ্রলোক : তারপর? (নেপথ্যে অরুর আর্তনাদ) ও কী??

রাম : আর্তনাদ ও মূর্ছা। যান চলে যান।

শ্যাম : এই দিকে।

(শ্যাম সরিয়া পথ করিয়া দিল। ভদ্রলোক ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।)

রাম : যাক সব কাজ শেষ। যদু এবার গুছিয়ে নে।

যদু : যাই দাদা।

(যদু চুবড়ি লইয়া শুকদেবের ঘরে গেল)

রাম : এক নম্বর—শুকদেব।

শ্যাম : দুই নম্বর—জয়দেব।

রাম : তিন নম্বর—সম্পত্তি।

শ্যাম : চার নম্বর —হিরো। দাদা, এ যে বিলকুল নাটকের প্লট! লিখে ফেলবে না কি?

রাম : লিখবো। পাঁচ নম্বরটা আগে সেরে নি।

শ্যাম : পাঁচ নম্বর কী?

রাম : প্রস্থান।

(যদুর প্রবেশ। হাতে ডালাবন্ধ চুবড়ি।)

যদু : পেয়েছি দাদা। পকেটেই ছিল।

শ্যাম : আবার এই ঝামেলা শুরু হোলো।

যদু : মেজদা, এর পরেও এর উপর তোমার রাগ?

রাম : না রে শ্যাম। আর ওর নামে কিছু বলিস নি।

শ্যাম: ভালো করে বন্ধ করেছিস?

যদু : নিশ্চয়ই! টেনে দেখো!

শ্যাম : (পিছাইয়া গিয়া) ঠিক আছে, ঠিক আছে! আমি কি অবিশ্বাস করেছি?

রাম : নে এবার। কুইক মার্চ!

যদু : মার্চ? তবে জেলখানার সেই মার্চিং সং-টা ধরি?

শ্যাম : ধর।

রাম-শ্যাম-যদু : (কোরাসে গাহিল)

হেলা হেলা চাওয়া
হেলা চাওয়া হেলা হো
চলো ভাই চলো ভাই চলো ভাই চলো ভাই
ওয়াম্বা ওয়াম্বা ওয়াম্বা
গিং গ্যাং গুলি গুলি গুলি গুলি গুলি গুলি গেচ্চলো
গিং গ্যাং গো গিং গ্যাং গো।

(গাহিতে গাহিতে তিনজনে বাহির হইয়া গেল।
গানের শব্দ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।)

সমাবৃত্ত

মুখবন্ধ

পর্দায় একটা ইংরিজি ছবি দেখে যথারীতি শতকরা মাত্র দশভাগ বুঝেছিলাম। নাটক করতে গিয়ে বাকিটা বানিয়ে নিতে হয়েছে। যেমন 'সলিউশন এক্স' 'বল্লভপুরের রূপকথা' ইত্যাদি নাটকে ঘটেছে।

আমাদের পুরোনো সংস্থা 'চক্র' মাত্র একবার অভিনয় করেছে এই নাটক। প্রকাশিত হয়নি এর আগে কোথাও।

বাদল সরকার

সমাবৃত্ত

চরিত্রলিপি
(মঞ্চাবতরণ অনুযায়ী)

সুজিত বসুমল্লিক	মোহিতপুরের জমিদার
প্রবীর গুহ	বহিরাগত আগন্তুক
ডঃ পাকড়াশী	মোহিতপুরবাসী চিকিৎসক
ব্রিজলাল	সুজিতের ড্রাইভার
শৈল	মালবিকার দূরসম্পর্কের দিদি
অনঙ্গ	সুজিতের খাসভৃত্য
মালবিকা	সুজিতের স্ত্রী
মধুসূদন	মহাজন
বৃদ্ধ	সুজিতের কাকা
দীপা	সুজিত-মালবিকার কন্যা
ঝর্ণা	মোহিতপুরনিবাসী মহিলা

প্রথম দৃশ্য

(একটি উচ্চস্তরের হোটেলের দুই-কামরা স্যুইট-এর বহির্কক্ষ। দর্শকদের দিকে পিছন ফিরানো একটি বড়ো চেয়ার অথবা সোফায় প্রবীর উপবিষ্ট। পরিধানে রঙিন সিল্কের লুঙ্গি ও গেঞ্জি। নিকটে তাহার ছাড়া শার্ট কোট প্যান্ট ইত্যাদি। পাশে পেগ টেবিলে কাঁচের পাত্রে পানীয়। প্রবীরের চেয়ার মঞ্চের সম্মুখভাগে, তাহার মুখোমুখি, অর্থাৎ দর্শকদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুজিত। তাহার পরিধানে পায়জামা ও সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে পানপাত্র। নিকটস্থ চেয়ারে বা অনুরূপ কোনও স্থানে তাহার ছাড়া ধুতি। সুজিত ও প্রবীর আকার-প্রকারে একই রূপ। অর্থাৎ পিছন হইতে প্রবীরকে দেখিয়া সুজিত বলিয়া মনে হয়। কণ্ঠস্বরেও মিল আছে।

মঞ্চে আলো কম। প্রবীরের দিকটিতে বিশেষভাবে কম। দুইজনের মিলিত হাসির মধ্যে যবনিকার উন্মোচন।)

সুজিত : তারপর? তারপর?

প্রবীর : তারপর আর কী? ভদ্রমহিলা রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে গেলেন, আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। হাওড়া স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুম—লোক গিস্‌গিস্ করছে। অবস্থাটা বুঝুন আমার!

সুজিত : (হাসিতে হাসিতে) আমার চোখের সামনে দৃশ্যটা ভাসছে। কিছু মনে করবেন না—আপনার দুর্গতি, কিন্তু ব্যাপারটা যতো ভাবছি, ততো হাসি পাচ্ছে। ডলি ক্ষেপলে কী বস্তু হয় আমার তো হাড়ে হাড়ে জানা আছে!

প্রবীর . ও ভদ্রমহিলা আপনার—?

সুজিত : (পাঞ্জাবি খুলিতে খুলিতে) বান্ধবী মশাই, বান্ধবী। খুব সরল সম্পর্ক। সেইজন্যই জটিল। (সুজিত পাঞ্জাবিটি তাহার ধুতির উপরে রাখিল)

প্রবীর : জটিল? কেন?

সুজিত : আর একটি নতুন বান্ধবী, বুঝতে পারছেন না? এমনিতেই ক্ষেপে ছিল। ঠাণ্ডা করবার জন্যে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম, আর আপনি বলে বসলেন তাকে চেনেনেই না।

প্রবীর : সত্যি কথাই বলেছি।

সুজিত : হ্যাঁ, প্রবীর গুহ সত্যি কথাই বলেছে, But what about (নিজেকে দেখাইয়া) সুজিত বসুমল্লিক? হাঃ হাঃ হাঃ ডলি তো অল্পে ছেড়ে দিয়েছে বলতে হবে! কই, আপনি খাচ্ছেন না তো?

প্রবীর : (এক চুমুক খাইয়া) বেশি খেতে ভরসা হয় না।

সুজিত : কিছু ভয় নেই মশাই। লিকার তো নয়, শেরী— just a refreshing drink !

প্রবীর : কখনো তো খাই নি আগে।

সুজিত : কক্ষনো খান নি?

প্রবীর : বার দুই সখ ক'রে চেখে দেখেছি—সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

সুজিত : মোটে? বলেন কী? একা লোক—এতো দেশবিদেশ ঘুরে মাত্র বার দুই?
প্রবীর : দেশবিদেশ আর কোথায়? ঐ একটাই তো।
সুজিত : আরে কালাপানি পেরুলেই বিদেশ। তাও বাংলা মতে বিলেত আমেরিকা নয়—খোদ আফ্রিকা!—নিন খান।
প্রবীর : (বাধা দিয়া) না না আর দেবেন না!
সুজিত : (ঢালিয়া) আরে খান মশাই! চোদ্দ বছর পরে দেশে ফিরলেন—সেলিব্রেট করুন। তার উপর এমন একটা আজব ব্যাপার—দেখেছেন কখনো?
প্রবীর : সিনেমায় দেখেছি। আর দেখেছি আমাদের গ্রামে—যমজ ভাই—
সুজিত : যমজ ভাই আমিও দেখেছি। কিন্তু এরকম—কিম্বা কে জানে হয় তো আমরাই যমজ ভাই! আপনি হয় তো ছোটবেলায় হারিয়ে গেছিলেন। কিম্বা পালিয়ে গেছিলেন বাড়ি থেকে।
প্রবীর : (হাসিয়া) সম্ভাবনা কম। আমি ছোটবেলা থেকেই একটু ঘরকুনো।
সুজিত : ঘরকুনো! আপনি? দুম করে চলে গেলেন আফ্রিকায়—আপনি ঘরকুনো?
প্রবীর : সেটা ঘটনাচক্র। সব মরে ঝরে গেলো, তিনকুলে রইলো না কেউ। তারপর একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেলো।
সুজিত : কী দুর্ঘটনা?
প্রবীর : (সতর্ক হইয়া) না, সে কিছু নয়।
সুজিত : আরে বলুন না মশাই। ধরে নিন না আমি আপনার যমজ ভাই। আমার তো বিলকুল ভ্রাতৃভাব এসে গেছে। আপনার আসছে না? (আবার প্রবীরের গ্লাস ভরিয়া দিল। প্রবীর এবার বাধা দিল না।)
প্রবীর : দেখুন, এক ঘণ্টা আগেও আপনাকে চিনতাম না। কিন্তু এর মধ্যে মনে হচ্ছে যেন অনেকদিনের চেনা। কেন বলতে পারেন?
সুজিত : চেহারার মিল বোধ হয়। যমজ ভ্রাতৃভাব।
প্রবীর : তা হবে। তাছাড়া—যেভাবে আপনি আমাকে স্টেশন থেকে টেনে নিয়ে এলেন—আমার তো কলকাতায় একটা মাথা গোঁজবার জায়গাও—(সচকিত হইয়া) তাই তো!
সুজিত : কী হোলো?
প্রবীর : দশটা দশ! আমি চলি। এরপর নইলে আস্তানা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে। (নিজের ছাড়া জামাকাপড়ে হাত দিল)
সুজিত : কোথায় যাবেন? এইখানেই থাকবেন। নইলে এতো রাত অবধি আড্ডা দিচ্ছি—আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?
প্রবীর : এখানে? মানে--এ হোটেলটা বোধ হয় আমার পক্ষে—অবশ্য একটা রাত—
সুজিত : ক্ষেপেছেন না কি? ঘর ভাড়া করতে যাবেন কেন? এইখানে থাকবেন—আমার ঘরে।
প্রবীর : না না, আপনার অসুবিধে করে—
সুজিত : এই দেখুন! কী কথা হোলো? যমজ ভাই! নিন— to our brotherhood--I mean twin-brotherhood (গ্লাস ঠুকিয়া) নিন, এক চুমুকে শেষ করে দিন!

(Toast-এর মর্যাদা রাখিতে প্রবীর সুজিতের মতো এক চুমুকে গ্লাস খালি করিল। ফলে তাহার কথাবার্তা নবলব্ধ ভ্রাতৃত্বের ভাবপ্রবণতায় উত্তরোত্তর সরস হইয়া উঠিতে লাগিল।)

প্রবীর : Twin-brotherhood ! হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক বলেছেন মশাই! যমজ ভাই! আপনি সামনে থাকলে আয়নার দরকার হবে না।

সুজিত : (প্রবীরের গ্লাস ভরিয়া দিয়া) তাই বলে আমার দিকে তাকিয়ে দাড়ি কামাবার চেষ্টা করবেন না যেন!

প্রবীর : দাড়ি কামাবার—হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ বলেছেন মশাই! আপনি কথাগুলো বেশ বলেন—

সুজিত : আমি তো সেই থেকে কথা বলছি। এবার আপনি বলুন?

প্রবীর : কী বলবো?

সুজিত : যা ইচ্ছে। আপনার কথা। ঐ গল্পটাই বলুন না?

প্রবীর : কোনটা?

সুজিত : ঐ যে কী দুর্ঘটনার কথা বলছিলেন? যার জন্যে দেশ ছাড়লেন?

প্রবীর : (গম্ভীর হইয়া) বলবো?

সুজিত : কেন বলবেন না?

প্রবীর : আপনি কাউকে বলবেন না?

সুজিত : আমাদের টোস্ট ভুলে গেলেন এর মধ্যে? নিন—আর একবার তা হলে: to our twin-brotherhood !

প্রবীর : Twin-brotherhood ! (গ্লাস খালি করিতেই সুজিত আবার ভরিয়া দিল) তবে শুনুন। (অন্যমনস্কভাবে একদিকে চাহিয়া রহিল)

সুজিত : কই, বলুন?

প্রবীর : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ। দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা। কিন্তু সবটা তো দুর্ঘটনা নয়? আমিও তো দিনের পর দিন ধরে তাই চেয়েছিলাম।

সুজিত : গোড়া থেকেই বলুন না?

প্রবীর : আমি—একটা লোককে খুন করেছিলাম।

সুজিত : (চমকাইয়া) খুন?

প্রবীর : না। না। আমি তাকে মারি নি। কিন্তু—কিন্তু আমি চেয়েছিলাম। তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম। দিনের পর দিন ধরে। তাকে খুন করা দরকার ছিল। গ্রামের সবাই খুশি হয়েছিলো। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলো।

সুজিত : কী হয়েছিলো? কে সে?

প্রবীর : গুণ্ডা। গুণ্ডা একটা। পাজি বদমায়েশ লোচ্চা একটা। গুণ্ডার দল পাকিয়ে গ্রামের লোকের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো। কিন্তু আমি খুন করি নি। সে মরে গেলো।

সুজিত : কী হয়েছিলো?

প্রবীর : আমাকে মারতে এসেছিলো। তার হাতে ছুরি ছিল। সবাই ভয় পেলো। পালিয়ে গেলো। আমিও ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু রেগেও গিয়েছিলাম। ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।

সুজিত : তারপর?

প্রবীর : তার পেটে একটা লাথি মেরেছিলাম। ঘুরে পড়ে গেলো। হাতের ছুরিটা—

সুজিত : বুঝেছি।

প্রবীর : পালিয়ে গেলাম। কোচিন। সেখান থেকে আফ্রিকা।

সুজিত : কী করে গেলেন?

প্রবীর : মাল জাহাজ। লোক দরকার ছিল। বেশি প্রশ্ন তোলে নি। আচ্ছা—আচ্ছা আমার কি নেশা হয়েছে?

সুজিত : হতে পারে একটু। অনেকক্ষণ থেকে শুধু শেরী খাচ্ছেন। একটু জিন মিশিয়ে নিন—অতো নেশা হবে না।

প্রবীর : হাঃ হাঃ হাঃ সুজিতবাবু! আমি মদ খাই নি, কিন্তু খেতে দেখেছি অনেক। মেশালে নেশা হবে না? আপনি আমাকে মাতাল করতে চান?

সুজিত : (চমকাইয়া) কে বললে?

প্রবীর : বুঝতে পারি। স—ব বুঝতে পারি। তুমি নিজে মাতাল—আমাকেও মাতাল করতে চাও। দাও—কী দেবে দাও। (সুজিত জিন ঢালিয়া দিল। তাহার দৃষ্টি প্রবীরের উপর।) আমি মাতাল হবো। তোমার ভাই হবো। যমজ ভাই। (পানীয় নিঃশেষ করিয়া) তুমি ঘরে নিয়ে এসেছো। তোমার লুঙ্গি পরতে দিয়েছো। থাকতে দিয়েছো। ভাই বলেছো। আমি ভাই হবো। যমজ ভাই। Twin-brotherhood ! দাও। আরো দাও। (সুজিত আরও দিল। প্রবীর ঢলিয়া পড়িল। সুজিত কম খায় নাই, কিন্তু নেশার চিহ্নমাত্র নাই। গ্লাস রাখিয়া সে টেলিফোন ধরিল।)

সুজিত : হ্যালো, সুজিত বসুমল্লিক। একটা ট্রাঙ্ক কানেকশান করে দিন তো। মোহিতপুব থ্রি সেভেন। ডক্টর পাকড়াশী। (ফোন রাখিয়া সুজিত খালি বোতলগুলি প্রবীরের পাশে সাজাইয়া রাখিল। প্রবীরের পোশাক তুলিয়া সেখানে নিজের ধুতি পাঞ্জাবি রাখিল। তারপর প্রবীরের পোশাক ও স্যুটকেস লইয়া শয়নকক্ষের দিকে গেল। ফোন বাজিল। সুজিত পোশাক ও স্যুটকেস রাখিয়া ফোন ধরিল।)
হ্যালো পেয়েছেন? হ্যাঁ দিন। ...(মাতালের স্খলিতকণ্ঠ নকল করিয়া) হ্যালো—ডাক্তারবাবু? নমস্কার স্যার—আমি সুজিত...সুজিত সুজিত—আপনাদের কুমারবাহাদুর। ......হে হে, ঠিক ধরেছেন। কী করবো? না খেয়ে উপায় ছিল না।...আরে শুনুন আগে। আমার কী হয়েছিলো জানেন? মাথার গোলমাল।......মাইরি বলছি— transferred identity fixation ...transferred identity...আরে আপনি জানবেন কোত্থেকে, আপনি তো মেডিক্যাল ডাক্তার! এসব বোঝে সাইকোলজিস্ট। .....লক্ষণ? শুনবেন? ক'দিন ধরে মনে হচ্ছে আমি আমি নই। .....আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আমি নই। মানে—সুজিত নই। মনে হচ্ছে আমার নাম—প্রবীর। প্রবীর গুহ। .....আর কী? মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকায় গিয়েছিলাম। .....হ্যাঁ হ্যাঁ আফ্রিকা! এ-এফ্-আর-আই—... বুঝতে পেরেছেন? ..... আরে ঐ জন্যেই তো খেলাম। মদ খেলে স-ব ঠিক হয়ে যায়। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি কুমার সুজিত নারায়ণ বসুমল্লিক বাহাদুর অফ্ মোহিতপুর।.....আপনাকে?...একটা অনুরোধ ছিল স্যার। .....বাড়িতে একটু খবর

পাঠিয়ে দেবেন—কাল সকালে যেন গাড়ি নিয়ে ব্রিজলাল চলে আসে। ক্রেটন হোটেল—স্যুইট্ নাম্বার ফোর। ...হ্যাঁ, তা না? বাড়িতে ফোন করি, আর গিন্নী আমার গুষ্টির পিণ্ডি চটকান! আপনি তো তাই চান।.....হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি যাবো! বাড়ি ছেড়ে কদ্দিন আছি বলুন তো? মন কেমন করে না? ...দেবেন তো খবরটা? .....থ্যাঙ্কিউ ডক্টর— good old soul— থ্যাঙ্কিউ থ্যাঙ্কিউ, গুডনাইট স্যার! (ফোন রাখিয়া প্রবীরের পোশাক ও স্যুটকেস লইয়া ভিতরে গেল। অল্প পরে প্রবীর নড়িয়া উঠিল।)

প্রবীর : ভাই! টুইন ব্রাদার! সুজিত প্রবীর দুই ভাই। চলো। চলো বাড়ি যাই। বাড়ি অনে—কদিন বাড়ি যাই নি। (প্রবীর আবার ঢলিয়া পড়িল। মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মঞ্চ আলোকিত হইবে সকালের রোদে। প্রবীর একই অবস্থায়। তবে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে অভিনেতা বদল হইয়া গিয়াছে। প্রথম দৃশ্যে সুজিতের ভূমিকায় যিনি ছিলেন, তিনি প্রবীরের স্থান লইয়াছেন। পরিধানেও প্রবীরের পোশাক—অর্থাৎ সেই সিল্কের লুঙ্গি ও গেঞ্জি। প্রবীর ধীরে ধীরে উঠিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। লক্ষ্যহীনভাবে মঞ্চের পিছনদিকে দুই পা গিয়া এই প্রথম দর্শকদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মদের বোতলগুলি তাহার নজরে পড়িল। অপরিচিত পারিপার্শ্বিকের বিস্ময় এবং নেশার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার তাহার অবস্থা শোচনীয়। খালি বোতলগুলি ঘাঁটিয়া স্মৃতিমন্থনের চেষ্টা করায় কিছুটা ফল পাওয়া গেল।)

প্রবীর : সুজিত। সুজিত বসুমল্লিক। সুজিতবাবু! ও সুজিতবাবু! (ডাকিতে ডাকিতে ভিতরে গেল। দরজায় টোকা। প্রবেশ করিলেন ডক্টর পাকড়াশী এবং ব্রিজলাল। প্রবীরের অনুসন্ধানী ডাকে ব্রিজলাল কিছুটা বিভ্রান্ত।)

ব্রিজলাল · ই কেমোন হোলো? দুসরা আদমি রহিয়েছে? না কি হুজুর হুজুরকো বুলাচ্ছেন? (ডক্টর পাকড়াশী খালি বোতল তুলিয়া দেখিলেন। প্রবীরের প্রবেশ।)

প্রবীর : সুজিতবাবু! —এ কী, আপনি—?

পাকড়াশী : নিজে আসাই ভালো মনে করলাম। সব শুনে বৌরানিও তাই বললেন।

প্রবীর : বৌরানি?

পাকড়াশী : বৌরানি। সম্পর্কে আপনার স্ত্রী হন। আমাকে চিনতে পারছেন?

প্রবীর : আমার স্ত্রী!

পাকড়াশী : একটু বসুন চুপ করে—একটু পরে সবাইকে মনে পড়বে। আমি ব্ল্যাক কফি দিতে বলে এসেছি।

প্রবীর : আপনি বোধহয় ভুল করছেন—

পাকড়াশী: তা হবে। বয়স হয়েছে তো—ভুলভ্রান্তি হয়। ব্রিজলাল, দেখো তো কফিটা হোলো কি না? হলে একেবারে নিয়ে আসবে—এদের বেয়ারার ভরসায় থেকো না।
(ব্রিজলালের প্রস্থান। প্রবীর এতক্ষণে বুঝিয়াছে।)

প্রবীর : (হাসিয়া) ও, আই সী! আপনি ভেবেছেন—আমি সুজিতবাবু!

পাকড়াশী : ঠিক ধরেছেন।

প্রবীর : কালও ঠিক এইরকম কাণ্ড হয়েছিলো—হাওড়া স্টেশনে। শুনুন, আমি সুজিতবাবু নই, বুঝলেন?

পাকড়াশী : বুঝেছি। আপনি একটু বসুন।

প্রবীর : আরে কী মুস্কিল! বলছি আমি সুজিত নই!

পাকড়াশী : আমি কি অবিশ্বাস করেছি? আমি শুধু বলছি একটু চুপ করে বসতে।

প্রবীর : আরে শুনুন না—

পাকড়াশী : শুনছি। আগে বলুন তো—মাথার যন্ত্রণা কী রকম?

প্রবীর : ভীষণ যন্ত্রণা।

পাকড়াশী : বমি হয়েছিলো?

প্রবীর : না। কিন্তু আপনি—

পাকড়াশী : চোখে কী রঙ দেখছেন?

প্রবীর : কিসের রঙ?

পাকড়াশী : এই চারদিকের জিনিসপত্রের?

প্রবীর : যার যা রঙ তাই দেখছি, আবার কী দেখবো?

পাকড়াশী : ঐ দেওয়ালটার কী রঙ?

প্রবীর : বেগুনি।

পাকড়াশী : এই টেবিল ক্লথটা?

প্রবীর : বেগুনি।

পাকড়াশী : ঐ ধুতিটা?

প্রবীর : বেগুনি।

পাকড়াশী : হুঁ। (কথা কহিতে কহিতে নিজের ব্যাগ হইতে সরঞ্জাম বাহির করিয়া ঔষধ মিশাইতেছিলেন। এইবার গ্লাসটি আগাইয়া দিলেন।)
নিন। খেয়ে নিন।

প্রবীর : কী এটা?

পাকড়াশী : খান না, মাথার যন্ত্রণাটা কমবে। (প্রবীর ঔষধ খাইয়া মুখ বিকৃত করিল) বসুন দেখি। (প্রবীর বসিল) একটু ভালো বোধ করছেন? (প্রবীর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল) কফিটা খেলে আরো দু'একটা রঙ দেখতে পাবেন।

প্রবীর : আপনি—ডাক্তার?

পাকড়াশী : আমি—ডাক্তার। আমার নাম বিমল পাকড়াশী। আপনার ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান।

প্রবীর : আমার ফ্যামিলি? অর্থাৎ সুজিতবাবুর ফ্যামিলি।

পাকড়াশী : অর্থাৎ—সুজিতবাবুর ফ্যামিলি।

(কফি লইয়া ব্রিজলালের প্রবেশ)

ব্রিজলাল : কফি হুজুর।

পাকড়াশী : এইখানে রাখো।

প্রবীর : ইনি কে?

পাকড়াশী : ইন ব্রিজলাল। আপনার ড্রাইভার। অর্থাৎ সুজিতবাবুর ড্রাইভার।

প্রবীর : যখন সব শুনবেন। আপনারই হাসি পাবে। সুজিতবাবু ফিরে আসুন।

পাকড়াশী : ব্রিজলাল, তুমি ভিতরে যাও। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নাও।

(ব্রিজলালের শয়নকক্ষে প্রস্থান)

প্রবীর : জিনিসপত্র গোছাবে কেন?

পাকড়াশী : সুজিতবাবু বাড়ি যাবেন।

প্রবীর : ও। (কফিতে চুমুক দিয়া) আমার একটা স্যুটকেস আছে, গুলিয়ে না ফেলে।

পাকড়াশী : গুলিয়ে ফেলবার কিছু নেই। সব কিছুই গাড়িতে যাচ্ছে।

প্রবীর : (চটিয়া) সব কিছু গাড়িতে গেলে তো চলবে না! আমার স্যুটকেস আমার কাছে থাকবে।

পাকড়াশী : কোনটা বলে দেবেন। ব্রিজলাল গাড়ির ভিতরে দিয়ে দেবে।

প্রবীর : আরে বলছি যতো—

পাকড়াশী : আপনি কফিটা শেষ করুন। (প্রবীর রাগিয়া কফি খাইতে গিয়া অল্প বিষম খাইল) আস্তে। আস্তে।

প্রবীর : এই দেখুন আমার কার্ড— (নিজের জামার স্থানে সুজিতের ধুতি পাঞ্জাবি) এ কী! আমার জামাটা কোথায়?

পাকড়াশী : বদলে গেছে বোধ হয়। আপনার মতো।

প্রবীর : এ তো ভালো আপদে পড়া গেলো। সুজিতবাবুও যে কোন্ চুলোয় গিয়ে বসে রইলেন। আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি। আমার পাসপোর্ট দেখাচ্ছি —আরে। স্যুটকেসটা গেলো কোথায়?

পাকড়াশী : কফিটা শেষ করে যান।

(কোনোগতিকে কফি শেষ করিয়া প্রবীর ছুটিয়া ভিতরে গেল। ডঃ পাকড়াশী দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া নিজের ব্যাগ গুছাইতে লাগিলেন।)

Incorrigible. Absolutely incorrigible.

(উত্তেজিত প্রবীরের প্রবেশ)

প্রবীর : আমার স্যুটকেস শার্ট প্যান্ট কিছু পাচ্ছি না! ঐ স্যুটকেসে আমার যথাসর্বস্ব।

পাকড়াশী : ভাববেন না। ব্রিজলাল সব গুছিয়ে নেবে।

প্রবীর : গুছিয়ে নেবে? আমার স্যুটকেস ব্রিজলাল গুছিয়ে নেবে? কোথায় আছে আমার স্যুটকেস?

পাকড়াশী : ব্রিজলাল দেখবে এখন।

প্রবীর : (চিৎকার করিয়া) আর একবার ব্রিজলালের নাম শুনলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে!

পাকড়াশী : (প্রবীরের দুই কাঁধে হাত রাখিয়া) কেন মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন সুজিতবাবু?

প্রবীর : (ঝটকা মারিয়া সরিয়া গিয়া) আবার সুজিতবাবু! কতোবর বলবো—আমি সুজিত নই সুজিত নই সুজিত নই—

পাকড়াশী : আচ্ছা বেশ। আপনি প্রবীর গুহ।

প্রবীর : হ্যাঁ আমি প্র— কী বললেন?

পাকড়াশী : আপনি প্রবীর গুহ।

প্রবীর : আপনি—আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

পাকড়াশী : আপনাকে চিনি বলে।

প্রবীর : চিনি? বললেই হোলো? আমি আজ চোদ্দ বছর এ দেশের বাইরে, জানেন?

পাকড়াশী : জানি বৈ কি?

প্রবীর : জানেন? কোথায় ছিলাম বলুন তো?

পাকড়াশী : আফ্রিকা। (প্রবীর খানিকক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

প্রবীর . কী ব্যাপার—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পাকড়াশী : Transferred identity fixation.

প্রবীর : সে আবার কী?

পাকড়াশী : পরে বুঝবেন। (সুজিতের ধুতি পাঞ্জাবি দেখাইয়া) এইগুলোই পরবেন, না ব্রিজলাল আর এক সেট দেবে?

প্রবীর : পরবো? কেন?

পাকড়াশী : তবে কি লুঙ্গি পরেই যাবেন?

প্রবীর : কোথায় যাবো?

পাকড়াশী : মোহিতপুর। সুজিতবাবুর বাড়ি। ব্রিজলাল হোলো তোমার?

ব্রিজলাল : (নেপথ্যে) জী হাঁ!

পাকড়াশী : টাকা আছে কিছু বাকি?

প্রবীর : টাকা তো সব স্যুটকেসে। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু।

পাকড়াশী : বুঝেছি। বৌরানি ঠিকই ধরেছিলেন। সব টাকা উড়িয়ে তবে বাড়ির কথা মনে পড়েছে।

প্রবীর : টাকা উড়িয়েছি? জানেন আমার স্যুটকেসে—

পাকড়াশী : যেতে দিন ও সব কথা। বলা উচিতও নয় আমার। আপনার বাবা আমায় ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন, তাই মাঝে মাঝে বলে ফেলি।

(ব্রিজলালের প্রবেশ)

প্রবীর : মাই গড। মাই গড! কারো সঙ্গে চেহারার মিল থাকলে যে এরকম হাল হয়—

পাকড়াশী : ব্রিজলাল। তুমি অফিসে গিয়ে লোক পাঠিয়ে দিতে বলো, মালগুলো তুলে দিক। বিলটাও তৈরি রাখতে বলে দাও।

ব্রিজলাল : জী।

(ব্রিজলালের প্রস্থান)

পাকড়াশী : নিন, আপনি কাপড়টা ছেড়ে নিন।

প্রবীর : (ডঃ পাকড়াশীর দুই হাত ধরিয়া) ডাক্তারবাবু শুনুন। আমাকে ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে দিন।

পাকড়াশী : গাড়িতে অনেক সময় পাবেন বলবার।

প্রবীর : এরকম চলতে থাকলে এর পর আমারই মনে হবে আমি সুজিত!

পাকড়াশী : সেইটাই তো চাইছি।

প্রবীর : আচ্ছা সুজিতবাবুকে আসতে দিন—

পাকড়াশী : সুজিতবাবু যখন আসবেন, তখন আসবেন। আপনি কাপড়টা ছাড়ুন।
(জামাকাপড় প্রবীরের হাতে তুলিয়া দিয়া ভিতরের দিকে লইয়া চলিলেন।)

প্রবীর : আপনি কি সত্যি সত্যিই সুজিত বসুমল্লিক বলে আমাকে টেনে নিয়ে যাবেন।

পাকড়াশী : আচ্ছা বেশ তো। না হয় প্রবীর গুহ হয়েই গেলেন।

প্রবীর : (চিৎকার করিয়া) কেন যাবো? কোথায় যাবো?

পাকড়াশী : বাড়ি যাবেন।

প্রবীর : (সহসা অন্য সুরে) বাড়ি যাবো?

পাকড়াশী : হ্যাঁ। বাড়ি যাবেন।

প্রবীর : (আর বোধহয় মাথা খেলিতেছে না) কিন্তু—আমার তো বাড়ি নেই ডাক্তার!

পাকড়াশী : সকলেরই বাড়ি থাকে। আপনারও আছে। যান তৈরি হয়ে নিন।
(প্রবীর বিহ্বলভাবে জামাকাপড় লইয়া ভিতরে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

(মোহিতপুর। সুজিতের পড়িবার ঘর। একদিকে একটি ছোট লিখিবার টেবিল ও চেয়ার। অন্যদিকে খান তিন চার চেয়ার ও মোড়া এবং একটি কফি-টেবিল। একটি বইয়ের শেল্‌ফ্‌ ও একটি ডালা-ওয়ালা ছোট ক্যাবিনেট। টেলিফোনও আছে। একদিকে শয়নকক্ষের দরজা। অন্য একটি দরজা দিয়া গৃহের বাকি অংশের সহিত যোগাযোগ।

লিখিবার টেবিলে শ্রীমতী শৈলজায়া অখণ্ড আগ্রহে একটি চিঠি পড়িতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সতর্ক দৃষ্টিতে বাহিরের দরজার দিকে চাহিতেছে। টেবিলে খোলা খাম এবং একটি পাত্রে জল। শৈলজায়ার পরিধানে বিধবার সাজ, কিন্তু তাহাতেও কিছুটা পরিপাটি আভিজাত্যের ছাপ আছে। বয়স পঁয়ত্রিশের নিচে নহে।

সুজিতের খাস-ভৃত্য অনঙ্গর প্রবেশ। তাহার বয়স হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল প্রভুর মন জোগাইতে এবং সেই সূত্রে নিজের কাজ গুছাইতে যে বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহার প্রভায় চোখ মুখ উজ্জ্বল। অনঙ্গ শৈলজায়ার অনধিকার চর্চা এক নজরে বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই।)

অনঙ্গ : মাসীমা, কিছু খুঁজছেন?

শৈল : না।

অনঙ্গ : কিছু দরকার থাকলে হুকুম করুন। আমি আপনার ঘরে দিয়ে আসছি।

শৈল : না, কিছু দরকার নেই। তুমি কী চাও এখানে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে ঘরটা গুছিয়ে রাখবো। হুজুর এখুনি আসবেন।

শৈল : আমি গোছাচ্ছি, তুমি যাও।

অনঙ্গ : আজ্ঞে আপনি কেন কষ্ট করবেন? এ তো আমার কাজ।

শৈল : সে আমি বুঝবো। তুমি যাও।
(শৈল টেবিলের একটি বস্তু সরাইয়া রাখিল। অনঙ্গ যাইতে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।)

অনঙ্গ : আজ্ঞে ওটা ডান দিকেই থাকে। (শৈল ফিরিয়া তাকাইতে) আজ্ঞে না।

(অনঙ্গর প্রস্থান। শৈল আবার চিঠি পড়িতে লাগিল। টেলিফোন বাজিতে চমকাইয়া চিঠি নামাইল। তারপর ফোন ধরিল।)

শৈল : হ্যালো...না এখনো আসেন নি...গাড়ি গেছে আনতে, এসে পড়বেন শিগ্গিরই...আপনি ঘণ্টাখানেক পরে একবার ফোন করুন না হয়...আচ্ছা।

(ফোন রাখিয়া শৈল আবার চিঠি ধরিল। মালবিকার প্রবেশ। শৈল সচকিত হইয়া চিঠি লুকাইল। মালবিকার গঠন দীর্ঘ ও ঋজু। মুখের ভাব, কথাবার্তা, চলাফেরায় একটি নিষ্করুণ সংযমের আবরণ। বিশেষ কোনও মুহূর্তে যখন সে আবরণে ফাটল ধরে, তখন ভিতরের অন্য এক মালবিকার আভাস পাওয়া যায়।)

মালবিকা : শৈলদি, আবার তুমি ওর চিঠি খুলে পড়ছো?

শৈল : না, পড়বে না। তোমার মতো চোখ বুঁজে বসে থাকবে।

মালবিকা : চোখ বুঁজে থাকলেই যদি দেখা না যেতো, তবে আমি চব্বিশ ঘণ্টা চোখে কাপড় বেঁধে রাখতাম।

শৈল : তুই খোঁজখবর রাখিস নি বলেই এতোটা বাড়াবাড়ি হয়েছে।

মালবিকা : খোঁজখবর করে নতুন আর কী জানতাম?

শৈল : এটা কার চিঠি জানিস?

মালবিকা : কার আবার? একটা কোনো মেয়ের। শেলী, না হয় নেলী, নয়তো ডলি—

শৈল : ছাই জানো তুমি। ডলির সঙ্গে তো ঝগড়া হয়ে গেছে!

মালবিকা : (নিরুৎসুক) হয়েছে বুঝি?

শৈল : আমি তোকে বলেছিলাম না—ডলি আর বেশিদিন নয়? নইলে ঐ কথা লেখে চিঠিতে? (মালবিকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এটা ওটা নাড়িতে নাড়িতে নিরুৎসুকভাবে কথা বলিতেছে)

মালবিকা : কোন কথা?

শৈল : বা রে! ভুলে গেলি? চিঠিটা তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে শুনিয়ে এলাম—এই তো সেদিন! এর মধ্যে ভুলে গেলি?

মালবিকা : (পূর্ববৎ) না, মনে আছে।

শৈল : ডলির দিন শেষ। এটা একেবারে আনকোরা নতুন। এর নামই শুনিস নি তুই কোনোদিন। (মালবিকাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া) কী নাম বল দিকি?

মালবিকা : পলি?

শৈল : উঁহু, নামের বাহার আছে। বি-পা-শা। কী লিখেছে শুনবি?

মালবিকা : না।

শৈল : কেন?

মালবিকা : আমরা ওসব ভালো লাগে না।

শৈল : ভালো লাগালাগির কী আছে? আমি কি ভালো লাগে বলে পড়ি?

মালবিকা : তবে কী জন্যে পড়ো—শুনি?

শৈল : (থতমত খাইয়া) কী জন্যে পড়ি? অবাক করলি।

মালবিকা : বলোই না?

শৈল : কী জন্যে পড়ি? তুই কিছু দেখবি না, শুনবি না, ও যা ইচ্ছে তাই করে

বেড়াবে—আমার সহ্য হয় না।

মালবিকা : তাই পড়ো?

শৈল : তা ছাড়া কী? তোরও পড়া উচিত। এতোটা বয়স হোলো—স্বামীকে কী করে বশে রাখতে হয় শিখলি নে।

মালবিকা : তুমি শিখলে কোত্থেকে? তোমার স্বামীর চেহারাটাও তো বোধ হয় তোমার মনে নেই।

শৈল : তুই এতোবড়ো কথা আমায় বললি মালবি? তোকে আমি এইটুকু দেখেছি—

মালবিকা : (অধৈর্য হইয়া) দোহাই তোমার শৈলদি, আমাকে আর জ্বালিও না। চব্বিশঘণ্টা তুমি আমার পেছনে লেগে আছো!

শৈল : কেন লেগে আছি—বুঝিস তুই?

মালবিকা : না বুঝি না। কেন?

শৈল : সুজিতের জমিদারির অবস্থা কীরকম— জানিস?

মালবিকা : না। কী হবে জেনে? কোত্থেকেই বা জানবো?

শৈল : জানবে আমি যেখান থেকে জেনেছি। ঐ চিঠিগুলো থেকে। জমিদারি গোল্লায় যেতে বসেছে।

মালবিকা : চুরি করে চিঠি না পড়েও ওটুকু আন্দাজ করা যায়।

শৈল : তার মানে কী —বোঝো?

মালবিকা : তুমি না বুঝিয়ে দিলে কী করে বুঝবো বলো?

শৈল : আমার কাছেই বুঝতে হবে তোমার, আর কোনো গতি নেই। সুজিতের এখন একমাত্র ভরসা—কাকাবাবুর সম্পত্তি।

মালবিকা : বাবার সম্পত্তি আমার নামে লেখা আছে। সেখানে ওর দাঁত ফোটাবার উপায় নেই। আমি বেঁচে থাকতে দাঁত ফোটাতে দেবোও না।

শৈল : এবার বুঝতে পেরেছো?

মালবিকা : কী আবার বুঝবো?

(অনঙ্গর প্রবেশ)

শৈল : কী চাই আবার?

অনঙ্গ : আজ্ঞে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

মালবিকা : অনঙ্গ।

অনঙ্গ : আজ্ঞে?

মালবিকা : দীপা কোথায় দেখেছিস?

অনঙ্গ : আজ্ঞে বাগানে।

মালবিকা : মাস্টারমশাই চলে গেছেন?

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ, এই গেলেন।

মালবিকা : আচ্ছা, যা তুই।

(অনঙ্গর প্রস্থান। শৈল খোলা খামে চিঠি ভরিয়া আঠা দিয়া সাঁটিতে লাগিল।)

শৈল : এই লোকটাকে আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারি না।

মালবিকা: যেমন মনিব, তার তেমনি চাকর। (শয়ন কক্ষের দরজার দিকে গেল)

শৈল : চললি কোথায়?

মালবিকা : শোবার ঘরটা একবার দেখে আসি।

শৈল : কথাটা শেষ করবি নে?

মালবিকা : ও কথার কি শেষ আছে না কি? (মালবিকার শয়নকক্ষে প্রস্থান)

শৈল : (খাম বন্ধ শেষ করিয়া) বুঝবি, বুঝবি। গরিবের কথা বাসি হলে ফলে। যখন বুঝবি, তখন যে আর কিচ্ছু করবার থাকবে না।

(বাহির হইতে কথা কহিতে কহিতে প্রবীর ও ডক্টর পাকড়াশীর প্রবেশ)

প্রবীর : আপনি বুঝতে পারছেন না ডাক্তারবাবু—কী একটা অ্যাবসার্ড অবস্থার মধ্যে আপনি আমাকে— (শৈলকে দেখিয়া থামিয়া গেল)

পাক : এই যে মাসী। আমি এনে দিলাম—এবার আপনারা সামলান।

শৈল : (কঠিন মুখে) যার জিনিস সে সামলাবে। আমি এ বাড়ির কে?

(শৈলর প্রস্থান)

পাক : মাঝে মাঝে ভাবি—এঁর সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে ঠিক উপযুক্ত হোতো।

প্রবীর : ইনি কে?

পাক : সুজিতবাবু, আপনি খুব ভালো অভিনয় করেন। কিন্তু সারা সকাল থিয়েটার দেখবার তো আমার সময় নেই, আমাকে রোগী দেখতে হবে।

প্রবীর : আপনি কি চলে যাচ্ছেন না কি?

পাক : বিকেলে আবার আসবো। ততোক্ষণ একটু কষ্ট করে থাকুন।

প্রবীর : আমি তা হলে কী করবো?

পাক : আপনার যা অভিরুচি।

প্রবীর : একটা খোঁজও করবেন না? সুজিতবাবু এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরেছেন।

পাক : তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

প্রবীর : উঃ! আপনি আমাকে—আমি বলছি আসল সুজিতবাবু—তিনি নিশ্চয়ই হোটেলে ফিরেছেন এতক্ষণে!

পাক : বেশ তো, খোঁজ নিন না।

প্রবীর : আমি? আমি কী করে খোঁজ নেবো?

পাক : টেলিফোন করুন। (প্রবীর টেলিফোন দেখিতে পাইয়া উদ্ভ্রান্তভাবে গিয়া গাইডের পাতা উল্টাইতে লাগিল।) সুজিতবাবু ফিরলে—মানে ধাতে ফিরলে আমাকে একটু খবর দেবেন দয়া করে।

(ডঃ পাকড়াশীর প্রস্থান)

প্রবীর : ক্ল্যারেন্স—ক্লার্ক—ক্রেটন হোটেল! (ফোনে) হ্যালো, ট্রাঙ্ক কল টু ক্যালকাটা প্লীজ ইয়েস, ক্রেটন হোটেল, টু ফোর ওয়ান এইট থ্রি-ফাইভ...আমার? বলছি— (টেলিফোনের গায়ে নম্বর দেখিয়া) মোহিতপুর টু ফোর।

(অনঙ্গ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবীর ফোন রাখিয়া ফিরিতেই অনঙ্গকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।)

অনঙ্গ : হুজুরের মালপত্রগুলো উপরে এনেছে। শোবার ঘরে রাখবো?

প্রবীর : আমি কী জানি? হুজুরের জিনিস হুজুর বুঝবেন।
অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।
প্রবীর : তাই জিজ্ঞেস করছিলে?
অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।
প্রবীর : আমাকে দেখে কি তোমার হুজুর বলে মনে হচ্ছে?
অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।
প্রবীর : নিজের মনিবকেও চিনে রাখতে পারো না? গাধা কোথাকার!
অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।
প্রবীর : কী আজ্ঞে হ্যাঁ?
অনঙ্গ : আজ্ঞে—আমি গাধা।
প্রবীর : উঃ! কোথায় এলাম? (মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল)
অনঙ্গ : আপনি কি এখন কিছু খাবেন হুজুর?
প্রবীর : না।
অনঙ্গ : চা দোবো কি?
প্রবীর : না।
অনঙ্গ : অন্য কিছু?
প্রবীর : অন্য কী আবার?
অনঙ্গ : আজ্ঞে— (ক্যাবিনেটটির দিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিল)
প্রবীর : কী আছে ওখানে?
অনঙ্গ : আজ্ঞে— (হাত কচলাইতে লাগিল)
প্রবীর : বলবে তো?
অনঙ্গ : আজ্ঞে—
প্রবীর : ধ্যাত্তেরি আজ্ঞের নিকুচি করেছে! যাও এখান থেকে!
অনঙ্গ : আজ্ঞে।

(অনঙ্গর প্রস্থান। প্রবীর পায়চারি করিতে লাগিল।)

প্রবীর : সুজিত বসুমল্লিক! মরবার আগে তোমাকে যেন একবার হাতের কাছে পাই! (ক্যাবিনেটটির সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর ডালা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে নানা আকারের মদের বোতল। একটি হাতে করিয়া দেখিতেছে—মালবিকা শয়নকক্ষ হইতে প্রবেশ করিল।)
মালবিকা : বাঃ! চমৎকার! (প্রবীর চমকাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। হাতের বোতলের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। মালবিকা দুই পা আগাইয়া আসিল।) তোমার কি লজ্জা বলে কোনো বস্তু নেই? সাতদিন কলকাতায় বেলেল্লাপনা করে এলে! বেহেড মাতাল অবস্থায় তুলে আনতে হোলো। হোটেলের বিলটা পর্যন্ত দেবার ক্ষমতা বাকি রাখো নি! আর এসেই সক্কালবেলা বোতল ধরেছো?
প্রবীর : বোতল? কিসের বোতল?
মালবিকা : সরষের তেলের বোতল! নাও আরম্ভ করো! যে ক'টা আছে শেষ করে দাও! (ক্যাবিনেট হইতে বোতলগুলি লইয়া দুমদাম করিয়া টেবিলে রাখিতে লাগিল। প্রবীর

বোতল হাতে বিহ্বলভাবে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল—একবার টেবিলের দিকে, একবার ক্যাবিনেটের দিকে।) নাও! শেষ করো! শেষ করে যদি খাড়া থাকো, তোমার পেয়ারের চাকর অনঙ্গকে বোলো—আরো এনে দেবে।

(মালবিকার প্রস্থান। প্রবীর খানিকক্ষণ তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া টেবিলের নিকট আসিল। শূন্য দৃষ্টি বোতলগুলির উপর। অনঙ্গ প্রবেশ করিল।)

অনঙ্গ : হুজুর।

প্রবীর : (ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া) তুমি আবার এসেছো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে না।

প্রবীর : আসো নি?

অনঙ্গ : আজ্ঞে—বলছিলাম মধুসূদন বাবু এসেছেন।

প্রবীর : কে মধুসূদনবাবু?

অনঙ্গ : আজ্ঞে—মধুসূদনবাবু।

প্রবীর : পরিষ্কার বোঝা গেলো। কী করতে হবে? (অনঙ্গ বোতলগুলির দিকে আড় চোখে চাহিল)

অনঙ্গ : আজ্ঞে এখন দেখা করবেন, না পরে আসতে বলবো?

প্রবীর : হ্যাঁ হ্যাঁ পরে আসতে বলো। পরে। সব্বাইকে পরে আসতে বলবে! (প্রবীর বোতল হাতে ঘুরিতে লাগিল। অনঙ্গ নিঃশব্দ চরণে ক্যাবিনেট হইতে একটি পানপাত্র বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল।) ওটা কী হোলো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে গেলাস।

প্রবীর : গেলাস বুঝি? ভাগ্যিস বললে? কী হবে ওটা?

অনঙ্গ : আজ্ঞে—ঢেলে দোবো?

(প্রবীরের হাতের বোতলটির দিকে হাত বাড়াইল। এতক্ষণে সচেতন হইয়া প্রবীর টেবিলে বোতলটি রাখিল। অনঙ্গ ক্ষিপ্রহস্তে বোতল খুলিয়া পানপাত্র ভরিয়া দিল। মধুসূদনের প্রবেশ।)

মধু : হেঁ হেঁ হেঁ—নমস্কা—র কুমার বাহাদুর। আজকেই আগমন হোলো?

অনঙ্গ : এ কী আপনি—এত্তেলা না দিয়ে একেবারে উঠে এলেন?

মধু : হেঁ হেঁ, এত্তেলা তো দিয়েছিলুম বাবা। তোমার বিলম্ব দেখে বুঝলুম হুজুরের অনুমতি হয়েছে। কি বলেন কুমার বাহাদুর? হেঁ হেঁ হেঁ—

অনঙ্গ : আপনি—

প্রবীর : আচ্ছা খুব হয়েছে। তুমি যাও।

(অনঙ্গর প্রস্থান)

মধু : হেঁ হেঁ—বেশ সাজিয়ে বসেছেন। রাজা মহারাজার এমনটি নইলে মানায় না—হেঁ হেঁ হেঁ—

প্রবীর : আপনি কিছু বলবেন?

মধু : হেঁ হেঁ—অনেকদিন অনুপাস্থিত ছিলেন—কেমন আছেন না আছেন একটু—হেঁ হেঁ হেঁ—

প্রবীর : খুব ভালো আছি। আপনি?

মধু : হেঁ হেঁ—আমাদের এই বয়সে আর—আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে কোনো রকমে—হেঁ হেঁ হেঁ—

প্রবীর : আর কোনো কথা আছে কি? আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন।

মধু : (বোতলগুলির দিকে চাহিয়া) তা তো দেখতেই পাচ্ছি—হেঁ হেঁ। আজকালকার লোকেরা রাজা-রাজড়া মান্য করতে চায় না। আমি হুজুর সেকেলে লোক—রাজাকে, হেঁ হেঁ—রাজা বলেই জানি।

প্রবীর : ভালোই করেন। আচ্ছা তাহলে— (নমস্কার করিল। মধুসূদনের উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।)

মধু : হেঁ হেঁ—তবে সেরেই ফেলি কথাটা। কী বলেন?

প্রবীর : তাই বলি।

মধু : হেঁ হেঁ—এইমাত্র আগমন হোলো—ভাবছিলুম এখন আর ওসব সামান্য কথা—

প্রবীর : কথা যখন আছে, সেরেই ফেলুন।

মধু : হেঁ হেঁ হেঁ—দু'মাস হয়ে গেলো কিনা? বেশি জমে গেলে আবার—হেঁ হেঁ হেঁ—

প্রবীর : কী জমে গেলে?

মধু : হেঁ হেঁ—কেন লজ্জা দেন হুজুর? দিন চালাতে হয় হুজুর, তাই আসি। নইলে কি আর এসব কথা উচ্চারণ করি হুজুরের সামনে—

প্রবীর : দেখুন, আমি মদ খেয়েছি। বুঝেছেন?

মধু : হেঁ হেঁ হেঁ—

প্রবীর : প্রচুর মদ খেয়েছি! মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। আমি যে কে—তারই হদিস পারছি না। আপনি আর একটু খুলে বললে আমার সুবিধে হয়।

মধু : হেঁ হেঁ—যদি অপরাধ না নেন—

প্রবীর : নেবো না। কথা দিচ্ছি।

মধু : হেঁ হেঁ হেঁ—ঐ হ্যান্ডনোটের দরুণ সুদটা। গত দু'মাস কিছু পাই নি। আসলটা নিয়ে ভাববেন না—হেঁ হেঁ—সে যখন আজ্ঞা হয়। শুধু সুদটা যদি নিয়মিত গরিবকে—হেঁ হেঁ হেঁ—

প্রবীর : আই সী!

মধু : হেঁ হেঁ হেঁ—অনেকগুলি পোষ্য কি না? নইলে কি আর—

প্রবীর : আসলটা কতো এবং তার সুদটাই বা কতো?

মধু : হেঁ হেঁ হেঁ, এই দেখুন না— (পকেট হইতে কাগজ বাহির করিল)

প্রবীর : দেখতে হবে না, শুধু বলে যান।

মধু : তিন হাজার—হেঁ হেঁ হেঁ। দু'মাসে সুদ একশো আশি দুগুণে তিন শো ষাট—হেঁ হেঁ হেঁ—শতকরা ছ'টাকা হিসেবে মাসে—

প্রবীর : সিক্স পার্সেন্ট—মাসে! ছ'বারোং বাহাত্তর পার্সেন্ট! আপনার বুঝি এই ব্যবসা?

মধু : হেঁ হেঁ কী যে বলেন হুজুর! ব্যবসা করবো সে সাধ্য কোথায়? সামান্য দু'চার পয়সা বাপ পিতামহ যা রেখে গেছেন, তাই দিয়ে—হেঁ হেঁ—কোনো রকমে দিন চালানো—

প্রবীর : হ্যাঁ, সে তো বটেই। যা দিনকাল। শুনুন। আপনি কাল আসুন।

মধু : কাল? হেঁ হেঁ—বুড়ো মানুষ, তার উপর বাতব্যধি। সিঁড়ি ভেঙে আবার এই তেতালা অবধি ওঠা—

প্রবীর : আজ দেবার উপায় নেই। আজ তিনি—মানে আজ আমি—নেই আর কি?

মধু : হেঁ হেঁ—কালই আসবো। একটু মনে রাখবেন দয়া করে গরিবকে—হেঁ হেঁ হেঁ—

(প্রস্থান)

প্রবীর : বেছে বেছে যে কার চেহারা নিয়ে জন্মেছিলাম! (মদের বোতলগুলি ক্যাবিনেটে ভরিতে লাগিল। টেলিফোন বাজিল। প্রবীর ধরিবে না স্থির করিয়া বোতলগুলি তোলা শেষ করিল। মদটুকু ফেলিয়া দিয়া গ্লাসটিও ভরিল। তারপর বিরক্ত হইয়া ফোন ধরিল।) হ্যালো কেউ বাড়ি নেই—অ্যাঁ?...হ্যাঁ, টু ফোর—কিন্তু কেউ—আমার কল? ট্রাঙ্ক—ও হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কল আমার কল—দিন...হ্যালো, ক্লেটন হোটেল? ইয়ে, সুজিতবাবু ফিরেছেন? সুজিত বসুমল্লিক?...বড়ি ফিরে গেছেন! কখন?...আজ সকালে? সে কী? ...কার সঙ্গে বললেন? ডক্টর পাকড়াশী—না না, সে সুজিতবাবু নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুজিত বসুমল্লিক, তবে—ইয়ে, তিনি ফিরেছেন কি না জিজ্ঞেস করছিলাম ...মানে, আবার হোটেলে ফিরে এসেছেন কি না...ফেরবার কথা নয় তা আমি জানি, ফিরেছেন কি না বলুন না?... ফেরেন নি?...আমি? আমি প্রব্—মানে সুজ—ইয়ে সুজিতবাবুর বন্ধু...না এমনি, এমনি খোঁজ করছিলাম। (ফোন ছাড়িল। অনঙ্গ ইতিমধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।) আবার কোনো মধুসূদন এসেছেন না কি?

অনঙ্গ : আজ্ঞে ছোটকর্তাবাবু আসছেন।

প্রবীর : ছোটকর্তাবাবু?

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রবীর : তিনি কে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে—ছোটকর্তাবাবু!

প্রবীর : বুঝলাম। ছোটকর্তাবাবু। তারপর?

অনঙ্গ : আজ্ঞে কোথায় আছে বলে দিন—বার করে আনি।

প্রবীর : এই বললে আসছেন, আবার বলছো বার করে আনি—আমি কী বুঝবো বলো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে ছোটকর্তাবাবু নয়।

প্রবীর : ফের গুলিয়ে দিলে। তবে কে আসছেন?

অনঙ্গ : আজ্ঞে—আসছেন ছোটকর্তাবাবু। বার করে আনবার কথা বলছিলুম—জিনিসটা।

প্রবীর : কোন জিনিসটা?

অনঙ্গ : আজ্ঞে ঐ জিনিসটা!

প্রবীর : তুমি মাস্টারি করো না কেন নিকুঞ্জ? এমন সুন্দর তোমার বোঝাবার ক্ষমতা?

অনঙ্গ : আজ্ঞে উনি এসে পড়বেন এখুনি। কোথায় আছে বলে দিন তাড়াতাড়ি।

প্রবীর : কোথায় আছে আমি জানি না নিকুঞ্জ। কী আছে তাও জানি না।

(একটি বৃদ্ধের প্রবেশ। শীর্ণ দেহ, কোটরগত চোখ জ্বলজ্বল করিতেছে। চাপা ভাঙা

কণ্ঠস্বর। অনঙ্গ নিঃশব্দে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।)

ব্রজ : এতোদিন কোথায় ছিলি? কোথায় ছিলি এতোদিন?

প্রবীর : (ঘাবড়াইয়া) আজ্ঞে আফ্রিকায়।

বৃদ্ধ : আফ্রিকায়! রসিকতা করছো তুমি? রসিকতা? গুরুজনের সঙ্গে রসিকতা? (অগ্রসর হইলেন। প্রবীর পিছাইয়া গেল।)

প্রবীরা : না না, মানে আমি ক্রেটন, ক্রেটন হোটেল—

বৃদ্ধ : (সহসা ক্রুদ্ধভাব ছাড়িয়া অধীর আগ্রহে) যাক গে! দে। এনে দে। (প্রবীরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গর্জন করিয়া) দেরি করছিস কেন? এনে দে! কী হচ্ছে আমার বুঝতে পারছিস না? এনে দে! এনে দে বলছি!

প্রবীর : কী এনে দেবো?

বৃদ্ধ : কী এনে দেবো? (আর্তকণ্ঠে) তবে কি আনিস নি?

প্রবীর : আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

বৃদ্ধ : বুঝতে পারছো না? সই করিয়ে নেবার বেলা তো বেশ বুঝেছিলে? আজ বুঝতে পারছো না? জোচ্চোর বদমায়েস কোথাকার! আমি তোকে—তোকে খুন করে ফেলবো একেবারে— (হাতের লাঠি তুলিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রবীর পিছাইয়া গেল। হোঁচট খাইয়া বৃদ্ধ পড়িলেন। ধরিয়া তুলিতে গিয়া প্রবীর থামিয়া গেল। চেয়ার ধরিয়া বৃদ্ধ কোনওমতে অর্ধেকটা উঠিলেন। যন্ত্রণাবিকৃত ভিক্ষুকের মুখভাব।) ওরে দে! এনে দে! আমি মরে যাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছিস না, আমি মরে যাচ্ছি! দে! আমার সব কিছু তো তোকে দিয়ে দিয়েছি। তবে কেন ওরকম করছিস?

প্রবীর : (ধরিয়া তুলিয়া) আপনি অমন করছেন কেন? আমি দেবো।

বৃদ্ধ : (আশান্বিত) দিবি?

প্রবীর : নিশ্চয়ই দেবো। শুধু কী জিনিসটা আমায় বলে দিন?

বৃদ্ধ : (আবার জ্ঞান হারাইয়া) কী জিনিসটা? আবার রসিকতা? পাজি বেইমান— (প্রবীরের গলা টিপিয়া ধরিলেন। অনঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া একটি কাগজের মোড়ক বাড়াইয়া দিল।)

অনঙ্গ : আজ্ঞে এইটা কি? (বৃদ্ধ কাড়িয়া লইয়া মোড়কটি খুলিতে আরম্ভ করিলেন)

বৃদ্ধ : পেয়েছিস? পেয়েছিস? (ভিতরে একটি ছোট বাক্স, ডালা খুলিয়া দেখিলেন) এই তো। এই তো। তবে কেন ওরকম করছিলি? জানিস তো আমি পারি না। থাকতে পারি না। তুই এসেছিস শুনে ঐ অতোগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছি।

প্রবীর : আমার—আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ : না না, ঠিক আছে। এনেছিস যখন ঠিক আছে। আমি জানি তুই আনবি। তোর বুড়ো কাকাবাবুকে ভুলে যাবি না। আর যে যাই করুক, তুই এখনো আমাকে ভালোবাসিস। তোর—তোর লাগে নি তো?

প্রবীর : না।

বৃদ্ধ : তুই রাগ করিস নি। (যাইবার আগ্রহে) আমি—আমি একটু ঘরে যাই। পরে আসবো। পরে আসবো।

(প্রস্থান)

প্রবীর : নিকুঞ্জ!
অনঙ্গ : আজ্ঞে বলুন।
প্রবীর : ওটা কী?
অনঙ্গ : স্যুটকেসেই ছিল আজ্ঞে।
প্রবীর : তা তো ছিল। কিন্তু জিনিসটা কী?
অনঙ্গ : আজ্ঞে— (হাত কচলাইতে লাগিল)
প্রবীর : বলবে না?
অনঙ্গ : (ধূর্ত বিনয়ে) আজ্ঞে, আমি হুকুমের চাকর। ওসব কী বুঝি বলুন?
প্রবীর : তোমার এমন বৈষ্ণব বিনয় নিকুঞ্জ, বাপ মা তোমার নাম নিত্যানন্দ রাখলে পারতেন।
অনঙ্গ : আজ্ঞে, বাপ মা নাম রেখেছিলেন—অনঙ্গ।
প্রবীর : অনঙ্গ?
অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।
প্রবীর : তবে এতোক্ষণ নিকুঞ্জ বলে ডাকছি—তুমি সাড়া দিচ্ছো যে?
অনঙ্গ : হুজুর যে নামে ডাকবেন, হাজির পাবেন।
প্রবীর : তোমার বাবা কী করতেন অনঙ্গ?
অনঙ্গ : আজ্ঞে বীরনগর রাজবাড়ির মেজো তরফের খাস খানসামা ছিলেন।
প্রবীর : তাঁর বাবা?
অনঙ্গ : আজ্ঞে ঐ বাড়িতেই রাজাবাহাদুরের আমলে হুঁকাবরদার ছিলেন।
প্রবীর : এতোক্ষণে খানিকটা বোঝা গেলো তোমাকে।
অনঙ্গ : চিঠিগুলো খুলে দেবো হুজুর?
প্রবীর : চিঠি? ও, না এখন থাক।

(শৈলর প্রবেশ। অনঙ্গ নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।)

শৈল : তবু ভালো—এখনো খাড়া আছো।
প্রবীর : অ্যাঁ?
শৈল : ক' বোতল হোলো সকাল থেকে?
প্রবীর : বোতল? ও হ্যাঁ। মানে—না!
শৈল : আচ্ছা তুমি কী? বলতে পারো?
প্রবীর : আগে পারতাম। এখন পারছি না।
শৈল : মালবী যে কী করে সহ্য করে সেই জানে। (প্রবীর নিরুত্তর) যাক গে। মালবী জিজ্ঞেস করছিল, তুমি কি মদই গিলবে, না স্নানাহার করবে?
প্রবীর : স্নানাহার? না, হ্যাঁ—করবো এখন। একটু পরে করবো।
শৈল : তোমার যা মর্জি! (যাইতে গিয়া ফিরিয়া) তোমার অনেকগুলো চিঠি এসে পড়ে আছে।
প্রবীর : হ্যাঁ দেখেছি।
শৈল : পড়বে না?
প্রবীর : পড়বো এখন, পরে, ধীরেসুস্থে—

(বিরক্তির ভঙ্গী করিয়া শৈলর প্রস্থান)

এর চেয়ে একটা বেবুনের সঙ্গে যদি চেহারার মিল থাকতো।

(অনঙ্গর প্রবেশ)

এই আবার। এবার কে অনঙ্গ?

অনঙ্গ আজ্ঞে ম্যানেজারবাবু এসেছেন।

প্রবীর এসেছেন? তবে যা—স্যুটকেসে আর কী আছে খুঁজে নিয়ে এসো।

অনঙ্গ আজ্ঞে?

কী চান তিনি আমি তো জানি না অনঙ্গ? জানো তুমি।

অনঙ্গ : আজ্ঞে জিজ্ঞেস করছেন আপনার কি এখন সময় হবে?

প্রবীর : শুধু সময় চান? এটা তবু বোঝা গেলো। কিসের জন্যে সময় চান?

অনঙ্গ : আজ্ঞে এস্টেটের খাতাপত্তর নিয়ে এসেছেন।

প্রবীর : না এখন হবে না। বিকেলে আসতে বলো। তাড়তাড়ি যাও—উঠে না আসে!

অনঙ্গ : যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

প্রবীর : এস্টেট। ম্যানেজার। পাওনাদার। একটা মাথাখারাপ বুড়ো। বৌরানি। আর একটা কোন রানি কে জানে! অনঙ্গ। ব্রিজলাল। ঐ হাড়-জ্বালানো ডাক্তার। আরো যে কতো আছে কপালে!

(মালবিকার প্রবেশ)

মালবিকা : তুমি আবার ঐ ছাইভস্মগুলো এনে কাকাবাবুকে দিয়েছো?

প্রবীর : ছাইভস্ম?

মালবিকা : তুমি কি ভাবো আমি কিছু বুঝতে পারি না? ভাবো আমি চোখ বন্ধ করে বসে আছি?

প্রবীর : কী করে যে বোঝাবো আমি—

মালবিকা : বোঝাবে? তুমি অনেক বুঝিয়েছো আমাকে এতোদিন ধরে। এবার আমার বোঝাবার সময় এসেছে। একটা কথা বলবে আমাকে?

প্রবীর : কী কথা?

মালবিকা : আর কতোটা নিচে নামবে তুমি? কিছুই তো বাকি রাখলে না! ঝর্ণা তোমাকে এতো ভালোবাসতো, তাকে আশা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে তুমি আমাকে বিয়ে করলে শুধু টাকার লোভে!

প্রবীর : টাকা?

মালবিকা : হ্যাঁ টাকা! স্রেফ টাকা! ঐ একটা জিনিসই চেনো তুমি। আগে যখন জানতাম না, তখন ঝর্ণার জন্যে একটুও দুঃখ হোতো না। ঝর্ণা কেন আজও বিয়ে করলো না—বোঝো তুমি?

প্রবীর : না। বুঝি না।

মালবিকা : তা বুঝবে কেন? তুমি বোঝো তোমার এই—(টেবিলের চিঠিগুলি আছড়াইয়া) পলি-ডলির কথা। তুমি বোঝো তোমার নন্দরানীর কথা। আর বোঝো টাকা! কাকাবাবুর সামান্য অংশটুকু ঠকিয়ে নেবার জন্যে লোকটার জীবনটা নষ্ট করে

দিলে—একটা চোখের পাতা কাঁপলো না তোমার! তাও তো সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে। এখন বাকি শুধু আমার সম্পত্তি।

প্রবীর : আমাকে একবার—

মালবিকা : আমার সম্পত্তির একটা পয়সা আমি তোমাকে ছুঁতে দেবো না। আমাকে দীপার কথা ভাবতে হবে।

প্রবীর : কে চায় সম্পত্তি?

মালবিকা : ও সব ধাপ্পাবাজিতে কোনো কাজ হবে না। আমি কাকাবাবুর মতো বুড়োসুড়ো ভালোমানুষও নই যে কোকেন ধরিয়ে যা খুশি তাই লিখিয়ে নেবে!

প্রবীর : কোকেন!!

মালবিকা : হ্যাঁ কোকেন! নামই শোনো নি জিনিসটার মনে হচ্ছে! এইমাত্র দেখে এলাম লোকটা বুঁদ হয়ে পড়ে আছে নিজের ঘরে। (অল্প থামিয়া) শোনো। আজ সকালেও তোমার হোটেলের দেনা চুকিয়েছি। এরপর আর একটা পয়সাও আমার টাকা থেকে দেবো না। দরকার হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমার ঋণের দায়িত্ব অস্বীকার করবো। সেটা বুঝে যেটুকু গোল্লায় যেতে পারো যেও!

(প্রস্থান)

প্রবীর : কোকেন? মাই গড। না, এ অসম্ভব! পালাতে হবে। যে রকম করে হোক পালাতে হবে, কিন্তু—কিন্তু একটা পয়সা যে সঙ্গে নেই!

(অনঙ্গর প্রবেশ)

অনঙ্গ : ম্যানেজারবাবু বিকেলে আসবেন।

প্রবীর অ্যাঁ? ও আচ্ছা।

অনঙ্গ (অল্প থামিয়া) একটা কথা ছিল হুজুর।

প্রবীর বলো।

অনঙ্গ (বাহিরের দিকে একবার চাহিয়া) নন্দরানী জিজ্ঞেস করছিলেন—আজ সন্ধেয় কি যাবেন?

প্রবীর নন্দরানী? আই সী! সো দ্যাট ইজ নন্দরানী। চোখ ফুটছে আস্তে আস্তে!

অনঙ্গ আজ্ঞে?

প্রবীর না কিছু না। বলে দিও যাবো না।

অনঙ্গ যে আজ্ঞে। আর হুজুর—

প্রবীর কী?

অনঙ্গ তেনার এ মাসের ভাতাটা হুজুর, বলছিলেন আমাকে—

প্রবীর বুঝলাম। কিন্তু টাকা—

অনঙ্গ আনবো হুজুর?

প্রবীর কোত্থেকে আনবে?

অনঙ্গ আপনার স্যুটকেসেই রয়েছে আজ্ঞে।

(শয়নকক্ষে প্রস্থান)

প্রবীর স্যুটকেসে টাকা? আর আমি ভাবছি কী করে পালাবো?

(অনঙ্গর মানিব্যাগ লইয়া প্রবেশ)

অনঙ্গ : এই যে হুজুর।

প্রবীর : (টাকা বাহির করিয়া) ইয়ে, কতো যেন?

অনঙ্গ : আজ্ঞে পঞ্চাশ।

প্রবীর : ও হ্যাঁ—পঞ্চাশ। (টাকা দিয়া ব্যাগটি পকেটে ভরিল। অনঙ্গ নিরাশ হইয়া বাহিরের দিকে গেল।) কিছু বলবে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে আমি তো কোনোদিন কিছু বলিনি। আপনি দয়া করে যখন যা দিয়েছেন—মাথা পেতে নিয়েছি।

প্রবীর : ও হো, ভুলে গিয়েছিলাম।

(একটি দশটাকার নোট দিল। অনঙ্গ ধনুক হইয়া অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিল এবং কপালে ছোঁয়াইয়া বাহির হইয়া গেল।)

কুড়ি—পঁচিশ—সাতাশ। একশো সাতাশ। তোমারই লাভ রইলো সুজিত বসুমল্লিক। আমার চোদ্দ বছরের সঞ্চয়!—আচ্ছা দাঁড়াও। জামা কাপড়ে দেখি কিছু পোষায় কি না!

(প্রবীর শয়নকক্ষে গেল। অল্প পরে দীপা বাহির হইতে সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স দশ। ঘরে কেহ নাই দেখিয়া সাহস করিয়া বইয়ের তাকের কাছে গেল এবং একটি আলোকচিত্রের পত্রিকা লইয়া ছবি দেখিতে বসিল। অল্প পরে প্রবীর প্রবেশ করিল। হাতে সুজিতের স্যুটকেস।)

প্রবীর : কে? (দীপা ভীষণ চমকাইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল)

শোনো শোনো। (দীপা দাঁড়াইল। প্রবীর স্যুটকেসটি রাখিল।)

শোনো না এদিকে। (দীপা দুই পা আগাইয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িল। ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রবীরের উপর নিবদ্ধ। প্রবীর কাছে আসিতেই যেন মার ঠেকাইবার জন্য দুই হাতে মুখ আড়াল দিল। প্রবীর স্তম্ভিত হইয়া থামিয়া গেল।) কী হোলো?

দীপা : আর করবো না বাবা।

প্রবীর : বাবা!

দীপা : আর কক্ষনো করবো না।

প্রবীর: কী করবে না? (দীপা ছবির বইটির দিকে চাহিল)

ওটা কী?

দীপা : তোমার বই। ঐখানে ছিল।

প্রবীর : (বইটি তুলিয়া) ছবি দেখছিলে? (দীপা ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িল)

তাতে কী হয়েছে?

দীপা : তুমি যে বারণ করেছিলে এ ঘরে কোনো জিনিসে হাত দিতে?

প্রবীর : তাই না কি? আচ্ছা আর বারণ করবো না। তুমি যাতে ইচ্ছে হাত দিও।

দীপা : যাতে ইচ্ছে হাত দেবো?

প্রবীর : যাতে ইচ্ছে!

দীপা : ঐ বইটা?

প্রবীর : এটা নেবে? এই নাও।

দীপা : আমি আবার রেখে দেবো।

প্রবীর : তোমার কাছে রেখে দিও।

দীপা : আমার কাছে? একেবারে নিয়ে নেবো? একদম একেবারে?

প্রবীর : হ্যাঁ গো—একদম একেবারে। এসো—দেখি কী ছবি আছে। (দুইজনে ছবি দেখিতে বসিল)

দীপা : এটা কী? এই যে গাছের উপর সাদা সাদা?

প্রবীর : ওটা বরফ। বরফ পড়েছে।

দীপা : বরফ পড়লে বুঝি এমন দেখায়? তুমি বরফ পড়া দেখেছো?

প্রবীর : না।

দীপা : মেরুপ্রদেশে সব সময়ে, বরফ, না বাবা?

প্রবীর : ঠিক বলেছো। তুমি এতো জানলে কী করে?

দীপা : বা রে, ভূগোল বইয়ে আছে তো? তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবা? কলকাতায়?

প্রবীর : না। আফ্রিকায়।

দীপা : আফ্রিকা? যেখানে সিংহ থাকে? গরিলা থাকে?

প্রবীর : হ্যাঁ।

দীপা : তুমি আবার চলে যাবে?

প্রবীর : অ্যাঁ? হ্যাঁ, চলে যাবো।

দীপা : আবার কবে আসবে?

প্রবীর : আর আসবো না।

দীপা : আর আসবেই না? কোনোদিন আসবে না?

প্রবীর : কী জানি? হয় তো আর কেউ আসবে।

দীপা : আচ্ছা বাবা, মা যে বলে— (থামিয়া গেল)

প্রবীর : কী বলে?

দীপা : তুমি রাগ করবে বললে।

প্রবীর : না, রাগ করবো না, তুমি বলো।

দীপা : রাগ করবে না?

প্রবীর : না

দীপা : মারবে না? (প্রবীর দীপার মাথা বুকে চাপিয়া ধরলি)

প্রবীর : না, মারবো না।

দীপা : মা যে বলে—তুমি খুব খারাপ—সত্যি?

প্রবীর : (অল্প থামিয়া) হ্যাঁ সত্যি।

দীপা : কেন বাবা?

প্রবীর : আচ্ছা আমি যদি ভালো হয়ে যাই, তোমাকে যদি আর না বকি, না মারি, তা হলে কেমন হয়?

দীপা : (আনন্দে) তাহলে খুব ভালো হয়। তাহলে তুমি আর চলে যাবে না? বাড়ি থাকবে?

প্রবীর : বাড়ি? বাড়ি থাকবো? (প্রবীরের চোখে চৌদ্দ বৎসরের সঞ্চিত এক অসম্ভব অবাস্তব স্বপ্ন। কয়েক মুহূর্ত।)

(মালবিকার প্রবেশ।)

মালবিকা : (কঠিন কণ্ঠে) দীপা! (স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া গেল। দীপা ছিটকাইয়া সরিয়া গিয়াছে। প্রবীর হতভম্ব। মালবিকা দীপাকে কাছে টানিয়া লইল।)
আবার কোন্ নতুন মতলব পাকাচ্ছো?

প্রবীর : মতলব?

মালবিকা : হ্যাঁ, মতলব! গত তিন বছরে তোমাকে মেয়ের সঙ্গে ভালো মুখে একটা কথা বলতে দেখিনি। আজ এতো আদর এমনি এমনি? আমি চিনি না তোমাকে?

প্রবীর : মানুষ তো বদলায়।

মালবিকা : মানুষ বদলায়। তুমি মানুষ নও। আয় দীপা।
(দীপাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবীর খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর স্যুটকেস লইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে বাহিরের দরজা পর্যন্ত গেল। আবার ফিরিয়া স্যুটকেস হাতে চিন্তা করিতে লাগিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(একই ঘর। সেইদিনই সন্ধ্যা। টেবিলে বেশির মধ্যে একতাড়া ফাইল কাগজপত্র। ঘরে একটি গ্রামোফোন আমদানি হইয়াছে এবং একটি যন্ত্রবাদ্যের রেকর্ড চালু হইয়াছে যবনিকা উঠিবার পূর্বেই। দীপা নাচিতেছে। সাজসজ্জা নাচের নহে, কিন্তু পায়ে ঘুঙুর। বাজনা শেষ হইবার পূর্বেই মালবিকার প্রবেশ।)

মালবিকা : দীপা! (দীপার নাচ থামিয়া গেল) কী করছিস এখানে?

দীপা : কিছু করিনি তো?

মালবিকা : (রেকর্ড থামাইয়া) এটা ও ঘর থেকে আনলি কেন? তোকে না বারণ করা হয়েছে?

দীপা : আমি আনিনি মা। বাবা এনেছে।

মালবিকা : বাবা এনেছে?

দীপা : হ্যাঁ মা। সত্যি বলছি।

মালবিকা : তা তুই হাত দিয়েছিস কেন?

দীপা : বাবা আমাকে চালাতে শিখিয়ে দিলো। আর বললো যখন ইচ্ছে চালাতে।

মালবিকা : তারপর যদি ভেঙে যায় তখন?

দীপা : বাবা বললো—ভাঙুক গে!

মালবিকা : বাবা বললো—ভাঙুক গে? ভাঙলে যে বাবাই মেরে হাড় ভেঙে দেবে সেটা মনে আছে?

দীপা : বাবা আর মারবে না।

মালবিকা : মারবে না! বলেছে তোকে!

দীপা : হ্যাঁ মা।

মালবিকা : কী হ্যাঁ মা?

দীপা : বলেছে মারবে না। আর কোনোদিন মারবে না।

মালবিকা : ওঃ! একদিনে খুব যে বাবার— (কী ভাবিয়া থামিয়া গেল। তারপর দীপার পিঠে হাত দিয়া নরম সুরে—) যা, ঘরে যা। তোর ঝর্ণামাসী এসেছে, তোকে খুঁজছে।

দীপা : (উৎসাহে) ঝর্ণা-মাসী! (ছুটিয়া চলিয়া গেল। মালবিকা গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া রেকর্ডগুলি গুছাইয়া রাখিল। তারপর শয়নকক্ষের দিকে যাইতেছে—শৈলর প্রবেশ।)

শৈল : ও মা, তুই এইখানে?

মালবিকা : ধরে ফেলেছো?

শৈল : ঝর্ণা এসে বসে রয়েছে তোর ঘরে দেখে এলাম।

মালবিকা : ও, আমার ঘরেও গিয়েছিলে? (হাসিয়া) আমি একটু চোখের আড়াল হলে তোমার মন ছটফট করে, না শৈলদি?

শৈল : হ্যাঁ করে। কেন করে তুই বুঝবি নে। এবার এসে ছ'মাস রয়ে গেলাম, তুই ভাবছিস বুড়িটা ঘাড় থেকে নামে না কেন?

মালবিকা : কী যা তা বকছো শৈলদি!

শৈল : ঠিক কথাই বলছি।

মালবিকা : মোটেই ঠিক কথা নয়। এখানে আছো বলে যে কোনো ছুতোয় তুমি একরাশ টাকা খরচ করো। পাছে তোমার খারাপ লাগে, তাই আমি কিছু বলতেও পারি না—

শৈল: ওরে তুই ভুল বুঝছিস। আমার যদি আশ্রয় না থাকতো, তোর ঘাড়ে বসে খেতে আমার একটুও লজ্জা করতো না।

মালবিকা : তবে ও সব আজে বাজে কথা—

শৈল : এই যে সব সময়ে তোর পেছন পেছন ঘুরি—তোর ভালো লাগে?

মালবিকা : না, মানে—আমার কী রকম মনে হয় তুমি যেন আমাকে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছো। তাই একটু অস্বস্তি লাগে মাঝে মাঝে।

শৈল : পাহারাই তো দিচ্ছি রে?

মালবিকা : পাহারা দেবার কী আছে?

শৈল : সুজিতের চালচলন আমার ভালো লাগে না।

মালবিকা : কার লাগে?

শৈল : শুধু মদ খাওয়া আর ঐ সব ব্যাপার নয়। বড়োলোকের বয়ে যাওয়া ছেলে আমিও দু'চারটে দেখেছি। ওতে নতুন কিছু নেই।

মালবিকা : ওর মধ্যে নতুন কী পেলে?

শৈল : এক এক সময়ে তোর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি।

মালবিকা : কেমনভাবে?

শৈল : সে থাক এখন। দরকার বুঝলে পরে বলবো।

মালবিকা : (হাসিয়া) আচ্ছা তাই বোলো। আমি কিন্তু অনেক কিছু নতুন দেখছি।

শৈল : কী দেখলি?

মালবিকা : সারা বিকেল কী করেছে জানো? ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে খাতাপত্তর নিয়ে বসেছিলো। ঐ দেখো তার নমুনা। (খাতা দেখাইল) তারপর ঐ দেখো—দীপার

হাতে গ্রামোফোন ছেড়ে দিয়েছে। কী ভাব এখন মেয়ের সঙ্গে!

শৈল : ঐ জন্যেই তো আরো বেশি ভয়। মতলব ছাড়া কোনো কিছু করবার পাত্র ও নয়।

মালবিকা : তুমি কি ভাবো, আমি সে কথা বুঝি না?

শৈল : বুঝিস?

মালবিকা : নিশ্চয়ই বুঝি। তবে সে মতলব খাটবে না। আমার কাছ থেকে টাকা বার করা অতো সোজা হবে না।

শৈল : হা ভগবান! আমি ভাবলাম এতোদিনে সত্যিই বুঝলি বোধহয়।

মালবিকা : তার মানে?

(অনঙ্গর প্রবেশ)

অনঙ্গ : বৌরানি মা, ডাক্তারবাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

মালবিকা : আমার ঘরে বসা। আচ্ছা থাক—এখানেই নিয়ে আয়।

অনঙ্গ : যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

মালবিকা : কী বলতে চাও তুমি শৈলদি?

শৈল : কিচ্ছু বলতে চাই না। আমি শুধু ভাবি তোর যদি একটু বোঝবার ক্ষমতা থাকতো—আমি বাঁচতাম।

(প্রস্থানোদ্যত)

মালবিকা : কোথায় যাচ্ছো?

শৈল : ঝর্ণার সঙ্গে দুটো কথা বলি গে। এখানে তো ডাক্তারবাবু আসছেন।

মালবিকা : আসছেন তো কী?

শৈল : সুজিতের কথা হবে বোধ হয়। আমার থাকার কোনো মানেও হয় না। ভালোও লাগে না ওসব কথা।

(ডঃ পাকড়াশীর প্রবেশ)

পাকড়াশী : কী মাসী, কী কথা ভালো লাগে না?

শৈল : আপনাদের কুমারবাহাদুরের কথা।

(প্রস্থান)

মালবিকা : বসুন ডাক্তারবাবু।

পাকড়াশী : আমরা সেকেলে হয়ে গেছি বৌরানি। এবার নতুন ডাক্তার খুঁজুন।

মালবিকা : কেন, কী হোলো?

পাকড়াশী : আপনার বাড়িতে সব মনস্তাত্ত্বিক রোগ। আপনার স্বামীর transferred identity fixation, আর আপনার শৈলদির transferred responsibility fixation.

মালবিকা : শৈলদিরও রোগ হয়েছে না কি?

পাকড়াশী : আপনার শৈলদি মনে করেন—স্বামীকে আপনি উপযুক্ত শাসনে রাখতে পারেন নি। সেটুকু যতোটা পারেন, উনিই পুষিয়ে দেন।

মালবিকা : সে শৈলদি আমাকে খুব ভালোবাসে বলে—

পাকড়াশী : ঐ ভালোবাসা আর একটি মারাত্মক ব্যাধি। পুরুষানুক্রমে চলে। আপনার শ্বশুর

আমাকে ভালোবাসতেন। অতএব তাঁর ছেলের মাতলামি ছোটাতে আমার ছোটাছুটি।

মালবিকা : আর কে পারতো ডাক্তারবাবু? কাকেই বা বলতাম?

পাকড়াশী : ছেড়ে দিন ও কথা। পেশেন্ট কেমন আছেন বলুন। এখনো প্রবীর গুহ চলছে?

মালবিকা : (হাসিয়া) না, ওসব আমার কাছে একবারও বলবার চেষ্টা করেনি। আমি অবশ্য সুযোগও দিইনি বিশেষ। সকালবেলা হাতে মদের বোতল দেখে এমন ক্ষেপে গিয়েছিলাম যে—

পাকড়াশী : সকালবেলা আবার শুরু করেছিলো না কি?

মালবিকা : (অন্যমনস্ক) না। আমিই বোধহয় ভুল করেছিলাম। আজ সারাদিন ছোঁয় নি।

পাকড়াশী : কে বলেছে?

মালবিকা : অনঙ্গ।

পাকড়াশী : অনঙ্গ তো ওরই বাহন।

মালবিকা : হ্যাঁ, তা অবশ্য—কিন্তু কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। খাতাপত্র ঘাঁটছে। দীপাকে নিয়ে খেলছে। এই তো এখন বেরিয়েছে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে এস্টেট দেখতে।

পাকড়াশী : হাতে টাকা নেই বোধ হয়। তাই ভালো ছেলে "াজছে দু'দিন।

মালবিকা : তাই হবে। কিন্তু আর একটা কথা জানেন—আজ দুপুরে অনঙ্গ বলছিলো— অনেকক্ষণ কাগজে কী সব হিজিবিজি লিখেছে আর নিজের পুরোনো লেখার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে।

পাকড়াশী : কী লিখেছে?

মালবিকা : তা জানি না। কাগজগুলো না কি যত্ন করে পুড়িয়েছে। অনঙ্গ বলছিলো যেন দেখে দেখে হাতের লেখা লিখছে বলে মনে হোলো। আমি ভাবছিলাম —সত্যি সত্যি মাথায় কোনোরকম গোলমাল হয় নি তো?

পাকড়াশী : বোগাস্! এইটুকু বয়স থেকে দেখছি ওকে। Cool, calculating mind. মাথা খারাপ হবার ছেলে নয় ও।

(প্রবীরের প্রবেশ। এক হাতে একটি ডালপালাসমেত বুনো ফুলের গোছা, অন্য হাতে একটি নূতন ছোট মাটির হাঁড়ি। প্রবীরের ভাব এখন অনেকটা সহজ।)

প্রবীর : আরে ডাক্তারবাবু যে, কতোক্ষণ—(মালবিকাকে দেখিয়া আত্মসচেতন কুণ্ঠায়) ও আপ—তুমি! ও। ইয়ে—এই অনঙ্গ! অনঙ্গ! অনেকক্ষণ বসে আছেন ডাক্তারবাবু?

পাকড়াশী : না, এই অল্পক্ষণ। বৌরানির সঙ্গে গল্প করছিলাম।

প্রবীর : (নিজেকে দখলে আনিয়া) অর্থাৎ আমার আদ্যশ্রাদ্ধ করছিলেন। (অনঙ্গর প্রবেশ) চা নিয়ে এসো—চটপট।

(অনঙ্গর প্রস্থান। প্রবীর লিখিবার টেবিলে সাবধানে ফুল ও হাঁড়ি রাখিল।)

পাকড়াশী : কদ্দুর গিয়েছিলেন?

প্রবীর : ওঃ অনেকদূর। আপনাদের হাট দেখে এলাম।

পাকড়াশী : তবে তো অনেকদ্দুর গিয়েছিলেন।

প্রবীর : তাও সোজা রাস্তায় যাই নি। নদীর ধার দিয়ে গেলাম।

মালবিকা : (উঠিয়া) আমি যাই।

প্রবীর : কেন, বসুন না। (মালবিকা অবাক হইয়া তাকাইল) —ইয়ে বোসো না। চা খাবে না?

মালবিকা : আমাকে চা খেতে দেখেছো কোনোদিন?

প্রবীর : অ্যাঁ? ও না। তা অবশ্য দেখি নি কোনোদিন। তা ইয়ে—চা না খেলে, এমনি বোসো না?(মালবিকা একটু ইতস্তত করিয়া বসিল, তবে জাঁকাইয়া বসিল না)

পাকড়াশী : হাঁড়িটা কী জন্যে?

প্রবীর : (হাঁড়িটি হাতে তুলিয়া) হাটে কিনলাম। জোর পেয়ে গেছি। আর একটু দেরি হলে পেতাম না।

পাকড়াশী : আপনার কপাল ভালো। না পেলে মুস্কিল হোতো।

প্রবীর : হাঃ হাঃ হাঃ—আই সী ইয়োর পয়েন্ট! হাঁড়িটা আমার কোনো কাজে লাগবে না। আসল কথাটা হোলো—মোহিতপুরের মাটির জিনিস বাজারে পড়তে পায় না।

পাকড়াশী : মোহিতপুরের মাটির বাসনের নাম আছে।

প্রবীর : কেন জানেন? এখানকার খাঁড়ির মাটি। জায়গাটা দেখে এলাম। যেখানে কুমোরপাড়াটা গড়ে উঠেছে। ও রকম মাটি সব জায়গায় পড়তে দেখবেন না। একটা প্রাকৃতিক যোগাযোগে—মানে হয়েছে কি, খাঁড়িটা যে ভাবে সাধারণত যায় সেভাবে না গিয়ে এইরকম ভাবে বেঁকে—

মালবিকা : হঠাৎ মাটি নিয়ে এতো মাতামাতি কেন?

প্রবীর : মাটি নয়। পটারি।

পাকড়াশী : পটারি?

প্রবীর : এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না অবশ্য। আরো যেতে হবে, দেখতে হবে। পরে একদিন পুরো স্কীমটা বোঝাবো।

পাকড়াশী : স্কীম? আপনি কি মাটির হাঁড়ির কারখানা খুলবেন না কি?

প্রবীর : বাংলা কথাটা তাই। ইংরিজিতে পটারি ইন্ডাস্ট্রিজ। অবশ্য মার্কেটিং-এর প্রশ্ন সবচেয়ে ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

মালবিকা : হঠাৎ এ সখ কেন?

প্রবীর : সখ নয়। প্রয়োজন। মর্টগেজ আর হ্যান্ডনোটে ঝাঁঝরা হয়ে এসেছে সব কিছু।

মালবিকা : (বিদ্রূপ করিয়া) আজ প্রথম বুঝলে?

প্রবীর : আজ—প্রথম বুঝলাম। অনেক কিছুই আজ প্রথম বুঝছি। (কারখানা খুলিবার উৎসাহ নিজের ভিতর সম্পূর্ণ চাপিয়া প্রবীর স্থির দৃষ্টিতে মালবিকার দিকে চাহিয়া আছে। সুজিতের প্রতি মালবিকার যুক্তিসঙ্গত বিদ্বেষ প্রবীরকেও কোথায় যেন আঘাত করিতেছে। মালবিকা অস্বস্তি বোধ করিয়া উঠিয়া ঘরের অন্যদিকে চলিয়া গেল।)

পাকড়াশী : ইয়ে, আপনি তা হলে এখন বেশ ভালোই আছেন।

প্রবীর : হ্যাঁ। এখন বেশ ভালোই আছি।

পাকড়াশী : এখন আর নিজেকে প্রবীর গুহ বলে মনে হচ্ছে না তো?

প্রবীর : তা হচ্ছে। প্রায় সব সময়েই হচ্ছে।

পাকড়াশী : কী সর্বনাশ! এখনো মনে হচ্ছে আফ্রিকা থেকে আসছেন?

প্রবীর : (মৃদু হাসিয়া) আফ্রিকা চোখের সামনে ভাসছে। জোহানসবার্গ স্যালিসবেরী। ব্লুমফন্টেন। গ্রাস ব্রোইং। পটারি।

পাকড়াশী : বলেন কী? স্রেফ জঙ্গল নয়? রোগটা তাহলে অনেকদূর এগিয়েছে দেখছি।

প্রবীর : তা এগিয়েছে। দেখছেন না, মোহিতপুরের কতো জিনিস ভুলে যাচ্ছি? উনি যে চা খান না সেটা পর্যন্ত মনে ছিল না।

পাকড়াশী : তা হলে transferred identity fixation এখনো বেশ প্রবল, কী বলেন?

প্রবীর : আমি কী করে বলবো? আপনি রোগ ধরেছেন, আপনিই বলতে পারবেন।

পাকড়াশী : Transferred identity fixation নামটা জীবনে প্রথম শুনলাম আপনার মুখে।

প্রবীর : (বিস্মিত) আমার মুখে? কখন?

পাকড়াশী : কাল রাত্রে।

প্রবীর: কাল রাত্রে? কাল আপনার সঙ্গে দেখা হোলো কখন?

পাকড়াশী : দেখা হবে কেন? হোটেল থেকে ফোন করলেন যখন—

প্রবীর : হোটেল থেকে ফোন? কাল রাত্রে? ক'টার সময়ে বলতে পারেন?

পাকড়াশী : সওয়া দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছি আমি। তার মিনিট পাঁচেক পরে।

প্রবীর : দশটা কুড়ি। (আপন মনে) দশটা দশে আমি ঘড়ি দেখেছি। পরিষ্কার মনে আছে।

মালবিকা : কী হোলো?

প্রবীর : তা হলে প্রবীর গুহর নাম আমিই ফোনে বলেছি? (পাকড়াশী ঘাড় নাড়িলেন।) আর কী বলেছি?

পাকড়াশী : সব ভুলে গেছেন?

প্রবীর : বলুন না? ভালো মনে পড়ছে না।

পাকড়াশী : Is that important ?

প্রবীর : Very important. বলুন না?

পাকড়াশী : আফ্রিকার কথা বললেন।

প্রবীর : আর?

পাকড়াশী : আর কী? আর তো বললেন সকালে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বাড়ি আসবেন।

প্রবীর : (আপন মনে) শয়তান! শয়তান!

মালবিকা : কী হোলো তোমার? কী বলছো?

প্রবীর : বলছি—শয়তান।

মালবিকা : কে?

প্রবীর : কে আবার? সুজিত বসুমল্লিক। চেনো না তাকে? মাতাল, লম্পট, বদমায়েস, জোচ্চোর—

মালবিকা : ওরকম করছো কেন? কী হয়েছে?

পাকড়াশী : এক্সাইটেড্ হবেন না। চুপ করে বসুন।

প্রবীর : (স্বাভাবিক স্বরে) আরে ঘাবড়ে গেলেন না কি ডাক্তারবাবু? বসুন বসুন। বোসো মালবিকা। সকাল থেকে আপনাদের গালাগাল আর উপদেশ শুনতে শুনতে আমারও মনে হচ্ছিলো আমি একটা মাতাল, বদমায়েস। অথচ ঐ যে কী

fixation বললেন—ওটা বলছে আমি প্রবীর গুহ, এবং প্রবীর গুহ লোক খারাপ নয়। তাহলে ডাক্তারবাবু, যেটাকে রোগ ভাবছেন—সেইটাই হয় তো চিকিৎসা। আপনারাই ঠিক করে দিন, আমি সুজিত বসুমল্লিক হবো, না প্রবীর গুহ হবো। কী? চুপচাপ যে? বলুন? বলো মালবিকা? (চা লইয়া অনঙ্গর প্রবেশ) আচ্ছা, পরে মীমাংসা হবে। এখন চা খাওয়া যাক। (চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল)

মালবিকা : আমি দিচ্ছি। (প্রবীর ছাড়িয়া দিল। মালবিকা চা ঢালিতে লাগিল।) অনঙ্গ!

অনঙ্গ : আজ্ঞে?

মালবিকা : আর একটা কাপ নিয়ে এসো।

(অনঙ্গ বিস্মিত হইল কিন্তু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবীর ও ডঃ পাকড়াশীও বিস্মিত।)

প্রবীর : তবে যে বললে চা খাও না?

মালবিকা : তুমি মদ ছাড়তে পারলে, আর আমি চা ধরতে পারবো না?

প্রবীর : মদ ছেড়েছি কে বললে?

মালবিকা : একটা দিন তো খাও নি।

প্রবীর : এখনো দিন কাটেনি। এখুনি তো আবার শুরু করতে পারি।

মালবিকা : পাবে কোথায়?

প্রবীর : ঐ ক্যাবিনেটে এখনো চারটে লোককে মাতাল করবার মাল আছে।

মালবিকা : না নেই। (প্রবীর চাহিয়া রহিল। অনঙ্গ কাপডিশ লইয়া আসিল।)

প্রবীর : বাবা অনঙ্গ। তোমাকে যতোটা বিশ্বাসী ভেবেছিলাম, ততোটা তো নও!

অনঙ্গ : (মর্মাহত) আজ্ঞে?

প্রবীর : তুমি তো গোপন কথা সব প্রচার করে বেড়াচ্ছো?

অনঙ্গ : (আন্তরিক প্রতিবাদে) জিভ খসে যাবে আমার যদি কিছু বলে থাকি—

মালবিকা : আঃ, কী হচ্ছে? যা, তুই যা।

(গভীর মর্মবেদনা লইয়া অনঙ্গর প্রস্থান। এতোবড়ো অপবাদ তাহার তিনপুরুষে কেহ পায় নাই।)

গোপন বলতে অনঙ্গ অন্য জিনিস বোঝে। ভালো কথা গোপন রাখা ওর মাথায় আসবে কেন?

পাক : ঘটনাটা কী?

মালবিকা : এমন কিছু না। ডোমপাড়ায় আজ পাঁজির বাইরের এক পরব। কুমারবাহাদুর বিলিতি মদ বিলিয়েছেন।

প্রবীর . ওতেই ভুলে গেলে মালবিকা? যদি পটারি খোলবার জন্য টাকা বাগাতে তোমার কাছে ভালোমানুষ সাজি?

মালবিকা : চা-টা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

প্রবীর : কী, বললে না?

(শৈল ও ঝর্ণার প্রবেশ। ঝর্ণার বয়স প্রায় ত্রিশ। মুখে স্বভাবগত কোমলতার সহিত স্বাবলম্বী কাঠিন্য মিশ্রিত। সেইসঙ্গে কিছুটা বিষণ্ণ ক্লান্তির আভাস। প্রবীর ও মালবিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।)

শৈল : রীতিমতো মজলিস বসে গেছে দেখছি?

পাকড়াশী : আসুন, আসুন মাসী। ঝর্ণা কখন এলি?

ঝর্ণা : অনেকক্ষণ।

শৈল : ও তো চলে যাচ্ছিলো। আমিই এখানে ধরে নিয়ে এলাম। মালবী যে এইখানে জমে গেছে—

মালবিকা : ঝর্ণা, বোসো ভাই।

ঝর্ণা : না, আর বসবো না ভাই, দেরি হয়ে গেছে। সুজিতদা কেমন আছো? (প্রবীর বোধহয় পরিচয় করাইয়া দেওয়া আশা করিতেছিল)

প্রবীর : অ্যাঁ? ভালো। ভালো আছি। ডাক্তারবাবু তো বলছেন ভালোই আছি।

ঝর্ণা : কেন, কিছু হয়েছে না কি মেসোমশাই?

পাকড়াশী : তেমন কিছু না। একটু স্মৃতিভ্রংশ।

ঝর্ণা : স্মৃতিভ্রংশ? (হাসিয়া) আমাকে চিনতে পেরেছিলে তো?

প্রবীর : সত্যি কথা বলতে কী—পারি নি।

ঝর্ণা : আমারও তাই মনে হোলো তোমার চেহারা দেখে। এখন চিনতে পারছো?

প্রবীর : পারছি। বোসো, আমি চা দিতে বলি—

ঝর্ণা : না না, চা এইমাত্র খাওয়ালেন শৈলদি। (বসিল)

প্রবীর : (শৈলকে) আপনি?

শৈল : এটা তো নতুন দেখছি। আপনি!

প্রবীর : (হাসিয়া) স্মৃতিভ্রংশ! তুমি বলতাম বুঝি? (শৈল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিল) আর—কী বলে ডাকতাম?

শৈল : আমি ঘরে যাচ্ছি—

প্রবীর : আরে শোনো শোনো—

ঝর্ণা : এই শৈলদি!

(শৈলর প্রস্থান)

প্রবীর : ডাক্তারবাবু, আর একটু চা?

পাকড়াশী : না, আর না। আমি উঠি এবার।

ঝর্ণা : কেন মেসোমশাই? অনেক রোগী জমে আছে?

পাকড়াশী : আছে, তবে আজ রাত্রেই কারো মরবার কথা নেই।

মালবিকা : তবে উঠছেন কেন?

পাকড়াশী : ডাক্তারদের এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে নেই। লোকে ভাববে প্র্যাকটিস চলে গেছে।

ঝর্ণা : সে আমরা এমনিতেই ভাবি। বসুন, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন।

পাকড়াশী : অর্থাৎ তোমার বাড়ি গিয়ে অসময়ে এক পেট গিলতে হবে—এই তো?

(দীপার প্রবেশ। খুশিতে ঝলমল কবিতেছে।)

দীপা : মা, মাস্টারমশাই চলে গেলেন। (একপাক নাচিয়া লইল)

মালবিকা : চলে গেলেন কেন?

দীপা : বা রে, আমার পেট কামড়াচ্ছিলো যে?

(মালবিকা ছাড়া আর সকলে হাসিয়া উঠিল। প্রবীর সহসা দীপাকে কোলে তুলিয়া লইল। বড়ো হওয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় দীপার প্রবল আপত্তি।) নামিয়ে দাও! না, নামিয়ে দাও!

(ডঃ পাকড়াশী হাসিতেছেন। ঝর্ণার মুখে হাসি, চোখে বিস্ময়। প্রবীর হাসিতে হাসিতে দীপাকে নামাইয়া ফুলের গোছাটা তাহার হাতে দিল। মালবিকা ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখে ভালো-লাগা ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।)

মালবিকা : (সহসা চিৎকার করিয়া) না! (সমস্ত হাসি এক মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। প্রত্যেকের দৃষ্টি মালবিকার উপর নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত সকলে নিশ্চল।) দীপা, ঘরে যাও।

পাকড়াশী : বৌরানি—

মালবিকা : (আরও কঠিনকণ্ঠে) ঘরে যাও। এক্ষুনি।

(দীপা প্রবীরের দিকে একবার চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবীর নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

পাকড়াশী : (ধীরস্বরে) এটা কি খুব দরকার ছিল বৌরানি?

মালবিকা : অনেকদিন ডাক্তারবাবু। অনেকগুলো বছর। আপনি বুঝবেন না।

(দ্রুত প্রস্থান)

পাকড়াশী : (অল্প পরে) আমি উঠি। কাল বিকেলে আসবো। ঝর্ণা আসবি না কি?

ঝর্ণা : (ইতস্তত করিয়া) আমি পরেই যাবো মেসোমশাই। মালবীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবো।

(ডঃ পাকড়াশী চলিয়া গেলেন। প্রবীর এতোক্ষণে নড়ে নাই।)

প্রবীর : মালবিকা বোধ হয় তার ঘরে গেছে। (ঝর্ণা নিরুত্তর। প্রবীর ধীরে ধীরে তাহার দিকে ফিরিল।) যাবে না?

ঝর্ণা : তাড়িয়ে দিচ্ছো?

প্রবীর : আমার কাছে একা থাকা নিরাপদ নয়।

ঝর্ণা : কেন? তুমি কে?

প্রবীর : আমি কে? একটা প্রশ্ন বটে।

ঝর্ণা : কে তুমি?

প্রবীর : সুজিত বসুমল্লিক। মোহিতপুরের কুমারবাহাদুর। আমাকে বিশ্বাস করতে নেই। মতলব ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না।

ঝর্ণা : আমি এক সুজিত বসুমল্লিককে চিনতাম, তার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে খুব ভাব ছিল। সে এরকম ভাবে কথা বলতো না।

প্রবীর : কোনোদিন বলে নি?

ঝর্ণা : কোনোদিন না।

প্রবীর : সে কী রকম লোক ছিল বলতে পারো?

ঝর্ণা : খুব খারাপ লোক ছিল।

প্রবীর : শোনা যায় সেই খারাপ লোকটার সঙ্গে বিয়ে হোলো না বলে একটি মেয়ে বিয়েই করলো না।

ঝর্ণা : বাজে কথা। সে মেয়েটি বিয়ে করে নি—মানুষের উপর তার বিতৃষ্ণা ধরে

গিয়েছিলো বলে।

প্রবীর : কেন?

ঝর্ণা : কেন? ভুল করেছিলো বোধ হয়। একটা মানুষের মধ্যে দিয়ে সে দুনিয়াটা পাবার চেষ্টা করেছিলো। সে মানুষটা বিগড়ে গেলে দুনিয়াও বদলে যায় তার ছেলেমানুষি চোখে।

প্রবীর : সে সুজিতকে ভালো করতে পারলো না কেন?

ঝর্ণা : কী করে পারবে? শুধু যদি কতকগুলো খারাপ অভ্যেসের প্রশ্ন হোতো, তা হলে বোধহয় পারতো। কিন্তু সে—সে ভালো ছিল না।

প্রবীর : তার মানে?

ঝর্ণা : তার মনে বিষ ছিল। স্বভাবের বিষ।

প্রবীর : (নিরুপায় যন্ত্রণায়) সে বিষ কাটানো যায় না? দিনের পর দিন চেষ্টা করলেও মেরে ফেলা যায় না পুরোনো সুজিতকে? (ক্যাবিনেটের ডালা একটানে খুলিয়া) এই দেখো—সব দূর করে দিয়েছি। (ফাইল তুলিয়া) এই দেখো এস্টেটের খাতা! (হাঁড়িটির দিকে হাত বাড়াইয়া) এই দেখো— (ঝর্ণার অবিচলিত মুখ দেখিয়া থামিয়া গেল)

ঝর্ণা : হয় না। সে একটা রোগ। শিবের অসাধ্য রোগ। তার চোখে তার হাসিতে তার কথায় সে রোগের বিষ দেখা যায়। আমি দেখতে পাই।

প্রবীর : (আহত হিংস্রতায়) তবে কেন এ ঘরে বসে ন্যাকামি করছো? যাও বাড়ি যাও। পালিয়ে যাও এখান থেকে। গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকো যেখানে সুজিতের বিষ তোমাদের নাগাল পাবে না। (ঝর্ণা নড়িল না) যাও! (ঝর্ণা প্রবীরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রবীরের মুখোমুখি দাঁড়াইল।)

ঝর্ণা : তুমি কে? (প্রবীর নিশ্চল) বলো? কে তুমি?

প্রবীর : আমি—জানি না! (দুই হাতে মুখ চাপিয়া বসিয়া পড়িল। ঝর্ণা কাছে আসিল।)

ঝর্ণা : দেখি তোমার হাত?

প্রবীর : কেন?

ঝর্ণা : ছোটবেলায় একবার চেরোর বই পড়ে হাত দেখবার খেয়াল হয়েছিলো, মনে নেই? কই দেখি হাত! (প্রবীর হাত বাড়াইয়া দিল। ঝর্ণা গভীর মনোযোগে তাহার করতল পরীক্ষা করিল।)

প্রবীর : কী পেলে হাতে? অনন্ত নরকবাস?

ঝর্ণা : (ধীরে ধীরে) সুজিতের হাতের প্রত্যেকটি রেখা আমি চিনতাম। (প্রবীর ছিটকাইয়া সরিয়া গেল। হাত পিছনে লুকাইয়া ঝর্ণার দিকে চাহিয়া রহিল।)

কে তুমি? (প্রবীর নিরুত্তর) মালবিকা বোঝে না। ওরা কেউ বোঝে না। আমি বুঝি। আমি সুজিতের চোখের দৃষ্টি চিনেছি ছোটবেলা থেকে। আর বোধ হয় বোঝে দীপা।

প্রবীর : (অন্যদিকে ফিরিয়া) আপনি যান।

ঝর্ণা : আপনি বলছো কেন? আমি তো আপনি বলি নি?

প্রবীর : (একবার ঝর্ণার দিকে চাহিয়া) তুমি যাও। আমি আজ আর কথা বলতে পারছি না।

ঝর্ণা : আচ্ছা। (কাছে আসিয়া) কাল সকালে আমার বাড়িতে যেও। ব্রিজলালকে বোলো। সে পথ চেনে।
(প্রবীর কথা কহিল না। ঝর্ণা কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।)

পঞ্চম দৃশ্য

(একই ঘর। দুই সপ্তাহ পরে। টেবিলে চিঠি ও কাগজপত্র। মালবিকা একটি চিঠি হাতে করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া কী যেন ভাবিতেছে। শৈলর প্রবেশ। মালবিকা ঈষৎ চমকাইয়া আবার পূর্ববৎ বসিয়া রহিল।)

শৈল : কী হয়েছে তোর বল তো?
মালবিকা : কেন?
শৈল : সুজিত বেরিয়ে গেলেই তুই উপরে উঠে আসিস। এসে এই ঘরে ঘুরঘুর করিস। কেন?
মালবিকা : (হাসিয়া) ওর চিঠি কাগজপত্র চুরি করে পড়ি।
শৈল : সে কী?
মালবিকা : বাঃ তুমিই তো বলেছো খোঁজখবর রাখতে!
শৈল : বটে? কী খোঁজখবর পেলি?
মালবিকা : এই তো, এই চিঠিটা—মুখার্জি অ্যান্ড দাশগুপ্ত, এঞ্জিনীয়রস্ অ্যান্ড সার্ভেয়ার্স—বারো তারিখে আসবে খাঁড়ির ধারের জমি সার্ভে করতে।
শৈল : ও চিঠি পড়ে কী হবে?
মালবিকা : ও তুমি প্রেমপত্র চাও? তাহলে এইটা—শ্রীচরণের দাসী নন্দরাণী—থোক কিছু টাকা দিয়েই সব কিছু চুকিয়ে দেওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে চুলচেরা তর্ক তুলেছে।
শৈল : জানি। ও চিঠি আমি আগেই পড়েছি।
মালবিকা : তোমার এতোদিনের অভ্যেস। তুমি তো এগিয়ে থাকবেই।
শৈল : মালবী!
মালবিকা : আর এটা দেখেছো?
শৈল : কী ওটা?
মালবিকা : হ্যান্ডনোট। তিন হাজার টাকার।
শৈল : হ্যান্ডনোটে তিন হাজার টাকা ধার করেছে?
মালবিকা : ধার করেছিলো। এখন শোধ দিলো। বুঝিয়া পাইলাম—মধুসূদন দে।
শৈল : তা বেশ তো। তাতে কী হয়েছে?
মালবিকা . (উঠিয়া) কিছু হয়নি, ভাবছি এতো টাকা কোত্থেকে পাচ্ছে?
শৈল : কোত্থেকে আবার? সেরেস্তা?
মালবিকা : সেরেস্তায় পেয়েছে হাজারখানেক—খোঁজ নিয়েছি। তার বেশি এই সময়ে পাবে কী করে সেরেস্তায়?

শৈল : ব্যাঙ্কে তো ছিল কিছু? (মালবিকা কাগজপত্র গুছাইয়া তুলিতে লাগিল)

মালবিকা : চেকবুকও দেখেছি। পনেরো দিন হোলো এসেছে—চেক কেটেছে আজ প্রথম। তাও কতো টাকার জানো? কুড়ি টাকা।

শৈল : কুড়ি টাকা! এদিকে তিন হাজার টাকা ধার শোধ করছে?

মালবিকা : শুধু ধার শোধ নয়। পটারির ব্যাপার নিয়ে বেপরোয়া এগোচ্ছে। টাকার ভরসা যে কোথায় পাচ্ছে কে জানে?

শৈল : একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস মালবী?

মালবিকা : কী?

শৈল : ঝর্ণার সঙ্গে আজকাল খুব ভাব। প্রায়ই তার বাড়ি যাচ্ছে।

মালবিকা : ভালো কথা।

শৈল : ভালো কথা?

মালবিকা : ঝর্ণার সঙ্গে ভাব করেও লোকটা যদি মানুষ হোতো—তারপর আমার দিকে ফিরে না তাকালেও আমার বোধ হয় দুঃখ হোতো না।

শৈল : কী বলছিস তুই?

মালবিকা : এতো বছর ধরে চেয়েছি ও একটু ভালো হোক যে আর কিছু চাইতে ভুলেই গেছি।

শৈল : তোকে আমি বুঝি না মালবী।

মালবিকা : কী হবে বুঝে? তার চেয়ে বলো—ঝর্ণার কথা কেন তুললে?

শৈল : ভাবছিলাম—ঝর্ণা ওকে টাকা দেয় না তো?

মালবিকা : ঝর্ণা? (অল্প ভাবিয়া) তা হতে পারে। তাহলে—এক কাজ করলে তো হয়—

শৈল : কী কাজ?

মালবিকা : ঝর্ণার তো বেশি টাকা থাকার কথা নয়? আমি যদি ঝর্ণাকে—

শৈল : মালবী! তুই আবার টাকা দিবি?

মালবিকা . (সহসা সংযম হারাইয়া) দেবার জন্য ছটফট করে মরছি শৈলদি—একটা পয়সাও আমার কাছে চাইছে না! একটা পয়সা না! আমি যে কী করি!

(প্রবীরের প্রবেশ। হাতে একটি কাগজের মোড়ক।)

প্রবীর : আরে কী সৌভাগ্য! তোমরা এ ঘরে? —কী হোলো? মনে হচ্ছে যেন এক নাটকীয় মুহূর্তে আমি এসে সব মাটি করে দিলাম?

মালবিকা : নাটক নয়। তোমার কথা হচ্ছিলো। (প্রবীর মুহূর্তে নিজেকে গুটাইয়া লইল)

প্রবীর : খুব উপভোগ্য আলোচনা। অনঙ্গ! অনঙ্গ!

মালবিকা : নীহারবাবু টেলিফোন করছিলেন।

প্রবীর : নীহারবাবুটি কে?

মালবিকা : স্কুল কমিটির সেক্রেটারি—নীহার ব্যানার্জি।

(অনঙ্গর প্রবেশ)

প্রবীর : ওঃ হো! নামগুলো আজকাল কিছুতেই মনে রাখতে—এই যে অনঙ্গ। পুঁটির মাকে বলো তো এই কাপড়টা দীপাকে পরিয়ে দিতে।

অনঙ্গ : আজ্ঞে পুঁটির মা নেই।

প্রবীর : নেই? গেলো কোথায়?

অনঙ্গ : সবাই মেলা দেখতে গেছে হুজুর।

প্রবীর : মেলা কিসের রে? এক্সিবিশন তো?

মালবিকা : মোহিতপুরে ওই মেলা। বছরে একবার তো হয়—কেউ বাদ দেয় না।

প্রবীর : সবাই গেছে?

অনঙ্গ : শুধু দারোয়ান আছে হুজুর দেউড়িতে। আর আমি আছি আজ্ঞে।

প্রবীর : তুমিই বা আছো কেন আজ্ঞে? ঘুরে এলেই পারো।

অনঙ্গ : আজ্ঞে তা কী হয়? বাড়ি যে খালি হয়ে যাবে।

প্রবীর : পুঁটির মা নেই? তাই তো—

মালবিকা : কী চাই কী?

প্রবীর : এই শাড়িটা দীপার জন্যে এনেছিলাম। ওর শাড়ি পরে যাবার ইচ্ছে হয়েছিলো।

মালবিকা : দাও আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

শৈল : আমায় দে।

(শৈল মোড়কটি লইয়া চলিয়া গেল। অনঙ্গও গেল।)

মালবিকা : শাড়ি কিনলে কখন?

প্রবীর : দুপুরে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। চেক দিলাম, বললে বিশ্বাস করবে না—আমাকে টাকা দিয়ে দিলো!

মালবিকা : দেবে না কেন?

প্রবীর : স্মৃতিভ্রংশ তো! তার উপর কী সব fixation, যদি সই না মেলে?

মালবিকা : সেইজন্যেই বুঝি এই পনেরো দিন ধরে হাতের কাছে কাগজ পেলেই নাম সই করতে?

প্রবীর : ঠিক বলেছো। তাই ভয়ে ভয়ে কুড়ি টাকার চেক কাটলাম। টাকাটা পেয়ে খুব ফুর্তি হোলো—কিনে ফেললাম শাড়িটা। কিন্তু কে ফোন করেছিলো বললে না?

মালবিকা : বললাম তো—নীহারবাবু।

প্রবীর : ও হ্যাঁ হ্যাঁ। নীহারবাবু। কী বলছে? যেতে হবে না?

মালবিকা : না। সত্যি সত্যি যাচ্ছো কি না খোঁজ করছিলেন।

প্রবীর : বাঃ! কথা দিলাম, যাবো না?

মালবিকা : এরকম কথা দিয়ে আগে দু'বার যাও নি কি না? আর একবার তো যে অবস্থায় গেলে তার চেয়ে না যাওয়াই ছিল ভালো।

প্রবীর : কেন ? ও আই সী! খুব কেচ্ছা করেছিলাম—না?

মালবিকা : নীহারবাবুর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলে।

প্রবীর : হাঃ হাঃ হাঃ! তারপরেও ডাকে কেন বুঝি না।

মালবিকা : ডাকা তো বন্ধ করেছিলো তার পর থেকে। এবার বোধ হয়—(থামিয়া গেল)

প্রবীর : এবার কী?

মালবিকা : ঝর্ণা বোধ হয় বলেছে—এবারে ভয় নেই।

প্রবীর : (হাসিয়া) নীহারবাবু বোধ হয় আসলে খোঁজ করছিলেন—ঝর্ণা ঠিক বলেছে কি

না। আচ্ছা কী করতে হবে বলো তো? কাঁচি দিয়ে কচ করে লাল ফিতেটা তো কাটতে হবে জানি। আর কী?

মালবিকা : বক্তৃতা।

প্রবীর : বক্তৃতা? সুজিত বসুমল্লিক বক্তৃতা দেবে, অ্যাঁ? ছাত্রছাত্রীদের মানসিক গঠনে প্রদর্শনী কতোটা সাহায্য করে? কী করে তারা জীবনের মহৎ মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে পারে? হাঃ হাঃ হাঃ!

মালবিকা : তুমি এরকম নাম করে করে কথা বলো কেন আজকাল?

প্রবীর : নিজেকে অন্য লোক ভাবতে ভালো লাগে। Fixation!

(অনঙ্গর প্রবেশ)

অনঙ্গ : ডাক্তারবাবু এসেছেন।

প্রবীর : নিয়ে এসো।

(অনঙ্গর প্রস্থান)

ডাক্তারবাবুও বোধহয় ভয়ে ভয়ে আছেন।

মালবিকা : একটা কথা বলবে?

প্রবীর : কী?

মালবিকা : ঝর্ণা তোমাকে টাকা দিয়েছে? (প্রবীর সন্ধানী দৃষ্টিতে মালবিকার দিকে চাহিল। মালবিকা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কঠিন হইয়া উঠিল।)

প্রবীর : যদি দিয়েই থাকে?

মালবিকা : আমার কাছে তো চাইতে পারতে।

প্রবীর : চাইলে তুমি দিতে?

মালবিকা : চেয়ে দেখলে না কেন?

প্রবীর : মদ খাবার দরকার না হলে বৌয়েব কাছে তো টাকা চায় না সুজিত বসুমল্লিক। (মালবিকা যেন কঠিন এক আঘাতে পাথর হইয়া গেল। প্রবীর ভ্রূক্ষেপ করিল না। ডঃ পাকড়াশীব প্রবেশ।)

আসুন ডাক্তারবাবু আসুন!

পাকড়াশী : সাড়ে চারটে বাজে।

প্রবীর : তৈরি আছি ডাক্তারবাবু। পাঁচ মিনিট তো লাগবে যেতে গাড়িতে। অনঙ্গ!

পাক : কাপড় বদলাবেন না?

প্রবীর : কেন, এটা কী দোষ করলো?

(অনঙ্গর প্রবেশ)

পাক : একটা সভায় যাচ্ছেন—

প্রবীর : বদলেই বা কী উন্নতি হবে? যতো পাঞ্জাবি সব তো এই এক পেটেন্ট। এই আর একটা রোগ ডাক্তারবাবু, আপনি ধরতে পারেন নি—পেটেন্ট পাঞ্জাবি ফিক্সেশন। তেরোটা পাঞ্জাবি, আমি কাল গুনলাম—সব এক চেহারা। তাই না অনঙ্গ?

অনঙ্গ : আজ্ঞে—ষোলোটা।

প্রবীর : এই লোকটা আজ্ঞে হ্যাঁ ছাড়া কথা বলবে না, অথচ সমানে তর্ক করবে। আমি

শুনেছি অনঙ্গ—তেরোটা।

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রবীর : তবে?

অনঙ্গ : আর তিনটে কাচতে গেছে আজ্ঞে।

প্রবীর : সেটা আমার জানা আছে আজ্ঞে! সে তিনটে ধরেই তেরোটা। (অনঙ্গ নিরুত্তর) কী? বলো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রবীর : দেখেছেন ডাক্তারবাবু? বলছে আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু বিশ্বাস করলো আমার কথাটা? দেখবেন মজা? অনঙ্গ, ক'টা পাঞ্জাবি তা হলে আছে আমার সবশুদ্ধ?

অনঙ্গ : আজ্ঞে আপনি যখন বলছেন—

প্রবীর : আমি কিচ্ছু বলছি না। তুমি বলো।

অনঙ্গ : আজ্ঞে এবারে হুজুর কলকাতা থেকে ফেরার পরে গুনি নি--

প্রবীর : কলকাতা যাবার আগে কটা গুনেছো তাই বলো।

অনঙ্গ : আজ্ঞে ষোলোটা। (সকলে হাসিয়া উঠিল)

প্রবীর : দেখলেন ডাক্তারবাবু? যা বাবা, গাড়ি বের করতে বল্ ব্রিজলালকে। (অনঙ্গ সহসা একমুখ হাসিল। এই প্রথম।)

অনঙ্গ : আজ্ঞে যাই।

প্রবীর : হঠাৎ দাঁত বের করলি যে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে অ্যাদ্দিন 'তুমি' বলছিলেন। আজ আবার আগের মতো 'তুই' বললেন—তাই।

(প্রস্থান)

প্রবীর : (হাসিয়া) একটা চীজ বটে! তেরোটা পাঞ্জাবি ডাক্তারবাবু—আমি কালকেই গুনেছি— (সহসা থামিয়া গেল)

মালবিকা : কী হোলো?

প্রবীর : কলকাতায় যাবার আগে গুনেছে বললো—না?

মালবিকা : হ্যাঁ! তাতে কী হয়েছে?

প্রবীর : অনঙ্গর কথাই ঠিক। ঐ তিনটে পাঞ্জাবি তাহলে— (আবার থামিয়া গেল)

মালবিকা : কী? কলকাতায় হারিয়েছো?

প্রবীর : তাই হবে। (চিন্তা করিতে করিতে) কিন্তু কেন?

মালবিকা : কী কেন? হারালো কেন?

প্রবীর : (সামলাইয়া) হারায় নি। চুরি গেছে। ভাবছিলাম চুরি করলো কেন?

মালবিকা : চুরি আবার কী জন্যে করে?

প্রবীর : কোন্ চোর কী কারণে চুরি করে—তা কি সব সময়ে বলা যায়?

পাক : আর বেশি সময় নেই কিন্তু। চোরের মনস্তত্ত্ব না হয় গাড়িতে বসে বিশ্লেষণ করা যাবে।

প্রবীর : হ্যাঁ, চলুন।

মালবিকা : পোশাকটা বদলে নিলে পারতে। সকাল থেকে পরে আছো।

প্রবীর : খোলসটা বদলালেই কি ভিতরের মানুষটা বদলে যাবে মালবিকা?

(দীপার প্রবেশ। পরিধানে শাড়ি।)

দীপা : বাবা, এই দেখো!

প্রবীর : আরে বাপরে! রীতিমতো মহিলা হয়ে গেলো মেয়েটা শাড়ি পরে!

পাক : বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে!

প্রবীর : চলুন ডাক্তারবাবু। আসুন মিস বসুমল্লিক। (দীপার হাত ধরিয়া বাহির হইতেছে, শৈলর প্রবেশ) যাক। বেরোবার সময়ে তোমার মুখ দেখলাম, উদ্বোধনটা ভালোয় ভালোয় কাটবে।

(শৈল বিরক্তির ভঙ্গী করিল। প্রবীর হাসিতে হাসিতে দীপা ও ডঃ পাকড়াশীর সহিত বাহির হইয়া গেল। মালবিকা স্থির হইয়া বসিয়া।)

শৈল : কী হোলো তোর? অমন করে বসে আছিস?

মালবিকা আমি কী করবো বলে দিতে পারো শৈলদি?

শৈল : কিসের কী করবি?

মালবিকা একটা পয়সাও আমার কাছ থেকে নেবে না? সেধে দিলেও নেবে না?

শৈল : সেধে কে দিচ্ছে?

মালবিকা দিতে চেয়েছি শৈলদি। নিলো না।

শৈল : দিতে চেয়েছিস! তুই না বলেছিলি সুজিতকে আর কোনোদিন—

মালবিকা : (আপন মনে) কতোবার টাকা নিয়েছে। চেয়ে নিয়েছে, ঠকিয়ে নিয়েছে, চুরি করে নিয়েছে। নিয়ে মদ খেয়েছে, ফুর্তি করেছে। আর আজ ধার শোধ করছে, পটারি খুলছে—তবু একটা পয়সাও নেবে না আমার কাছ থেকে?

শৈল : (কঠিন কণ্ঠে) তুই কি সব কথা ভুলে গেলি মালবী?

মালবিকা : (বিহ্বলভাবে) কী কথা? (তারপর সম্মোহিতের মতো একটানা সুরে—যেন পড়া মুখস্থ বলিতেছে) না ভুলিনি। মনে আছে। দীপা জন্মাবার পর প্রথম দেখতে গিয়েছিলো মাতাল হয়ে। দীপাকে মদ খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলো। আমি বারণ করেছিলাম বলে গ্লাসের মদ আমার মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিলো।

শৈল : (শিহরিয়া) এ কথা তো কোনোদিন বলিস নি আমাকে?

মালবিকা : (পূর্ববৎ) তোমাকে কতোটুকু বলেছি শৈলদি? কতোটুকু তুমি জানো?

শৈল : তবু তুই আবার ওকে টাকা দিতে গিয়েছিলি? (মালবিকা শুনিতে পাইল না) মালবী!

মালবিকা . কী বলছো?

শৈল : তবু ওকে আবার টাকা দিতে চেয়েছিস?

মালবিকা : নিলো না তো? কেন নিলো না বলতে পারো? কী করেছি আমি?

শৈল : কী করেছিস—তুই??

মালবিকা : কী করেছি? ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ ভালোমুখে কথা বলতে পারি না—তাই?

শৈল : তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

মালবিকা : (কর্ণপাত না করিয়া) আমি তো চেষ্টা করি। পারি না যে? কিছুতেই ভুলতে পারি না যে? কতোদিন ঘুম আসে নি, মাঝরাত্রে জানলায় গিয়ে বসে থেকেছি। মনে

হয়েছে—চলে আসি। এই ঘরে—ওর শোবার ঘরে চলে আসি। কতোদি—ন আসি নি। সেই যে দীপা জন্মাবার পর থেকে আলাদা ঘর হয়ে গেলো আমাদের—

শৈল : কী বলছিস তুই যা তা!

মালবিকা : (সহসা অসহায় ক্ষোভে) কিন্তু পারি না। কিছুতেই পারি না! ওকে দেখলেই আমার সব মনে পড়ে যায়। সব গোলমাল হয়ে যায়! মাথায় রক্ত চড়ে যায় শৈলদি—আমি কিছুতেই পারি না! (মুখ গুঁজিয়া) কিছু—তেই পারি না! (শৈল স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এখন যেন নিজেকে প্রস্তুত করিয়া মালবিকার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।)

শৈল : ও, এই তা হলে এখন তোর অবস্থা! (চাপা বিষাক্ত সুরে) সব ভুলে গেছিস তুই। দু'দিন মদ খায়নি। ভালো ছেলে সেজেছে, পটারি নিয়ে দু'টো ফাঁকা কথা বলেছে—আর অমন তুই স—ব ভুলে গেছিস। বোকা! বোকা তুই! এতোদিন দেখেও ওর ভান বুঝতে পারিস না!

মালবিকা : (চিৎকার করিয়া) ভান করে তিন হাজার টাকা ধার শোধ করে দিলো?

শৈল : তিন লাখ টাকা ফিরে পাবার জন্যে—গাধা কোথাকার!

মালবিকা : কী যা তা বকছো তুমি শৈলদি?

শৈল : যা তা বকছিস—তুই! তোর সম্পত্তির দাম তিন লাখেরও অনেক বেশি।

মালবিকা : তাতে কী হয়েছে?

শৈল : তুই মরে গেলে এ সম্পত্তি কার হাতে যাবে ভেবে দেখেছিস কোনোদিন?

মালবিকা : (না বুঝিয়া) মরে গেলে? মরতে যাবো কেন?

(অনঙ্গর প্রবেশ)

অনঙ্গ : বৌরানি মা।

মালবিকা : (চমকাইয়া) কে? ও, তুই। কী হয়েছে?

অনঙ্গ : আমাকে কোনো হুকুম আছে?

মালবিকা : হুকুম? না, কেন?

অনঙ্গ : আজ্ঞে হুজুর দারোয়ানকেও ছুটি দিয়েছেন। আমি নিচে গিয়ে বসতাম—দেউড়িতে।

মালবিকা : ঠিক আছে, যা।

(অনঙ্গর প্রস্থান)

কী বলতে চাইছিলে তুমি শৈলদি?

শৈল : কী বলবো? বললেও তুই বুঝবি না। তুই অন্ধ হয়ে গেছিস!

মালবিকা : (অল্প বিরক্ত হইয়া) তুমি এমন কেন করো বলতে পারো? আমি এতো চেষ্টা করি ভুলতে, তুমি কিছুতেই তা হতে দেবে না। অথচ কী যে তোমার বলবার আছে, তাও খুলে বলবে না।

(দরজায় সুজিত। একই পোশাক—ধুতি এবং সেই পেটেন্ট পাঞ্জাবি। অতএব দর্শকদের বুঝিবার উপায় নাই—সুজিত না প্রবীর।)

শৈল : বলবো। সময় হলে বলবো।

মালবিকা : তোমার সময় হবে আমি মরলে!

শৈল : (চমকাইয়া) কী বললি?

মালবিকা : বললাম—তোমার বলবার সময় হবে আমি মরলে!

শৈল : দেখ মালবী, তুই মরবার কথা কক্ষনো বলবি না আমার কাছে!

মালবিকা : আমি কোনো কথাই বলতে চাই না তোমার কাছে। তুমি যাও। তোমার ঘরে যাও। (সুজিত চট করিয়া সরিয়া গেল) আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। (মালবিকা অন্যদিকে গিয়া শৈলর দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। শৈল খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। মালবিকা অল্প পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল। তারপর শূন্য ঘরে উদ্দেশহীন ঘুরিতে লাগিল। সুজিত প্রবেশ করিয়া ধীরে সুস্থে একটি সিগারেট জ্বালাইল। মালবিকা চমকাইয়া ফিরিল।)

মালবিকা : এ কী? তুমি চলে এলে যে?

সুজিত : ভালো লাগলো না। বড়ো ভিড় ওখানে।

মালবিকা : আর সবাই কোথায়?

সুজিত : একজিবিশন দেখছে। আমি ওপন্ করেই চলে এলাম।

মালবিকা : বক্তৃতা দিলে না?

সুজিত : বলেছি দু'চার কথা। (অল্পক্ষণ চুপচাপ)

মালবিকা : তুমি কাজ করবে এখন?

সুজিত : কেন?

মালবিকা : তাহলে আমি যাই।

সুজিত : তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। (মালবিকা কিছুটা উদগ্রীব, কিছুটা আসন্ন আশাভঙ্গের জন্য প্রস্তুত)

মালবিকা : কী কথা?

সুজিত : ও ঘরে চলো, বলছি।

মালবিকা : কেন, এখানেই বলো না? কেউ তো নেই। (সুজিতের স্বরে যেন কিছুটা কৌতুকের আভাস)

সুজিত : ও ঘরে দক্ষিণের জানলা দিয়ে অনেকদূর দেখা যায়। সেই নদীর ধারের গাছের সারি পর্যন্ত। ঐ জানলায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে সুবিধে হবে।

মালবিকা : এতো কাব্য তোমার মধ্যে আগে ছিল না তো?

সুজিত : ছিল। তুমি টের পাও নি। ঐ জানলা দিয়ে কতোদিন আমি মুগ্ধ হয়ে নিচের বাগানের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।

মালবিকা : (হাসিয়া) বাগান কোথায়? নিচে তো শান বাঁধানো কম্পাউন্ড।

সুজিত : ঠিক। শান-বাঁধানো কম্পাউন্ড। সেই জন্যেই তো আবার দূরে নদীর দিকে তাকাই। মনে হয় ঐ পাঁচিল ঘেরা সিমেন্ট করা কম্পাউন্ডের মধ্যে কোথায় যেন নদীর ধারের ব্যাপ্তি লুকিয়ে আছে।

মালবিকা : তোমার কথা আছে বলছিলে—সে কি এই কাব্য?

সুজিত : কাব্যও বলতে পারো। চলো বলছি।

(সুজিত ও মালবিকা ভিতরে গেল। অল্পক্ষণ পরে শৈল আবার প্রবেশ করিল।

মালবিকাকে না দেখিয়া ফিরিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ায় টেবিলের নিকটে আসিয়া চিঠিপত্রগুলি ঘাঁটিয়া দেখিল। কোনোটিকেই চিত্তাকর্ষক মনে না হওয়াতে আবার ফিরিয়া বাহিরে যাইতেছে—সহসা নীরবতা চিরিয়া ঘর হইতে মালবিকার আর্তচিৎকার আসিল—"শৈলদি!" শৈল ভীষণ চমকাইয়া ফিরিল। কিন্তু কোথা হইতে চিৎকার আসিল ধরিতে পারিল না। সহসা শোবার ঘর হইতে সুজিত প্রবেশ করিল। শৈলকে দেখিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল। তার পরেই সবেগে বাহির হইয়া গেল। শৈল সেইসঙ্গে চেতনা পাইয়া সুজিতের পিছনে দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া শোবার ঘরে গেল। ভিতর হইতে তাহার ডাক আসিতে লাগিল—'মালবি! মালবি!' অনঙ্গর প্রবেশ। শৈল আবার বাহির হইয়া আসিল। উদ্ভ্রান্ত অবস্থা।)

শৈল : মালবি! তুই—তুই দেখেছিস?

অনঙ্গ : আজ্ঞে কী?

শৈল : সুজিতকে?

অনঙ্গ আজ্ঞে হ্যাঁ। এই বার হয়ে গেলেন। আমার মনে হোলো যেন বৌরানি মা—

শৈল : তুই সাক্ষী রইলি। যদি মালবির কিছু হয়ে থাকে—তুই সাক্ষী—

(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দূর হইতে তাহার উদ্ভ্রান্ত ডাক ভাসিয়া আসিতে লাগিল—'মালবি! মালবি! মালবি!' অনঙ্গ সম্মোহিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ভয়ঙ্কর এক উপলব্ধি যেন তাহাকে পাথর করিয়া দিয়াছে।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(একই ঘর। চার-পাঁচদিন পরে। সন্ধ্যা। ঘরে ঝর্ণা এবং ইনস্পেক্টর। ঝর্ণা বসিয়া। ইনস্পেক্টরের হাতে নোটবুক ও পেন্সিল। প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে মিলাইতেছেন এবং মাঝে মাঝে লিখিতেছেন।)

ইনস্পেক্টর : কে খবর দিলো?

ঝর্ণা : স্কুলের বেয়ারা—জগবন্ধু।

ইনস্পেক্টর : ক'টার সময়ে বললো আপনাকে?

ঝর্ণা : সাড়ে পাঁচটা।

ইনস্পেক্টর : কী করে জানলেন?

ঝর্ণা : হলঘরে ঘড়ি ছিল, আমার চোখের সামনে।

ইনস্পেক্টর : সুজিতবাবু তখনো বক্তৃতা দিচ্ছিলেন?

ঝর্ণা : হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : আপনি কী করলেন?

ঝর্ণা : আমি অফিসঘরে এসে ফোন ধরলাম।

ইনস্পেক্টর : বলে যান।

ঝর্ণা : শৈলদি বললেন তক্ষুনি চলে আসতে। মালবি—

ইনস্পেক্টর : ওরকমভাবে নয় মিস মিত্র। কী কথা হয়েছিলো যতোটা পারেন ভেবে বলুন।

ঝর্ণা : আমি বললাম—হ্যালো, ঝর্ণা কথা বলছি। শৈলদি বললেন—ঝর্ণা, সুজিত মালবিকে খুন করেছে!

ইনস্পেক্টর : প্রথম কথা তাই?

ঝর্ণা : হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : মিসেস ঘোষই যে ফোন করছেন, আপনি বুঝলেন কী করে?

ঝর্ণা : গলা শুনে।

ইনস্পেক্টর : গলা তো ফোনে সব সময়ে বোঝা যায় না।

ঝর্ণা : কী জানি, আমার শৈলদি ছাড়া আর কেউ বলে মনে হয় নি।

ইনস্পেক্টর : তারপর?

ঝর্ণা : আমার প্রথমে—আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি—আমি বোধ হয় বলেছি—কী হয়েছে? তখন শৈলদি খানিকটা—খানিকটা অসংলগ্নভাবে বলে গেলেন। আমি শুধু বুঝলাম—মালবিকে খুন করেছে। মালবি মরে গেছে। শিগ্গির এসো।

ইনস্পেক্টর : আর কোনো কথা মনে পড়ছে না?

ঝর্ণা : ঐ কথাই যেন বারবার বলছিলেন। আর একটা কথা বলছিলেন—আমি জানতাম—এ আমি জানতাম—

ইনস্পেক্টর : অসংলগ্নভাবে বললেন?

ঝর্ণা : হ্যাঁ, মানে—খুব ইয়ে হয়ে গেলে যেমন হয়। আর তাই তো হবার কথা।

ইনস্পেক্টর : কী হবার কথা তা তো আমি জানি না মিস মিত্র। কী হয়েছে সেইটা আমার জানা দরকার।—আচ্ছা, মিসেস ঘোষের কি সুজিতবাবুর উপর রাগ ছিল?

ঝর্ণা : পছন্দ করেন না, এটা ঠিক।

ইনস্পেক্টর : বিশেষ কোনো কারণ আছে তার?

ঝর্ণা : থাকলেও আমার জানা নেই।

ইনস্পেক্টর : কোনো আন্দাজও নেই?

ঝর্ণা : সে সময়ে সুজিতদা যেভাবে চলতেন, ভালো লাগবার তো কথা নয়। তবে শৈলদির একটু বিশেষ অপছন্দ ছিল। হয় তো মালবিকাকে খুব ভালোবাসতেন বলে।

ইনস্পেক্টর : মিসেস ঘোষের কি বদ্ধ কোনো ধারণা ছিল যে সুজিতবাবু তাঁর স্ত্রীকে খুন করতে পারেন?

ঝর্ণা : বলতে পারবো না।

ইনস্পেক্টর : (অল্প পরে) আচ্ছা, আপনাকে এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। আপনি—(নোটবুক দেখিয়া) ডক্টর পাকড়াশীকে পাঠিয়ে দিন। চলে যাবেন না কিন্তু।

ঝর্ণা : না, আমি আছি।

(প্রস্থান। ডঃ পাকড়াশীর প্রবেশ।)

পাকড়াশী : এ ইনভেস্টিগেশনের কী অর্থ হয় বলতে পারেন? সমস্ত এনকোয়ারি হয়ে গেলো, রিপোর্ট বেরিয়ে গেলো, আপনি নতুন কী বার করবেন এর মধ্যে?

ইনস্পেক্টর : আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি ডক্টর পাকড়াশী? আমি তো হুকুমের চাকর।

পাকড়াশী : হুকুমটা কে করিয়েছে আমি জানি ইনসপেক্টর সাহেব। আমি শুধু ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই—একজন তার শ্বশুরবাড়ির ইনফ্লুয়েন্স ভাঙিয়ে একটা খোঁচা লাগালো, আর আপনারাও কলকাতা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন।

ইনস্পেক্টর : সবটাই ইনফ্লুয়েন্স নয় বোধ হয়। মিসেস ঘোষের অভিযোগটা খুব সাধারণ অভিযোগ নয়।

পাকড়াশী : আজগুবি অভিযোগ! অ্যাব্‌সার্ড! একঘর লোক বসে সুজিতের বক্তৃতা শুনছে, আর উনি একা দেখলেন সুজিত বাড়িতে এসে বৌকে খুন করে গেলো। আপনারা একটা রেস্পন্সিবল্‌ বডি হয়ে কী করে যে এসব এন্টারটেন করেন—

ইনস্পেক্টর : ও কথা আর বলে কী হবে? যা করতেই হবে করে চুকিয়ে দেওয়া যাক।

পাকড়াশী : কী করতে হবে?

ইনস্পেক্টর : কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো শুধু।

পাকড়াশী : বলুন।

ইনস্পেক্টর : (নোটবুক দেখিয়া) আপনার রিপোর্ট পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের সঙ্গে মিলেছে। কাজেই ওদিকে আর কিছু জানবার নেই। আপনি—পড়ে যাবার কারণটা কী মনে করেন, তাই বলুন।

পাকড়াশী : অ্যাক্সিডেন্ট। আমি বরাবর বলে আসছি। লোকাল এনকোয়ারিতেও বলেছি।

ইনস্পেক্টর : সুইসাইড বলে কখনো মনে হয়নি আপনার?

পাকড়াশী : সুইসাইড করবার তো কোনো কারণ ছিল না!

ইনস্পেক্টর : সুজিতবাবু কষ্ট তো কম দেন নি।

পাকড়াশী : তা দিয়েছে। কিন্তু সে সব পুরোনো কথা। এখন সুজিত একেবারে বদলে গেছে। Completely changed !

ইনস্পেক্টর : সেটা যদি অভিনয় হয়ে থাকে।

পাকড়াশী : তা যদি হয়, খুব ভালো অভিনয় বলতে হবে। সে অভিনয় দেখবার পর বৌরানির আত্মহত্যা করবার কথা নয়।

ইনস্পেক্টর : আপনি বাড়ি থেকে বেরুবার পর আগাগোড়া সুজিতবাবুকে দেখেছেন?

পাকড়াশী : আগাগোড়া। এক গাড়িতে গেছি। একসঙ্গে হলে ঢুকেছি। ডায়াসে পাশের চেয়ারে বসেছি। আমার পাঁচহাত দূরে দাঁড়িয়ে সে বক্তৃতা দিয়েছে।

ইনস্পেক্টর : যখন মিস মিত্র আপনাকে ফোন করেন তখন আপনারা কী করছিলেন?

পাকড়াশী : একজিবিশন দেখছিলাম। একসঙ্গে একজিবিশনে গেছি।

ইনস্পেক্টর : আপনি যখন ফোন ধরতে গেলেন?

পাকড়াশী : সুজিত তখন স্কুল কমিটির সেক্রেটারি এবং আরো দু'চারজনের সঙ্গে ছিল। ফিরে এসে সেইখানেই সবাইকে পেয়েছি। ওদের জিজ্ঞেস করতে পারেন।

ইনস্পেক্টর : করেছি। যাবার সময়ে গাড়িতে আর কে ছিল?

পাকড়াশী : দীপা আর ব্রিজলাল। তাদের জিজ্ঞেস করুন।

ইনস্পেক্টর : তাও করেছি।

পাকড়াশী : তা হলে?

ইনস্পেক্টর : আর কিছু নেই। একবার শুধু অনঙ্গকে পাঠিয়ে দিন।

পাকড়াশী : তাকে তো ডাকলেন একটু আগে?

ইনস্পেক্টর : আর একবার দরকার।

(ডঃ পাকড়াশীর প্রস্থান। ইনস্পেক্টর নোটবুক পেন্সিল ছাড়িয়া উঠিলেন। অনঙ্গর প্রবেশ। ইনস্পেক্টর প্রশ্ন করিতে করিতে অনঙ্গর পিছনে চলিয়া গেলেন।)

ইনস্পেক্টর : দারোয়ান কখন গেলো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে ওনারা চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পরে।

ইনস্পেক্টর : তুমি তখন থেকেই আছো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে বললাম যে—

ইনস্পেক্টর : আবার বলো। তখন থেকেই আছো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে তখন উপরে এসেছিলাম।

ইনস্পেক্টর : এই ঘরে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : কে ছিলেন এই ঘরে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে বৌরানিমা আর মাসীমা।

ইনস্পেক্টর : তারপরেই দেউড়িতে গেছো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : আগাগোড়া ওখানেই ছিলে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : চিৎকার শোনবার আগে পর্যন্ত আগাগোড়া ছিলে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে?

ইনস্পেক্টর : (সহসা ধমকাইয়া) বলো!

অনঙ্গ : আজ্ঞে কিসের চিৎকার?

ইনস্পেক্টর : তোমার বৌরানিমার চিৎকার?

অনঙ্গ : আজ্ঞে আমি তো কিছু শুনিনি?

ইনস্পেক্টর : ফের বাজে কথা বলছো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে?

ইনস্পেক্টর : (ভিন্ন পথ ধরিয়া, সহজ কণ্ঠে) তোমার বাবু তোমাকে কিছু বলেন নি?

অনঙ্গ : আজ্ঞে কখন?

ইনস্পেক্টর : স্কুল থেকে ফিরে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে ওনারা সবাই ফিরেই তো—

ইনস্পেক্টর : ওনারা সবাই নয়। তোমার বাবু যখন একা এসেছিলেন—

অনঙ্গ : আজ্ঞে একা তো আসেন নি?

ইনস্পেক্টর : আসেন নি তুমি জানলে কী করে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে আমি দেউড়িতে ছিলুম, দারোয়ানকেও হুজুর ছুটি দিয়ে দিলেন বলে—

ইনস্পেক্টর : (আবার ধমকাইয়া) থামো!

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : কতো টাকা পেলে বাবুর কাছ থেকে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে?

ইনস্পেক্টর : ন্যাকামি কোরো না। কতো টাকা পেয়েছো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে গত পুজোর সময়ে—

ইনস্পেক্টর : পুজোর কথা বলছি না। এখন কতো পেয়েছো?

অনঙ্গ : আজ্ঞে এ সময়ে তো আমরা কিছু পাই না, আবার সেই হোলিতে—

ইনস্পেক্টর : দেখো অনঙ্গ, নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে কোরো না। কোথায় রেখেছো টাকা?

অনঙ্গ : আমার ঘর দেখুন।

ইনস্পেক্টর : ঘরে যে নেই তা তুমিও জানো আমিও জানি। ঘর আগেই দেখা হয়েছে।

অনঙ্গ : দেশে আমার পরিবার আছে, খোঁজ করে দেখুন—টাকা যদি পাঠিয়ে থাকি—

ইনস্পেক্টর : সে খোঁজ যে পোস্ট অফিসে করা হবে তাও তোমার জানা। তুমি ঘোড়েল কম নও। কিন্তু একদিন ঠিক ধরবো। তখন মরবে। (অনঙ্গ নিরুত্তর) তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় এখন সত্যি কথা বলো—তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না।

অনঙ্গ : আজ্ঞে সত্যি কথাই তো বলছি।

ইনস্পেক্টর : তুমি বাবুকে একা আসতে দেখো নি?

অনঙ্গ : আজ্ঞে না।

ইনস্পেক্টর : বেরিয়ে যেতে?

অনঙ্গ : আজ্ঞে না।

ইনস্পেক্টর : কোনো চিৎকার শোনো নি?

অনঙ্গ : আজ্ঞে না। (ইনস্পেক্টর একবার পায়চারি করিলেন। অনঙ্গ ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়াইয়া।)

ইনস্পেক্টর : যাও, ওদের সবাইকে আসতে বলো।

অনঙ্গ : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেও না এখন।

অনঙ্গ : আজ্ঞে না।

(প্রস্থান। অল্প পরে ডক্টর পাকড়াশী, ঝর্ণা, প্রবীর ও শৈলর প্রবেশ। শৈলর মুখ কঠিন, চোখে জ্বালা। প্রবীর ক্লান্ত, কিন্তু সংযত। মুখে বিশেষ কোনো ভাবের প্রকাশ নাই।)

পাকড়াশী : শেষ হোলো আপনার ইনভেস্টিগেশন?

ইনস্পেক্টর : মোটামুটি।

পাকড়াশী : কী কী নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন?

ইনস্পেক্টর : (ব্যঙ্গ গায়ে না মাখিয়া) মিসেস ঘোষ, আপনি এখানকার পুলিশের রিপোর্ট বিশ্বাস করেন না?

শৈল : না।

ইনস্পেক্টর : করোনারের রায়ের পরেও না।

শৈল : না।

ইনস্পেক্টর : আপনার ধারণা—অ্যাক্সিডেন্ট নয়?

শৈল : আমার ধারণা নয়। আমি জানি।

ইনস্পেক্টর : কী করে জানলেন?

শৈল : সে কথা তো আগেই বলেছি।

ইনস্পেক্টর : আর একবার বলুন।

শৈল : আমি মালবির চিৎকার শুনেছি। তার ঠিক পরেই নিজের চোখে সুজিতকে ঐ ঘর থেকে বেরুতে দেখেছি।

ইনস্পেক্টর : ঐ একই সময়ে কমপক্ষে দেড়শো লোক স্কুলের হলঘরে বসে সুজিতবাবুর বক্তৃতা শুনেছে।

শৈল : তা আমি জানি না। আমি সুজিতকে দেখেছি। অনঙ্গও দেখেছে।

ইনস্পেক্টর : অনঙ্গ বলছে দেখে নি।

শৈল : বলবেই। শয়তানের সাকরেদ শয়তান।

পাকড়াশী : মাসী—

শৈল : আপনি চুপ করুন।

ইনস্পেক্টর : আপনার তাহলে দৃঢ় ধারণা সুজিতবাবু তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন?

শৈল: হ্যাঁ।

ইনস্পেক্টর : কিন্তু মিসেস বসুমল্লিকের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

শৈল : পাওয়া যায় নি? দেহটা থেঁৎলে চটকে গেলো, আর আপনি বলছেন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি?

ইনস্পেক্টর : সে তো তেতালা থেকে পড়ে যাবার আঘাত। তার আগে যে খুন করা হয়েছে, সেরকম কিছু—

শৈল : তার আগে আর কী করবার ছিল? তেতালার জানলা দিয়ে ধাক্কা মেরে নিচে শানবাঁধানো উঠোনে ফেলে দেওয়াটা খুন করা নয়?

ইনস্পেক্টর : আপনি ধাক্কা মারতে দেখেছেন?

শৈল ! দেখবার দরকার করে না। চিৎকারের পরেই আমি ওকে ঐ ঘর থেকে বেরুতে দেখেছি। সে চিৎকার আমি কোনোদিন ভুলবো না!

ইনস্পেক্টর : আয়্যাম সরি মিসেস ঘোষ। আপনার অভিযোগের কোনো ভিত্তি আমি পাচ্ছি না।

শৈল : আপনি বলতে চান—আমি মিথ্যে কথা বলছি?

ইনস্পেক্টর : না, তা বলতে চাই না।

শৈল : তবে?

ইনস্পেক্টর : আপনি হয় তো ভুল দেখেছেন।

শৈল : ভুল দেখেছি? চিৎকারটাও ভুল শুনেছি?

ইনস্পেক্টর : চিৎকার হয় তো পড়ে যাবার আগের মুহূর্তে করে থাকতে পারেন। তাতেও আপনার অভিযোগ দাঁড়ায় না।

শৈল : আপনি জানেন মালবিকার সমস্ত সম্পত্তি ও পাবে? আপনি জানেন নিজের সব কিছু ও উড়িয়ে দিয়েছে?

ইনস্পেক্টর : সব জানি মিসেস ঘোষ। Motive যদি না থাকতো, আমাকে বোধ হয় কলকাতা থেকে পাঠানোই হোতো না। কিন্তু alibi মিসেস ঘোষ। It's a cast iron alibi! আমি করোনারের রায় না মেনে পারছি না।

শৈল : আমি বলছি ও খুন করেছে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন! ও খুনে! অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছে, আমার জন্যে পারে নি! আমি জানতাম। আমি মালবিকে পাহারা দিয়ে বেড়িয়েছি। তবু পারলাম না! তবু খুন করলো! (ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে) তেতালা থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো! মালবি থেঁৎলে গুঁড়িয়ে গেলো, মরে গেলো, আমি কিছু করতে পারলাম না—

ইনস্পেক্টর : আপনারা ওঁকে নিয়ে গিয়ে একটু শুইয়ে দিন— (ঝর্ণা ও ডঃ পাকড়াশী শৈলকে লইয়া দরজার দিকে গেল। প্রবীরের মুখ শুধু আর একটু কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যেন বহুকষ্টে নিজেকে দখলে রাখিয়াছে।)

শৈল : (যাইতে যাইতে) ও খুন করেছে। আমি জানি ও খুন করেছে! ও খুনে! মালবিকে ও খুন করেছে—

(ঝর্ণা, ডঃ পাকড়াশী ও শৈলর প্রস্থান)

ইনস্পেক্টর : মিস্টার বসুমল্লিক। দায়ে পড়ে আপনাদের অনেক বিরক্ত করতে হোলো এই সময়ে। আয়্যাম সরি। আশা করি বুঝতে পারছেন, আমার কোনো উপায় ছিল না।

প্রবীর : বুঝতে পারছি।

ইনস্পেক্টর : হয় অ্যাক্সিডেন্ট না হয় সুইসাইড—আপনার কোনটা মনে হয়?

প্রবীর : আমার মনে হওয়ায় কি কিছু এসে যায়?

ইনস্পেক্টর : তা অবশ্য ঠিক। তাছাড়া অ্যাক্সিডেন্ট হোক আর সুইসাইড হোক—ফলটা একই।

প্রবীর : হ্যাঁ। মালবিকা বেঁচে নেই।

ইনস্পেক্টর : আচ্ছা, মিসেস ঘোষের আপনার উপর এতো রাগ কেন?

প্রবীর : আমার স্বভাব চরিত্র তো খুব ভালো ছিল না। রাগ হবারই কথা।

ইনস্পেক্টর : এখন ভালো হয়েছে?

প্রবীর : লোকে তো বলে—বদলে গেছি।

ইনস্পেক্টর : হাতে টাকা এলে আবার আগের মতো হয়ে যেতে পারেন মনে হচ্ছে?

প্রবীর : কী করে জানবো? বদলে যাওয়াটা সব সময়ে নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না।

ইনস্পেক্টর : এখন আপনাকে বলতে বিশেষ বাধা নেই, আমি এটাকে খুন বলে ধরে নিয়েই কথা আরম্ভ করেছিলাম।

প্রবীর : তাই না কি?

ইনস্পেক্টর : যদিও জানতাম আপনি খুন করেন নি।

প্রবীর : কী করে জানলেন?

ইনস্পেক্টর : Alibi জানা ছিল, তবু এখানে এসে নিজে চেক করেছি। অকাট্য।

প্রবীর : আপনার তা হলে ধারণা—আর কেউ খুন করেছে?

ইনস্পেক্টর : ধারণা ছিল।

প্রবীর : ছিল? এখন নেই! (ইনস্পেক্টর চট করিয়া জবাব দিলেন না)

ইনস্পেক্টর : আর কেউ কেন করবে? কোনো জিনিস চুরি যায় নি।

প্রবীর : না। শুধু মালবিকার সম্পত্তি সুজিত বসুমল্লিকের হাতে এসেছে।

ইনস্পেক্টর : আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছেন?

প্রবীর : পারছি।

ইনস্পেক্টর : আপনার কথায় এই দাঁড়ায় যে সুজিত বসুমল্লিক তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করবার জন্যে ভাড়াটে লোক লাগিয়েছিলেন।

প্রবীর : আপনিও তো তাই ভেবেছেন।

ইনস্পেক্টর : যদি ভেবেই থাকি?

প্রবীর : তবু তো সুজিতকে ধরতে পারছেন না।

ইনস্পেক্টর : হয় তো পারি। যদি সেই ভাড়াটে লোকটাকে ধরতে পারি।

প্রবীর : ধরতে চেষ্টা করছেন না কেন?

ইনস্পেক্টর : দু'টো কারণে। একটা হোলো আপনার চেহারা। (প্রবীর ধীরে ধীরে ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরিয়া চাহিল)

প্রবীর : আমার চেহারা?

ইনস্পেক্টর : হ্যাঁ। আমাদের বহু খুনী নিয়ে কারবার করতে হয়েছে। আপনার চেহারা খুনীর চেহারা নয়।

প্রবীর : তার কারণ—আমি খুন করি নি।

ইনস্পেক্টর : খুন যে করায়—সেও খুনী। অন্তত চেহারার দিক থেকে।

প্রবীর : আমার সে চেহারাও নয়?

ইনস্পেক্টর : না। যদিও I must admit, আমার অন্য ধারণা ছিল।

প্রবীর : কেন?

ইনস্পেক্টর : এখানে আসবার আগে মোহিতপুরের কুমারবাহাদুরের পুরোনো ইতিহাস যথাসম্ভব ঘেঁটেছি। তাতে সম্পূর্ণ অন্য চেহারা কল্পনা করেছিলাম। মিললো না।

প্রবীর : চেহারা দেখে আপনারা দোষী বার করেন না কি?

ইনস্পেক্টর : না। বলেছি তো—দু'টো কারণ।

প্রবীর : অন্যটা কী?

ইনস্পেক্টর : অনঙ্গর কথা ধরি না। বন্দোবস্ত থাকলে ভাড়াটে লোককেও সে ঢুকতে দিতে পারে। কিন্তু মিসেস বসুমল্লিককে আপনি ছাড়া আর কেউ ঐ জানলার কাছে নিয়ে যেতে পারতো না।

প্রবীর : মালবিকা যদি আগে থেকেই জানলায় থেকে থাকে?

(ইনস্পেক্টর অল্পক্ষণ ভাবিলেন। তারপর যেন ঝাঁকানি দিয়া চিন্তা ঝাড়িয়া ফেললেন।)

ইনস্পেক্টর : সমস্ত বাড়ি খালি থাকবে, মিসেস বসুমল্লিক তেতালার ঘরে গরাদহীন জানলায় বসে থাকবেন, ঘরে অচেনা লোক ঢুকে কাছে এলেও টের পাবেন না—এরকম যোগাযোগ হয় না মিস্টার বসুমল্লিক। আরো একটা জিনিস হয় না।

প্রবীর : কী?

ইনস্পেক্টর : যে খুন করেছে, সে নিজের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থিত করে না।

(ঝর্ণা ও ডঃ পাকড়াশীর প্রবেশ)

কেমন আছেন মিসেস ঘোষ? একটু শান্ত হয়েছেন?

পাকড়াশী : হ্যাঁ। খুব শক্ত মেয়ে।
ইনস্পেক্টর : এখন কী করছেন?
পাকড়াশী : জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন।
ইনস্পেক্টর : কেন?
ঝর্ণা : কাল সকালে বাড়িতে চলে যাবেন মুর্শিদাবাদ।
ইনস্পেক্টর : মুর্শিদাবাদ? ও আই সী, ওঁর শ্বশুরবাড়ি। আমি তা হলে চলি এখন। অনেক বিরক্ত করতে হোলো—কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।
প্রবীর : আপনার কী রায় হোলো শেষ পর্যন্ত?
ইনস্পেক্টর : আমার রিপোর্ট হবে—অ্যাক্সিডেন্ট।
প্রবীর : রিপোর্ট? আর—আপনার অভিমত?
ইনস্পেক্টর : খুন যদি হয়েই থাকে, আপনি করেন নি, বা করান নি। এই আমার অভিমত। (প্রস্থানোদ্যত)
প্রবীর : চেহারাই জিতলো তা হলে? (ইনস্পেক্টর শুধু প্রবীরের দিকে একবার চাহিলেন)
ইনস্পেক্টর : নমস্কার।

(দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন)

পাকড়াশী : Of all the silly ideas–
প্রবীর : কে বলতে পারে ডাক্তারবাবু?
পাকড়াশী : অ্যাঁ?
প্রবীর : সুজিত বসুমল্লিককে আপনি হয়তো পুরো চেনেন না।
পাকড়াশী : কী আশ্চর্য, আমি—
ঝর্ণা : আঃ সুজিতদা! মেসোমশাই, আপনি এখন বাড়ি যাচ্ছেন?
পাকড়াশী : কেন? তোকে পৌঁছে দেবো?
ঝর্ণা : না, আমি পরে যাবো। আপনি কাল সকালে একবার আসবেন?
পাকড়াশী : কেন?
ঝর্ণা : শৈলদিকে তুলে দেবো স্টেশনে।
পাকড়াশী : আসবো এখন। চলি সুজিতবাবু। Take some rest. সাতদিন ধরে যা গেলো—
প্রবীর : আমি ঠিক আছি ডাক্তারবাবু। ভাববেন না।

(ডঃ পাকড়াশীর প্রস্থান)

ঝর্ণা : মেসোমশাইয়ের সামনে ও সব যা তা বলছিলে কেন? কী কথা হয়েছিলো আমাদের?
প্রবীর : শুধু ডাক্তারবাবু নয় ঝর্ণা। আমি ইনস্পেক্টরের সামনেও বলেছি।
ঝর্ণা : সে কী?
প্রবীর : কী করবো বলো? ওদের মাথায় কিছু ঢোকে না। ওরা খানিকটা অবধি বোঝে, তার পরেই ভুল লাইনে চলে যায়।
ঝর্ণা : সেইটাই তো আরো ভয়। সেইজন্যেই তো কথা হোলো সুজিত বসুমল্লিক হয়ে চুপচাপ বসে থাকো—alibi ভরসা করে।

প্রবীর : কিন্তু বুঝতে পারছো না ঝর্ণা, আমার কী অবস্থা? শৈলদি আমাকে খুনী বলে জেনে গেলো। অনঙ্গ আমাকে খুনী ধরে নিয়ে মিথ্যে কথা বলে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে! এরপর আমাকেই খুনী সেজে অনঙ্গকে টাকা দিতে হবে। ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার!

ঝর্ণা : এ সময়ে যদি অতো মাথা গরম করো সুজিতদা—

প্রবীর : ঝর্ণা, দোহাই তোমার, তুমি অন্তত সুজিতদা বোলো না! আমাকে একটুক্ষণের জন্য মনে করিয়ে দাও আমি সুজিত বসুমল্লিক নই—প্রবীর গুহ।

ঝর্ণা : আস্তে! মনে রেখো অনঙ্গ সুজিতের চাকর, প্রবীরের নয়।

প্রবীর : তাহলে চলো—বেরোই এ বাড়ি থেকে। বাইরে গিয়ে তোমার মুখে একটু নিজের আসল নামটা শুনি।

ঝর্ণা : এখন থেকে বাইরেও তোমাকে সুজিতদা বলতে হবে।

প্রবীর : কেন?

ঝর্ণা : অভ্যেস রাখবার জন্যে। কোনো ঝুঁকি এখন নেওয়া চলবে না।

প্রবীর : কিন্তু আমি—

ঝর্ণা : কেন ওরকম করছো? পুলিশের হাঙ্গামা তো চুকলো, এখন কী করবে তাই বলো।

প্রবীর : কী আর করবো? সুজিত বসুমল্লিকের জন্যে অপেক্ষা করবো।

ঝর্ণা : তার মানে?

প্রবীর : সামান্য কথাটা বুঝতে পারছো না ঝর্ণা? প্রবীর গুহকে সম্পত্তি দেবার জন্যে এতো কাণ্ড তো করেনি সুজিত! এবার তার ফেরবার পালা।

ঝর্ণা : ফেরবার পালা? কিন্তু—কিন্তু কী করে ফিরবে?

প্রবীর : একটা সোজা উপায় হোলো প্রবীরকে সরিয়ে দেওয়া।

ঝর্ণা : সরিয়ে দেওয়া?

প্রবীর : হ্যাঁ। প্রবীরের কাজ তো ফুরিয়েছে। মোহিতপুরের নদীর ধারে এমন বহু জায়গা আছে যেখানে পুঁতে রাখলে একশো বছরের আগে প্রবীর গুহর কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঝর্ণা : প্রবীর!

প্রবীর : (হাসিয়া) চুপ! দেওয়ালেরও কান আছে। বলো—সুজিতদা।

ঝর্ণা : তুমি—তুমি পালাও!

প্রবীর : পালাবো? কোথায়?

ঝর্ণা : যেখানে হয়। অনেক দূরে কোথাও। আফ্রিকায়।

প্রবীর : কী করে যাবো? আমার স্যুটকেসের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীর গুহও লোপ পেয়ে গেছে। স্যুটকেসে আমার পাসপোর্ট ছিল।

ঝর্ণা : তবে অন্য কোথাও যাও। দিল্লি বম্বে মাদ্রাজ যেখানে খুশি!

প্রবীর : আবার হারিয়ে যাবো ঝর্ণা? আবার ঘুরে বেড়াবো পথে পথে? বাড়ি থাকবে না। ঘর থাকবে না—

ঝর্ণা : থাকবে।

প্রবীর : কী করে থাকবে?

ঝর্ণা : আমাকে খবর দিও। আমি যাবো। (প্রবীর ঝর্ণার দিকে চাহিয়া রহিল)

প্রবীর : তুমি যাবে?

ঝর্ণা : যাবো।

প্রবীর : যেখানেই থাকি, তুমি যাবে?

ঝর্ণা : যেখানই থাকো, যাবো।

প্রবীর : (অগ্রসর হইয়া) ঝর্ণা তুমি—(থামিয়া গেল)

ঝর্ণা : কী?

প্রবীর : (যেন বিশ্বাস হইতেছে না) তুমি—প্রবীর গুহকে বিয়ে করবে?

ঝর্ণা : (হাসিয়া) প্রবীর গুহ যদি না চায়, তাহলে আর কী করে করবো?

প্রবীর : মোহিতপুর ছেড়ে দেবে? তোমার বাড়ি ঘর—তারা তো কিছু জানবেই না! তোমাকে—তোমাকে তো পালিয়ে যেতে হবে! আমার মতো!

ঝর্ণা : যদি সুজিত এসে এখানে রাজত্ব শুরু করে, তাহলে মোহিতপুর আমি এমনিতেই ছাড়বো।

প্রবীর : (যেন খোঁচা খাইয়া) সুজিত এসে রাজত্ব করবে? আমাকে শিখণ্ডী করে বৌকে খুন করে বৌয়ের সম্পত্তি নিয়ে রাজত্ব করবে?

ঝর্ণা : করুক!

প্রবীর : আবার মদ খাবে! আবার ডলি বিপাশা নন্দরানী শুরু করবে? আবার দীপাকে—দীপা! দীপার কী হবে?

ঝর্ণা : (দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া) জানি না। (প্রবীর একবার পায়চারি করিল। তারপর দাঁড়াইল।)

প্রবীর : না ঝর্ণা। সে আমি পারবো না।

ঝর্ণা : তবে কী করবে?

প্রবীর : জানি না। আর ভাবতে পারছি না। চলো বেরোই। ঘরের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি।

ঝর্ণা : চলো। একটু দাঁড়াও, আমি একবার শৈলদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

(ঝর্ণার প্রস্থান। প্রচণ্ড দোটানা লইয়া প্রবীর টেবিলের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। অভ্যাসমতো পেন্সিল-কাটা বড়ো ছুরিটি দুই-একবার খুলিল, বন্ধ করিল। ফোন বাজিল। প্রবীর খানিকক্ষণ বিরক্ত চোখে চাহিয়া শেষে ফোন ধরিল।)

প্রবীর : সুজিত বসুমল্লিক...(ভীষণ চমকাইয়া) কে?...(নিজেকে সংযত করিয়া) বটে? তারপর?...হ্যাঁ, খুব ভালো ব্যবস্থা। কিন্তু পদ্ধতিটা কী?...আফ্রিকা? কিন্তু আমার পাসপোর্ট?...আর টাকা? ...সব ফেরৎ পাবো? আর কিছু পাবো না?...আমার সার্ভিসের দাম? ...পরে পাবো? যদি না পাই?...বিশ্বাস করতে হবে? তোমাকে?...আর যদি রাজি না হই?...ও আই সী। কিন্তু এটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট বলে প্রমাণ না হয়?...হ্যাঁ তা বটে। নদীর ধারে অমন অনেক জায়গা আছে, আমিও দেখেছি।...এখুনি বলতে হবে? ভাববার সময় দেবে না? ...তা ঠিক, ভাববার কিছু নেই। হয় প্রবীর গুহ হয়ে আফ্রিকায় বেঁচে থাকা, না হয় মোহিতপুরের মাটির নিচে চিরবিশ্রাম।... হ্যাঁ আমি রাজি। কিন্তু টাকার অঙ্কটা

ঠিক করে নিলে হোতো না?...এই ধরো—হাজার বিশেক?...রাজি? তাহলে কী করতে হবে বলো?...এক্ষুনি? কোথায় বলো?...হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চিনি, খুব নির্জন জায়গা। স্যুটকেসটা থাকবে তো সঙ্গে?...আচ্ছা...হ্যাঁ, হেঁটে যেতে আধ ঘণ্টা খানেক লাগবে...আচ্ছা। (ফোন রাখিয়া এক মুহূর্ত ভাবিল। হাতের ছুরিটির দিকে নজর গেল। একবার খুলিল। ঝর্ণার প্রবেশ। প্রবীর বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই ছুরিটি আড়াল দিল। পরে ঝর্ণাকে লুকাইয়া পকেটে ফেলিল।)

ঝর্ণা : চলো।

প্রবীর : ঝর্ণা আমি তোমার সঙ্গে বেরুতে পারছি না। আমাকে একটু—অন্য কাজে বেরুতে হবে।

ঝর্ণা : এর মধ্যে আবার কী কাজ পড়লো?

প্রবীর : এর মধ্যে নয়। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। খুব জরুরি কাজ। চলো, আমি ব্রিজলালকে বলে দিচ্ছি তোমাকে দিয়ে আসবে।

ঝর্ণা : কেন, তুমি কি হেঁটে যাবে?

প্রবীর : হ্যাঁ, আমি হেঁটে যাবো।

ঝর্ণা : কতোক্ষণে ফিরবে তুমি?

প্রবীর : জানি না। এক ঘণ্টা। দু'ঘণ্টা। আমার হাতে নয়। চলো, আর সময় নেই।

ঝর্ণা : তুমি ঘুরে এসো। আমি শৈলদির ঘরে বসি।

প্রবীর : আচ্ছা। (দরজা অবধি গিয়া আবার ফিরিল) কিন্তু এ ঘরে আজ রাত্রে আর এসো না।

ঝর্ণা : (অবাক হইয়া) কেন?

প্রবীর : এমনি। আর—আর আমাকে—কাউকে চট করে বিশ্বাস কোরো না।

ঝর্ণা : কী হয়েছে তোমার বলো তো?

প্রবীর : কিছু হয় নি। শুধু মনে হচ্ছে সুজিতের মতো প্রবীরও অনেক কিছু করতে পারে। কয়েকটা ব্যাপারে ওরা বোধ হয় সত্যিই যমজ ভাই।

ঝর্ণা : প্রবীর—

প্রবীর : না ঝর্ণা, আজ আর কোনো প্রশ্ন নয়। কাল তোমাকে—কাল তুমি নিজেই সব জানতে পারবে। আমি চললাম।

(দ্রুত প্রস্থান। ঝর্ণা তাকাইয়া রহিল।)

সপ্তম দৃশ্য

(একই ঘর। ঘণ্টা তিনেক পরে। ঘর খালি। টেবিলে একটি ক্ষুদ্র হুইস্কির শিশি। অনঙ্গ প্রবেশ করিল। ঘর খালি দেখিয়া শয়নকক্ষের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হুইস্কির শিশিটি দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। তারপর ক্যাবিনেট হইতে গ্লাস আনিয়া ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল। শয়নকক্ষ হইতে যে প্রবেশ করিল—সে প্রবীর না সুজিত, চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই।

আপাতত প্রবীর নামটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরিধানে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। তোয়ালে দিয়া হাত মুছিতেছে, যেন এইমাত্র হাতমুখ ধুইয়া আসিল। অনঙ্গকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।)

প্রবীর : কে? তুই! তুই কী চাস এখানে?
অনঙ্গ : আজ্ঞে না।
প্রবীর : আজ্ঞে না? আজ্ঞে না, মানে কী?
অনঙ্গ : আজ্ঞে ঢেলে দিলাম।
প্রবীর : ঢেলে? —ও। ঠিক আছে, যা। (গ্লাসটি তুলিয়া নিরীক্ষণ করিল)
অনঙ্গ : সোডা যে নেই হুজুর?
প্রবীর : সোডা ? দরকার হবে না। (এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া মুখ বিকৃত করিল)
অনঙ্গ : আজ্ঞে দিদিমণি মাসীমার ঘরে বসে আছেন।
প্রবীর : কে বসে আছে?
অনঙ্গ : আজ্ঞে ঝর্ণা দিদিমণি।
প্রবীরপ্র: এতো রাত্তিরে?
অনঙ্গ : আজ্ঞে হুজুর ফিরলে ডেকে দিতে বলেছিলেন। (প্রবীর কথা না কহিয়া আর একটু ঢালিয়া খাইল) ডাকবো হুজুর?
প্রবীর : (অন্যমনস্ক) কাকে?
অনঙ্গ : আজ্ঞে দিদিমণিকে?
প্রবীর : (কর্কশকণ্ঠে) না! (অন্যদিকে গেল। তারপর ফিরিয়া—) কী চাই কী তোর?
অনঙ্গ : আজ্ঞে না। (প্রস্থানোদ্যত)
প্রবীর : কিছু বলবার থাকে তো বলে যা!
অনঙ্গ : আজ্ঞে—আজ্ঞে—
প্রবীর : (ধমকাইয়া) কী আজ্ঞে আজ্ঞে করছিস। সিধে করে বলতে পারিস না?
অনঙ্গ : (মরিয়া হইয়া) আজ্ঞে আপনি কি খুন করেছেন? (প্রবীর সহসা স্থানু হইয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে অনঙ্গর দিকে অগ্রসর হইল। তাহার চোখ জ্বলিতেছে। অনঙ্গ সম্মোহিতের মতো চাহিয়া রহিল, কিন্তু নড়িল না।)
প্রবীর : হ্যাঁ করেছি। বেশ করেছি। কী করবি তুই? পুলিশে যাবি? যা! এক্ষুনি যা!
অনঙ্গ : (যেন বুঝিতে পারিতেছে না) পুলিশে যাবো? পুলিশ?
প্রবীর : হ্যাঁ, যা। পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দে আমাকে।
অনঙ্গ : (অসংলগ্ন বকিতে লাগিল) আমি আজ বিশ বছর হুজুরের নিমক—সেই কর্তাবাবুর আমল থেকে—তিনি জানতেন—তিনপুরুষ আমরা রাজবাড়ির চাকর হুজুর—কী করবো হুজুর—কোনোদিন দেখি নি—তাই বলে নেমকহারামি কখনো—
প্রবীর : কী কোনোদিন দেখিস নি?
অনঙ্গ : আজ্ঞে—খুন।
প্রবীর : (ধীরে ধীরে) কী চাস তুই? (অনঙ্গ সহসা প্রবীরের হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

অনঙ্গ : আমি বেইমানি করি নি হুজুর—বেইমানি শিখি নি কোনোদিন—কিন্তু হুজুর, সারা রাত্তির ঘুমুতে পারি না—শুধু বৌরানিমার। (প্রবীর ছিটকাইয়া সরিয়া গেল)

প্রবীর : কী বললি?

অনঙ্গ : সেদিন আপনাকে দেখেছিলুম হুজুর। কাউকে বলি নি। পুলিশে কতো চেষ্টা করলো বার করতে—কলকাতার দারোগা সায়েব—একটা কথা বলি নি হুজুর—

প্রবীর : (নিজেকে সংযত করিয়া) কী চাস তুই?

অনঙ্গ : আজ্ঞে ছুটি। আমাকে ছুটি দিন হুজুর।

প্রবীর : চলে যাবি?

অনঙ্গ : হ্যাঁ হুজুর।

প্রবীর : আর কী চাস?

অনঙ্গ : আর কিছু চাই নে হুজুর!

প্রবীর : টাকা?

অনঙ্গ : (ভয়ার্ত কণ্ঠে) টাকা? না হুজুর, টাকা নয়! টাকা নিতে পারবো না হুজুর! (তারপর অদ্ভুত কণ্ঠে) অনেক পাপ করেছি হুজুর। অনেক টাকা খেয়েছি। দেশে জমিজমা করেছি। বাপ পিতেমোর কাছে সেই শিক্ষাই পেয়েছি। কখনো অন্যাই বলে মনে হয় নি। কিন্তু খুন—খুনের টাকা—না হুজুর, সে পারবো না। কিন্তু বেইমানি আমি করি নি হুজুর—কোনোদিন করবো না—

প্রবীর : চুপ কর! (অনঙ্গ থামিয়া গেল। প্রবীর অল্পক্ষণ ভাবিল। তারপর আরও খানিকটা মদ্যপান করিল। নেশা হয় নাই, কিন্তু স্বর কিঞ্চিৎ স্খলিত।)
তুই খুনী কোনোদিন দেখিস নি—না?

অনঙ্গ : না হুজুর।

প্রবীর : আচ্ছা যা। ঘরে যা। (অনঙ্গর প্রস্থান। প্রবীর নিজের করতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।) খুন। খুনী।

(ঝর্ণার প্রবেশ।)

ঝর্ণা : কখন ফিরলে?

প্রবীর : কে? (যেন কষ্টে চিনিয়া) ও, তুমি—তুমি ঝর্ণা! এখানে কেন?

ঝর্ণা : আমি তো তোমার জন্যে বসে আছি। অনঙ্গ বলে নি?

প্রবীর : অনঙ্গ? হ্যাঁ অনঙ্গ। অনঙ্গ—চলে গেলো। (হুইস্কি ঢালিল)

ঝর্ণা : তুমি মদ খাচ্ছো?

প্রবীর : মদ? হ্যাঁ। হুইস্কি। নির্জলা হুইস্কি। কিন্তু—নেশা হচ্ছে না তো? নেশা হয় না কেন?

ঝর্ণা : কী হয়েছে তোমার? তুমি এ সব কী করছো প্রবীর?

প্রবীর : প্রবীর? (সহসা হাসিতে আরম্ভ করিল) কে প্রবীর ঝর্ণা? প্রবীর গুহ? প্রবীর মরে গেছে ঝর্ণা! মরে গেছে! তাকে আমি নদীর চরে কবর দিয়ে এসেছি। (ঝর্ণা শিহরিয়া পিছাইয়া গেল)

ঝর্ণা : তুমি—তুমি কে? তুমি—সুজিতদা?

প্রবীর : (কর্কশকণ্ঠ) হ্যাঁ আমি সুজিত! সুজিত বসুমল্লিক! কেন সুজিত হবো না।
ঝর্ণা : তুমি মালবীকে খুন করেছো? (মুখ ঢাকিল)
প্রবীর : (বিহ্বলভাবে) মালবি? মা-ল-বিকা?
ঝর্ণা : তুমি প্রবীরকে মেরে ফেলেছো? (প্রবীর চুলের মধ্যে একবার হাত চালাইয়া লইল। চেষ্টা করিয়া অসংলগ্ন চিন্তা সংযত করিল।)
প্রবীর : না। প্রবীর এখনো মরে নি। এখনো তাকে বাঁচানো যায়।
ঝর্ণা : (মুখ তুলিয়া আশান্বিত কণ্ঠে) বাঁচানো যায়? কোথায় সে?
প্রবীর : ঐ ঘরে। একটা স্যুটকেসে। প্রবীরের স্যুটকেশ। তার মধ্যে—পাসপোর্ট আছে।
ঝর্ণা : কী বলছো তুমি?
প্রবীর : ঝর্ণা! এদিকে এসো তো? আমার কাছে।
ঝর্ণা : কেন?
প্রবীর : আমার হাতটা একটু দেখো তো?
ঝর্ণা : (হাত দেখিয়া) তুমি—প্রবীর!!
প্রবীর : না, আমি সুজিত। কিন্তু প্রবীর হবো। ঐ ঘরে—স্যুটকেসে—পাসপোর্ট আছে।
ঝর্ণা : কী পাগলামি করছো?
প্রবীর : তুমি যাও ঝর্ণা। বাড়ি যাও। তুমি থাকলে আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। (হুইস্কির দিকে হাত বাড়াইল। ঝর্ণা শিশিটি সরাইয়া লইল।)
ঝর্ণা : না।
প্রবীর : কেন?
ঝর্ণা : কী হয়েছে আমাকে বলো।
প্রবীর : কী হবে শুনে ঝর্ণা?
ঝর্ণা : কী হবে শুনে? তোমার কথা আমার শুনে কী হবে?
প্রবীর : শুনলে তুমি আর আমার ছায়া মাড়াবে না।
ঝর্ণা : শুনি আগে, তারপর দেখা যাবে।
প্রবীর : আমি—সুজিতকে খুন করেছি। (এক মুহূর্ত, তারপরেই ঝর্ণা নিজেকে সামলাইয়া লইল। হয়তো এইরূপ কিছুর জন্য খানিকটা প্রস্তুত ছিল বলিয়াই এত শীঘ্র নিজেকে দখলে আনা সম্ভব হইল।)
ঝর্ণা : গোড়া থেকে বলো।
প্রবীর : গোড়া থেকে? খুন করেছি! আমি খুনী! আর কী শুনবার আছে?
ঝর্ণা : হ্যাঁ আছে। কী হয়েছিলো বলো।
প্রবীর : (খানিকটা আপন মনে) সুজিত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। নদীর ধারে। বলেছিলো চলে যেতে। আফ্রিকায় ফিরে যেতে। আমি রাজি হই নি। ভয় দেখালো। তবু রাজি হই নি। আমাকে মারতে এলো। ওর হাতে ছুরি ছিল। অনেকদিন আগে আর একজন অমনি করে আমাকে ভয় দেখিয়েছিলো। মারতে এসেছিলো। তাকে—তাকে আমি খুন করেছিলাম।
ঝর্ণা : না। সে মরেছিলো।
প্রবীর : হয় তো। কিন্তু সুজিতকে আমি মেরেছি। সুজিতের গায়ে জোর কম। আমার

থেকে কম। তার উপর মদ খেয়েছিলো। ও পারলো না।

ঝর্ণা : তারপর?

প্রবীর : পুঁতে ফেললাম। ওরই আনা কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেললাম। কোদালটা ফেলে দিলাম নদীতে। ভাবলাম—স্যুটকেসটাও পুঁতে ফেলি। তারপর ভাবলাম—ধরা দি। পারলাম না। শেষে ঠিক করলাম—চলে যাই। আফ্রিকায়।

ঝর্ণা : চলে যাচ্ছিলে?

প্রবীর : তাও পারলাম না। একবার তোমাকে দেখতে, দীপাকে দেখতে—ভীষণ ইচ্ছে হোলো। স্টেশনের পথ ভুলে গেলাম। দেখি ঘরে চলে এসেছি।

ঝর্ণা : ভালো করেছো।

প্রবীর: ভালো করিনি ঝর্ণা। এসে দুর্বল হয়ে পড়ছি কেবলই। তাই মদ খাচ্ছিলাম।

ঝর্ণা : মদ কোথায় পেলে?

প্রবীর : সুজিতের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিলো—মারামারির সময়ে। পকেটে করে নিয়ে চলে এসেছিলাম। অনঙ্গ ঢেলেদিলো। অনঙ্গ—অনঙ্গ চলে যাচ্ছে।

ঝর্ণা : কোথায়?

প্রবীর : বাড়ি। খুনীর কাছে ও থাকতে পারবে না। শৈলদিও পারবে না। কেই বা পারে বলো? তুমি পারো?

ঝর্ণা : না। (প্রবীরের এক অসম্ভব আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল)

প্রবীর : না। পারো না। তুমি বাড়ি যাও। আমি কাল ভোরে চলে যাবো।

ঝর্ণা : তাহলে আমি গুছিয়ে নিই গে।

প্রবীর : কী গুছিয়ে নেবে?

ঝর্ণা : আমার জিনিসপত্র?

প্রবীর : তুমি—তুমি কোথায় যাবে?

ঝর্ণা : পরে যাবো? তাহলে বলো, কোথায় দেখা পাবো?

প্রবীর : ঝর্ণা! আমি খুন করেছি!

ঝর্ণা : না। করোনি।

প্রবীর : একবার নয় ঝর্ণা—দু-দু'বার। অনেকদিন আগে—আমাদের গ্রামে—

ঝর্ণা : সে খুন নয়—অ্যাক্সিডেন্ট।

প্রবীর : কিন্তু সুজিতকে তো আমি—

ঝর্ণা : সেও অ্যাক্সিডেন্ট!

প্রবীর : অ্যাক্সিডেন্ট?

ঝর্ণা : হ্যাঁ প্রবীর—অ্যাক্সিডেন্ট। সব অ্যাক্সিডেন্ট। মালবিকাও অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি যেও না প্রবীর! ও স্যুটকেসটা পুঁতে ফেলো। প্রবীর গুহ মরে যাক। তুমি সুজিত দা।

প্রবীর : সুজিতদা?

ঝর্ণা : হ্যাঁ, সুজিতদা। কতো বছর ধরে স্বপ্ন দেখেছি সুজিতদা বদলে গেছে। একেবারে বদলে গেছে। কী জানি হয় তো আরো অনেকে এই স্বপ্ন দেখেছে। মালবিকা। দীপা।

প্রবীর : ঝর্ণা!

ঝর্ণা : আচ্ছা স্বপ্ন কি সত্যি হয় না? বলো না? (অস্থির উত্তেজনায়) হয় না সত্যি? কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টে সব কিছু বদলে গিয়ে স্বপ্নের মতো হয়ে যেতে পারে না?

প্রবীর : কিন্তু আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না—আমি খুন করেছি!

ঝর্ণা : (সহসা দুর্বলভাবে) জানি না। আমি শুধু চাইছি তুমি সুজিতদা হয়ে থাকো। স্বপ্নটা সত্যি হোক। আর পুরোনো বিশ্রী সত্যিটা দুঃস্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে যাক।

(প্রবীর প্রচণ্ড দ্বিধা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝর্ণা শূন্যনেত্রে বসিয়া রহিল। দীপার প্রবেশ।)

দীপা : বাবা।

প্রবীর : কে? (দীপাকে দেখিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া থামিয়া গেল)
তুমি—তুমি ঘুমোও নি?

দীপা : ঘুম ভেঙে গেলো বাবা। ভয় করছে।

প্রবীর : কিসের ভয়? তোমার—মাসীমা নেই?

দীপা : মাসীমা মার ঘরে চুপ করে বসে আছে। ও ঘরে যেতে ভয় করলো। তাই তোমার কাছে এলাম।

প্রবীর : তাই—আমার কাছে এলে?

দীপা : হ্যাঁ বাবা।

প্রবীর : আমার কাছে তোমার ভয় করবে না?

দীপা : ভয় করবে কেন? তুমি তো আছ? (প্রবীর দীপাকে কাছে টানিয়া লইল)
আমি তোমার ঘরে শোবো বাবা?

প্রবীর : আমার ঘর? আ-মার ঘর?

ঝর্ণা : হ্যাঁ সুজিতদা। তোমার ঘর। চলো দীপা, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি। (ঝর্ণা দীপাকে লইয়া ঘরের দিকে গেল। দীপা ফিরিল)

দীপা : আমি তোমার জন্যে অনেকক্ষণ জেগে শুয়েছিলাম। তুমি কখন বাড়ি ফিরেছো বাবা?

প্রবীর : বাড়ি? (আপন মনে) অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছি। অনেক রাতে। বাড়ি। বাড়ি ফিরেছি।

এবং ইন্দ্রজিৎ

মুখবন্ধ

নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩, কিন্তু আসলে কবিতায় আর ডায়েরীতে এটি রচিত হয়ে গিয়েছিলো লন্ডনে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সালে। বস্তুত একটা ছাড়া সবকটি কবিতাই ঐ সময়ে লেখা। তখনকার ডায়েরীতে কিছু অংশ হুবহু তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁরা যদি আমার 'প্রবাসে হিজিবিজি' গ্রন্থটি পড়েন তবে আরো বিশদভাবে জানতে পারবেন।

এই নাটকটির জন্যে নিন্দা আর প্রশংসা দুইই জুটেছে আমার কপালে। অনেক অপব্যাখ্যাও দেখেছি। আর কিছু না হোক, এটাকে সেইসব কারণেই বিতর্কিত বলা যেতে পারে।

কোনো চরিত্রলিপি দেওয়া হোলো না, নাটকটি পড়লেই তার কারণটা বোঝা যাবে।

বাদল সরকার

প্রথম অঙ্ক

(টেবিলে একতাড়া কাগজ। চেয়ারে লেখক, দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে বসে। লেখক লিখছে। অনেকক্ষণ থেকে লিখছে। মাসীমা এলেন। মাসীমা বলা শুধু নাম দেবার জন্য। মা হতে পারেন। পিসীমা, কাকীমা, মামীমা, বড়ো বৌদি—যে কোনো একজন হওয়া চলে। মাসীমা বিরক্ত। তিনি কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। কিছু বুঝে উঠতে না পারা মাসীমাদের ধর্ম।)

মাসীমা কী যে তোর ব্যাপার, আমি কিছু বুঝে উঠতে পারি না। (লেখক নিরুত্তর) খেতে আসবি কি আসবি না ব'লে দে, আমি আর পারিনে বাপু। (লেখক নিরুত্তর) কী হোলো?

লেখক : যাচ্ছি।

মাসীমা : যাচ্ছি তো এই নিয়ে তিনবার বললি। আমি আর ডাকতে পারবো না বলে দিলুম—হ্যাঁ।

লেখক : ও কথাটাও তো এই নিয়ে তিনবার বললে।

মাসীমা : যা ইচ্ছে করো। লেখা লেখা আর লেখা। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, শুধু লেখা। কী যে হবে গুচ্ছের লিখে—ভগবান জানেন—

(মাসীমা বকতে বকতে চলে গেলেন। লেখা থেমেছে অল্পক্ষণ হোলো। লেখক পড়ে দেখছে। কাগজ হাতে উঠে এলো পড়তে পড়তে। একটি মেয়ে এলো। এর নাম দেওয়া যেতে পারে মানসী।)

মানসী : শেষ হয়েছে?

লেখক : না।

মানসী : কী লিখলে—শোনাবে না?

লেখক : কিছুই লিখিনি। (কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেললো)

মানসী : ও কী? ছিঁড়ে ফেললে?

লেখক : কিছু হয়নি। কিছু লেখবার নেই আমার।

মানসী : কিছু লেখবার নেই?

লেখক : কী লিখবো? কাকে নিয়ে লিখবো? ক'টা মানুষকে চিনি আমি? ক'জনের কথা জানি?

মানসী : (দর্শকদের দেখিয়ে) এই এতো লোক আছে—এদের একজনকেও চেনো না? একজনের কথাও জানো না?

লেখক : এদের? চিনি হয়তো দু'একজনকে। আমার মতো দু'একজনকে। তাদের নিয়ে নাটক হয় না।

মানসী : দেখো না চেষ্টা করে।

লেখক : অনেক চেষ্টা করেছি।

(কাগজের কুচিগুলি ছুঁড়ে ফেলে লেখক ফিরে গেলো টেবিলে। মানসী অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে

চলে গেলো। হঠাৎ লেখক ফিরে দাঁড়ালো। এগিয়ে এলো সামনের দিকে। প্রেক্ষাগৃহে ঠিক তখনি দেরি করে আসা চারজন দর্শক ঢুকে আসন খুঁজছে। লেখক তাদের উদ্দেশ করে হাঁক ছাড়লো।)

শুনুন! এই যে, শুনছেন? (দর্শকরা শুনলেও তাদের উদ্দেশ্যে হাঁক ধারণা করতে পারেনি প্রথমে) শুনছেন—ও মশাই?

১ম দর্শক : আমায় বলছেন?

লেখক : আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা একটু এদিকে আসবেন দয়া করে?

২য় দর্শক : আমরা—সবাই?

৩য় দর্শক : স্টেজে?

লেখক : আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি কিছু মনে না করেন। একটু দরকার ছিল। (চারজন এগিয়ে এলো)

১ম দর্শক : কোথা দিয়ে যাবো?

লেখক : এই যে—এই দিক দিয়ে উঠে আসুন। (চারজন মঞ্চে উঠলো) আপনার নামটা জানতে পারি?

১ম দর্শক : অমলকুমার বোস।

লেখক : আপনার?

২য় দর্শক : বিমলকুমার ঘোষ। (লেখক তৃতীয় দর্শকের দিকে ফিরলো)

৩য় দর্শক : কমলকুমার সেন।

লেখক : আপনার?

৪র্থ দর্শক : নির্মলকুমার—

লেখক : (হঠাৎ চিৎকার করে) না! (স্তব্ধতা। চারজনের চোখে বিস্ময়। দেহ স্থির।) অমল, বিমল, কমল, নির্মল—এ হতে পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো নাম আছে! থাকতেই হবে! কী নাম আপনার?

(মঞ্চের আলো নিভে গেলো। সম্পূর্ণ অন্ধকার। অমল বিমল কমল অন্ধকারে পিছনে সরে দাঁড়িয়েছে। মঞ্চের কেন্দ্রে চতুর্থ দর্শক। অন্ধকারে লেখকের কণ্ঠস্বর।)

কী নাম আপনার?

৪র্থ দর্শক : ইন্দ্রজিৎ রায়।

লেখক : তবে কেন নির্মল বলছিলেন?

ইন্দ্রজিৎ : ভয়ে।

লেখক : কিসের ভয়ে?

ইন্দ্রজিৎ : অশান্তির। নিয়মের বাইরে গেলে অশান্তি।

লেখক : চিরকাল কি নির্মল নাম বলে এসেছেন?

ইন্দ্রজিৎ : না। আজ বলি। এখন বলি।

লেখক : কেন?

ইন্দ্রজিৎ : বয়স হয়েছে। বয়স আনন্দকে ভয় করে। সুখকে ভয় করে। স্বস্তি চায়। শান্তি চায়। ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল দরকার এখন।

লেখক : কতো বয়স?

ইন্দ্রজিৎ : একশো। দু'শো। জানি না কতো। ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের হিসেবে পঁয়ত্রিশ।

লেখক : কোথায় জন্ম?

ইন্দ্রজিৎ : কলকাতায়।

লেখক : লেখাপড়া?

ইন্দ্রজিৎ : কলকাতায়।

লেখক : কর্মস্থান?

ইন্দ্রজিৎ : কলকাতায়।

লেখক : বিবাহ?

ইন্দ্রজিৎ : কলকাতায়।

লেখক : মৃত্যু?

ইন্দ্রজিৎ : এখনো হয়নি।

লেখক : ঠিক জানেন? (অল্পক্ষণ চুপ। তারপর অন্ধকারে ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।)

ইন্দ্রজিৎ : না। ঠিক জানি না।

(ধীরে ধীরে মঞ্চ আলোকিত হোলো, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। ইন্দ্রজিৎ ও তার পিছনে সারি দিয়ে অমল, বিমল, কমল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। শূন্যদৃষ্টি সোজা সামনের দিকে দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের দেওয়াল ছাড়িয়ে চলে গেছে। লেখক দর্শকদের দিকে ফিরলো। একবার সবাইকে দেখে নিয়ে ক্লান্ত অধ্যাপকের মতো একঘেয়ে সুরে বলে যেতে লাগলো।)

লেখক : ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর হিসাবে কলকাতার বর্তমান লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। এর শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ গ্র্যাজুয়েট বা আরো উচ্চশিক্ষিত। বিভিন্ন নামে এঁদের পরিচিতি। এঁরা মধ্যবিত্ত, যদিও এঁদের মধ্যে বিত্তের তারতম্য যথেষ্ট। এঁরা বুদ্ধিজীবী, যদিও বুদ্ধি জীবিকা হলে অনেকেই অনাহারে মরতো। এঁরা শিক্ষিত, যদি ডিগ্রীকে শিক্ষা বলে ধরে নেওয়া চলে। এঁরা ভদ্রলোক, ছোট-লোকদের থেকে নিজেদের পার্থক্যটা বোঝেন বলে। এঁরা অমল বিমল কমল।

(অমল বিমল কমল মঞ্চ ছেড়ে গেলো। তাদের পদক্ষেপে উন্নাসিক স্বাতন্ত্র্যবোধ)

এবং ইন্দ্রজিৎ।

(ইন্দ্রজিৎ একবার লেখকের দিকে তাকালো। তারপর অমলদের পিছনে পিছনে গেলো। তার চোখে যন্ত্রণা, পদক্ষেপে ক্লান্তি।)

এদের জীবনে নাটক হয়তো আছে। ছোট ছোট নাটক। অনেক নাটক। সে নাটক রচনা করবে শক্তিশালী কোনো নাট্যকার আগামী কোনো যুগে।

(মাসীমার প্রবেশ)

মাসীমা : তুই আসবি খেতে?

লেখক : না।

(মাসীমার প্রস্থান। মানসীর প্রবেশ।)

মানসী : পারলে লিখতে?

লেখক : না।

(মানসীর প্রস্থান)

লেখক : আমি নাটক লিখেছি। একাধিক নাটক। আমি নাটক লিখতে চাই। আরো নাটক। আমি জানি না নিপীড়িত জনসাধারণের কথা। কয়লাখনির গোলামকে আমি চিনি না। ধান-ক্ষেতের চাষীকে আমি চিনি না। সাপ খেলানো বেদে, সাঁওতালী মোড়ল, বড়োগাঙের মাছমারার দল আমার অপরিচিত। আমার চারিপাশে যাদের দেখি তাদের রূপ নেই, বর্ণ নেই, বস্তু নেই। তারা অনাটকীয়। তারা—অমল, বিমল, কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।(আলো নিভে গেলো। সম্পূর্ণ অন্ধকার।)
আমি—অমল, বিমল, কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।

(অন্ধকার মঞ্চে একটা চাপা ফিসফিসে মিলিত কণ্ঠস্বর। প্রতিধ্বনির মতো।)

মিলিত কণ্ঠস্বর : অমল বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
অমল বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।
এবং ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রজিৎ।

(আবহ বাদ্যের প্রচণ্ড ঝঙ্কারে কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেলো। জ্বলে উঠলো নগ্ন কঠিন সাদা আলো। কোনো ছায়া সে আলোকে সুললিত করেনি।

মঞ্চ শূন্য। আবহ বাদ্য যেমন সহসা শুরু হয়েছিল তেমনি সহসা শেষ হয়ে গেলো। ইন্দ্রজিতের প্রবেশ। তার পঁয়ত্রিশ বছরের চেহারায় কোনো রূপসজ্জা নেই। কিন্তু ভাবে ভঙ্গীতে কথায় অল্পবয়সের চাপল্য। পিছন পিছন অমলের প্রবেশ। শিক্ষক-সুলভ গাম্ভীর্য। এখন থেকে অমল বিমল কমল তিনজনেরই চলন-বলনে খানিকটা পুতুল-নাচের ছোঁয়াচ। ভূমিকা অনুযায়ী ভাবভঙ্গী কণ্ঠস্বর সবই আছে। কিন্তু তবু যেন একটা যান্ত্রিক আড়ষ্টতা। হাস্যকর, তবু করুণার যোগ্য।)

অমল : রোল নাম্বার থার্টি ফোর!

ইন্দ্রজিৎ : ইয়েস স্যার।

অমল : Every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by an external impressed force to change that state.

(অমলের প্রস্থান। ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে রইলো। বিমলের প্রবেশ।)

বিমল : রোল নাম্বার থার্টি ফোর!

ইন্দ্রজিৎ : ইয়েস স্যার।

বিমল : Poetry, in a general sense, may be defined to be the expression of the imagination.

(বিমলের প্রস্থান। কমলের প্রবেশ।)

কমল : রোল নাম্বার থার্টি ফোর!

ইন্দ্রজিৎ : ইয়েস স্যার।

কমল : প্রবন্ধ-সাহিত্যের মূল উপাদান—যুক্তির সার, ভাব, ভাষা ও চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, মননধারার সংহতি এবং তত্ত্ব ও তথ্যের উপযুক্ত সমাবেশ।

(কমলের প্রস্থান)

ইন্দ্রজিৎ : তত্ত্ব ও তথ্যের উপযুক্ত সমাবেশ। তত্ত্ব ও তথ্যের উপযুক্ত সমাবেশ। Expression of the imagination. Expression of the imagination. State of rest or of uniform motion. State of rest. Uniform motion.

(অমল বিমল কমল হৈ হৈ করে ঢুকে ইন্দ্রজিৎকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনজনেই এখন তরুণ।)

অমল : খেলোয়াড় নয়? দু'রানে আউট হলেই খেলোয়াড় নয়?

বিমল : তা বলে অমনি ভাবে আউট হওয়া? তাছাড়া সেকেন্ড টেস্টেই বা কী করেছে?

কমল : ক্রিকেট হোলো গেম অফ গ্লোরিয়াস আনসার্টেন্টি। কী বলিস ইন্দ্র?

ইন্দ্রজিৎ : নিশ্চয়ই।

অমল: আর স্কিলটা কিছু না? বললেই হবে?

ইন্দ্রজিৎ : কিছু না কে বলেছে?

বিমল : যাই বলিস—ফুটবল অনেক এক্সাইটিং।

ইন্দ্রজিৎ : তা ঠিক।

কমল : এক্সাইটিং তো টেক্সাসমার্কা ছবিও। তবে ভালো ছবি দেখিস কেন?

বিমল : এই অমল, তুই য়ুল ব্রাইনারের কোনো ছবি দেখেছিস্?

অমল : সব ক'টা দেখেছি। দারুণ করে! যতোই মার্লোন ব্র্যান্ডো বলো—ওর কাছে লাগে না। ইন্দ্র দেখেছিস?

ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ, দেখেছি খান-দুই।

কমল : দূর—ন্যাড়া মাথা!

অমল : আজ্ঞে হ্যাঁ। মাথার মতো মাথা—তাই ন্যাড়া রাখবার হিম্মৎ আছে।

বিমল : মাথার মতো মাথা বলতে অন্য জিনিস বোঝায়।

কমল : যেমন আইনস্টাইনের মাথা।

ইন্দ্রজিৎ : আইনস্টাইনের থিওরীর ওপর একটা বই দেখছিলাম সেদিন। কিছুই বুঝলাম না।

অমল : আইনস্টাইন বলেছেন, ডাইমেনশন তিনটে নয়, চারটে।

বিমল : ফোর্থ ডাইমেনশন হচ্ছে টাইম—না?

কমল : কে জানে বাবা! কলেজের ফিজিক্স সামলাতে পারছি না, তার ফোর্থ ডাইমেনশন। অমল, তোর প্র্যাকটিকাল খাতা লেখা হয়েছে সব?

অমল : মেজদার পুরোনো খাতা আছে, টুকে মেরে দেবো! কবে সাব্‌মিট করতে বলেছে?

বিমল : তেরো তারিখের মধ্যে। আমি শুরুই করিনি। ইন্দ্র, তোর কদ্দূর?

ইন্দ্রজিৎ : কাল শুরু করেছি। একটা ভাল বই পেয়েছিলাম। দু'টো দিন পড়ার বই ছুঁইনি।

কমল : কী বই?

ইন্দ্রজিৎ : বার্ণার্ড শ-এর 'কম্‌প্লিট্ প্লেজ্'।

অমল : বার্ণার্ড শ? আঃ! চাবুক চাবুক! 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান' পড়েছিস?

বিমল : আমি শুধু প্লেজ প্লেজেন্টটা পড়েছি।

কমল : আমাদের প্রমথ বিশী খানিকটা ঐ ধরনের শুরু করেছিল।

অমল : কিসে আর কিসে! জি. বি. এস. আর প্র. না. বি.!

বিমল : প্রমথ বিশী আবার পলিটিক্স ঢুকিয়ে ফেলে।

কমল : তাতে ক্ষতিটা কী? সাহিত্যে পলিটিক্স থাকবেই। না থেকে পারে না।

অমল : মোটেই না। সাহিত্য হবে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতীক। পলিটিক্সের মতো নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিমল : নোংরা কথাটায় আমার আপত্তি আছে। নোংরা যদি সত্য হয় তবে তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা এস্‌কেপিজম্। সাহিত্য হবে জীবনের ছবি—রিয়েলিস্টিক! ইন্দ্র কী বলিস?

ইন্দ্রজিৎ : আমি ঠিক বুঝি না। রিয়েলিস্টিক্ হবে এটা মানি। কিন্তু নিছক জীবনের ফটোগ্রাফ হবে সেটাও—

কমল : (সহসা) এই, ক'টা বাজে জানিস? সাড়ে সাত!

অমল : মাই গড্! প্র্যাকটিকাল খাতা! চল্ চল্!

বিমল : আমাদের তো উল্টো পথ।

কমল : চল্ অমল।

(অমল ও কমলের প্রস্থান)

বিমল : কী রে ইন্দ্র, যাবি না?

ইন্দ্রজিৎ : আমার—আমায় একটু ঘুরে যেতে হবে রে।

বিমল : কোন্ দিকে?

ইন্দ্রজিৎ : ঐ দিকে।

বিমল : ওদিকে তো ওদের সঙ্গে গেলি না কেন?

ইন্দ্রজিৎ : তখন খেয়াল করি নি।

বিমল : যাব্বাবা! একা একা হাঁটালি!

(বিমলের অন্যদিকে প্রস্থান। এতোক্ষণ একঘেয়েভাবে তবলার একটা প্রাথমিক বোল বাজছিলো। এবার একটি দ্রুত জটিল বোল। লেখকের প্রবেশ।)

লেখক : কীরে, বসে আছিস যে?

ইন্দ্রজিৎ : এমনি।

লেখক : কী ভাবছিস?

ইন্দ্রজিৎ : কিছু না।

লেখক : ওরা আসেনি আজ?

ইন্দ্রজিৎ : এসেছিলো।

লেখক : কে কে?

ইন্দ্রজিৎ : অমল, বিমল, কমল।

লেখক : কী করলি?

গ্যাঁজালাম।

লেখক : কী গ্যাঁজালি?

ইন্দ্রজিৎ : এই—নানারকম।

লেখক : ক্রিকেট—সিনেমা—ফিজিক্স—রাজনীতি—সাহিত্য?

ইন্দ্রজিৎ : অ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্রিকেট—সিনেমা—ফিজিক্স—রাজনীতি—সাহিত্য। কী করে জানলি? (লেখক উত্তর দিলো না। পকেট থেকে চীনেবাদাম বার করে দিলো।)

লেখক : নে খা।

ইন্দ্রজিৎ : কী করা যায় বল্ তো?

লেখক : কিসের কী করবি?

ইন্দ্রজিৎ : লেখাপড়া আর ভালো লাগছে না।

লেখক : কী করতে চাস?

ইন্দ্রজিৎ : তা জানি না। এক-এক সময় ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়ি।

লেখক : কোথায় যাবি?

ইন্দ্রজিৎ : জানি না কোথায়। অনেক দূরে কোথাও। কী আছে অনেক দূরে তাও জানি না। জঙ্গল। মরুভূমি। বরফের স্তূপ। কতকগুলো পাখি। পেঙ্গুইন। অস্ট্রিচ্। কতকগুলো জন্তু। ক্যাঙ্গারু। জাগুয়ার। কিছু মানুষ। বেদুইন। এস্কিমো। মাওরি।

লেখক : এক কথায় সরল ভূগোল-পরিচয়। ডি.পি.আই. কর্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মনোনীত।

ইন্দ্রজিৎ : ভূগোলের বাইরে একটা পৃথিবী আছে। বাইরের পৃথিবী। এখানে নয়। অন্য কোথাও। দূরে কোথাও। বাইরে কোথাও।

লেখক : ক্রিকেট—সিনেমা—ফিজিক্স—রাজনীতি—সাহিত্যের বাইরে?

ইন্দ্রজিৎ : ঠিক বলেছিস!

লেখক : চল্।

ইন্দ্রজিৎ : কোথায়?

লেখক : বললি যে সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়বি?

ইন্দ্রজিৎ : এখুনি?

লেখক : আবার কখন?

ইন্দ্রজিৎ : যাঃ। বাজে বকিসনি! তোকে বলাই ভুল হয়েছে।

লেখক : তোর পকেটে কতো আছে?

ইন্দ্রজিৎ : আনা আষ্টেক। কেন?

লেখক : আমার পকেটে পাঁচ সিকে আছে। হাওড়া স্টেশন থেকে এক টাকা বারো আনায় যদ্দূর যাওয়া যায় যাবো। তারপর হাঁটবো।

ইন্দ্রজিৎ : ঠাট্টা করবি জানলে তোকে বলতাম না এসব কথা।

লেখক . আমি সীরিয়াস! (ইন্দ্রজিৎ লেখকের মুখের দিকে চাইলো। লেখক সত্যিই সীরিয়াস। ইন্দ্রজিৎ দ্বিধাগ্রস্ত।)

ইন্দ্রজিৎ : কিন্তু—মা?

লেখক : তা বটে। মা।

ইন্দ্রজিৎ : তা ছাড়া—সামনে পরীক্ষা।

লেখক : ঠিক কথা। পরীক্ষার পরে কথা বলা যাবে। নে। আর একটা আছে।
(শেষ চীনেবাদামটি দিয়ে লেখক বেরিয়ে গেলো। ইন্দ্রজিৎ শূন্যনেত্রে দাঁড়িয়ে। নেপথ্যে মাসীমার হাঁক—"ইন্দ্র"!)

ইন্দ্রজিৎ : যাই মা।

(কিন্তু নড়লো না। মাসীমার প্রবেশ।)

মাসীমা : কী রে, খাবি না? কতোক্ষণ ভাত নিয়ে বসে থাকবো?

ইন্দ্রজিৎ : আচ্ছা মা—

মাসীমা : কী হোলো?

ইন্দ্রজিৎ : আচ্ছা—আমি যদি—আমাকে যদি কোথাও চলে যেতে হয়—

মাসীমা : যতো সব অলক্ষুণে কথা। আয় খেতে আয়। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।
(মাসীমার প্রস্থান। নেপথ্যে একটি সমবেত সঙ্গীত—প্রথম আস্তে, তারপর আরো জোরে। ইন্দ্রজিৎ মাসীমা যেদিকে গেছেন—সে দিকে বেরিয়ে গেলো।)

গান : এক—দুই—তিন
এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন
এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন
চার—পাঁচ—ছয়
চার—পাঁচ—ছয়—পাঁচ—চার—পাঁচ—ছয়
চার—পাঁচ—ছয়—পাঁচ—চার—পাঁচ—ছয়
সাত—আট—নয়
সাত—আট—নয়—আট—সাত—আট—নয়
সাত—আট—নয়—আট —সাত—আট—নয়
নয়—আট—সাত—ছয়—পাঁচ—চার—তিন—দুই—এক
(গানের মধ্যে লেখকের প্রবেশ। গানের শেষ লাইনটি গলা মিলিয়ে গাইতে গাইতে লেখক পাদপ্রদীপের কাছে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।)

লেখক : (গান থামতেই) অনাটকীয়! একেবারে অনাটকীয়! ওদের নিয়ে নাটক হয় না। হতে পারে না। ঐ অমল, বিমল, কমল—

(অমল বিমল কমল হৈ হৈ করে এসে লেখককে ঘিরে ধরলো)

অমল : আরে কবি যে! কী খবর?

লেখক : ভালো।

বিমল : কী কাব্যটাব্য লিখলে নতুন বলো।

লেখক . কিছু লিখিনি বিশেষ।

কমল : আরে চেপে যাচ্ছো কেন ব্রাদার? টুকে নেবো? পারবো না ব্রাদার-- বানান ভুল হয়ে যাবে। (তিনজনের অট্টহাস্য)

লেখক · একটা ছোট কবিতা লিখেছি শুধু।

অমল : এইতো বেরুচ্ছে! শোনাও, শোনাও।

বিমল : 'এবার তোমার কাব্যকূজন আরম্ভ করো কবি!'

কমল : যদি বুঝতে পারি—ছিঁড়ে ফেলো। না পারলে মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিও। (তিনজনের অট্টহাস্য)

লেখক : শুনবে?

অমল, বিমল, কমল : (একসঙ্গে) নিশ্চয়ই!

লেখক : (আবৃত্তি করে) এক—দুই—তিন

এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন

চার—পাঁচ—ছয়

চার—পাঁচ—ছয়—পাঁচ—চার—পাঁচ—ছয়

সাত—আট—নয়

সাত—আট—নয়—আট—সাত—আট—নয়

অমল : তারপর?

লেখক : নয়—আট—সাত—ছয়—পাঁচ—চার—তিন—দুই—এক

বিমল : বলে যাও।

লেখক : আর নেই।

কমল : ফুরিয়ে গেলো?

লেখক : হ্যাঁ, ফুরিয়ে গেলো। (খানিকক্ষণ চুপ। তারপর তিনজনের অট্টহাস্য।)

অমল : বাঃ, খাসা লিখেছো।

বিমল : পাকা হাত তোমার।

লেখক : বুঝতে পারলে?

কমল : অঙ্কের ক্লাসে শোনালে বুঝতাম। কবিতা হলে কী করে বুঝবো? (তিনজনের অট্টহাস্য)

লেখক : একটা নাটক লিখবো ভাবছি।

অমল : হঠাৎ কবিতা ছেড়ে নাটক?

লেখক : হঠাৎ নয়। অনেকদিন ধরেই ভাবছি।

বিমল : লিখে ফেলো। বিশুদাকে ধরে যদি রি-ইউনিয়নে লগিয়ে দিতে পারো—

কমল : বিশুদা বড়ো খুঁতখুঁতে। সনৎ চৌধুরী—ফোর্থ-ইয়ারের—চিনিস? বেশ ভালো নাটকটা লিখেছিলো। বিশুদা বললে—ড্রামাটিক ক্লাইম্যাক্সটা না কি ঠিক মতো বিল্ড করতে পারে নি।

অমল : কী নাটক লিখবে? সামাজিক?

লেখক : সামাজিক মানে?

বিমল : সামাজিক নাটক জানো না? তবে আর কী লিখবে হে?

কমল : সামাজিক মানে—এই যুগের আর কি—মানে আমাদের এই সময়কার—

লেখক : হ্যাঁ আমাদের কথা নিয়েই লিখবো।

অমল : প্লটটা কী?

লেখক : প্লট নেই।

বিমল : আহা, থীমটা কী বলো না!

লেখক : থীম? এই—আমরা!

কমল : আমার বলতে কী বোঝায়?

লেখক : এই—তোমরা, ইন্দ্রজিৎ, আমি—

অমল : আমাদের নিয়ে? তবেই তোমার নাটক লেখা হয়েছে!

বিমল : আমাদের জীবনে আবার নাটক আছে নাকি?

কমল : আমাদের নাটক তো স্ত্রীচরিত্রবর্জিত হয়ে যাবে হে? (তিনজনের অট্টহাস্য)

অমল : বাজে বকছো কেন কমল? তোমার পাশের বাড়ির নায়িকা?

বিমল : হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। কদ্দূর এগুলো কমল?

কমল : আরে আমার তো দূর থেকে জানলা-কাব্য। অমল যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে—খবর রাখো? গত পুজোয় পুরীতে কী হয়েছিলো জিজ্ঞেস করো ওকে!

বিমল : কী ব্যাপার অমল? এসব তো শুনি নি—

অমল : আরে যাঃ, ওসব—

কমল : বল্ না বাবা—অমন করছিস কেন?

(তিনজনে অল্প সরে গিয়ে নিচু গলায় গল্প করতে লাগলো। লেখকও শুনছে, কিন্তু অল্প তফাতে। মানসী একদিক থেকে ঢুকে হেঁটে মঞ্চ পার হয়ে গেলো। তিনজনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো। তারপর তিন মাথা এক করে কীসব কথা হোলো। কথার পর হাসি। মানসী আবার এলো। হাতের ব্যাগ ইত্যাদি আলাদা, হাঁটার ভঙ্গী ভিন্ন—অর্থাৎ অন্য মেয়ে। আবার একই রকম মূকাভিনয়। শুধু হাসিটা আরো জোরে, আরো রসাশ্রিত। এর পর মানসী এলো আর একটি মেয়ে হয়ে। অনাড়ম্বর সাজসজ্জা। সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ। এরা চুপ। চোখে কৌতূহল ও ঈর্ষা। মানসী ইন্দ্রজিৎ গল্প করতে করতে চলে গেলো।)

অমল : দেখেছিস?

বিমল : তাই ভাবি ক'দিন ধরে ইন্দ্রটাকে অন্যরকম লাগছে কেন!

কমল : সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার। কবি দেখলে?

লেখক : দেখলাম।

অমল : কী রকম বুঝলে?

লেখক : মনে হচ্ছে নাটকটা স্ত্রীচরিত্র-বর্জিত হবে না।

বিমল : ইন্দ্রকেই হিরো করে ফেলো। আমাদের মরা সৈনিক করে রেখো।

কমল : হিরোইনটি কে বলতে পারিস?

অমল : কে জানে? ইন্দ্র তো বলে না কিছু আমাদের।

বিমল : হ্যাঁ—দারুণ চাপা ছেলে।

কমল : চাপা নয়—ডাঁট! নিজেকে উঁচু স্তরের জীব মনে করে। ওসব টাইপ চেনা আছে আমার।

অমল : কবি, চেনো নাকি?

লেখক : কাকে?

বিমল : ভাব এসে গেছে নাকি? তোমার নাটকের হিরোইনকে!

লেখক : ওর নাম মানসী।

কমল : অ্যাইদ্দ্যাখো!! কবি চেনে! ইন্দ্র আলাপ করিয়ে দিয়েছে বুঝি?

লেখক : না।

অমল : গুল মারছো কবি?

লেখক : বিশ্বাস করো—এই প্রথম দেখলাম।

বিমল : যাক গে। ইন্দ্র কী বলেছে বলো।

লেখক : ইন্দ্র কিছু বলে নি।

কমল : বটে! প্রথম দেখেছো, ইন্দ্র কিছু বলে নি—শুধু ওর নাম মানসী?

লেখক : ওর নাম আমি জানি না। আমার মনে হোলো মানসী—তাই বললাম।

অমল : যাব্বাবা! এ যে কখন কাব্য করে আর কখন সুস্থ থাকে—বোঝা মুশকিল।

লেখক : নাটকটার কী নাম দেওয়া যায় বলো তো?

বিমল : প্রথমেই নাম?

কমল : তা নাম তো প্রথমেই থাকে। তুমি বলো কবি, তোমার তো নাম দেবার বেশ ন্যাক্ আছে।

লেখক : আমি ভেবেছি—অমল—বিমল—কমল—ইন্দ্রজিৎ ও মানসী।

অমল : এ তো মলাটে কুলোবে না হে!

বিমল : আমাদের আর টানা কেন বাবা? আমরা তো কাটা সৈনিক।

কমল : হ্যাঁ, তার চেয়ে রাখো—ইন্দ্রজিৎ ও মানসী। —চল্ রে, যাবি নাকি?

অমল : কোথায় যাবো?

বিমল : কমল, চা খাওয়াবি?

কমল : খাওয়াবো। চল্।

(তিনজনের প্রস্থান)

লেখক : ইন্দ্রজিৎ ও মানসী। ইন্দ্রজিৎ ও মানসী— (দর্শকদের উদ্দেশ করে বক্তৃতার ভঙ্গীতে) আপনারা জানেন—ইন্দ্রজিৎ আর মানসীকে নিয়ে দেশে দেশে যুগে যুগে বহু নাটক লিখিত হয়েছে। পৌরাণিক. ঐতিহাসিক, সামাজিক, মিলনান্ত, বিয়োগান্ত। কতো নামে, কতো রূপে, সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ইন্দ্রজিৎরা আর মানসীরা এসেছে, ভালোবেসেছে। কত আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ, ঈর্ষা-অভিমান, কত জটিল মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে এদের নাটক গড়ে উঠেছে। ইন্দ্রজিৎ আর মানসীর প্রেম। একটি চিরন্তন নাটকীয় উপাদান।—ইন্দ্রজিৎ!

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

ইন্দ্রজিৎ : কী হোলো, চেঁচাচ্ছিস কেন? (লেখকের নাটকীয় বক্তৃতা ও অতি-নাটকীয় হাঁকের পর ইন্দ্রজিতের কথাটা বড়ো বেসুরো শোনালো। লেখক তবুও নাটক রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলো।)

লেখক : বলো ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ : কী বলবো?

লেখক : তোমাদের কাহিনী। যে কাহিনী চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন, যে কাহিনী মহাভারতের যুগ থেকে আরম্ভ করে—

ইন্দ্রজিৎ : তুই কাব্য ছেড়ে একটু সরল ভাষায় বলবি? কী জানতে চাস? (লেখকের উচ্ছ্বাস অনেকটা কাবু হয়ে এসেছে)

লেখক : তোমার আর মানসীর কথা।
ইন্দ্রজিৎ : মানসী? মানসী কে?
লেখক : যার সঙ্গে দেখলাম তোমাকে পথে হেঁটে যেতে।
ইন্দ্রজিৎ : ও, দেখেছিস বুঝি? তার নাম তো মানসী নয়? তার নাম—
লেখক : দরকার নেই তার নাম। আমি তার নাম দিয়েছি মানসী।
ইন্দ্রজিৎ : তুমি নাম দিলে তো হবে না। বাপ-মা তার নাম দিয়েছে—
লেখক : বাপ-মা যা ইচ্ছে নাম দিতে পারে, তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি বলো।
ইন্দ্রজিৎ : কী বলবো?
লেখক : তোমার আর তার কথা বলবে। সে তোমার কী—তাই বলবে।
ইন্দ্রজিৎ : সে আমার বোন হয়।
লেখক : (অল্প থেমে) বোন?
ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ, মাস্তুতো বোন।
লেখক : মাস্তুতো বোন? কেন?
ইন্দ্রজিৎ : কেন! তার মা আমার মাসীমা বলে।
লেখক : না না, সে—তোমার সঙ্গে কেন!
ইন্দ্রজিৎ : বাড়িতে এসেছিলো, পৌঁছে দিতে গেছিলাম। এরকম তো যাই।
লেখক : ও, তা হলে—ওর নাম তা হলে মানসী নয়?
ইন্দ্রজিৎ : নয়—সে তো আগেই বলেছি।
লেখক : আমার যেন মনে হোলো তোমরা—তোমরা গল্প করছো।
ইন্দ্রজিৎ : করছিলাম তো।
লেখক : খুব নিবিষ্টভাবে গল্প করছো।
ইন্দ্রজিৎ : (হেসে) খুব নিবিষ্টভাবে গল্প করছি মনে হোলো? তা হতে পারে। ওর সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগে। বাড়ি পৌঁছে দেওয়াটা প্রায়ই সোজা রাস্তায় হয় না।
লেখক : গল্প করতে ভালো লাগে? কেন?
ইন্দ্রজিৎ : কেন—তা কী করে বলবো? হয়তো সারাদিন যে আড্ডা চলে, তার থেকে অন্যরকম বলে।
লেখক : ক্রিকেট—রাজনীতি—সাহিত্য নয়?
ইন্দ্রজিৎ : ক্রিকেট—রাজনীতি—সাহিত্য নয়। অন্তত সব সময়ে নয়।
লেখক : কী কথা হয় তা হলে?
ইন্দ্রজিৎ : অনেক কথা হয়। আমাদের কথা, আমার চেনা মানুষদের, আমার বন্ধুদের কথা বলি। ও-ও বলে। ওর বাড়ির কথা, বন্ধুদের কথা, কলেজের গল্প।
লেখক : আর কী?
আর কী? তোর সঙ্গে কী কথা হয়?
লেখক : ক্রিকেট—সিনেমা—রাজনীতি—
ইন্দ্রজিৎ : না, সব সময়ে নয়। আরো অনেক কথা হয়। তোর লেখার কথা। মানুষের কথা। ভবিষ্যতের কথা। নানারকম উদ্ভট ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা।

লেখক : ঐ—পেঙ্গুইন-ক্যাঙ্গারু-এস্কিমোদের কথা?

ইন্দ্রজিৎ : কেন নয়? সবাইকে কি ওসব কথা বলতে পারি?

লেখক : মানসীকে বলতে পারিস?

ইন্দ্রজিৎ : ওর নাম—

লেখক : জানি, ওর নাম মানসী নয়। আমি মানসী বললে তোর কোনো আপত্তি আছে?

ইন্দ্রজিৎ : (হেসে) কোনো আপত্তি নেই। বরং ভালোই লাগছে নামটা। ওর আসল নামটায় অত কাব্য নেই।

লেখক : তবে বল্।

ইন্দ্রজিৎ : কী জিজ্ঞেস করছিলি?

লেখক : আমাকে যা বলিস, ওকে বলতে পারিস?

ইন্দ্রজিৎ : পারি কী—বলেছি! আর অনেক কিছু বলি, যা তোকে বলি না।

লেখক : আমাকে বলতে পারিস না?

ইন্দ্রজিৎ : পারি না তা নয়। বলিনি কখনো। কোনো বিশেষ কথা বলবার আছে তা নয়। এমনি কথা। কতকগুলো চিন্তার কথা। প্রশ্নের কথা। হয়তো কতকগুলো ভালো লাগা, খারাপ লাগার কথা। খুব তুচ্ছ ছোটখাটো ঘটনার কথা।

লেখক : মানসী কি তোর বন্ধু?

ইন্দ্রজিৎ : বন্ধু? হ্যাঁ, বন্ধু। ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। কথা বলে অনেক সময় মন হালকা হয়। এই যে সারাদিন ধরে যা চলে—প্রত্যেকদিন—সারাদিন—(সহসা লেখকের দিকে ফিরে) আচ্ছা তোর কখনো মনে হয় না?

লেখক : কী?

ইন্দ্রজিৎ : এই যে চলছে—তার কোনো মানে নেই? একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে। আর আমরা তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘুরছি আর ঘুরছি—

লেখক : এক—দুই—তিন। এক—দুই—তিন—দুই—এক—দুই—তিন।

ইন্দ্রজিৎ : কী বললি?

(কিন্তু ততোক্ষণে আবহ সঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে—এক—দুই—তিন। অমলের প্রবেশ। প্রফেসর সে।)

অমল : রোল নাম্বার থার্টি-ফোর।

ইন্দ্রজিৎ : ইয়েস্ স্যার।

অমল : হোয়াট ইজ্ দ্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ আয়রন?

ইন্দ্রজিৎ : ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন স্যার।

(অমলের প্রস্থান। বিমলের প্রবেশ।)

বিমল : রোল নাম্বার থার্টি-ফোর।

ইন্দ্রজিৎ : ইয়েস্ স্যার।

বিমল : হু ওয়াজ্ মাৎসিনি?

ইন্দ্রজিৎ : ওয়ান অফ্ দ্য ফাউন্ডারস্ অফ্ মডার্ন ইটালী।

(বিমলের প্রস্থান। কমলের প্রবেশ।)

কমল : রোল নাম্বার থার্টি-ফোর।

ইন্দ্রজিৎ : ইয়েস স্যার।

কমল : ভারতীয় চিত্তের বৈরাগ্যভাব প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে?

ইন্দ্রজিৎ : ভারতীয় চিত্তের পরম অনাসক্তি প্রাচীন সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত অংশের প্রাধান্যের মূল কারণ বলা যেতে পারে। গল্পের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ প্রবাহ প্রতিপদে খণ্ডিত করে বর্ণনা, তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে—

(কমল চলে গেছে। আবহ সঙ্গীত ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিয়েছে। হৈহৈ করে অমলের প্রবেশ।)

অমল : ইন্দ্র আমার প্রক্সিটা দিয়ে দিস। আমি সিনেমায় যাচ্ছি।

ইন্দ্রজিৎ : দেবো।

(অমলের প্রস্থান। বিমলের প্রবেশ।)

বিমল : তোর কেমিস্ট্রি নোটটা এই শনিবার দিতে পারবি একটু?

ইন্দ্রজিৎ : নিয়ে যাস্!

(বিমলের প্রস্থান। কমলের প্রবেশ।)

কমল : তোর কাছে একটা টাকা হবে ইন্দ্র? সোমবার পেয়ে যাবি।

ইন্দ্রজিৎ : আজ নেই সঙ্গে। কাল এনে দেবো।

(কমলের প্রস্থান। মাসীমার প্রবেশ।)

মাসীমা : ইন্দ্র, ভাত বাড়বো?

ইন্দ্রজিৎ : একটু পরে মা।

মাসীমা : আবার পরে কেন? খেয়ে আমায় উদ্ধার করে দিয়ে যাও।

(মাসীমার প্রস্থান। আবহ সঙ্গীত আবার চড়লো, তারপরে শেষ হয়ে গেলো—নয়—আট—সাত—ছয়—পাঁচ—চার—তিন—দুই—এক।)

ইন্দ্রজিৎ : ঘুরছি আর ঘুরছি।

মাসীমা : (নেপথ্যে) ইন্দ্র!

ইন্দ্রজিৎ : যাই মা।

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থান। মাসীমার প্রবেশ।)

মাসীমা : তুই আসবি খেতে?

লেখক : না।

(মাসীমার প্রস্থান। মানসীর প্রবেশ।)

মানসী : পারলে লিখতে?

লেখক : না।

(মানসীর প্রস্থান।)

লেখক : এক—দুই—তিন। অমল—বিমল—কমল। —এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং মানসী। ঘর থেকে স্কুল। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে দুনিয়া। বড়ো হচ্ছে। আর ঘুরছে। ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুরছে। এক—দুই—তিন—দুই—এক। অমল—বিমল—কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।

(অমল-বিমল-কমল-ইন্দ্রজিৎ এসে পরীক্ষা দিতে বসেছে। টুল আর টেবিল। প্রশ্নপত্র আর খাতা। লেখক পাহারা দিচ্ছে ঘুরে ঘুরে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়লো।)

টাইম আপ। স্টপ্ রাইটিং প্লীজ।

(ওরা উর্ধ্বশ্বাসে লিখছে। লেখক একে একে কলমের তলা থেকে খাতা কেড়ে নিলো। ওরা চলে গেলো, অনুচ্চারিত আলোচনা করতে করতে। সংশয়। ভয়। হতাশা।)

লেখক : স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ আর পরীক্ষা। পরীক্ষা আর পাস। তারপর দুনিয়া।

(অমল, বিমল, কমল আর ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

অমল : পাস করলে কী করবি?

বিমল : পাস করি আগে। তারপর ও কথা।

কমল : পাস করি আর ফেল করি—আমাকে চাকরি খুঁজতে হবে। বাবা রিটায়ার করছেন এই বছর।

অমল : চাকরি কি খুঁজলেই মেলে না কি? রোজ তো খবরের কাগজ দেখছি, যুৎসই কিছুই তো পাচ্ছি না।

বিমল : তোর আর কী? আমার তিনটে বোনের বিয়ে দেওয়া বাকি।

কমল : অ্যাদ্দিন বেশ ছিলাম। রেজাল্ট বেরুবার দিনটা ঘনিয়ে আসছে আর গলা দিতে ভাত নামছে না।

লেখক : অমলকুমার বোস। (অমল আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। সকলে তাকে পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানালো।) বিমলকুমার ঘোষ। (একই ব্যাপার) কমলকুমার সেন। ইন্দ্রজিৎ রায়।

(প্রতিবারেই পারস্পরিক অভিনন্দন চললো। মাসীমার প্রবেশ। এক এক করে পায়ের ধুলো নিলো ওরা চারজন। মাসীমা আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। ওরাও চলে গেলো হৈ হৈ করতে করতে।)

এইবার দুনিয়া। ঐ চেয়ার-ক'টাতে বসেন জ্ঞানীগুণী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা। তাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। যাচাই করে দেখেন কে কতো কাজের লোক। আর দরজার বাইরে ঐ লম্বা বেঞ্চিটায় বসে অমল—বিমল—কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।

(অমল-বিমল-কমল ঢুকে বেঞ্চিটার দিকে যাচ্ছে)

না না। এক মিনিট, এক মিনিট।

(ওরা ফিরে গেলো)

ভুলে গিয়েছিলাম। এর আগে একটুখানি আছে। ও চেয়ারগুলো এখানে নেই। বেঞ্চিটা ভুলে যান। এখানে সবুজ ঘাস। ঐগুলো গাছ। আর ঐদিকে—ঐ গাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথার ফাঁকে একটা সিঁদুরে রঙ। রোজ যে সূর্যটা ওঠে, সেটা আজকেও উঠেছিলো। এখন অস্ত যাচ্ছে। ঐখানে, ঐদিকে—ঐ ঝাঁকড়া ডালপালার ফাঁকে—একরাশ সিঁদুরে রঙ।

(এর মধ্যে ইন্দ্রজিৎ আর মানসী ঢুকেছে। বসেছে সবুজ ঘাসে। ঝাঁকড়া-মাথা গাছের নিচে। মানসীর হাতে একটি নতুন বই। লেখক চলে গেলো সিঁদুরে রঙের দিকে চোখ রেখে।)

মানসী : তুমি আমাকে বই দিলে কেন? আমারই তো বই দেবার কথা।

ইন্দ্রজিৎ : কেন?

মানসী : বাঃ! তুমি পাস করেছো—আমিই তো দেবো!

ইন্দ্রজিৎ : কোথায় লেখা আছে আমি পাস করলে তোমাকে দিতে হবে, আমি দিলে চলবে না?

মানসী : লেখা আবার কোথায় থাকবে? তাই নিয়ম।

ইন্দ্রজিৎ : তুমি খুব নিয়ম মানো, না?

মনসী : (হেসে) মানতে আর দাও কই?

ইন্দ্রজিৎ : মানতে চাও?

মনসী! মানতে হয় মেয়েদের।

ইন্দ্রজিৎ : মেয়েদের,—ঐ কথাটা অনেকবার শুনলাম তোমার মুখে। মেয়েদের মানতে হয়। ছেলেদের না মানলে চলে, কিন্তু মেয়েদের মানতে হয়।

মানসী : কথাটা কি মিথ্যে?

ইন্দ্রজিৎ : জানি না। আমিও মানি। বহু নিয়ম মানি। লেখাপড়া করা নিয়ম—মেনেছি। পরীক্ষা দেওয়া নিয়ম, মেনেছি। চাকরি করা নিয়ম—মানবো। কিন্তু একটা কথা বলো তো?

মানসী : কী?

ইন্দ্রজিৎ : সবই তো মানছি। কিন্তু নিয়ম মানাটাই উচিত এ কথাটাও কি মানতে হবে?

মানসী : না মেনে কী করবো?

ইন্দ্রজিৎ : নিয়মটাকে ঘেন্না করবো। অন্তত সেটুকুও তো বাকি থাকা দরকার।

মানসী : কী লাভ হবে?

ইন্দ্রজিৎ : যে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছি, সেটাকে পুজো করেই বা কী লাভ হবে?

মানসী: পুজো কে করতে বলেছে?

ইন্দ্রজিৎ : যদি বলি—দড়িটাই নিয়ম, এবং সেটা মানা উচিত, তবে পুজোর আর বাকি রইলো কী?

মানসী : কী করতে চাও তুমি?

ইন্দ্রজিৎ : জানি না। দড়িটাকে ছিঁড়তে চাই। চারিপাশে এই যে বদ্ধ কানা দেওয়ালগুলো—ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে চাই।

মানসী : কার সঙ্গে তোমার লড়াই?

ইন্দ্রজিৎ : দুনিয়ার সঙ্গে। চারিপাশের লোকগুলোর সঙ্গে। তোমাদের ঐ যাকে সমাজ বলো—সেইটার সঙ্গে, তার ব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে। —লীলার কথা বলেছিলাম তোমায়—মনে আছে?

মানসী : যার স্বামীর টি.বি.?

ইন্দ্রজিৎ : যার স্বামীর টি.বি. ছিল। স্বামী মরে গেছে বেশ ক'দিন হোলো। ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মানসী : তাড়িয়ে দিয়েছে?

ইন্দ্রজিৎ : দিন কতক রেখেছিলো। সামান্য কিছু প্রভিডেন্ট ফান্ড আর ইনসিওরেন্সের টাকা

পাওয়া বাকি ছিল। এখন গয়না যেটুকু ছিল কেড়ে নিয়ে বার করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

মানসী : তারপর?

ইন্দ্রজিৎ : শুনলাম এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতির বাড়িতে উঠেছিলো। এ ব্যক্তিটির একটি দোকান আছে ছোট। শোনা যায় নানাবিধ চোরাই কারবারে তিনি এবং তাঁর দোকানটি লিপ্ত।

মানসী : কী হবে তাহলে ওর?

ইন্দ্রজিৎ : কী হবে নয়, যা হবার হয়ে গেছে। আমি শুনেছি গতকাল, কিন্তু খবরটা তিন মাসের পুরোনো। বলতে পারো এটা কী রকম নিয়ম! (মানসী চুপ)
যে স্টপে আমি বাসে উঠি, ঐখানে একদিন সাত-আট বছরের একটি ছেলে আমায় ধরেছে। জুতোর পালিশ করবে। কোলে একটা বছরখানেকের ছেলে, জুতোর কালিমাখা ন্যাকড়াটা নিয়ে খেলছে। (মানসী চুপ) আমি জুতা পালিশ করাইনি। একটি পয়সাও দিইনি। ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আরো বিরক্ত করলে হয়তো মারতাম।

মনসী : *(ইন্দ্রের হাত চেপে ধরে) কেন?*

ইন্দ্রজিৎ : জানি না। কাকে মারতে হয় আমি জানি না। ওকে মারতে নেই—তা বুঝি। তবু হয়তো মারতাম। ওকে মানতে পারি না যে! যে নিয়মে সাত বছরের ছেলেকে জুতো পালিশ করতে হয়, আর কোলের ভাইকে রাখতে হয়—সে নিয়মটাকে মানতে পারি না।

মানসী : কিন্তু এ তো অন্য কথা?

ইন্দ্রজিৎ : কিসের অন্য কথা? ঐ নিয়মের আর একটা পিঠ তোমার বাড়ি। যে বাড়ির যতো নিয়ম তুমি মেনে চলো, আর বলো—মানতে হয়।

মানসী : (নরম গলায়) তুমি কি আজ আমাকে বকবে?

ইন্দ্রজিৎ : (অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে) তোমাকে যে বকছি না, তা তো তুমি জানো। (মানসী চুপ) জানো না?

মানসী : জানি।

ইন্দ্রজিৎ : তবে কেন এ রকম করে বলো?

মানসী : তোমাকে এই রকম দেখলে আমার কেমন ভয় করে।

ইন্দ্রজিৎ : কী রকম দেখলে?

মানসী : এই—এই রাগ। নিয়মের উপর রাগ।

ইন্দ্রজিৎ : (একটু থেমে) এ রাগের কোনো মূল্য নেই। এ রাগ অন্ধ। অক্ষম। শুধু দেওয়ালে মাথা খোঁড়া।

মানসী : তবে নিজেকে এমন করে ক্ষতবিক্ষত করো কেন?

ইন্দ্রজিৎ : তুমি বাইবেল পড়েছো কিছু?

মানসী : বাইবেল?

ইন্দ্রজিৎ : জ্ঞানবৃক্ষের ফলের গল্প জানো? যে ফল খেয়ে অ্যাডাম আর ঈভ্ স্বর্গচ্যুত হয়েছিলো?

মানসী : জানি।

ইন্দ্রজিৎ : যদি জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেতাম—তোমাদের এই নিয়মের সমাজে স্বর্গবাস করতে পারতাম। এখন আর দেওয়ালে মাথা না খুঁড়ে উপায় নেই। (অল্পক্ষণ চুপ)

মানসী : ইন্দ্র।

ইন্দ্রজিৎ : কী?

মানসী : তুমি তো জানো, আমি খুব বোকা।

ইন্দ্রজিৎ : (হেসে) কী হোলো?

মানসী : আমি অতো কথা বুঝতে পারি না। আমিও দেখি। আমার দুঃখ হয়। মায়া হয়। কিন্তু ওরকম রাগ করতে পারি না।

ইন্দ্রজিৎ : (একটু থেমে) তুমি কি চাও—আমি রাগ না করি?

মানসী : (ভেবে) না। আমি চাই, তুমি যা আছো, তাই থাকো। আমার—আমার শুধু ভয় করে, তাই বললাম।

ইন্দ্রজিৎ : এ রাগ যেদিন ফুরিয়ে যাবে—আমিও ফুরিয়ে যাবো।

মানসী : (আস্তে আস্তে) আমি জানি ইন্দ্র। (তারপর) তুমি যা আছো তাই থাকো। মেনো না। আমার ভয়কেও মেনো না। (চুপচাপ)
এক এক সময় ভাবি—তুমি না থাকলে আমার কী হোতো।

ইন্দ্রজিৎ : কেন?

মানসী : তুমি শুনলে হয়তো রাগ করবে। আমি অনেক কিছু মানতে পারি— তুমি আছো বলে। তুমি না থাকলে আমি হয় তো—রাগ করতাম।

ইন্দ্রজিৎ : তার মানে—আমি তোমার ক্ষতি করেছি?

মানসী : ও কথা বলছো কেন? ও কথা বোলো না। (ইন্দ্র চুপ) আমি বোঝাতে পারি না। তুমি জানো না, তুমি আমার কাছে কী। তুমি আছো বলে কতোটা জোর আমি পাই। বাঁচবার জোর। এ জোর না থাকলে আমি অনেক আগে তলিয়ে যেতাম। (ইন্দ্র শুনছে) কিন্তু আমার জোর রাগ করে নয়। রাগ করতে আমি চাই না। আমার জীবনটাকে ভালো লাগে। অনেক কিছু মানি। মানতে হয়। তবুও ক্ষোভ হয় না। তুমি আছো ভাবলে—অনেক সহজভাবে জীবনটাকে—(হঠাৎ হাল ছেড়ে) আমি বোঝাতে পারছি না।

ইন্দ্রজিৎ : বলো। বলে যাও।

মানসী : না, আমি গুছিয়ে বলতে পারি না। অন্য কথা বলো।

ইন্দ্রজিৎ : অন্য কথাই তো হচ্ছিলো।

মানসী : এই বইটা পড়ে বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দেবে? (ইন্দ্র মানসীর দিকে চেয়ে রইলো) কী, কথা বলছো না যে?

ইন্দ্রজিৎ : আমি যেদিন চাকরি পাবো, তার পরদিন তোমাকে বিয়ে করবো।

মানসী : না।

ইন্দ্রজিৎ : দেখো তুমি!

মানসী : আমি তোমার মাসতুতো বোন, সে কথা মনে আছে?

ইন্দ্রজিৎ : মনে না থেকে উপায় আছে? যতোবার বিয়ের কথা বলি, ততোবার মনে করিয়ে দাও।

মানসী : আর ততোবার তুমি বলো—মানি না।

ইন্দ্রজিৎ : মানি না-ই তো। কেন মানবো? কিছু মানবো না।

মানসী : আমাকেও না?

ইন্দ্রজিৎ : তোমাকে মানি। তোমার নিয়মগুলো মানি না।

মানসী : আমাকে তুমি বেশিদিন সহ্য করতে পারবে না।

ইন্দ্রজিৎ : এই আর একটা কথা তোমার!

মানসী : হ্যাঁ, সত্যি। আমি খুব সাধারণ মেয়ে।

ইন্দ্রজিৎ : আর আমি খুব অসাধারণ ছেলে।

মানসী : কী জানি? তুমি সতিাই বোধ হয় খানিকটা অসাধারণ।

ইন্দ্রজিৎ : শুনে খুশি হলাম।

মানসী : ইঃ। মোটেই অসাধারণ নয়!

ইন্দ্রজিৎ : তাহলে তো চুকেই গেলো ঝামেলা।

মানসী : কী চুকে গেলো?

ইন্দ্রজিৎ : সাধারণ ছেলে সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করলে কোনো ঝামেলা নেই।

মানসী : কিচ্ছু চুকে যায়নি। চলো, বাড়ি চলো।

ইন্দ্রজিৎ : না যাবো না।

মানসী : দেরি হচ্ছে না?

ইন্দ্রজিৎ : হোক।

মানসী : ভারি মজা, না? তোমার জন্যে রাতদিন আমায় বকুনি খেতে হয় বাড়িতে।

ইন্দ্রজিৎ : কিসের বাড়ি? বাড়ি চুলোয় যাক।

মানসী : এই আবার শুরু হোলো! না, চলো ওঠো!

ইন্দ্রজিৎ : (উঠে) চলো।

মানসী : ওঃ, রাগ দেখাচ্ছে আবার! তোমার রাগকে আমি ভয় করি নাকি?

ইন্দ্রজিৎ : চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে বকুনি খাবে।

মানসী : যাবো না।

ইন্দ্রজিৎ : তবে আমি বসলাম।

মানসী : (উঠে) এই—না না। চলো। (ইন্দ্র মানসীর কাঁধে বাহু জড়িয়ে নিলো। মানসী হাতটা নামিয়ে দিলো।) কী হচ্ছে, এটা পার্ক না?

ইন্দ্রজিৎ : পার্ক তো কী?

মানসী : (চাপা গলায়) ঐ দেখো—একজন ঐ গাছটার পাশে।

(ওরা ওঠবার পরে লেখক এসে একপাশে আধো অন্ধকারে বসে ছিল)

ইন্দ্রজিৎ : তাতে কী হয়েছে?

মানসী : দেখছে না?

ইন্দ্রজিৎ : দেখুক। ভালো করে দেখুক।

(আবার মানসীর কাঁধে হাত জড়িয়ে নিলো। মানসী ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে গেলো। ইন্দ্র

হাসতে হাসতে পিছন পিছন গেলো। লেখক এগিয়ে এলো সামনে।)

লেখক : ইন্দ্রজিৎ ও মানসী। ঘুরতে ঘুরতে ওরা অনেক দূর চলে এসেছে। অনেক দূর? চলে এসেছে? না ঘুরছে? শুধু ঘুরছে? ওরা বিয়ে করতে পারে। তারপর? ঘুরবে। ওদের বিয়ে না হতেও পারে। তাহলে? ঘুরবে। এক—দুই—তিন—চার—তিন—দুই—এক। এ এক অঙ্ক। আবর্তনের অঙ্ক। পুরো অঙ্কটার উত্তর শূন্য। তাই পুরো অঙ্কটা কেউ নেয় না। কেটে ছোট করে নেয়। উত্তর হয়—জীবন। এক এক জনের এক এক রকম জীবন।

দিকে দিকে থাক ঐতিহাসিক পাথুরে নয়ন মেলা,
ছন্দবাঁধনে আবর্তনের চলুক অনাদি খেলা,
আলো আঁধারির চক্রধাঁধায় কালের শোণিতধ্বনি
দিবারাত্রের খণ্ডচয়নে গেঁথে যাক বন্ধনী,
অজানা দিশায় আগামী অতীত ভুলে যাক সন্ধান,
আমি তো বর্তমান।
কী হবে মিথ্যা সূক্ষ্ম হিসাবে পুরোনো সংখ্যা গুণে?
কী হবে স্বপ্নে ভবিষ্যতের তন্তু-আঁচল বুনে?
রাত্রিদিনের ছন্দে কখনো যাবে না তো কেটে তাল,
বৃথা কেন তবে মনের দেউলে ভরে তোলা জঞ্জাল?
হৃৎস্পন্দন সময়ের তালে বেঁধে নিতে যদি পারো
পরোয়া থাকে না কারো।

(অমল-বিমল-কমলের প্রবেশ)

দাঁড়াও। এখন না। এখনো সময় আসে নি।

(অমল-বিমল-কমলের প্রস্থান)

এক মুহূর্ত। এক মুহূর্ত—আবর্তনকে অস্বীকার করো। পুরো অঙ্কটা অস্বীকার করো। এক মুহূর্ত। একটি বর্তমান মুহূর্ত। জীবন।

নির্বোধ মনে অবুঝ অঙ্কে তবু উত্তর খোঁজা,
তবু সংখ্যার চক্ররাশিতে ভারি করে তোলা বোঝা।
অনেক দিনের হিসাবে শূন্য—সে কথা যায় না মানা,
অল্পদিনের ক্ষুদ্র গণনে তাই তো গণ্ডী টানা।
প্রকৃতিপত্রে শিশু অক্ষরে জীবনের ভাষা তাই
এখনো তো লিখে যাই।

(কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের কাছের আলো কমে আসছে। পিছনে সেই তিনটি চেয়ার আর দরজার বাইরের বেঞ্চি—সেইখানে জোরালো সাদা আলো। আবৃত্তি শেষ করে লেখক চলে গেছে। অমল, বিমল, কমল ও ইন্দ্রজিৎ এসে বেঞ্চিতে বসেছে। ওদের পোশাক ফিটফাট। ভঙ্গী আড়ষ্ট, কঠিন। ঘণ্টা বাজলো। অমল উঠে ঘরে ঢুকলো। নমস্কার করলো চেয়ারে বসা অদৃশ্য জ্ঞানী গুণী বিচক্ষণ ব্যক্তিদের। অনুমতি পেয়ে বসলো উল্টো দিকের চেয়ারের কিনারায়। মূক প্রশ্নের মূক উত্তর দিয়ে চললো একে একে। বাইরে বেঞ্চিতে অন্যরা তখন কথা বলছে।)

বিমল : ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের নামগুলো সব ক'টা জানিস?

কমল : না, আমি ওসব দেখে আসিনি।

বিমল : ইয়ারবুকটা নিয়ে এলেই হোতো।

কমল : কী আর হোতো? কতো আর দেখতিস?

বিমল : ক'টা বাজে রে ইন্দ্র?

ইন্দ্রজিৎ : বারোটা কুড়ি।

কমল : এগারোটা থেকে বসিয়ে রেখে বারোটায় বাবুরা এলেন ইন্টারভিউ নিতে।

বিমল : এসব লোক দেখানো। আসল লোক ঠিক করা আছে।

কমল : কে বল্ তো? অমলের আগে যার হোলো?

বিমল : কে জানে? আমরা নই, এইটুকু জানি।

কমল : অমল কতক্ষণ গেছে রে?

ইন্দ্রজিৎ : মিনিট পাঁচেক হবে।

বিমল : কী অতো জিজ্ঞেস করছে রে বাবা।

(ভিতরে অমল উঠেছে। দরজার দিকে আসতে গিয়ে চেয়ারের ধমক খেয়ে বোকা হাসি হেসে অন্য দিকে বেরিয়ে গেলো।)

কমল : টেকনিক্যাল প্রশ্ন খুব করে নাকি?

বিমল : বেশি করে না। আসলে উত্তরটা তো দেখে না, কেমন ভাবে বলছো সেইটা দেখে।

কমল : হ্যাঁ, না জানা থাকে—স্মার্টলি 'আই ডোন্ট নো' বলে দিতে হয়।

ইন্দ্রজিৎ : 'আই ডোন্ট নো' কথাটা স্মার্টলি বলা খুব শক্ত।

(ঘণ্টা। বিমল ভিতরে গেলো। এরা বেঞ্চিতে সরে সরে বসলো। ভিতরে বিমলের একই রকম মূকাভিনয়।)

কমল : গলাটা একটু ধরে আছে। তোর কাছে লবঙ্গ আছে?

ইন্দ্রজিৎ : না। (কমল সিগারেট বার করলো) গলা ধরেছে—সিগারেট খাবি?

কমল : ঠিক হবে না খাওয়াটা—না? (সিগারেট রেখে দিলো)

তুই এর আগে কটা ইন্টারভিউ দিয়েছিস?

ইন্দ্রজিৎ : পাঁচটা।

কমল : তুই মেরে আছিস। আমার এইটে নিয়ে চারটে হবে। খবর পেয়েছিস কোনোটার?

ইন্দ্রজিৎ : একটার রিগ্রেট লেটার পেয়েছি।

কমল : (অল্প থেমে) আসছে মাসে বাবা রিটায়ার করছেন।

(ইন্দ্রজিৎ কথা বললো না। লেখকের প্রবেশ। মৃদু হেসে বেঞ্চিতে বসলো ইন্দ্রজিতের পরে। অল্পক্ষণ নীরবতা)

কমল : ক'টা বাজে রে?

ইন্দ্রজিৎ : সাড়ে বারোটা।

কমল : আপনাকে ক'টায় ডেকেছে?

লেখক : এগারোটায়। আমার আর একটা ইন্টারভিউ পড়ে গেলো আজকেই—সাড়ে দশটায়। এটার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম—একটা চান্স নিলাম আর কি?

কমল : ডাক পড়েনি তো?

লেখক : না, জোর পেয়ে গেছি!

কমল : লাক্ আছে আপনার।

(ভিতরে মূকাভিনয় শেষ করে বিমল অন্যদিক দিয়ে চলে গেলো এর মধ্যে। ঘণ্টা। কমল ভিতরে গেলো।)

লেখক : সিগারেট?

ইন্দ্রজিৎ : আমি খাই না—থ্যাঙ্কস্।

লেখক : (সিগারেট ধরিয়ে) কী জিজ্ঞেস করছে—কিছু শুনলেন?

ইন্দ্রজিৎ : না, ওদিক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

লেখক : তাই করে য়ুজুয়ালী। প্রশ্নের স্টক তো কম থাকে বেটাদের!

ইন্দ্রজিৎ : আপনার আগের ইন্টারভিউটা কেমন হোলো?

লেখক : খুব সুবিধের হয় নি। হবে না বোধ হয়। চাকরিটা ভালো ছিল।

ইন্দ্রজিৎ : সেই জন্যেই বুঝি এটা ছেড়ে ঐটায় গিয়েছিলেন?

লেখক : হ্যাঁ, কিন্তু কী জানেন? পলিসিটা বোধ হয় ঠিক নয়। চাকরি পাওয়াটাই যখন বেশি দরকার তখন খারাপ চাকরিটার ইন্টারভিউই আগে দেওয়া উচিত। যেটার বেশি চান্স।

ইন্দ্রজিৎ : এখন তো দু'টোই হয়ে গেলো।

লেখক : সেটা লাকের ব্যাপার। না হলে এই আপসোসে তিনরাত ঘুম হোতো না। চাকরি যে একটা কী ভীষণ দরকার আপনি জানেন না।

ইন্দ্রজিৎ : (হেসে) চাকরি তো সকলেরই দরকার।

লেখক : সে কথা একশোবার। মানে—জেন্যার্লি। কিন্তু আমরা পার্টিকুলারলি—বলেই ফেলি আপনাকে। ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ফেলেছি ধার করে। কম ভাড়ায় সুবিধেমতো ফ্ল্যাট তো বসে থাকবে না আমার জন্যে? এটার—আর কিছু না হোক—জল কলটা আলাদা।

ইন্দ্রজিৎ : বুঝলাম না ঠিক।

লেখক : মানে বিয়ে করছি আর কি। বাবার অমতে। চাকরি একটা এই মাসের ভিতরে না পেলে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হবে। বুঝছেন অবস্থাটা? ধার করে আর ক'দিন বাড়িভাড়া গোনা যায়?

(কমলের শেষ হয়েছে। সে বাইরে গেছে। তারপর অমল-বিমল-কমল একসঙ্গে ফিরে তিনটি চেয়ার দখল করে বসলো। জ্ঞানী-গুণী-বিচক্ষণ তিনটি ব্যক্তি। লেখকের কথা শেষ হতে অমল ঘণ্টা বাজালো, ইন্দ্রজিৎ ভিতরে গেলো। এবার আর একজনের মূকাভিনয় নয়। চেয়ার তিনটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—কণ্ঠে নয়, অঙ্গভঙ্গীতে। লেখক অল্পক্ষণ একা বসে সিগারেট খেলো। তারপর সিগারেট ফেলে সামনে এগিয়ে এলো।)

লেখক : অমল রিটায়ার করে। তার ছেলে অমল চাকরি করে। বিমল অসুখে পড়ে। তার ছেলে বিমল চাকরি করে। কমল মারা যায়। তার ছেলে কমল চাকরি করে। এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং ইন্দ্রজিতের ছেলে ইন্দ্রজিৎ। ঐখানে ফুটপাথে একটা সাত

বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতে কাঠের বাক্স, কোলে একটা এক বছরের ভাই। ঐখানে ফুটপাথে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার নাম লীলা। ঐদিকে আকাশে সিঁদুরে রঙ। তার নিচে বসে মানসী জীবনকে ভালবাসতে চায়। অনেকগুলো জীবন। অনেক জানা অজানা অচেনা অজ্ঞতা আলো অন্ধকার। খণ্ড খণ্ড টুকরো টুকরো অণু পরমাণু সব যোগ করে নাগরদোলার পরম আবর্তন।

নাগরদোলার আবর্ত-ছাঁদে গড়া
আমি এলোমেলো আকাশে এনেছি নেশা
অজ্ঞ বাতাস চেতনার বিষে মেশা,
না জানা ছন্দে ভাঙাচোরা বোঝাপড়া!

এদের কথা আমাকে বলতে হবে। এদের নাটক আমাকে ভাষায় গাঁথতে হবে।

ভাষা তো প্রাচীন, ক্ষতবিক্ষত কথা,
আলো দিশাহারা শিথিল অপ্রকাশে,
সমাধি মৌন জড়তার নাগপাশে,
চিতাবহ্নিতে প্রদীপ্ত বাচালতা।

(ইন্দ্রজিৎ শেষ করে চলে গেছে। আবার ঘণ্টা।)

ঘণ্টা বাজছে। একটি পরমাণু খসে গেছে। আর একটি পরমাণুকে ডাকছে। তিনটি পরমাণু ডাকছে। আরো রাশি রাশি পরমাণু মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে বিরাট এক পৃথিবী ঘুরছে আর ঘুরছে। আর একের পর এক সেকেন্ড মিনিট ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। (আবার ঘণ্টা। অমল-বিমল-কমল অধৈর্য।) ঘণ্টা বাজছে। আবার বাজবে। তবু পৃথিবী আছে। তবু শতাব্দী আছে। আমার পৃথিবী! আমার শতাব্দী! নাগরদোলা চুলোয় যাক। আমরা আছি। অমল বিমল কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ। এবং আমি। আমরা আছি। এখন আছি। পৃথিবীতে আছি। (অমল বিমল কমল অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন ঘণ্টা দিচ্ছে। কিন্তু ওদের ওখানে আবছায়া। তীব্র সন্ধানী আলো লেখককে কুড়িয়ে নিয়েছে।)

আমি বিভক্ত, আমি অণুখণ্ডিত,
গুঁড়ো দিয়ে গাঁথা জটিল ঐক্যতান।
বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান,
চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত!

(দপ করে আলো নিভে গেলো। মঞ্চ অন্ধকার। ছায়ার মতো যবনিকা সরে আসছে অন্ধকারে। একটা চাপা মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি চলছে—)

মিলিত কণ্ঠ : বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান॥
চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত।
বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান,
চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(গোটা চারেক ছোট টেবিল ও চেয়ার একঘেয়েভাবে সাজানো। পেছনে বড়ো চেয়ার, বড়ো টেবিল, টেলিফোন। লেখক চেয়ার টেবিল ঝাড়ছে। ঝাড়া মানে একটি পালকের ঝাড়ু দিয়ে এক এক ঘা দিয়ে যাওয়া। তার চেহারা বা পোশাকের কোনো বদল হয় নি। ঝাড়া শেষ করে সামনে এলো।)

লেখক : ঘর থেকে স্কুল। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে দুনিয়া। দুনিয়া একটি অফিস। এইরকম একটা অফিস। এখানে অনেক কাজ হয়। বড়ো বড়ো দরকারী কাজ। এখানে অনেক মানুষ কাজ করে—অমল বিমল কমল ইন্দ্রজিৎ।

(অমল বিমলের প্রবেশ)

অমল : আটটা বাহান্নো আজ লেট করেছে দশ মিনিট।

বিমল : শেয়ালদায় আজ ট্রাম আটকে ট্রাফিক জাম।

(কমল ইন্দ্রজিতের প্রবেশ। অমল বিমল বসেছে।)

কমল : ন'টা তেরো আজও ফেল করলাম।

ইন্দ্রজিৎ : দু'টো বাস ছাড়তে হোলো, পা রাখবার জায়গা নেই। (কমল ইন্দ্রজিৎ বসলো।)

অমল : (বিমলকে) ছেলে কেমন আছে?

বিমল : একটু ভালো। (কমলকে) মেয়ে ভর্তি হোলো?

কমল : কই আর হোলো? (ইন্দ্রজিৎকে) কলমটা পাওয়া গেলো?

ইন্দ্রজিৎ : নাঃ, পকেট মারই গেছে।

অমল : হরিশ!

বিমল : হরিশ!

কমল : হরিশ!

ইন্দ্রজিৎ : হরিশ!

অমল : (গলা চড়িয়ে) হরিশ!

লেখক : বলুন।

অমল : জল দাও এক গ্লাস।

বিমল : (গলা চড়িয়ে) হরিশ!

লেখক : বলুন।

বিমল : পান নিয়ে এসো—জর্দা।

কমল : (গলা চড়িয়ে) হরিশ!

লেখক : বলুন।

কমল : দু'টো সিগারেট—কাঁচি।

ইন্দ্রজিৎ : (গলা চড়িয়ে) হরিশ!

লেখক : বলুন।

ইন্দ্রজিৎ : চিঠিটা ডাকে ফেলে দিও।

(লেখক নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি। এরাও কেউ তাকে পয়সা বা চিঠি কিছু দেয়নি। এমনকি তার দিকে তাকায়ওনি।)

অমল : পকেটমারের যা উপদ্রব শুরু হয়েছে। সেদিন ধর্মতলার ট্রামে মৌলালির স্টপেজটা ছাড়তেই—

বিমল : হোমিওপ্যাথি যদি করাতে চাও তো—কানাই ভট্টাচার্যি! আমার ভগ্নীপতির ক্রনিক ডিসেন্ট্রি—আজ প্রায়—

কমল : ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হবে—তার অ্যাডমিশন টেস্টের ঘটা কী! ইংরিজি—বাংলা—অঙ্ক—আবার বলে বার্থ সার্টিফিকেট না দেখালে বয়স—

(হঠাৎ লেখক ঘ্যাট ম্যাট করে মঞ্চ পরিক্রমা করে বড়ো টেবিলের দিকে রওনা দিলো। অমল বিমল কমল ইন্দ্রজিৎ অর্ধেক উঠে কপাল চুলকে আবার বসলো। লেখক চেয়ারে বসতেই টেলিফোন।)

লেখক : হ্যালো! হ্যালো! ইয়েস! অর্ডার! চালান! ডেলিভারি! ফিফটিন্ পার্সেন্ট! ইয়েস! বাই! (পরপর কয়েকটা ফাইল ইন থেকে নিয়ে সই করে আউটে ফেললো। আবার আউট থেকে নিয়ে ইনে ফেললো। অমল গিয়ে ফাইলে সই করিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এসে বসলো। তারপর বিমল। তারপর কমল। তারপর ইন্দ্রজিৎ। আবার ফোন।) হ্যালো—হ্যালো—ইয়েস—অর্ডার—চালান—ডেলিভারি—ফিফটিন্ পার্সেন্ট—ইয়েস—বাই। (আবার ইনের ফাইল সই করে আউটে)

অমল : হরিশ!

বিমল : হরিশ!

কমল : হরিশ!

ইন্দ্রজিৎ : হরিশ!

(লেখক বেরিয়ে এসে পালকের ঝাড়ু দিয়ে হরিশের টুল ঝেড়ে বসলো। ওরা গলা চড়িয়ে হাঁকলো।)

অমল : হরিশ!

বিমল : হরিশ!

কমল : হরিশ!

ইন্দ্রজিৎ : হরিশ! (লেখক উঠে এক এক করে সকলের কাছে গেলো।)

লেখক : বলুন। বলুন। বলুন। বলুন।

অমল : বিমলবাবু—

(লেখক অমলের ফাইল বিমলকে দিলো, বিমল সেটা রেখে আর একটা দিলো।)

বিমল : কমলবাবু— (লেখক বিমলের ফাইল কমলকে দিলো)

কমল : নির্মলবাবু—

লেখক : নির্মলবাবু তো রিটায়ার করে গেলেন স্যার!

কমল : ওহো! ইন্দ্রজিৎবাবু। (লেখক কমলের ফাইল ইন্দ্রজিৎকে দিলো)

ইন্দ্রজিৎ : অমলবাবু।

অমল : বিমলবাবু।

বিমল : কমলবাবু।

কমল : ইন্দ্রজিৎবাবু।

(এমনি বার তিনেক চললো। প্রত্যেকবার আগের বারের থেকে দ্রুতগতিতে। লেখক শেষবারে চর্কিপাক খাচ্ছে। ঘণ্টা বাজলো। লেখক ছুটে ভিতরে গেলো। বড়ো সাহেবের হুকুম নিয়ে বেরুলো।)

অমল : হরিশ!

বিমল : হরিশ!

কমল : হরিশ!

ইন্দ্রজিৎ : হরিশ!

লেখক : বড়ো সাহেবের চা আনতে যাচ্ছি স্যার।

অমল : ও!

বিমল : ও!

কমল : ও!

ইন্দ্রজিৎ : ও! (লেখক কিন্তু চা আনতে গেলো না। ঘুরে সামনে চলে এলো।)

লেখক : ফাইলের পর চা। তারপর ফাইল। তারপর টিফিন। তারপর ফাইল। তারপর চা। তারপর টিফিন। তারপর ট্রাম বাস ট্রেন। আরো বড়ো অফিস আছে। সেখানে আরো দরকারী কাজ হয়। সেখানে ফাইলের পর টী। তারপর ফাইল। তারপর লাঞ্চ। তারপর ফাইল। তারপর টী। তারপর ফাইল। তারপর হিন্দুস্থান—ফিয়াট—স্ট্যান্ডার্ড।

অমল : হ্যালো ঘোষ—ওল্ড বয়—ক্লাবে যাচ্ছো আজ?

বিমল : না, আজ বাড়ি যেতে হবে। মিসেস্ একটা পার্টি দিচ্ছেন তাঁর ওল্ড ফ্রেন্ডস্‌দের।

কমল : হ্যালো রয়—ওল্ড বয়—গাড়িটা বেরুলো গ্যারেজ থেকে?

ইন্দ্রজিৎ : আর বোলো না! ক্লাচপ্লেট জ্বলে গেছে। ট্যাক্সিরও যা হাল—পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগালো চাকরটা আজ সকালে। (লেখক ততোক্ষণে ভিতরে বড়ো সাহেবের টেবিলে বসেছে। এদের কথা শেষ হতে টেলিফোন।)

লেখক : হ্যালো—ইয়েস—বোর্ড অফ ডায়রেক্টর্স—কন্‌ফারেন্স—বাজেট—অ্যানুয়াল রিপোর্ট—ইয়েস্—ইয়েস্—বাই। মিস্ ম্যালহোত্রা!

(মানসী শর্টহ্যান্ডের খাতা-হাতে ঢুকলো)

মানসী : ইয়েস স্যার।

লেখক : (পায়চারি করতে করতে) with reference to your above letter–in connection with the above matter–I would request you–I shall be obliged if–forward us at your earliest convenience–let this office know immediately–15th ultimo–25th instant–thanking you–assuring you of our best co-operation–yours sincerely–sincerely yours. (টেলিফোন) হ্যালো—ইয়েস্—ইয়েস—বোর্ড অফ ডায়রেক্টর্স—কন্‌ফারেন্স—বাজেট—অ্যানুয়াল রিপোর্ট—ইয়েস্—ইয়েস্—ইয়েস্—বাই। দ্যাট্‌স্ অল মিস্

(মানসী চলে গেলো। লেখক বেরিয়ে সামনের দিকে এলো।)

দ্যাট্‌স অল মিস্ ম্যালহোত্রা। দ্যাট্‌স অল লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। দ্যাট্‌স অল।

অমল : দ্যাট্‌স অল!

বিমল : দ্যাট্‌স অল!

কমল ! দ্যাট্‌স অল!

(সকলে কোরাসে 'দ্যাটস অল' বলছে—দু'হাত ছুঁড়ে, শুধু ইন্দ্রজিৎ চুপ। ইন্দ্রজিতের নীরবতা নজরে পড়তে অমল বিমল কমল প্রথমে থেমে গেলো। তারপর একসঙ্গে অট্টহাস্য করে উঠলো।)

অমল : বাক্ আপ ওল্ড বয়!

বিমল : চিয়ারিও ওল্ড বয়!

কমল : অল দ্য বেস্ট ওল্ড বয়!

(এক এক করে ইন্দ্রজিতের পিঠ চাপড়ে অলম বিমল কমল চলে গেলো। ইন্দ্রজিৎ বসে রইলো। লেখক ঘুরে পিছনে গেলো। ঝাড়ু চালাতে লাগলো। ইন্দ্রজিৎ অন্যমস্কভাবে ফাইল ঘাঁটতে লাগলো।)

লেখক : কিছু খুঁজছেন স্যার?

ইন্দ্রজিৎ : অ্যাঁ? হ্যাঁ, খুঁজছি।

লেখক : কী, বলুন?

ইন্দ্রজিৎ : আর কিছু!

লেখক : কী বললেন স্যার?

ইন্দ্রজিৎ : অ্যাঁ? না, কিছু বলিনি। আর কিছু নেই। এই-ই সব, তাই না?

লেখক : ঠিক বুঝলাম না স্যার। কী পাচ্ছেন না!

ইন্দ্রজিৎ : কিছুই পাচ্ছি না হরিশ। ছেড়ে দাও ওকথা। কাল সকালে এই ফাইলটা অমলবাবুর টেবিলে দিও, এইটা বিমলবাবুকে, এইটা কমলবাবু—আর এইটাতে বড়ো সাহেবের সই হবে। আমি কাল না-ও আসতে পারি।

লেখক : শরীর খারাপ নাকি স্যার?

ইন্দ্রজিৎ : শরীর খারাপ? হ্যাঁ, শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে কাল। চললাম।

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থান)

লেখক : অমল চলে গেছে। বিমল চলে গেছে। কমল চলে গেছে। ইন্দ্রজিৎ বসে ভাবছে। ইন্দ্রজিৎ চলে গেছে। আমি বসে ভাবছি। আমি—

আমি। বসে ভাবি। শুধু ভাবি।
শুধু ভাবি বসে আমি খণ্ডিত উপকথা,
অসম্ভাব্য বায়বীয় পূর্ণতা।
সমাপ্তি যদি মেশে বিলোপের গানে,
অর্ধচেতনা তবু কেন আনে
ঝংকৃত মুখরতা?
পৃথিবীর গুঁড়ো বাতাসে ছড়ানো ধুলো
সময়ের কুলো বাছে!

জীবনের বীজ ধুলোতে কি মিশে আছে?
কী হবে কুড়িয়ে ছাঁকা ভবিষ্যকণা?
এ মাটি পুরোনো। রিক্ত আকাশ।
বৃথা পরিকল্পনা।
আমি। বসে ভাবি। আজো ভাবি।
আজো কেন তবু ভাবি পুরো মানুষের কথা?
অংশ-চেতনা আজো কেন খোঁজে লিখনের অন্যথা?

(মাসীমার প্রবেশ)

মাসীমা : তুই এখানে? আমি খুঁজে মরছি। এখানে বসে কী করছিস?

লেখক : ভাবছি, বসে ভাবছি।

মাসীমা : কী ভাবিস এতো ছাইভস্ম?

লেখক : ভাবি—আমরা কে?

মাসীমা : এর আবার ভাবার কী আছে? তোরা—তোরা। আবার কে?

লেখক : তা বটে। আমরা—আমরা। এটা আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু আমরা—কী?

মাসীমা : শোনো কথা। আমরা কী! তোরা সব হীরের টুকরো ছেলে। অতোগুলো পাস দিয়েছিস, ভালো ভালো চাকরি করছিস।

লেখক : ঠিক বলেছো! হীরের টুকরো। 'টুকরো' অবধি আমি ধরতে পেরেছিলাম। হীরেটা কিছুতেই মাথায় আসছিলো না।

মাসীমা : কী যে হেঁয়ালি বকিস!

লেখক : হেঁয়ালিই তো। ধাঁধা। দু'টো পেরেছো, এইবার আর একটা বলো দেখি। এটা অতো সোজা হবে না।

মাসীমা : কী বলবো?

লেখক : আমরা—কেন?

মাসীমা : তোরা কেন? তার মানে?

লেখক : মানে—আমরা আছি কেন?

মাসীমা : বালাই ষাট—থাকবি না কেন? তোরা আছিস বলে কার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে শুনি?

লেখক : উঁহু উঁহু—হোলো না। ওটা লজিক হোলো না।

মাসীমা : কে তোর লজিকের ধার ধারে? যতো সব অলক্ষুণে কথা। বিয়ে না করলেই ঐসব উদ্ভুট্টে কথা মাথায় আসে।

লেখক : বিয়ের কথা এলো কোত্থেকে?

মাসীমা : না, বিয়ের কথা আসবে কেন? আসবে যতো সমস্ত কে কী কেন কবে কোথায়। বিয়ে করবি নে কেন—সে প্রশ্নটার জবাব দিতে পারিস?

লেখক : শক্ত প্রশ্ন! করবো কেন—সেইটার জবাব বার করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

মাসীমা : শোনো কথা—করবো কেন! সবাই করছে, তুই করবি না কেন?

লেখক : এই পেয়ে গেছি! সব্বাই করছে।

কেন তুমি হাঁচবে? কেন তুমি কাশবে?

দাঁত ক'টি মেলে ধরে কেন মধু হাসবে?

কেন তুমি দেবে তুড়ি, ওরা যদি তোলে হাই?

সব্বাই করে বলে, সব্বাই করে তাই!

মাসীমা : এই কাব্যি শুরু হোলো। আমি চললাম। (লেখক পথ আটকে দাঁড়ালো)

লেখক : কাব্যির নাম শুনে কেন তুমি পালাবে?

কেন রোজ রেডিওটা অতো জোরে চালাবে?

কেন তুমি ডালে দেবে আটখানা লঙ্কাই?

সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই!

মাসীমা : ডালে আবার আটখানা লঙ্কা কবে দিলাম?

লেখক : কেন তুমি ঘড়ি ধরে অফিসেতে ছুটবে?

কেন তুমি তরকারি বঁটি দিয়ে কুটবে?

তেল দিতে কেন বাছো অন্যের চরকাই?

সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই!

মাসীমা : কী যে পাগলামি করিস—আমি বুঝে উঠতে পারি না। বিয়ে-থা করলে এসব ক্ষ্যাপামি ঘুচে যেতো দু' দিনে।

(মাসীমার প্রস্থান)

লেখক : বিবাহ। জন্ম বিবাহ মৃত্যু। জন্মের পর বিবাহ। তারপর মৃত্যু। অনেকদিন আগে একটা সুন্দর গল্প পড়েছিলাম। আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না। গল্পটার বেশির ভাগ ভুলে গেছি। একজন রাজপুত্র ছিল মনে আছে। আর একটা রাজকন্যা। অনেক সব ব্যাপারের পর তাদের বিয়ে হোলো। তারপর—তারপরেই আসল কথাটা—তারপর তারা সুখে রাজত্ব করতে লাগলো। রাজত্ব—কিংবা সংসার—অথবা ঘরকন্না—কথাটা কী ছিল মনে পড়ছে না। কিন্তু সুখে। এতো সুখ যে তা নিয়ে আর গল্পই হয় না।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি। মানসীর মাথায় কাপড়। সলজ্জা নববধূ। মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।)

বিবাহ। একটি পুরুষ এবং একটি নারী। দম্পতি—জম্পতি—জায়াপতি। সহজ ভাষায়—বর-কনে।

(অমলের প্রবেশ। নূতন বিবাহের সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা।)

অমল : একটু সুপুরি দাও তো।

মানসী : ঐ তো রয়েছে তাকে। নিয়ে নিতে পারো না?

অমল : কোথায় রয়েছে—ও আমি খুঁজে পাবো না।

মনসী : আহা, খুঁজে পাবো না। এতোদিন কে দিতো, শুনি?

অমল : এতোদিন কি কেউ ছিল আমার?

মানসী : আঃ চুপ করো! কে শুনতে পাবে।

অমল : শুনতে পাবে? তাহলে কানে কানে বলি—

মানসী : কী হচ্ছে কী? তুমি যাও তো এঘর থেকে। কখন কে এসে পড়বে তার ঠিক নেই।

(অমলের প্রস্থান)

লেখক : দম্পতি—জম্পতি—জায়াপতি। সহজ ভাষায়—স্বামী-স্ত্রী।

(মানসীর ঘোমটা খসেছে। ভঙ্গিতে সংসারী স্বাভাবিকতা। বিমলের প্রবেশ। হাতে খবরের কাগজ। চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করলো। মানসী কাছে এলো।)

মানসী : আজ খুব জরুরি খবর আছে বুঝি?

বিমল : অ্যাঁ? না—সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।

মানসী : আমি ভাবলাম বিরাট কিছু বুঝি ঘটে গেলো দুনিয়ায়!

বিমল : কেন, কী হয়েছে?

মানসী : সারা সকাল কাগজ থেকে মুখ তুললে না তো?

বিমল : এই তো—একটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। (কাগজ রেখে) কী বলছিলে বলো।

মনসী : এমন কিছু না। আজ বিকেলে কী করছো জিজ্ঞেস করছিলাম।

বিমল : কেন বলো তো?

মানসী : এমনি, একটু বেরুতাম।

বিমল : বেরুবে? কিন্তু আজকে তো—মানে অফিসের একজন রিটায়ার করছে—একটা ফেয়ারওয়েল মিটিং—তা—কোথায় যেতে হবে বলছিলে?

মানসী : না, কোথাও না।—তুমি দাড়ি কামাবে না? নটা বাজে।

বিমল : ন'টা। মাই গড্!

(বিমলের প্রস্থান)

লেখক : দম্পতি—জম্পতি—জায়াপতি। সহজ ভাষায়—কর্তা-গিন্নী।

(কমলের প্রবেশ)

মানসী : আচ্ছা, তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই? খোকার জ্বর—দেখে গেলে, তবু রাত দশটা বাজিয়ে ফিরলে?

কমল : এই তো—এনেছি বার্লি! এই নাও।

মানসী : বার্লি আনলে ফুরিয়ে গেলো, না? আর কোনো দায়িত্ব নেই? রাত দশটা অবধি কী খাবে--সেটা খেয়াল হয় না, না?

কমল : একটুও ছিল না?

মানসী : যা ছিল তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি, আর কী করবো!

কমল : আছে কেমন?

মানসী: নিরানব্বুই। মোসাম্বি আনো নি?

কমল : এই ফলের দোকানটা চোর। টাকায় চারটে বলে। কাল বাজার থেকে আনবো এখন।

মানসী : যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো। আমি ভাত বাড়ছি।

(কমলের ও মানসীর বিপরীত দিকে প্রস্থান)

লেখক : দম্পতি—জম্পতি—জায়াপতি। বর-কনে—স্বামী-স্ত্রী—কর্তা-গিন্নী। অমল—বিমল—কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

কে? আরে—ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ : আরে—তুই! কী আশ্চর্য! তোর সঙ্গে এরকম দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারি নি। (দুজনে পরস্পরের হাত ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিতে লাগলো)

লেখক : ওঃ, কতো বছর পরে দেখা হোলো তোর সঙ্গে।

ইন্দ্রজিৎ : তা প্রায়—বছর সাতেক হবে।

লেখক : কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন? সেই ভূপালে?

ইন্দ্রজিৎ : নাঃ, ভূপালের চাকরি বছরখানেক পরেই গেলো। তারপর বহু ঘাট ঘোরা হোলো। বোম্বাই, জলন্ধর, মীরাট, উদয়পুর—বদলির চাকরি পেয়েছি একটা। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

লেখক : তাই তো চেয়েছিলি তুই?

ইন্দ্রজিৎ : তাই চেয়েছিলাম? কী জানি?

লেখক : সে কী রে? সেই পেঙ্গুইন ক্যাঙ্গারু এস্কিমো, ভুলে গেলি?

ইন্দ্রজিৎ : ওঃহো—সেই সরল ভূগোল পরিচয়? তুই এখনো মনে করে রেখেছিস?

লেখক : কেন, তুই ভুলে গেছিস?

ইন্দ্রজিৎ : না, ভুলি নি। তবে চোখটা বদলে গেছে বোধ হয়। সেদিন এক টাকা বারো আনা পকেটে নিয়ে হাওড়া স্টেশন ছাড়লে কেমন লাগতো জানি না। আজ মনে হয়—ভূগোলের বাইরে পৃথিবী নেই। অন্তত এদেশে নেই।

লেখক : বিদেশে?

ইন্দ্রজিৎ : বিদেশে তো যাই নি—কী করে জানবো? মালয়ে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। পেলাম না।

লেখক : পেলে যেতিস?

ইন্দ্রজিৎ : কেন যেতাম না?

লেখক : বিয়ে করিস নি বুঝি?

ইন্দ্রজিৎ : সময় পেলাম কোথায়? তুই?

লেখক : একই অবস্থা।

ইন্দ্রজিৎ : আর সকলের খবর কী?

লেখক : আর কে—বল?

ইন্দ্রজিৎ : এই—অমল—বিমল—কমল?

লেখক : চাকরি করছে। সংসার করছে। ভালোই আছে।

ইন্দ্রজিৎ : তোর কথা শুনে তো মনে হচ্ছে না—ভালো আছে?

লেখক : না, ভালোই আছে। তবে আমি ওদের হিংসে করি না। তুই করিস?

ইন্দ্রজিৎ : কী জানি? জানি না।

লেখক : মানসীর খবর কী?

ইন্দ্রজিৎ : মানসী? ওহো, তুই তো ওকে মানসী বলতিস। ভালোই আছে।

লেখক : কোথায় আছে?

ইন্দ্রজিৎ : (হেসে) মানে—বিয়ে করেছে কিনা জিজ্ঞেস করছিস? না করে নি। হাজারীবাগে একটা স্কুলে চাকরি করছে।

লেখক : (অল্প অপেক্ষা করে) ব্যাস্? আর কোনো খবর নেই?

ইন্দ্রজিৎ : আর কী খবর চাস?

লেখক : তুই যেটুকু বলবি।

ইন্দ্রজিৎ : (হেসে) সত্যিই আর কোনো খবর নেই। দুনিয়াতে বলবার মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। আমি চাকরি করছি, ও চাকরি করছে। আমি চিঠি লিখি। ও জবাব দেয়। বছরে একবার দেখা হয়। প্ল্যান করে ছুটি নিয়ে দেখা করি। কলকাতায়। এই খবর।

লেখক : তোরা বিয়ে করবি না?

ইন্দ্রজিৎ : করবো না বলে ঠিক করিনি কিছু। তবে করিনি এখনো।

লেখক : কেন করিস নি?

ইন্দ্রজিৎ : জানি না কেন। কারণ দেখাতে পারবো না। হয় তো একদিন—পাস করবার ঠিক পরেই—না ভেবেচিন্তে করে ফেলতে পারতাম। তখন জানতাম না। ভাবতাম না। ঐখানে ঐ মাঠে বসে কতো গল্প করেছি। প্ল্যান করেছি। তর্কও করেছি। একদিন এমনি এক তর্ক—কী যে হয়ে গেলো—

(মানসী বসে সবুজ ঘাসে। ঝাঁকড়া গাছের নিচে। ইন্দ্র তার কাছে। লেখক অন্ধকারে এক কোণে।)

মানসী : আমি পারবো না ইন্দ্র।

ইন্দ্রজিৎ : কেন পারবে না?

মানসী : কেন অমন করে জোর করছো ইন্দ্র? আমাকে সময় দাও।

ইন্দ্রজিৎ · সময়, সময়, সময়! আজ ছ'মাস ধরে তুমি শুধু বলছো—সময় দাও।

মানসী : কী করবো বলো? তোমার মতো মনের জোর আমার নেই।

ইন্দ্রজিৎ : মনের জোর নয়। বলো—মনের ইচ্ছে।

মানসী: ইচ্ছে থাকলেই কি সব কিছু করা যায়?

ইন্দ্রজিৎ : সব কিছুর কথা জানি না। বিয়ে করা যায়।

মানসী : ছেলেরা যা কিছু—

ইন্দ্রজিৎ : জানি জানি! ছেলেরা যা কিছু পারে, মেয়েরা তা পারে না। মেয়েরা পারে ভাবতে, আর মানতে, আর সময় চাইতে।

মানসী : কেন মিথ্যে রাগ করছো?

ইন্দ্রজিৎ : (থেমে) রাগ করছি না। কাল আমি ভূপালে চলে যাচ্ছি। তাই আজকে এতো করে জানতে চাইছি।

মানসী: ভূপালে চলে গেলেই কি সব শেষ হয়ে যাবে?

ইন্দ্রজিৎ : (থেমে) জানি না।

মানসী: ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ : জানি না মানসী। আমি কিছু জানি না।

মানসী : (অল্প পরে) তবে, তাই আগে জানো। ভূপালে গিয়ে দেখো আগে —কী হয়।

ইন্দ্রজিৎ : এবার কে রাগ করছে?

মানসী : এটা রাগ নয় ইন্দ্রজিৎ। আমি খুব ভেবেই বলছি। জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।

(ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে রইলো। আলো নিভে গেলো। লেখকের কাছে আলো। ইন্দ্রজিৎ ফিরে আসছে।)

ইন্দ্রজিৎ : জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারলাম না আমরা। অনেক ভাবলাম। অনেক হিসেব করলাম। আজও ভাবছি। ভয় পাচ্ছি, পাছে ছেলেখেলা হয়ে যায় জীবন নিয়ে। জীবন। মহামূল্যবান জীবন। কাগজ পড়িস?

লেখক : কাগজ? পড়ি মধ্যে মধ্যে।

ইন্দ্রজিৎ : কবে যেন পড়ছিলাম একটা খবর। আমেরিকার যতো আণবিক অস্ত্র নাকি কতকগুলো সুইচের ব্যাপার। পাছে ভুল করে আণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাই সুইচের নানারকম অটোম্যাটিক ইন্টারলকিং সিস্টেম করা আছে। রেলের সিগন্যালের মতো। কল্পনা কর, ভুল করে কয়েকটা অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা পড়ে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে গেলো। ভাবতে পারিস?

লেখক : কী বলতে চাস?

ইন্দ্রজিৎ : এমন কিছু নয়। এই মূল্যবান জীবনের কথা। যা নিয়ে এতো বিবেচনা, এতো হিসেব।

লেখক : তুই তাহলে বিয়ে করতে চাস? মানসীই ঠিক করতে পারছে না?

ইন্দ্রজিৎ : তাও নয়। এখন তাও নয়। সব সময়ে কেউ অ্যাটম বোমার কথা ভাবতে পারে? রাত্রে আকাশ-ভরা তারার দিকে তাকিয়ে বইয়ে পড়া অ্যাস্ট্রনমি যদি ভাবিস, এই ছোট্ট সৌরজগতের ছোট্ট পৃথিবীটার কোনো মূল্য থাকে? এই কীটাণুকীট মানুষগুলোর কোনো মূল্য থাকে? তাই বলে সেই কথা যদি সব সময় ভাবি, বেঁচে থাকা যাবে?

লেখক : তবু তো তুই ভাবিস?

ইন্দ্রজিৎ : ভাবি মধ্যে মধ্যে। না ভেবে পারি না। আবার নিজের জীবনটাকে বিরাট করেও ভাবি। ভুলে যাই—মহাকালের কাছে আমার আয়ু সামান্য। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। ভুলে যাই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার অস্তিত্ব একটা অদৃশ্য ধূলিকণার চেয়েও অর্থহীন। বরং ভাবি আমরা জীবনের মতো মূল্যবান আর কিছু নেই দুনিয়ায়।

লেখক : এ ভুলে যাওয়া বোধ হয় প্রকৃতির দান। মানুষের বেঁচে থাকার হাতিয়ার।

ইন্দ্রজিৎ : ও হাতিয়ারে কুলোয় না। জ্ঞানবৃক্ষের ফল। ঐ তারা-ভরা আকাশ সব গুলিয়ে দেয়। তুমি আমি মানসী কমল বিমল অমল—

(আবহবাদ্যে ইন্দ্রজিতের গলা ডুবে গেলো। মঞ্চ অন্ধকার। শুধু একটা আলোর দ্যুতিতে লেখক ও ইন্দ্রজিৎ। আর একটা আলোর রশ্মিতে মঞ্চের পিছনে মানসীর স্থিরমূর্তি। অন্য দিকে আধো অন্ধকারে অমল বিমল কমলের ছায়ামূর্তি। আবহবাদ্য পরিণত হলো এক গম্ভীর কণ্ঠস্বরের আবৃত্তিতে।)

কণ্ঠস্বর :

মৃত্তিকা সমুদ্রে শেষ। সমুদ্র দিগন্তে সীমাটানা।
সৌরমণ্ডলের চক্রে পৃথিবীর নগণ্য ঠিকানা
কোথায় হারিয়ে আছে।
অবিশ্রান্ত সময়ের কাছে
দু'টি মুহূর্তের খেলা পৃথিবীর অস্তিত্ববিলাস,

আকস্মিক সমন্বয়ে জীবনের ক্ষণ-ইতিহাস,
সৃজন লুপ্তির মাঝে গোটাকয় মুহূর্তের দান—
ধরণীর অর্থহীন প্রাণ।
সে অনন্ত গণনাতে
আমি আছি সংজ্ঞাহীন সামান্য কণাতে।
বকের আশ্চর্য প্রশ্ন যুধিষ্ঠির বুঝেছিলো ঠিক,
বাস্তবিক—
অবশ্য মৃত্যুর ছন্দে খুঁজে ফেরা তালের বিচ্যুতি,
অনির্বাণ জীবনের অলীক আকৃতি—
এর চেয়ে বিস্ময়প্রয়াস
এখনো লেখেনি মর্তে মানুষের স্বল্প ইতিহাস।

(স্তব্ধতা। আর সব আলো নিভে গেলো। শুধু মানসী আলোয় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।)

মানসী : তবু আমি কীটাণু-অধম
বেশরম।
প্রতিবেশী সান্ত্বনায় ভুলে থাকি বিরাট ধারণা
জটিল গণিত-তত্ত্ব সূক্ষ্ম আলোচনা।
প্রাণের উদ্ধত অধিকারে
অনন্ত ঘোষণা রাখি কণিকার মুহূর্তপ্রচারে।

(মানসীর আলো নিবে গেলো। আবার যখন ধীরে ধীরে আলো ফুটলো, তখন লেখক একা। মঞ্চের মাঝখানে পাদপ্রদীপের কাছে।)

লেখক : প্রাণের উদ্ধত অধিকার! কার প্রাণ? ইন্দ্রজিৎ, মানসী, আমি, আর কে? অমল—বিমল—কমল?

(অমলের প্রবেশ)

অমল : আরে কবি যে? কী খবর?

লেখক : ভালো।

অমল : এখনো লেখো-টেখো?

লেখক : লিখি মাঝে মাঝে।

অমল : তোমার সেই নাটকটা লেখা হোলো?

লেখক : না। তোমার খবর কী?

অমল : ভালো না ভাই।

লেখক : কেন, কী হোলো?

অমল : এই এ-বি-সি কোম্পানিতে ঢুকে ভবিষ্যৎটা ঝরঝরে হয়ে গেলো। সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের পোস্টে ছ'বছরের এক্সপিরিয়েন্স—জানো? আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করে নিয়ে এলো বাইরে থেকে এক মাদ্রাজিকে!

লেখক : তাই নাকি?

অমল : আর বোলো না! মদ্রদের দিন এখন। বাঙালিরা বাঙালির হাতেই মরবে।

আমারই ভুল হোলো, পি-কিউ-আর কোম্পানির অফারটা নিলাম না তখন। ভাবলাম এখানে তো প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে, কেন আর মিছিমিছি—জীবনটায় ঘেন্না ধরে গেছে ভাই!

লেখক : বাড়ির সব ভালো?

অমল : আর ভালো! এ অবস্থায় কতো আর ভালো থাকা যায়? ছ'বছর হয়ে গেলো—সেই সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট! চলি ভাই, একটু তাড়াতাড়ি আছে।

(অমলের প্রস্থান, বিমলের প্রবেশ)

বিমল : আরে কবি যে? কী খবর?

লেখক : ভালো।

বিমল : এখনো লেখো-টেখো?

লেখক : লিখি মাঝে মাঝে।

বিমল : তোমরা সেই নাটকটা লেখা হোলো?

লেখক : না। তোমার খবর কী?

বিমল : মন্দ না! ভালো একটা কনট্রাক্ট পেয়েছে আমাদের ফার্ম। রাঁচিতে বদলি হলাম। কাল চলে যাচ্ছি।

লেখক : ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছো?

বিমল : হ্যাঁ, কোয়ার্টার দিয়েছে। ফ্যামিলি মানে মিসেস। ছেলেটাকে কার্সিয়াঙে স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। রাঁচিতে কেমন স্কুল পাবো কে জানে?

লেখক : তাহলে ভালোই আছো?

বিমল : এই চলে যাচ্ছে আর কী! চলি ভাই, একটু নিউ মার্কেটে যাবো। কয়েকটা লাস্ট মিনিট শপিং। তুমি যাবে নাকি ওদিকে? লিফ্‌ট দিতে পারি।

লেখক : না, আমি যাচ্ছি না।

বিমল : আচ্ছা ভাই—so long !

(বিমলের প্রস্থান, কমলের প্রবেশ)

কমল : আরে কবি যে, কী খবর?

লেখক : ভালো।

কমল : এখনো লেখো-টেখো?

লেখক : নাঃ।

কমল : হ্যাঁ, ওসব হবি রাখা যায় না সংসারের চাপে। আমিও তো মাউথ অর্গ্যান বাজাতাম। রাখতে পারলাম কই? খারাপ হয়ে পড়ে রইলো—সারানোই হোলো না। যা বাজার! ইন্‌সিওরেন্স করেছো কিছু?

লেখক : না।

কমল : সে কী হে? না না, কাজটা ভালো করোনি। একটা সিকিওরিটি—জীবনের কথা কেউ কিছু বলতে পারে? করিয়ে ফেলো। হাজার দশেক অন্তত—

লেখক : কার জন্যে করবো?

কমল : বিয়ে করোনি?

লেখক : না।

কমল : করোনি, করতে কতক্ষণ? আর করলেই ছেলেপুলে। তখন বেশি বয়সে প্রিমিয়াম-রেট বড্ডো হাই হয়ে যাবে। তাছাড়া নিজের বুড়ো বয়সের একটা সংস্থান। কতো করবে বলো—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

লেখক : তুমি কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছো নাকি?

কমল : চাকরি ছাড়বো এই বাজারে? মাথা খারাপ? তবে হ্যাঁ, একটা বিজনেসের চেষ্টায় আছি! যদি জমে যায়—চাকরি-বাকরি ইনসিওরেন্স-এজেন্সি—সব ছেড়ে দেবো। হাজার পঁচিশ ঢালতে পারে—এরকম ফিনান্সিয়ার জানা আছে কেউ? খুব ভালো স্কিম—ফর্টি পার্সেন্ট প্রফিট গ্যারান্টেড। অঙ্ক কষে দেখিয়ে দেবো।

লেখক : তেমন তো কেউ নেই জানাশোনা।

কমল: ঠিক আছে। ও পেয়ে যাবো। যা স্কিম—টাকা ঢালবার লোকের অভাব হবে না। চলি আজ। তুমি ইন্‌সিওরেন্সের কথাটা সীরিয়াসলি ভেবে দেখো।

(কমলের প্রস্থান)

লেখক : প্রাণের উদ্ধত অধিকারে।
অনন্ত ঘোষণা রাখি কণিকার মুহূর্তপ্রচারে।

এইসব কণিকা! এদের মুহূর্ত-প্রচারের ইতিহাস নিয়ে আমার নাটক। অমল—বিমল—কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

কোন্ অনন্ত ঘোষণা তুমি রাখবে ইন্দ্রজিৎ?

ইন্দ্রজিৎ : কী রাখবো?

লেখক : কিছু না। দেখা হয়েছে মানসীর সঙ্গে?

ইন্দ্রজিৎ : হয়নি। হবে। ঐ মাঠে। (ইন্দ্রজিৎ পিছনে চলে গেলো)

লেখক : ঐ মাঠে। ঐ ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নিচে।

ও মাঠে মাটিতে ঘাসে মেশা
অনেক পুরোনো নেশা
অনেক জরুরি আলোচনা,
ওখানে প্রাচীন দিন বয়সের প্রথম সূচনা,
ও মাঠে তরল দিন বহুদিন বহু কথা বোনা।

ইন্দ্রজিৎ আর মানসী! ওরা ঐ মাঠে আবার বসবে। কথা বলবে।

বয়সের ঘষায় ঘষায়
কথা তো পুরোনো হয়ে যায়,
একই কথা ঘুরে ফিরে আসে।
তবু চলো মাটি-মাখা ঘাসে
আজে বাজে দু'টো কথা রাখি,
দু'দণ্ড বসে থাকি
কাছাকাছি গোলাপী বাতাসে।

(মানসী এসে ইন্দ্রজিতের কাছে বসেছে। কথা শুরু হয়েছে। লেখক সরে গেলো।)

ইন্দ্রজিৎ : এবার বোধ হয় অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

মানসী : কেন?

ইন্দ্রজিৎ : বোধ হয় বাইরে চলে যাবো।

মানসী : বাইরে মানে? বাইরেই তো আছো?

ইন্দ্রজিৎ : আর একটু বাইরে।

মানসী : কোথায়?

ইন্দ্রজিৎ : লন্ডন।

মানসী : লন্ডন? চাকরি পেয়েছো?

ইন্দ্রজিৎ : পাইনি। ভেসে পড়বার মতো টাকা জমেছে। একটা ইভনিং কোর্সে অ্যাডমিশন নিয়েছি। পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে চাকরি একটা খুঁজে নেবো।

মানসী : যদি না পাও?

ইন্দ্রজিৎ : পেয়ে যাবো।

মানসী : না পেলে?

ইন্দ্রজিৎ : একটা কিছু পাবোই। একটা পেট চললেই হোলো।

মানসী : এরকম করে ক'দিন ভেসে বেড়াবে?

ইন্দ্রজিৎ : যতোদিন চলে।

মানসী : ভালো লাগছে?

ইন্দ্রজিৎ : না।

মানসী : তবে?

ইন্দ্রজিৎ : তবে কী?

মানসী: এক জায়গায় স্থির হয়ে বসো না কেন?

ইন্দ্রজিৎ : তা হলেই ভালো লাগবে?

মানসী : জানি না।

ইন্দ্রজিৎ : আমিও জানি না। আসলে ভালো লাগা কথাটারই কোনো মানে হয় না। ভালো লাগবার কথা নয়।

মানসী : (অল্প থেমে) ইন্দ্র!

ইন্দ্রজিৎ : কী?

মানসী: আমাকে বিয়ে করলে তুমি স্থির হয়ে বসতে?

ইন্দ্রজিৎ : জানি না। এখন আর বলতে পারি না। এককালে পারতাম।

মানসী : আমার উপর রাগ হয় না?

ইন্দ্রজিৎ : না। আগে হোতো। এখন হয় না। বিয়ে করলে কী হোতো—কে বলতে পারে? হয়তো আমাদের এই বন্ধুত্ব চলে যেতো।

মানসী : হয়তো অন্য বন্ধুত্ব হোতো। আরো ভালো বন্ধুত্ব।

ইন্দ্রজিৎ : জানি না। আমি অনেক ভেবেছি। অনেক যুক্তি তর্ক বিচার মনে মনে করেছি। সব কিছুর উত্তর—জানি না। কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। যুক্তি তর্ক আর ভালো লাগে না। কিছু করতেও পারছি না। শুধু ক্লান্ত লাগছে। ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। (অল্পক্ষণ চুপচুপ)

মানসী: চলো হাঁটি।

ইন্দ্রজিৎ : চলো। (দুজনে উঠে চলে গেলো। লেখকের প্রবেশ। ক্লান্ত পদক্ষেপ।)

লেখক : আমি ক্লান্ত। বৃথা প্রশ্ন থাক,
এখন ঘুমোতে দাও নিভন্ত নির্বাক
ছায়ার গভীরে।
কী হবে কথার রাশি দিয়ে?
কী হবে তর্কের বীজ বাতাসে ছড়িয়ে?
আমি ক্লান্ত যুক্তির জ্বালায়,
আমাকে ঘুমোতে দাও একা নিরালায়
ছায়ার গভীরে।
আমার সন্ধান ক্লান্ত। এখনো গোপন
ধরণীর শেষ বিশ্লেষণ।
আমার প্রচেষ্টা ক্লান্ত। এখনো নিঃসাড়
জগতের জড়তার ভার।
আমার প্রতীক্ষা ক্লান্ত সমাধির পাশে
জীবনের ব্যর্থ আশে
মরণের তীরে।
প্রশ্ন নিয়ে তুমি যাও,
তর্ক নিয়ে যুক্তি নিয়ে তুমি যাও ফিরে,
আমাকে ঘুমোতে দাও ছায়ার গভীরে।

তৃতীয় অঙ্ক

(অমল-বিমল-কমল বসে তাস খেলছে। প্রত্যেকে নিজের কথা বলে একটি করে তাস পিটছে। কমল তৃতীয় তাস ফেলে পিট কুড়িয়ে মাঝখানে রাখছে।)

অমল : ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।

বিমল : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি।

কমল : এখন আমাদের স্বাধীন স্বাবলম্বী সমাজ গড়ে তোলার প্রস্তুতি।

অমল : ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙতেই হবে।

বিমল : ফ্যাসিজম্ পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

কমল : কম্যুনিজম্ মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধকে লুপ্ত করে।

অমল : ডেমোক্র্যাসি দিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় না।

বিমল : ডিক্টেটরশিপ সব সময়ে সব দেশেই অন্যায়।

কমল : সাধারণ মানুষ সব সিস্টেমেই ভুগবে।

অমল : দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেলো।
বিমল : এ গভর্নমেন্টকে দিয়ে কিস্যু হবে না।
কমল : যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।
অমল : রাজনীতি অতি নোংরা জিনিস।
বিমল : আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কী হবে?
কমল : আপনি বাঁচলে চাচার নাম।
অমল : প্রমোশন হোলো না।
বিমল : কোয়ার্টারটা বাজে।
কমল : ব্যবসা ফাঁদা গেলো না।
অমল : গিন্নীর অসুখ।
বিমল : ছেলেটা ফেল করলো।
কমল : বাবা মারা গেলেন।
অমল : যতো সব—
বিমল: ছি ছি ছি—
কমল : ধ্যাত্তেরি—
অমল : বিমল—
বিমল: কমল—
কমল : অমল—
অমল : বিমল—
বিমল : কমল—
কমল : অমল—
নেপথ্যে ঘোষণা : এবং ইন্দ্রজিৎ।

(লেখকের প্রবেশ)

অমল : আরে কবি যে! কী খবর?
বিমল : আরে কবি যে! কী খবর?
কমল : আরে কবি যে! কী খবর?
লেখক : ইন্দ্রজিতের চিঠি পেলাম কাল।
অমল : তাই নাকি? কী লিখেছে?
বিমল : ও তো বিলেতে গিয়েছিলো, না?
কমল : ফেরে নি এখনো?
লেখক : পাস করেছে।
অমল বাঃ! ভালো খবর।
বিমল : ফিরলেই চাকরি। লাইনটা ভালো।
কমল : এখনো দেশে বিলিতি ডিগ্রীর খুব কদর।
লেখক : চিঠিটা শুনবে?
অমল : পড়ো শুনি।
বিমল : বড়ো চিঠি?

কমল : হোক বড়ো!

(লেখক পড়তে লাগলো। এরা তাস খেলতে লাগলো। এবার আর কথা নয়। শুধু তিন তাসে পিট।)

লেখক : কলকাতা ভূপাল বোম্বাই জলন্ধর মীরাট উদয়পুর কলকাতা লন্ডন। সমস্ত অতীতটা চাকার মতো ঘুরে ঘুরে গেছে। তবু চাকার মতো নয়। প্রত্যেক চক্র পুরোনো চক্রকে ছাড়িয়ে উঠেছে—সেইটাই ট্র্যাজেডি। ধরছি, জানছি, ফুরিয়ে যাচ্ছে, ফেলে দিচ্ছি। আবার ধরছি।

তবু একটা অসম্ভব অভাবনীয় ঘটনার প্রতীক্ষা ফুরোতে চায় না। তবু খালি মনে হয় এইটাই সব নয়। কিছু একটা আসবে যা আগের সব কিছুকে ঝাপসা করে দেবে অবিশ্বাস্য আলোয়! একটা অবাধ্য একগুঁয়ে নির্বোধ স্বপ্ন! ঘুম ভাঙলেও স্বপ্নের জেদ ফুরোতে চায় না!

(ইন্দ্রজিৎ এসে দাঁড়িয়েছে লেখকের পাশে। এরা খেলেই চলেছে মুখ না তুলে।)

ইন্দ্রজিৎ : যা কিছু পাবার সব পেয়ে গেছি, এবং পেয়ে কিছু হয়েছে—এ কথাটা অভদ্র রকমের সত্যি। আরো পাবো, এবং পেলে চারটে হাত নির্ঘাত গজাবে—এ আশাটাও শোচনীয় রকম মিথ্যে। অতীত ভবিষ্যৎ আজও বিপরীতমুখী—স্বপ্ন আছে বলেই। স্বপ্ন ফুরোলেই ভবিষ্যৎটাকে ভাঁজে মুড়ে অতীতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। বর্তমানটাও একটা না-জানা ভবিষ্যতের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অনির্দিষ্ট হয়ে না থেকে সীমাবদ্ধ সুনির্দিষ্ট বিন্দু হয়ে যেতে পারে। অন্য ভাষায় তার নাম মরে যাওয়া।

(মানসী এসেছে একটু আগে)

মানসী : মরে যাওয়া?

ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ, মরে যাওয়া। আসলে মরে যাওয়াটা পরম সুখের। কতো লোক মরে সুখে আছে। যতোগুলো আগামীকাল আছে, সব ক'টাকে গতকালের সঙ্গে ছাঁচ মিলিয়ে পরম সুখে মরে আছে। আমাকেও তো একদিন না একদিন ঐ রকম মরতে হবে। এখনই মরি না কেন?

মানসী : মরে যেও না। বেঁচে থাকো।

ইন্দ্রজিৎ : মানুষের বাঁচতে হলে বিশ্বাস দরকার। ভগবানে বিশ্বাস। অদৃষ্টে বিশ্বাস। কাজে বিশ্বাস। মানুষে বিশ্বাস। বিপ্লবে বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস। ভালোবাসায় বিশ্বাস। এর মধ্যে কোন বিশ্বাসটা আজ আমার আছে বলে বলতে পারি?

মানসী : জীবনে বিশ্বাস?

ইন্দ্রজিৎ : জীবন! বিরাট প্রশ্নের যেখানে উত্তর মেলে না, সেখানে কতকগুলো খুচরো অর্থহীন সমস্যা নিয়ে বোঝাপড়া। কতকগুলো একঘেয়ে অর্থহীন ভান আর মিথ্যে। যেগুলোর কোনো দবকার ছিল না, দরকার নেই, তবু করতে হবে। এর নাম জীবন। মানুষের জীবন। আমি একটা মানুষ। কোটি কোটি মানুষের একটা। আমার জীবনের মিথ্যে কোটি কোটি মানুষের জীবনের মিথ্যে।

মানসী : কী করতে চাও?

ইন্দ্রজিৎ : কী করবো? ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বো? না, হেসে জীবনটাকে উড়িয়ে দেবো? হাসিটাই বোধহয় ঠিক। জীবন বস্তুটা এতো প্রচণ্ড হাস্যকর যে, হাসি চেপে রাখবার কোনো মানে হয় না।

(ইন্দ্রজিৎ সহসা অট্টহাস্য হাসতে লাগলো। মানসী ও লেখক দু'দিকে চলে গেলো। অমল বিমল কমল কিছু না শুনে, কিছু না বুঝে অট্টহাস্য শুরু করলো। লেখক আবার ঢুকে পাদপ্রদীপের কাছে এলো। দু'হাত তুলে দর্শকদের থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো—যেন তাঁরাই হাসছেন। অমল বিমল কমল চলে গেলো। তাদের হাসির আওয়াজ আস্তে আসতে মিলিয়ে এলো।)

লেখক : আপনারা হাসবেন না। দোহাই আপনাদের, হাসবেন না। আমি পারছি না, কিন্তু বুঝতে পারছেন না কী প্রচণ্ড চেষ্টা করছি লেখবার? একটা নাটক লেখবার? ঐ অমল-বিমল-কমলের নাটক? এবং ইন্দ্রজিৎ?

(মাসীমার প্রবেশ)

মাসীমা : খেতে আসবি না?

লেখক : না।

(মাসীমার প্রস্থান। মানসীর প্রবেশ।)

মানসী : খেতে আসবে না?

লেখক : (দু'হাতে মুখ ঢেকে) তুমি-ও?

মানসী : না ভুল হয়ে গেছে। তুমি লিখবে না?

লেখক : কী করে লিখবো? ইন্দ্রজিৎ ফিরছে না। তিন বছরে তিনটে চিঠি সে লিখেছে আমাকে। প্রত্যেকবার এক কথা।

মানসী : কী কথা?

লেখক : ঘুরছে। ঘুরছে আর ঘুরছে। কিন্তু মরছে না। অবাধ্য একগুঁয়ে স্বপ্নটা মরছে না কিছুতেই। যে জীবনটাকে সত্যি করে দেখে আর স্বপ্ন করে ভাবে—তাকে নিয়ে কি নাটক হয়?

মানসী : তাকে নিয়েই তো নাটক হয়।

লেখক : না হয় না। যতোবার তাকে ঘটনার মধ্যে আনি, সে ঘটনার উর্ধ্বে চলে যায়। বলে—এ ঘটনা আসল ঘটনা নয়। যতোবার তাকে দিয়ে কথা বলাই, কথার বাইরে চলে যায়। বলে—এ কথা আসল কথা নয়। সে জেনে গেছে। বড়ো বেশি জেনে গেছে।

মানসী : তবু সে স্বপ্ন দেখে।

লেখক : সে স্বপ্ন তো একদিন ফুরোবে!

মানসী : জানি।

লেখক : তখন?

মানসী : যাক ফুরিয়ে।

লেখক : তারপর?

মানসী : তারপর আর স্বপ্নের কুটো ধরে ভেসে থাকতে পারবে না।

লেখক : ডুবে যাবে?

মানসী : ডুবুক। ডুবে হয়তো তল পাবে। শক্ত জমি পাবে। হয় তো তখনই জীবনের শুরু।

লেখক : কী করে জানলে?

মানসী : জানি না। আমি জানি না। আমি বোকা। আমি কিছু জানি না। শুধু বিশ্বাস করি।

(মানসীর প্রস্থান)

লেখক : বিশ্বাস? পাতালে বিশ্বাস?

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ)

ইন্দ্রজিৎ : ভেসে থাকি আস্তিকের দৈন্য নিয়ে,
কুটোয় এলিয়ে রাখি জীবনের ভার,
মুছে গেছে অন্য পার কুয়াশার সাদা দীর্ঘশ্বাসে।
মেঘের ওপাশে যতো সোনামোড়া রাজ্যপাট আছে,
আকাশে তারার কাছে যতো স্বর্গ ভাসে,
এ প্রবাসে সবই মিথ্যে হোলো।
জোলো সান্ত্বনার বুলি ছেড়ে দাও,
কেড়ে নাও বিশ্বাসের অন্ধ ঠুলি,
ডুবে দেখো কতোখানি গেলে মেলে তল।
মানুষ সচল।
মানুষ আশ্চর্যতম প্রাণী;
ডুবো পাথরের ভিতে পাতালে সে পাতে রাজধানী।

লেখক : ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ : বলো।

লেখক : তুমি ফিরে এসেছো?

ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ।

লেখক : কবে ফিরলে?

ইন্দ্রজিৎ : অনেকদিন।

লেখক : কোথায় আছো?

ইন্দ্রজিৎ : কলকাতায়।

লেখক : কী করছো?

ইন্দ্রজিৎ : চাকরি।

লেখক : বিয়ে করেছো?

ইন্দ্রজিৎ : করেছি।

লেখক : মানসী বিয়ে করলো তা হলে শেষ পর্যন্ত?

ইন্দ্রজিৎ : না।

লেখক : তবে?

ইন্দ্রজিৎ : আর একজনকে বিয়ে করেছি।

লেখক : আর একজনকে?

ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ।
লেখক : কে সে?
ইন্দ্রজিৎ : একটি মেয়ে।
লেখক : কী নাম তার?
ইন্দ্রজিৎ: মানসী।
লেখক : তা কী করে হবে?
ইন্দ্রজিৎ : তাই হয় দুনিয়ায়। কতো মানসী আসে। আবার চলে যায়। তাদের একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়। আবার কতো মানসী আসে। আবার যায়। মানসীর বোন মানসী। মানসীর বন্ধু মানসী। মানসীর মেয়ে মানসী।
লেখক : যেমন অমল—বিমল—কমল?
ইন্দ্রজিৎ : যেমন অমল—বিমল—কমল। এবং ইন্দ্রজিৎ।

(মানসীর প্রবেশ। মাথায় কাপড়।)

আলাপ করিয়ে দিই। আমার স্ত্রী মানসী। আর এ আমার পুরোনো বন্ধু—লেখক।

লেখক : নমস্কার।
মানসী : নমস্কার। আপনি কী লেখেন?
লেখক : যখন যা পারি।
মানসী : এখন কী লিখছেন?
লেখক : একটা নাটক লেখবার চেষ্টা করছি।
মানসী : আমাকে শোনাবেন?
লেখক : শোনাবো। শেষ হলেই শোনাবো।
মানসী : কতোটা লেখা বাকি?
লেখক : বেশি বাকি নেই। আজকালের মধ্যেই আরম্ভ করবো।
মানসী : আরম্ভই করেন নি এখনো?
লেখক : করতে পারলাম কই?
মানসী : তবে যে বললেন শেষ হতে বেশি বাকি নেই?
লেখক : এ নাটকের আরম্ভ আর শেষে বিশেষ তফাৎ নেই। নাটকটা বৃত্তাকার।
মানসী : বুঝতে পারছি না আপনার কথা।
ইন্দ্রজিৎ : বুঝবে কী করে মানসী? কথা কি বোঝবার জন্যে?
মানসী : কথা তো বোঝবার জন্যেই বলা হয়?
ইন্দ্রজিৎ : সে তো আগে বলা হোতো। এখন বলা হয় অভ্যাসে।
মানসী : যাঃ! বাজে কথা।
ইন্দ্রজিৎ : বাজে কথাই তো। ঐ দেখো।

(অমল-বিমল-কমলের প্রবেশ। মঞ্চের অন্যদিকে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছে।)

মানসী : ওরা কে?
লেখক : ওরা অমল-বিমল-কমল।
অমল : ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র—

বিমল : সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, মার্কস্‌বাদ—
কমল : অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি—
অমল : কোটেশন, টেন্ডার, স্টেটমেন্ট—
বিমল : রিপোর্ট, মিনিট্‌স, বাজেট—
কমল : মিটিং, কমিটি, কনফারেন্স—
অমল : সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি—
বিমল : সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—
কমল : ব্রহ্ম, নির্বাণ, ভূমা—
অমল : সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা—
বিমল : ফুটবল, ক্রিকেট, হকি—
কমল : মার্গসংগীত, পল্লীগীতি, আধুনিক—
অমল : ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ—
বিমল : ট্রাম, বাস, ট্রেন—
কমল : গরম, জঞ্জাল, মশা—
অমল : ছেলে, মেয়ে, গিন্নী—
বিমল : মাস্টার, ড্রাইভার, বাবুর্চি—
কমল : শালী, ভাগ্নে, শ্বশুরমশাই—
মানসী : ওবা কী বলছে?
ইন্দ্রজিৎ : কথা বলছে। কথা।
(অমল-বিমল-কমল হাত পা নেড়ে নিঃশব্দে কথা বলতে বলতে চলে গেলো)
মানসী : কী কথা?
ইন্দ্রজিৎ : আমি জানি না। লেখককে জিজ্ঞেস করো।
মানসী : (লেখককে) এ ছাড়া কি আর কোনো কথা নেই?
লেখক : বোধহয় আছে। নিশ্চয়ই আছে। (সামনে এসে দর্শকদের ডেকে) এ ছাড়া কি কথা নেই? (দর্শকরা নীরব) নেই? (তবু নীরব) তবে আমি কী নিয়ে নাটক লিখবো? এইসব কথা নিয়ে? কে সে নাটক অভিনয় করবে? কে দেখবে? (ইন্দ্রজিৎ আর মানসী চলে যাচ্ছে) ইন্দ্রজিৎ যেও না।
(মানসী চলে গেলো। ইন্দ্রজিৎ ফিরে এলো।)
বলে যাও।
ইন্দ্রজিৎ : কী বলবো?
লেখক : মানসী কোথায়?
ইন্দ্রজিৎ : ঐ তো—চলে গেলো।
লেখক : ও মানসী নয়। যে মানসী হাজারীবাগে ছিল। কোথায় সে?
ইন্দ্রজিৎ : হাজারীবাগে আছে।
লেখক : তাকে চিঠি লেখো না?
ইন্দ্রজিৎ : লিখি।
লেখক : তার সঙ্গে দেখা হয় না?

ইন্দ্রজিৎ : হয় মাঝে মাঝে।

লেখক : কোথায় দেখা হয়?

ইন্দ্রজিৎ : ঐ মাঠে। ঐ ঝাঁকড়া গাছটার নিচে।

লেখক : কথা বলো?

ইন্দ্রজিৎ : বলি।

লেখক : কী কথা বলো?

ইন্দ্রজিৎ : যে কথা চিরকাল বলতাম। আমার যতো কথা। ওর যতো কথা।

লেখক : সে কথাও কি ঐরকম ঐ অমল-বিমল-কমলের কথার মতো? (ইন্দ্রজিৎ নিরুত্তর) বলো ইন্দ্রজিৎ!

(ইন্দ্রজিৎ তবু উত্তর দিলো না। শুধু চলে গেলো পিছনের ঐ মাঠে। ঐ ঝাঁকড়ামাথা গাছটার নিচে' সেখানে মানসী। হাজারীবাগের মানসী।)

মানসী : বলো।

ইন্দ্রজিৎ : কী বলবো?

মানসী : যা বলছিলে?

ইন্দ্রজিৎ : কী বলছিলাম?

মানসী : তোমার সংসারের কথা।

ইন্দ্রজিৎ : ও হ্যাঁ। আমার বৌ সংসার দেখে। আমি চাকরি করি। আমার বৌ সিনেমায় যায়। আমি সঙ্গে যাই। আমার বৌ বাপের বাড়ি যায়। আমি হোটেল খাই। আমার বৌ ফিরে আসে। আমি বাজার করি।

মানসী : এসব কী বলছো?

ইন্দ্রজিৎ : কথা! আমার সংসারের কথা। তুমি তো শুনতে চাইলে?

মানসী : মোটেই আমি এসব কথা শুনতে চাইনি।

ইন্দ্রজিৎ : তবে কী শুনতে চাও?

মানসী : তোমার কথা।

ইন্দ্রজিৎ : আমার কথা? আমি—আমি একটা রেল লাইন ধরে হাঁটছি। সিধে একটা রেল লাইন। পেছনে তাকিয়ে দেখছি—দু'টো লোহার লাইন অনেক দূরে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিলে গেছে। সামনে তাকিয়ে দেখছি—সেই দু'টো লাইন অনেক দূরে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিশে গেছে। যতোই হাঁটছি, বিন্দুটা সরে সরে যাচ্ছে। পেছনেও যা, সামনেও তাই। গতকালও যা, আগামীকালও তাই।

মানসী : তারপর?

ইন্দ্রজিৎ : ভেবেছিলাম একটা গাড়ি আসবে। পেছন থেকে কিংবা সামনে থেকে।

মানসী : গাড়ি এলে কী করতে?

ইন্দ্রজিৎ : লাফিয়ে সরে যেতাম। কিংবা দৌড়োতাম। কিংবা চাপা পড়তাম। একটা কিছু ঘটতো। কিন্তু তা হবে না। ও লাইনটায় গাড়ি চলে না, আমি জেনে গেছি। তাই ভাবছি—(থেমে গেলো)

মানসী : কী ভাবছো?

ইন্দ্রজিৎ : ভাবছি আর হাঁটবো না। হেঁটে লাভ নেই। শুয়ে থাকবো লাইনটার উপর।

মানসী : (অল্প থেমে) তা যে হয় না ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ : কেন হবে না?

মানসী : পথ যখন, তখন হাঁটতেই হবে!

ইন্দ্রজিৎ : অনেক তো হেঁটেছি।

মানসী: আরো হাঁটতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ : আমি ক্লান্ত।

মানসী : তবু হাঁটতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ : কেন? কেন? কেন? ঐ একই পথ, আমি হাঁটছি আর হাঁটছি আর হাঁটছি। তবু নিষ্কৃতি নেই?

মানসী : না, নিষ্কৃতি নেই।

লেখক :

তথাপি নিষ্কৃতি নেই। ক্লিন্ন মন। ভুখা দ্বিপ্রহর।
জাগা রাত। ছেঁড়াখোড়া দিন।
আমি আছি। বেঁচে আছি। জেগে আছি।
মনে আছে সব। আরো তো জীবন আছে বাকি।
যা ছিলাম, আজো আছি। আরো বহু দূরে
আরো আরো আরো থাকা
সবই তো আমার।—আমি এই!
তথাপি নিষ্কৃতি নেই।
আমি উড়ি শ্রান্তির পাখায়,
ডানামেলা বিশ্রামের ঘোরে
ওড়ে আর ওঠে নামে ভাসে
কুচি কুচি ছোটবেলা
গুঁড়ো গুঁড়ো আগের সময়।
আমি ঘুরি কাজের চাকায়,
আওয়াজে গম্ভীর করি
হাওয়া ভরি ফাঁপা কথা ঝুটো বেলুনেই;
তথাপি নিষ্কৃতি নেই।
তুমি তো আমাকে জানো,
তুমি জানো যতো কথা সব কথা
যারা আনে ঝঙ্কারের রব,
আলো আনে, নেশা আনে,
রঙিন কাপড়ে ঢাকে পচা গলা শব!
তুমি জানো সমুখে যা আছে
সবই গাঁথা পুরোনো সুতোয়
ফেলে আসা হয়ে যাওয়া ফুল।
তুমি জানো এখানেই আমি শেষ,
আমি মৃত আমাতেই!

কেন তবু এতোবার বলো—
আরো চলো, আরো চলো,
এখনো নিষ্কৃতি নেই?

ইন্দ্রজিৎ : কেন বলো?

মানসী : পথ যখন আছে, চলতেই হবে।

ইন্দ্রজিৎ : কেন চলতে হবে? কী আছে পথের শেষে? কিসের জন্য চলবো?

মানসী : আর সবাই কিসের জন্য চলে?

ইন্দ্রজিৎ : আর সবাই?

(সামনের দিকে অমলের প্রবেশ। লেখকের সঙ্গে দেখা।)

লেখক : এই যে অমল। কোথায় চললে?

অমল : পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি।

লেখক : পরীক্ষা? বুড়ো বয়সে আবার কী পরীক্ষা?

অমল : ইন্‌স্টিটিউট অফ্ বেটারম্যানশিপের পরীক্ষা। গতবারও দিয়েছিলাম। পাস করতে পারিনি। দেখি আর একবার চেষ্টা করে। এবার একটা করেস্‌পন্ডেন্স কোর্স নিয়েছি।

লেখক : এ পরীক্ষা দিয়ে লাভ কী?

অমল : লাভ আছে ভাই। এই ইন্‌স্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ পেয়ে গেলে প্রমোশন ঠেকায় কে? ম্যানেজারের পোস্টে যেতেও পরে আর কোনো অসুবিধে থাকবে না। চলি ভাই—লেট হয়ে যাবে।

(অমলের প্রস্থান। বিমলের প্রবেশ।)

লেখক : আরে বিমল যে! কোথায় চললে?

বিমল : যাচ্ছি একটু সিমেন্টের পারমিটের ধান্ধায়। তাগাদা না দিলে ফাইল তো নড়ে না ওদের!

লেখক : সিমেন্ট কী হবে?

বিমল : বাড়ি করছি। জমি কিনেছি, সি.আই.টি. স্কিমে। রিজার্ভ প্রাইস সাড়ে ছ' হাজার—নিলামে চড়ে গেলো ন'হাজার আটশো পঞ্চাশ। কী যে অবস্থা হয়েছে জমির! এখন বাড়ি করার টাকা কোত্থেকে জোটে বলো দিকিনি? গভর্নমেন্টের লোন, ইন্‌সিওরেন্স থেকে লোন, এমপ্লয়িজ ক্রেডিট সোসাইটি থেকে লোন—তবু দোতলার বেশি তুলতে পারছি না।

লেখক : তা এখন করছো কেন বাড়ি?

বিমল : আর কী করবো বলো? টাকার কোনো দাম আছে আজকাল? জমি বাড়ি তবু বুড়ো বয়সে মাথা গোঁজবার ঠাঁই। তা ছাড়া ছেলেপুলেগুলোর কথাও তো ভাবতে হবে? চলি ভাই—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

(বিমলের প্রস্থান। কমলের প্রবেশ।)

লেখক : কমল নাকি? কোথায় চললে?

কমল : এই একটু শ্যামলের অফিসে যাচ্ছি। শ্যামল একটা ফিনান্সিয়ার জোগাড় করেছে। দেখি যদি বোঝাতে পারি।

লেখক : কী বোঝাবে?

কমল : একটা ভালো বিজনেসের স্কিম পেয়েছি। ফুলপ্রুফ স্কিম। ইমপোর্ট লাইসেন্স পাওয়া যাবে, অ্যাসেমব্লিং-এর কোন ডিফিকাল্‌টি নেই, মার্কেট দারুণ। বাজারে মাল পড়তে পাবে না—সব বুক্‌ড ইন্‌ অ্যাডভান্স। স্রেফ ক্যাপিটালের জন্য ঠেকে আছে ভাই! শ্যামল আমি ধার-ধোর করে যা তুলেছি—তাতে কুলোচ্ছে না। ফিফ্‌টিন পার্সেন্ট সুদেও টাকা পাচ্ছি না।

লেখক : তা এখন এ ব্যবসা নাই করলে?

কমল : না করলে খাবো কী? এই তো চাকরি। মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছ'টি সন্তান। মেয়েটার টাইফয়েডে খসে গেলো একরাশ টাকা। মেজো ছেলে স্কুলে প্রমোশন পেলো না—এক বছরের খরচ লোকসান। এমনি করে কদ্দিন চলবে?—চলি ভাই, সময় হয়ে এসেছে।

(কমলের প্রস্থান। লেখকও চলে গেলো।)

ইন্দ্রজিৎ : আর সবাই। এই আর সবাই। এই অমল বিমল কমল!

মানসী : তবু তো ওরা চলেছে।

ইন্দ্রজিৎ : ওরা সুখী, মানসী। ওদের সামনে কিছু একটা আছে। ওদের লক্ষ্য আছে, আশা আছে, স্বপ্ন আছে।

মানসী : তোমার নেই?

ইন্দ্রজিৎ : না, নেই।

মানসী : কোনোদিন ছিল না?

ইন্দ্রজিৎ : হ্যাঁ ছিল। আমি নিজে ছিলাম। ধরে নিয়েছিলাম আমার কিছু একটা করবার আছে। কী—তা জানতাম না। একটা বিরাট কিছু, প্রকাণ্ড কিছু। স্বপ্ন দেখতাম—একটা বহ্নিমান জ্বলন্ত উল্কার মতো দিগন্ত ভেদ করে উঠেছি—আকাশ চিরে এক কোণ থেকে আর কোণ পর্যন্ত চিরে, শুধু উঠে যাচ্ছি, যতোক্ষণ না উল্কার আগুন নিঃশেষ হয়ে ভস্ম হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। শুধু আকাশে থাকছে একটা ক্ষণিক চোখ-ঝলসানো আলোর জ্বালা।

মানসী : ভস্ম হয়ে গেলে?

ইন্দ্রজিৎ : না মানসী। আলো ঝলসানো না। আকাশে জ্বালা রইলো না। আমি দিগন্ত ছিঁড়ে উঠতেই পারলাম না।

মানসী : কেন?

ইন্দ্রজিৎ : আমার ক্ষমতা নেই। কোনো দিন ছিল না। শুধু ক্ষমতার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সাধারণ। স্বীকার করতে যতোদিন পারিনি—স্বপ্ন ছিল। আজ স্বীকার করি।

মনসী : ইন্দ্রজিৎ!

ইন্দ্রজিৎ : না না, মানসী। ইন্দ্রজিৎ বোলো না। আমি ইন্দ্রজিৎ নই। আমি নির্মল। অমল বিমল কমল। এবং নির্মল। আমি অমল বিমল কমল নির্মল।

(বলতে বলতে ছটফট করে এগিয়ে এলো ইন্দ্রজিৎ সামনে। লেখক এসে পিছনে দাঁড়ালো। মানসী বসে রইলো।)

লেখক : ইন্দ্রজিৎ?

ইন্দ্রজিৎ : আপনি বোধ হয় ভুল করছেন। আমার নাম নির্মলকুমার রায়।

লেখক : আমাকে চিনতে পারছো না, ইন্দ্রজিৎ?

ইন্দ্রজিৎ : কে তুমি? লেখক?

লেখক : আমার নাটকটা যে শেষ করতে পারছি না ইন্দ্রজিৎ?

ইন্দ্রজিৎ : কী হবে শেষ করে? ওর শেষ নেই। ওর গোড়া শেষ সব এক।

লেখক : তবু তো লিখতে হবে?

ইন্দ্রজিৎ : তোমার লেখা আছে, তুমি লেখো। আমার কিছু নেই। আমি নির্মল।

লেখক : কিন্তু তোমার যে কিছু নেই। প্রমোশন নেই, বাড়ি করা নেই, ব্যবসার স্কিম নেই। কী করে নির্মল হবে তুমি?

ইন্দ্রজিৎ : কিন্তু—আমি যে সাধারণ!

লেখক : তবু তুমি নির্মল নও। আমিও সাধারণ। তবু আমি নির্মল নই। তোমার আমার নির্মল হবার আর উপায় নেই।

ইন্দ্রজিৎ : আমরা তবে কী নিয়ে থাকবো?

লেখক : পথ। আমাদের শুধু পথ আছে। আমরা হাঁটবো। আমার লেখবার কিছু নেই, তবু লিখবো। তোমার বলবার কিছু নেই, তবু বলবে। মানসীর বাঁচবার কিছু নেই, তবু বাঁচবে। আমাদের পথ আছে, আমরা হাঁটবো।

ইন্দ্রজিৎ : দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপে সিসিফাসের প্রেতাত্মা প্রকাণ্ড ভারি পাথরের চাঁই ঠেলে পাহাড়ের চূড়োয় তোলে। যেই চূড়োয় পৌঁছোয়, আবার গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় পাথরটা। আবার ঠেলে ঠেলে তোলে। আবার পড়ে যায়, আবার তোলে।

লেখক : আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে। যখন ঠেলে ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোনো মানে নেই। পাহাড়ের ঐ চূড়োর কোনো মানে নেই।

ইন্দ্রজিৎ : তবু ঠেলতে হবে।

লেখক : তবু ঠেলতে হবে। আমাদের আশা নেই, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের জানা। আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। আমরা জেনে গেছি—পেছনে যা ছিল, সামনেও তাই।

ইন্দ্রজিৎ : তবু বাঁচতে হবে?

লেখক : তবু বাঁচতে হবে। তবু চলতে হবে। আমাদের তীর্থ নেই, শুধু যাত্রা আছে। তীর্থযাত্রা।

(মানসী এসে লেখক আর ইন্দ্রজিতের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। তিনজনের চোখ সামনের দিকে, একটু উপরে, প্রেক্ষাগৃহের ছাতের কোণ ছাড়িয়ে, বাতাস ছাড়িয়ে, আকাশ ছাড়িয়ে, অনেক দূরে মেলা। যেখানে পথের দুটি রেখা একটি বিন্দুতে মিশেছে। একটি নিঃসঙ্গ আলোকরশ্মি তাদের উজ্জ্বল করে রেখেছে অন্ধকারের পটভূমিকায়। দূর থেকে লেখকের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ঘোষণা।)

কণ্ঠস্বর : আজো তাই
এ পথের শেষ নাহি পাই।

ফুরালে এ পথ
পূর্ণ হবে সর্ব মনোরথ
দেবতার সোপানশ্রেণীতে—
এ আশ্বাস নাই আর পথশ্রম দূর করে দিতে।
এ যাত্রায় তাই
উদ্দেশ হারালো আজ, অর্থ কিছু নাই।

তবে তাই হোক।
বৃথা প্রশ্ন চাপা থাক, ভুলে যাই শোক।
জীবনের প্রথম প্রভাতে
বিনা দ্বন্দ্বে বিনা প্রশ্নে উন্মুক্ত দু'হাতে
তীর্থপথ মহাদীক্ষা করেছি গ্রহণ।
দিবসান্তে আজ যেন মন
নাহি ভোলে সেই দীক্ষা। তীর্থ নয়,
তীর্থপথ আমাদের—মনে যেন রয়।

সারারাত্তির

মুখবন্ধ

নাটকটি ফ্রান্সের পূর্বসীমানার একটি শহরে বাস করার সময়ে লেখা। তিনটি মাত্র চরিত্র, তাদের নামের উল্লেখ নেই নাটকে, অতএব চরিত্রলিপি নিষ্প্রয়োজন।

বাদল সরকার

প্রথম দৃশ্য

(শূন্য ঘর। আধা অন্ধকার ঘর। বাইরে বৃষ্টি। বাইরে প্রচণ্ড দুর্যোগ। কিন্তু ঘরে স্তব্ধতা, ঘরের স্থিরতা অবিচলিত। মনে হয় অব্যবহৃত ঘর। ঘরে পরিচয়হীন ছোট বড়ো জগদ্দল একগাদা জিনিসপত্র। গুদাম? না। গুদাম নয়। গুদামে সাজানো থাকে। এখানে কিছুই সাজানো নেই। তবু একটা সংহতি। এই এলোমেলো রাখা যেন এক ইচ্ছাকৃত আজগুবি ঘর-সাজানো। কোথায় যেন প্রাণের আভাস। কোনো একটা প্রাণ যেন বেঁচে আছে; বাস করছে এই সংহত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে। কোনো একটা অস্তিত্বের গৃহকোণ এই ঘর। একান্ত নিজস্ব গৃহকোণ।

ওরা বাইরের। এ গৃহে ওদের অনধিকার প্রবেশ। দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা পেতে আশ্রয় খুঁজছে এই আবাসে। ক্ষণিকের জন্য। ভঙ্গ করছে এখানকার একান্ত নিজস্বতা। বাইরের কলরব, বাইরের ক্ষুদ্র বিবেচনা, আলোচনা, বাইরের কর্মব্যস্ত প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে ওরা আসছে এই জগৎ-ছাড়া নির্জন সংসারে।

দুম্ করে বাইরের দরজা বন্ধ করলো ওরা। এখনো এ ঘরের বাইরে। ওদের কণ্ঠস্বর আঘাত করছে এ ঘরের সমাহিত নিস্তব্ধতাকে।)

স্ত্রীকণ্ঠ : উঃ! এখানেও যে ভিজছি!

পুরুষকণ্ঠ : এখানে দাঁড়ানো যাবে না। ছাত দিয়ে জল পড়ছে।

স্ত্রীকণ্ঠ : ছাত কোথায়? ঐ দেখো—একদম ফাঁকা। কোথায় এলাম?

পুরুষকণ্ঠ : এদিকে এসো। সরে এসো-এদিকে।

স্ত্রীকণ্ঠ : কোথায় যাবো? সব তো সমান?

(দরজা খুলে পুরুষ ঢুকলো ঘরে। আধা অন্ধকার ঘরটা দেখবার চেষ্টা করলো।)

পুরুষ : এখানে চলে এসো, ভিতরে।

(স্ত্রী এলো ভিতরে।)

স্ত্রী : ভিতরে চলে এলে, না বলে কয়ে?

পুরুষ : কাকে কী বলবো? দেখছো না—ভাঙা পোড়ো বাড়ি?

স্ত্রী : আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। টর্চটা জ্বালো না।

পুরুষ : টর্চ জ্বলছে না, বললাম না তোমায়?

(বলতে বলতে জ্বলে উঠলো টর্চ। অনির্দিষ্ট আলো পড়লো স্ত্রীর মুখে মুহূর্তের জন্য।)

আরে। জ্বলছে তো এখন?

স্ত্রী : তবে?

পুরুষ : তবে মানে? তুমি জানতে বোধহয়, টর্চ জ্বলবে! (আলো ফেলে ঘরটাকে জানবার চেষ্টা করে পুরুষ)

স্ত্রী : আহা, চেষ্টা করে দেখবে তো? একবার জ্বলে নি বলেই ফেলে দেবে টর্চ?

পুরুষ : কী ছিল এটা? গুদাম?

স্ত্রী : ছিল কেন? এখন নেই?

পুরুষ : এই তেপান্তরের ফাঁকা মাঠে এখন আবার কী থাকবে?

স্ত্রী : ফাঁকা জায়গায় বাড়ি থাকে না? দেওঘরের সেই বাড়িটা দেখেছিলাম মনে আছে? পিকনিকের দিন?

পুরুষ : সে বাড়িটার আর্ধেক ছাত ধ্বসে গিয়েছিলো? সে বাড়িটার দরজাগুলো এমনি হাট করে খোলা ছিল? সব সময়ই তর্ক করবে, ভাববে না এক ফোঁটা।

স্ত্রী : তর্ক কে করছে? মনে হোলো—বললাম।

পুরুষ : মনে হোলো—বললাম! যখন যা মনে হবে—দুম করে বলে দেবে। বলবার আগে একটু বুদ্ধি খরচ করবে না।

(স্ত্রী চুপ করে গেলো। স্ত্রীর এই ধরনের নির্বুদ্ধিতায় পুরুষ যখনই এই ধরনের মেজাজ খারাপ করে, তখন স্ত্রীর আসল বুদ্ধি তাকে চুপ করিয়ে দেয়। কিন্তু ঘরের মেঝেয় যদি আচমকা খরখর আওয়াজ হয়, তবে চুপ করে থাকা মুস্কিল।)

স্ত্রী : উঃ মাগো!

পুরুষ : কী হোলো? (টর্চের আলো পড়ে স্ত্রীর উপর। খানিকটা নিজের উপরেও। কারণ স্ত্রী অতি নিকটে, এবং সে তার বাহুটা খামচে ধরেছে।)

স্ত্রী : কী যেন সর সর করে চলে গেলো ওদিক দিয়ে!

পুরুষ : (ওদিকে আলো ফেলে) কই?

স্ত্রী : ঐ—ওদিকে গেলো।

পুরুষ : ইঁদুর টিঁদুর হবে বোধ হয়।

স্ত্রী : সাপ নয় তো?

(সম্ভাবনাটা পুরুষের মাথায়ও এসেছিলো। তাই উত্তর দিতে মুহূর্তকাল দেরি হোলো এবং উত্তরে নিশ্চয়তার অতিরিক্ত প্রকাশ দেখা গেলো।)

পুরুষ : সাপ না কচু! মাথা খারাপ তোমার? শীতকালে সাপ বেরোয়?

স্ত্রী : শীতকাল কোথায়? সবে পুজো কাটলো!

পুরুষ : আরে পশ্চিমে এই সময়েই শীত। তোমার শীত করছে না? আমার তো বেশ কাঁপুনি ধরেছে। (স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বদলে গেলো সঙ্গে সঙ্গে)

স্ত্রী : দেখি? এ কী, ওয়াটারপ্রুফের কলারটা তুলে দাওনি? ঘাড়ের কাছে সমস্তটা ভিজে একেবারে—ছি ছি ছি!

পুরুষ : ও আর কতোটুকু? ওয়াটারপ্রুফটা ছিল বলে রক্ষে।

স্ত্রী : কে আনতে বলে মশাই পৈ পৈ করে? তুমি তো বোঝা বইবার ভয়ে মরো রোজ।

পুরুষ : বা বা বা। তাই বলে আজ এতোদূরে আসছি, না নিয়ে বেরোতুম?

স্ত্রী : তুমি তো বেরুবার সময়ে শুকনো দেখলেই বলো—বিষ্টি হবে না!

পুরুষ : আজ বলেছি?

স্ত্রী : রোজই তো বলো।

পুরুষ : রোজের কথা হচ্ছে না। আজ বলেছি কি না বলো।

স্ত্রী : আজ একদিন হয়তো বলো নি—

পুরুষ : (থামিয়ে দিয়ে) তাই বলো।

(স্ত্রীকে আবার চুপ করতে হলো। আজ মুখে বলে নি বটে, তবে বলতে পারতো, মনে

মনে ভেবেছিলো নিশ্চয়ই। বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে এ যুক্তিটা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা করা যেতো। কিন্তু এই পোড়ো ঘরে, অন্ধকারে, তার উপর—মাগো, কী সব ছুটোছুটি করছে ঘরে, থাকগে ওসব যুক্তি।)

তুমি ভিজেছো?

স্ত্রী : না। পায়ের কাছের কাপড়টা ভিজেছে শুধু।

পুরুষ : ইস্! এই মাঠের মধ্যে অমন লুটিয়ে পরবার কী দরকার ছিল? কে দেখছিলো এখানে?

স্ত্রী : লুটিয়ে কোথায় পারলাম? এই অ্যাতোখানি তুলে নিয়ে তো দৌড়েছি!

পুরুষ : অ্যাতোখানি তুললে কখনো এ রকম ভেজে?

স্ত্রী : এ তো ওয়াটারপ্রুফের জল গড়িয়ে ভিজেছে। নিজেরটা দেখেছো চেয়ে?

(কথাটা সত্যি। তাই বলে পুরুষ তো চুপ করে যেতে পারে না। তাকে অন্য কথা বলতে হয়।)

পুরুষ : নিংড়ে ফেলো। নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

স্ত্রী : (নিংড়োতে নিংড়োতে) ইস্ নতুন শাড়িটা!

পুরুষ : নতুন? তোমার মা এটা দিয়েছেন অন্তত তিন বছর হয়ে গেলো।

স্ত্রী: তুমি তো সব জানো! মা দিয়েছে এটা?

পুরুষ : তবে কে দিয়েছে?

স্ত্রী : এটা তো বড়ো বৌদি দিলো গেলো পুজোয়? কতো খবর রাখেন আমার কাপড়ের!

পুরুষ : আমার তো খেয়ে দেয়ে কম্মো নেই, তোমার বড়ো বৌদি বড়োলোকি দেখাতে কবে কোন্ কাপড় দিলো তার হিসেব রাখি!

(এটা তর্ক নয়। এ আঘাত। অকারণ আর নির্মম মনে হয় এ আঘাত। খুব সহজভাবে আসে বলেই বেশি নির্মম। এ আঘাতে বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে চুপ করে যেতে শিখেছে স্ত্রী। কিন্তু এখানে এই অবাস্তব খাপছাড়া পরিবেশে সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে।)

স্ত্রী : যা তা বোলো না, বুঝলে?

(ছোট জবাব। কিন্তু বলবার আগে এক মুহূর্তের নীরবতা কঠিন করে তুলেছে জবাবটাকে। গলার স্বরেও অনেক তফাত, অনেক ভিতর থেকে এসেছে ঐ ক'টা কথা। এতোটা বোঝে না পুরুষ। কাঠিন্যটা বোঝে, কারণটা বোঝে না। বোঝার অভ্যাস নেই।)

পুরুষ : কী হোলো?

স্ত্রী : কিছু হয়নি। চুপ করো।

পুরুষ : কেন, কী বলেছি কী?

স্ত্রী : কিছু বলোনি,—এইখানে কি সারারাত বসে থাকবে না কি?

পুরুষ : বৃষ্টিটা থামুক!

স্ত্রী : বৃষ্টি আর থেমেছে আজ। বেরিয়ে দেখো না—কমলো কি না।

(প্রায় আদেশ। পুরুষকে যেতে হয়।)

পুরুষ : টর্চটা তুমি রাখো।

স্ত্রী : টর্চ আমি রাখবো, আর তুমি অন্ধকারে দেখবে কী করে বৃষ্টি কমলো কি না?

পুরুষ : আহা, হাত বাড়ালেই তো বোঝা যাবে!

স্ত্রী : থাক, আর ভিজতে হবে না।

(অগত্যা টর্চ নিয়েই পুরুষ বেরোয়। টর্চে আর কতোটুকু আলো, তবু ঘরটা যেন একেবারে নিভে যায়। একটা ফিসফিসে প্রতিধ্বনি—হবে না হবে না হবে না। মনের ভুল? তাই হবে। স্ত্রী নড়েচড়ে বসে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এদিক ওদিক চমকে তাকিয়ে ফেলে। আবছা অন্ধকারে খানিক দূর দেখা যায়। কতকগুলি আকারহীন প্রয়োজনহীন বস্তুর আবছা আকৃতি। কিন্তু প্রতিধ্বনি যেন আরো স্পষ্ট। হবে না হবে না হবে না। স্ত্রী উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে যেতে চায়। ছুটে পালিয়ে যাবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছে। কিন্তু তবু নড়া যায় না। ঘরের সম্মোহন আটকে রাখে। আটকে রেখে শোনায়—হবে না হবে না হবে না। পুরুষ প্রবেশ করে আবার। তার হাতের আলো অন্ধকারের খানিকটা চিরে দেয়। তার গলার স্বর প্রতিধ্বনিকে স্তব্ধ করে।)

পুরুষ : নাঃ, বৃষ্টি থামে নি।

(বৃষ্টি যে থামে নি, সে তো জানা কথা। বলা হয়েছিলো কমেছে কি না দেখতে। কিন্তু সে কথা বলতে গিয়ে থেমে যেতে হয়। ঐ আবার সেই প্রতিধ্বনি। থামে নি থামে নি থামে নি থামে নি—)

কী? হোলো? কী দেখছো অমন করে?

(দর্শনীয় বস্তুর দিকে টর্চের আলো ফেলে পুরুষ। একটা ভাঙা জগদ্দল বস্তু। কিন্তু তাই কি দেখছিলো স্ত্রী অমন করে চেয়ে?)

স্ত্রী : (ফিসফিস করে) শুনতে পাচ্ছো না?

পুরুষ : কী?

(কী? কিছুই না। থেমে গেছে সব। স্ত্রী হাসবার দুর্বল চেষ্টা করে।)

স্ত্রী : আমার যেন মনে হোলো—ঘরটায় প্রতিধ্বনি হয়।

পুরুষ : প্রতিধ্বনি? কই, শুনি নি তো এতোক্ষণ?

স্ত্রী : ঐ যে তুমি বললে না—বৃষ্টি থামে নি? আমার যেন মনে হোলো প্রতিধ্বনি শুনলাম—থামে নি?

(ঠিকই। আবার শুরু হয়েছে—থামে নি, থামে নি, থামে নি—)

পুরুষ : হ্যাঁ, সত্যি তো?

(সত্যি, কিন্তু নতুন কথার নতুন প্রতিধ্বনি হোলো না। সেই পুরোনো কথা—থামে নি, থামে নি, থামে নি। এ ভালো নয়। এ তো হবার কথা নয়? যা হবার কথা নয় তা হওয়া তো ভালো নয়। হঠাৎ চিৎকার করে প্রতিধ্বনি শুনতে চায় পুরুষ।)

এ—ই!

(চমকে কাছে সরে আসে স্ত্রী। এতোক্ষণ বহু কথা বলেছে ওরা, ঘরের একান্ত পরিবেশকে অনেক ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু এ চিৎকার মাত্রা-ছাড়া। এ চিৎকার অভদ্র, অশালীন। প্রতিধ্বনি আসে না। পুরোনো প্রতিধ্বনি থেমে যায়। ঘরের নিস্তব্ধতায় অসমর্থনের ভ্রূকুটি।)

পুরুষ : কী হোলো? ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

স্ত্রী : না, চমকে গিয়েছিলাম। তুমি এমন চেঁচিয়ে উঠলে হঠাৎ।

পুরুষ : দেখছিলাম—প্রতিধ্বনি হয় কি না।

স্ত্রী : কই, হোলো না তো? (একটু চুপ করে শুনে) এখন তো হচ্ছে না আর?

পুরুষ : আমার মনে হয় ঘরটার গড়নে কোনো একটা ব্যাপার আছে। এক একটা আওয়াজ ধরে নেয় বোধ হয়।

স্ত্রী : সে আবার হয় না কি কখনো?

পুরুষ : তা ছাড়া আর কী হতে পারে বলো? (স্ত্রী চুপ করে রইলো। তার মুখে ভয়।) কী? ভূত?

স্ত্রী : আঃ, চুপ করো।

পুরুষ : (হেসে উঠে) অ্যাই! ঠিক ধরেছি! ভূতের ভয় ঢুকেছে মাথায়।

স্ত্রী : (দুর্বল হেসে) ধ্যাৎ! ভূত না তোমার মাথা।

পুরুষ : বটে? ঐ দিকে যাও তো একবার?

স্ত্রী : ওদিকে যাবো কী করতে?

পুরুষ : যাও না। দেখি কতো সাহস।

স্ত্রী : (দু'পা এগিয়ে) কী হয়েছে? এই তো।

পুরুষ : আরো যাও।

স্ত্রী : (ফিরে এসে) হ্যাঁ, আর সাপে কামড়াক।

পুরুষ : সাপ তো এদিকেও থাকতে পারে।

স্ত্রী : এদিকটায় জঞ্জাল কম।

পুরুষ : আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখানে দাঁড়াও। (ওদিকে এগিয়ে গেলো কয়েক পা)

স্ত্রী : কোথায় যাচ্ছো? (পুরুষের পেছনে এক পা গেলো)

পুরুষ : দাঁড়াও না ওখানে। একা দাঁড়াতে ভয় করছে?

স্ত্রী : আহা, এতেক্ষণ একা ছিলাম না এ ঘরে?

পুরুষ : (হাসতে হাসতে) যতো সাহস কলকাতায়। বাইরে এলেই ভূতের ভয়।

স্ত্রী : মোটেই না।

পুরুষ : না তো কী?

স্ত্রী : আহা, হাজারিবাগের ঐ ফাঁকা বাংলোটায় একটা পুরো সন্ধে আমি একা ছিলাম না? যেদিন তুমি ভবতোষবাবুদের এগিয়ে দিতে গিয়ে দেরি করলে?

পুরুষ : সে তো চৌকিদার ছিল।

স্ত্রী : কাঁচকলা ছিল। চৌকিদার কোথায় ভেগে গেলো তার পাত্তাই নেই! ঐ হ্যারিকেনের লাইটে দু'টি ঘণ্টা আমি একদম একা—

(আবার প্রতিধ্বনি শুরু হোলো—একা, একা, একা। স্ত্রী ছুটে এলো পুরুষের কাছে। পুরুষও চমকে উঠেছিলো, তার ঠাট্টার মেজাজ নেই আর। অল্প পরে) চলো বেরোই। (তার কণ্ঠস্বর চাপা। যেন সমীহ করেছে ঘরের নীরবতাকে। কিংবা হয়তো ভয় করছে নতুন প্রতিধ্বনির। পুরুষের কণ্ঠও নেমে এসেছে।)

পুরুষ : কোথায় বেরোবে? ভীষণ বৃষ্টি!

—হ্যাঁ, ভীষণ বৃষ্টি!

(এ প্রতিধ্বনি নয়। স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর—একেবারে ঘরের ভিতরে। নির্দিষ্ট এক জায়গায়। চমকানো টর্চের আলো সে জায়গায় ঠিকরে গিয়ে পড়ে। আলোকিত করে এক বৃদ্ধকে। বৃদ্ধই হবে। সমস্ত চুল পাকা, কপালে গালে চিবুকে গভীর রেখা কয়েকটা। কিন্তু প্রথম দৃষ্টির পরে আর অতোটা নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধ বলে মনে হয় না। ছোট্ট মানুষটি, লম্বা

চওড়া নয়। অতি সাধারণ চেহারা, সাধারণ বেশভূষা। তবু যেন কোথায় অসাধারণত্ব আছে। হয়তো দুই চোখে। হয়তো দাঁড়াবার সহজ ঋজু ভঙ্গীতে। হয়তো এই অদ্ভুত পরিবেশে অভাবনীয় আকস্মিক আবির্ভাবে। এ আবির্ভাব যদি ভয়াবহ হোতো তবে বোধহয় এতো অসাধারণ লাগতো না। কিন্তু বৃদ্ধের মুখ সরল অভ্যর্থনায় সহাস্য। যেন কলকাতার এক গলিতে রকে দাঁড়িয়ে ভিজতে দেখে দরজা খুলে আহ্বান জানাচ্ছেন শুকনো সাজানো বৈঠকখানায়।)

বৃদ্ধ : ভীষণ বৃষ্টি। এখন যেতে পারবেন না। একটু বসে যান।

পুরুষ : আ-আপনি—

বৃদ্ধ : আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা আমারই বাড়ি। বসুন। বসাবোই বা কোথায়? এ কি বসবার মতো ঘর? এইখানেই বসুন একটু কষ্ট করে, কতোক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন?

(রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিলেন বৃদ্ধ এক ভাঙা আসবাবের। বাধা দিতে ভুলে গেলো এরা। বড়ো অবাস্তব, বড়ো অসম্ভব এখানে এই পরিচিত জগতের আপ্যায়ন।)

দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।

(কোথায় যেন সুইচ টিপলেন, বোঝা গেলো না, কিন্তু আলো জ্বললো। যথেষ্ট আলো, কিন্তু ঘরের বেখাপ্পা বস্তুগুলো এলোমেলো ছায়া ফেলেছে যেখানে সেখানে।)

হ্যাঁ ইলেকট্রিক। অবাক হয়ে গেলেন তো? ছোট একটা ডায়নামো আছে। কেরোসিনে চলে।

পুরুষ : আপনি—এখানে থাকেন?

বৃদ্ধ : আমি এখানে থাকি। থাকবার যোগ্য মনে হচ্ছে না বাড়িটাকে, না?

পুরুষ : (অপ্রস্তুত) না না, তা কেন—

(বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা হাসি।)

বৃদ্ধ : লজ্জা পেয়ে গেলেন নাকি? ঠিক কথাই ভেবেছেন। বাড়িটাকে বাসযোগ্য বলা চলে না। আমিও তেমনি অগোছালো—যেমন তেমন পড়ে আছে। অতিথি সজ্জন বড়ো একটা পায়ের ধুলো দেন না তো?

পুরুষ : না আমি—সব খোলা পড়ে আছে দেখে—

বৃদ্ধ : হ্যাঁ খোলাই থাকে। কেউ আসে না। চোরও আসে না।

পুরুষ : এখানে এরকমভাবে—

(প্রশ্ন আসছে। স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরের সময় হয়নি। বৃদ্ধ সোজা স্ত্রীর দিকে ফেরেন।)

বৃদ্ধ : ওয়াটারপ্রুফটা খুলে ফেলুন। কাপড় ছাড়বেন? শাড়ি নেই কিন্তু। ধুতি দিতে পারি। তাও থান ধুতি।

স্ত্রী : না না, দরকার নেই।

বৃদ্ধ : কেন, থান বলে?

স্ত্রী : না না, তা কেন, মানে—

বৃদ্ধ : লাল কালি আছে। ধুতিতে যদি খানিকটা ছিটিয়ে দিই?

(বৃদ্ধের কথায় কৌতুকের আভাস। এ-সব কথা কেন? ওবা অস্বস্তি বোধ করে।)

স্ত্রী : না, সে কথা নয়। এখুনি তো যাবো আমরা।

পুরুষ : হ্যাঁ, বৃষ্টি একটু কমলেই—

বৃদ্ধ : বসুন, চা নিয়ে আসি।

(এরা কিছু বলবার আগেই বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অর্থাৎ চলে গেলেন। বড়ো বড়ো বস্তুগুলি লম্বা লম্বা ছায়ায় এমন অবস্থা করে রেখেছে যে একটু আড়ালে গেলেই মনে হয় উবে গেলো বুঝি।)

স্ত্রী : আমার ভালো লাগছে না। চলো বেরোই।

পুরুষ : বেরোবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

স্ত্রী : বৃষ্টিতে ভিজলে কী হবে? ভিজিনি কখনো?

পুরুষ : হ্যাঁ, ভিজেছো—কলকাতায়, বাড়ির ছাতে। একবার বাইরে গিয়ে দেখে এসো কী অবস্থা! (স্ত্রী রওনা দিলো) কোথায় যাচ্ছো?

স্ত্রী : বাইরে গিয়ে দেখতে।

পুরুষ : তোমার যে এক এক সময় কী মাথায় চাপে! মাঠ থৈ থৈ করছে জলে। ওদিকের রাস্তা তো খাল হয়ে গেছে নির্ঘাত এতোক্ষণে। তারপর এই অন্ধকার।

স্ত্রী : টর্চ তো আছে।

পুরুষ : টর্চ তো নৌকা নয়! পার হবে কিসে?

স্ত্রী : আহা মাঠের মধ্যে কতো জল আর জমবে! বরং কলকাতা হলে জল জমতো।

পুরুষ : বুদ্ধি কি ভগবান ঘটে একটুও দেন নি? বলি রাস্তা খুঁজে পাবে? সখ করে তো রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভাঙতে নেমেছিলে!

স্ত্রী : হ্যাঁ, আমি একাই তো নেমেছিলাম!

পুরুষ : তুমি তো বললে প্রথম—চলো মাঠ দিয়ে যাই!

স্ত্রী : হ্যাঁ, আর তুমি কিছুতেই রাস্তা ছাড়তে রাজি হচ্ছিলে না, আমি জোর করে তোমাকে টেনে নিয়ে এলাম!

পুরুষ : আজে-বাজে কথা বলে তো কোনো লাভ নেই।

স্ত্রী : কে আজে-বাজে কথা বলছে? তুমি তো বলছো—নৌকো চাই।

(পুরুষ জবাব দিলো না। স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতা যখন চরমে ওঠে, জবাব না দেওয়াই ভালো। এ নীরবতা আরো অসহ্য। স্ত্রীর কণ্ঠে ঝাঁজ বাড়ে।)

তা কী করবে কী? বসে থাকবে এখানে?

পুরুষ : তা বৃষ্টি না কমলে আর কী করবো?

স্ত্রী : বৃষ্টি যদি সারারাত্তির পড়ে? (পুরুষ জবাব দিলো না। কারণ জবাব নেই এর।) কী, বলো? বৃষ্টি যদি চলে সারারাত্তির? (পুরুষ জবাব দিলো না। জবাব দিলো প্রতিধ্বনি। সারারাত্তির, সারারাত্তির।) ঐ আবার, শুনছো?

পুরুষ : কী?

স্ত্রী : ঐ যে—প্রতিধ্বনি। সারারাত্তির, সারারাত্তির—

বৃদ্ধ : সারারাত্তির, সারারাত্তির। কী সারারাত্তির?

(বলা হয়নি, বৃদ্ধের প্রবেশ হয়েছে এর মধ্যে। কোথায় কোন্ বিদ্‌ঘুটে বস্তুর ছায়ার আড়াল থেকে হঠাৎ আবির্ভাব হয়, বোঝাই যায় না। এরাও বোঝেনি, তাই চমকে ওঠে। বৃদ্ধ হাতের ট্রে রাখেন এক প্যাকিং বাক্সের উপর।)

সারারাত্তির কী?

পুরুষ : আমার স্ত্রী বলছিলেন—যা বৃষ্টি, সারারাত্তির চলাও আশ্চর্য নয়।

বৃদ্ধ : কিছুই আশ্চর্য নয়। সারারাত্তির দুই চোখ মেলে জেগে কাটিয়ে দেয় মানুষ তাও আশ্চর্য নয়। সারারাত্তির ওইরকম জেগে থেকেছেন কখনো?

পুরুষ : আমি? না, সারারাত্তির নয়—তবে—

স্ত্রী : তবে—কী? রাত বারোটা অবধিও জেগেছো কখনো? আমি তো দেখি নি।
(এ কথাটা এখানে এখন বলবার কী অর্থ হতে পারে? পুরুষের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।)

বৃদ্ধ : আমি জেগেছি। সারারাত্তির।
সারারাত্তির সারারাত্তির
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি
দুই চোখ মেলে জেগেছি দেখেছি
তন্দ্রাবিহীন দুই চোখ মেলে
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি জেনেছি।

স্ত্রী : আপনি কবিতা লেখেন নাকি? (বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠলেন)

বৃদ্ধ : এ কি একটা কবিতা হোলো নাকি? ইংরিজিতে বলে না—ঘুম না হলে কল্পনা করবে একটা একটা করে ভেড়া লাফিয়ে বেড়া পার হচ্ছে। ঐ ভেড়া গুণতে গুণতে ঘুম এসে যাবে। এও তাই। ভেড়াকে বেড়া পার না করে কথা নিয়ে লোফালুফি। নিন চা নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।
(পুরুষ চা মুখে নিলো। বেশি গরম, একটু চমকাতে হলো। বৃদ্ধের চোখে কৌতুক।)

স্ত্রী : আপনার চা?

বৃদ্ধ : আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন।

স্ত্রী : (চট করে) চা তবে কে খায় বাড়িতে?
(বৃদ্ধ হাসলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। কোনো শিশু নিজের বয়সের আন্দাজে বেশি বুদ্ধির পরিচয় যদি দেয় হঠাৎ কোনো কথায় তবে যেমন করে বড়োরা হাসেন—খানিকটা গর্বে আর অনেকটা স্নেহে।)

বৃদ্ধ : না, এ বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি একা।
(স্ত্রী অপ্রস্তুত হোলো। চায়ের পেয়ালা তুলে নিলো তাড়াতাড়ি।)

পুরুষ : আপনি একা থাকেন?

বৃদ্ধ : চা-টা খাবার মতো হয়েছে?

স্ত্রী : খুব ভালো হয়েছে চা।

বৃদ্ধ : চায়ের খুব দরকার ছিল তার মানে।

পুরুষ : দরকার বলে দরকার? সেই বেলা তিনটেয় একটা গেঁয়ো দোকানে চা খেয়েছি—ব্যাস্। তাও বিচ্ছিরি, তেঁতো!

বৃদ্ধ : ক্ষিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব?

পুরুষ : ক্ষিদে? না তেমন—

স্ত্রী : (তাড়াতাড়ি) না না, সঙ্গে খাবার ছিল—এই সন্ধেবেলা খেয়েছি।
(কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু পুরুষকে গুম খেয়ে যেতে হয়। মনে হয়—ক্ষিদের কথাটা মনে না করালেই ভালো হোতো। বৃদ্ধ আবার হাসেন।)

বৃদ্ধ : চায়ের সঙ্গে আর কিছু দিলাম না। খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছি, বেশিক্ষণ লাগবে না।

পুরুষ : খিচুড়ি?

(এ উক্তিটি বিস্ময়ের না আনন্দের বলা শক্ত। আপত্তির নিশ্চয়ই নয়। আপত্তি করলো স্ত্রী। মেয়েদের কি ক্ষিদে কম পায়?)

স্ত্রী : সে কী? না না, তা হয় না।

বৃদ্ধ : কেন হয় না? খুব খারাপ রাঁধি না, খেয়ে দেখবেন।

স্ত্রী : না না, খারাপ রাঁধবেন কেন? কিন্তু—আমরা তো এক্ষুনি যাবো—বৃষ্টিটা একটু কমলেই—

বৃদ্ধ : এইমাত্র যে বলছিলেন—বৃষ্টি যদি সারারাত্তির চলে?

স্ত্রী : (অনিশ্চয়তাভাবে) না, কমে যাবে।

পুরুষ : সিগারেট?

বৃদ্ধ : সিগারেটও ছেড়ে দিয়েছি। ধন্যবাদ।(পুরুষ সিগারেট ধরালো। অল্পক্ষণ নীরবতা)

স্ত্রী : একটু বেরিয়ে দেখো না, কমলো কিনা।

বৃদ্ধ : কমে নি। খিচুড়ি পর্যন্ত সারা-রাত্তিরের চিন্তাটাকে মুলতুবি রাখুন। অন্য কথা হোক। অনেকদিন 'কথা' শুনিনি। কথা বলুন।

('কথা বলুন' বললে কথা বলা মুশকিল হয়ে পড়ে। এক প্রশ্ন করা চলে, যে প্রশ্ন কিছুতেই মরছে না।)

পুরুষ : আপনি—একা থাকেন এখানে?

বৃদ্ধ : আপনি কথাটা ভুলতে পারছেন না দেখছি।

পুরুষ : না, মানে, এখানে, এরকমভাবে—

বৃদ্ধ : কেন থাকি, এই তো?

(পুরুষ একটা অস্ফুট আওয়াজ করলো। বোঝা গেলো প্রশ্নটা তাই।)

পুরুষ : আ:চ্ছা, কেন বারবার জিজ্ঞেস করছো? ওঁর হয়তো বলতে আপত্তি আছে।

(বৃদ্ধ আবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন।)

বৃদ্ধ : না, বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সব কথা সহজে বলে বোঝানো যায় না।

স্ত্রী : কেন যাবে না?

বৃদ্ধ : আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি—আপনি কেন একা থাকেন? বলে বোঝাতে পারবেন?

পুরুষ : কিন্তু ও তো একা থাকে না?

(বৃদ্ধ কিন্তু স্ত্রীর দিকেই চেয়ে আছেন, যেন শুনতে পান নি।)

স্ত্রী : আমি—আমরা তো একা থাকি না।

(পুরুষের চেয়ে দুর্বল কিন্তু কথার সুরটা)

বৃদ্ধ : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। আপনারা তো একা থাকেন না। ঠিক কথা।

(একবাক্যে মেনে নেওয়াটা কেমন যেন পরিহাসের মতো শোনায়। অবশ্য আগাগোড়াই বৃদ্ধের কথাবার্তায় একটু পরিহাসের ছোঁয়াচ।)

আপনাদের দেখে অনেকে বোধ হয় ভাবে আপনাদের সদ্য বিয়ে হয়েছে?

পুরুষ : হ্যাঁ, অনেকে বলেছে বটে।

স্ত্রী : আপনি যে ভাবেন নি সেটা বোঝা গেলো।
(হাসলো সে, কিন্তু একটু যেন ক্ষুণ্ণ। লোকের ওই ভুলটা খানিকটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। বৃদ্ধও হাসলেন—অপরাধ স্বীকারের হাসি।)
আচ্ছা, কতো বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে আন্দাজ করুন তো?

বৃদ্ধ : বলবো? (দু'জনকে একবার ভালো করে দেখে) সাত বছর। (এরা একবার মুখ চাওয়া-চাওই করলো।) কী, হয়েছে ঠিক?

স্ত্রী : আপনি কি গুণতে জানেন না কি?

পুরুষ : কাল আমাদের বিয়ের তারিখ। সাত বছর পুরবে কাল।

স্ত্রী : আমি তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত বলতে শুনেছি। এখন অবধি কেউ তিন বছরের বেশি বলে নি। আপনি কী করে বললেন ভাবছি!

বৃদ্ধ : আমি খুব ভেবে বলি নি। সাত বছর সম্বন্ধে আমার একটা থিওরী আছে। আমার মনে হয়, সাত-বছরটা মানুষের জীবনে একটা একক। একটা ইউনিট, বা মডিউল, বা মাপকাঠি—যা বলেন। সাত এক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ, চার সাত্তে আঠাশ, পাঁচ সাত্তে পঁয়ত্রিশ—বয়সগুলো কল্পনা করুন? সাত, চোদ্দ, একুশ, আঠাশ, পঁয়ত্রিশ, বিয়াল্লিশ। বয়সের এক-একটা সন্ধিক্ষণ। একটা পুরোনো চেতনার শেষ। নতুন চেতনার আরম্ভ।

পুরুষ : সে তো অন্য কোনো সংখ্যা ধরলেও হতে পারে?

বৃদ্ধ : যেমন?

পুরুষ : এই ধরুন, ধরুন পাঁচ?

বৃদ্ধ : দেখুন ভেবে। পাঁচ, দশ, পনেরো, কুড়ি, পঁচিশ। ঠিক সাতের মতো হচ্ছে কি?
(ভেবে দেখলো ওরা। ঠিক যেন হচ্ছে না।)

স্ত্রী : আচ্ছা—আট?
(বৃদ্ধ কিছু বললেন না। ওরাই আট ষোলো চব্বিশ মনে মনে ভেবে দেখলো।)

পুরুষ : (প্রায় জিতে গেছে) কিন্তু পাঁচ আষ্টে চল্লিশ!

বৃদ্ধ : (হেসে) অর্থাৎ আপনার বয়স পঁয়ত্রিশ।

পুরুষ : কী করে জানলেন?

বৃদ্ধ : পঁয়ত্রিশ হলেই চল্লিশ সংখ্যাটা মাথায় চাপে সাধারণত। প্রায় ভীতির মতো। তা ছাড়া আমার ইউনিটের ঝোঁক—পাঁচ সাত্তে পঁয়ত্রিশ।

স্ত্রী : আচ্ছা, আমার বয়স কতো বলুন তো?
(বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। হাসি নেই এবার।)

বৃদ্ধ : মেয়েদের বয়স আন্দাজ করতে নেই। নইলে বলতাম—যে বয়সে মেয়েরা সমস্ত পুরোনো জীবনটা খতিয়ে হিসেব করতে বসে—আপনার সেই বয়স।

স্ত্রী : কতো?
(হয়তো শোনার ভুল, কিন্তু সুরটা যেন একটু ফিসফিসে। একটু যেন সময় লাগলো প্রশ্নটা করতে।)

বৃদ্ধ : চার সাত্তে আঠাশ। বসুন খিচুড়িটা দেখে আসি।

(দু'টো কথাই প্রায় এক সুরে বলে বৃদ্ধ ছায়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পুরুষ স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছে। স্ত্রী তা জানে, জানে বলেই অন্য দিকে ফিরে আছে সে। অল্পক্ষণ।)

পুরুষ : তোমার জন্মদিন গেলো কবে?

স্ত্রী : এর মধ্যে ভুলে গেলে?

(খুব আস্তে বলা কথা। কিন্তু খুব স্পষ্ট। অভিমান নয়, একটা মেনে নেওয়া। একটা অভ্যাস। তবু একটা বঞ্চনার অনুভূতি। পুরুষের অস্বস্তি লাগে। হালকা হতে হয় অন্য কথা বলে।)

পুরুষ : বুড়োর কিন্তু অদ্ভুত আন্দাজ! সব ক'টা লেগে যাচ্ছে! (স্ত্রী কথা বললো না) ওঃ, ক্ষিদে যা পেয়েছে না? নাড়িভুঁড়ি-শুদ্ধু যেন হজম হয়ে গেছে! (স্ত্রী নীরব) বুড়োর খিচুড়ির আইডিয়াটা ভালো। এমনি তো রাত্তিরে কী ভোগান্তি আছে কপালে কে জানে, তার উপরে যদি আবার খালি পেটে হোতো—তবেই হয়েছিলো আর কি। (স্ত্রী তবুও নিরুত্তর) কী, কথা বলছো না যে?

স্ত্রী : কী বলবো?

পুরুষ : একটা কিছু বলো? একেবারে চুপ করে গেলে যে?

স্ত্রী : শুনছি।

পুরুষ : কী শুনছো?

স্ত্রী : তোমার কথা।

পুরুষ : (হেসে) আমার কথা এরকম নিঃশব্দে শুনে যাওয়া তো তোমার ধাতে ছিল না কোনোদিন?

স্ত্রী : আমার ধাতে কী আছে না আছে, তুমি জানো সব?

পুরুষ : জানি না? সাত বছর ঘর করছি, তোমার ধাত জানবো না?

স্ত্রী : (অন্যমনস্কভাবে) সাত বছর!

পুরুষ : কী হোলো? বুড়োর সাতের থিওরী মাথায় ঢুকে গেছে নাকি?

স্ত্রী : বোধ হয়।

পুরুষ : এমন অদ্ভুত থিওরী কখনো শুনিনি বাবা। সাত এক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ! বুড়োর মাথায় একটু ছিট আছে না?

স্ত্রী : তা আছে। নইলে খামোখা দু'টো উটকো লোকের জন্যে খিচুড়ি চাপায়?

পুরুষ : খিচুড়ির কথা কে বলছে? আমি বলছি—বুড়োর কথাগুলো একটু ইয়ে না!

(কিন্তু সুর মিলছে না। দু'জনের সুর মিলছে না।)

কী হয়েছে তোমার বলো তো?

স্ত্রী : কী আবার হবে?

পুরুষ : কথাবার্তা বলছো না। বসে বসে কী যেন ভাবছো।

স্ত্রী : ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবছি।

পুরুষ : কোন কথা?

স্ত্রী : আঠাশ বছরে মেয়েরা কী করে না করে—ও জানলো কী করে?

পুরুষ : আঠাশ বছরে কী করে? ও—ঐ হিসেব? কেন, তুমি হিসেব করো নাকি?

স্ত্রী : করি। সব মেয়েই বোধ হয় করে।

পুরুষ : কাঁচকলা করে!

স্ত্রী : তুমি জানবে কী করে?

পুরুষ : তুমিই বা জানছো কী করে যে সব মেয়েই করে?

স্ত্রী : আমি তো করছি।

পুরুষ : তোমার তো উদ্ভট কিছু শুনলেই মাথায় চাপে।

স্ত্রী : কোন্ উদ্ভট কথা শুনে মাথায় চাপে আমার?

পুরুষ : চাপে না? রঞ্জনের যতো উদ্ভট কথা তুমি হাঁ করে গেলো না? অদ্ভুত কিছু দেখলে বা শুনলেই তোমার কল্পনা চাগিয়ে ওঠে। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ তুমি!

স্ত্রী : এই গালাগালটা কতোবার যে তোমার মুখে শুনলাম! শুনে শুনে এক-এক সময় মনে হয়, সত্যিই বুঝি কল্পনাপ্রবণ হওয়া একটা দোষ।

পুরুষ : দোষ নয়? কোথায় কোন আধপাগলা বুড়ো এক আজগুবি নামতা-পড়া থিওরী শোনালো—আর তুমি অমনি জীবনের হিসেব মেলাতে বসলে! যতো সব! (স্ত্রী নিরুত্তর) তা হিসেব করে কী পেলে? শূন্য?

স্ত্রী : আচ্ছা, কেন অমন করছো বলো তো? কী করেছি আমি তোমার?
(এ আবার কীরকম কথা? কী রকম সুর? অবাক হয়ে গেলো পুরুষ।)

পুরুষ : কেন, কী করলাম?

স্ত্রী : কিছু করো নি। একটু চুপ করে বোসো তো? এক্ষুনি খিচুড়ি আসবে।
(সাংঘাতিক অপমানিত বোধ করে পুরুষ। খুব কড়া কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্ত্রীকে কড়া কথা বলা তার স্বভাব নয়। তাছাড়া স্ত্রীর বহু খামখেয়ালিপনা সহ্য করা এতোদিনে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। গুম হয়ে বসে সিগারেট ধরায়।)

স্ত্রী : (হঠাৎ) আজ পনেরো তারিখ না?(পুরুষ কথা বলে না। ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়।) সতেরো তারিখ আমরা কলকাতায় ফিরছি, না? (একই ভাবে জবাব আসে।) আচ্ছা আর ক'দিন থেকে গেলে হয় না?

পুরুষ : কী করে হবে? আঠারোই আমাকে অফিসে জয়েন করতে হবে না?

স্ত্রী . দু'দিন পরে না হয় জয়েন করলে?
(এ সব কথার কি জবাব হয়? 'হুঃ' বলে একটা কাঁধঝাঁকানি দিয়ে পুরুষ অন্যদিকে ফেরে। স্ত্রীর মুখে সামান্য একটা হাসির আভাস ফুটে ওঠে। যেন প্রশ্নটা ইচ্ছে করে করেছে হিসেবের প্রয়োজনে।)

বৃদ্ধ : আর একটু দেরি হবে।
(আবার ভুল হয়ে গেলো। বৃদ্ধ প্রবেশ করে কথা বলেন, না কথা বলে আবির্ভূত হন, বোঝা শক্ত।)

পুরুষ : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে? বৃষ্টি তো—বৃষ্টি তো সমানে চলেছে বোধ হয়।

বৃদ্ধ : না।

পুরুষ : কমেছে?

বৃদ্ধ : বেড়েছে।

পুরুষ : বেড়েছে? কী সর্বনাশ!

বৃদ্ধ : দুশ্চিন্তা করবেন না। খাবার আগে দুশ্চিন্তা করলে বদহজম হয়।

স্ত্রী : সে ভয় করবেন না। খাবার জিনিস খেয়ে বদহজম আজ অবধি হয়নি ওর।

পুরুষ : (অনেক উর্ধ্বে) সাধারণ মানুষের মতো আমার ক্ষিধে তেষ্টা পায়। আমার স্ত্রী মনে করেন সেটা যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়।

বৃদ্ধ : আপনার স্ত্রী কবি। তিনি কল্পনার জগতে বিচরণ করেন।

স্ত্রী : কবি? জীবনে কবিতা লিখিনি আমি!

বৃদ্ধ : সব কবি কি কবিতা লেখে? আমি তো কবি, কিন্তু লিখিনা তো? শুধু বলি।

স্ত্রী : আমি তো বলিও না!

বৃদ্ধ : আপনি আরো বড়ো কবি। কবিতা আপনাকে নাড়া দেয়। ভাবায়। আনন্দ দেয়। কষ্ট দেয়। কবিতা আপনার কাছে কথা নিয়ে খেলা নয়।

পুরুষ : উনি কবিতার রাজ্যে বাস করেন!

বৃদ্ধ : (প্রচণ্ড উৎসাহে) সাধু সাধু! যথার্থ বলেছেন। কবিতার রাজ্যে বাস করেন। কবিতা লেখেন না, বলেন না, কিন্তু কবিতার রাজ্যে বাস করেন। অদ্ভুত আপনার প্রকাশ করবার ক্ষমতা!

(পুরুষ একটু ঘাবড়ে যায়। আকস্মিক এই উচ্ছ্বাস সত্যি না পরিহাস বুঝে উঠতে পারে না। স্ত্রীও অবাক হয়।)

মাটির উপর দু'টো পা রেখে যারা কবিতায় ভেসে যেতে পারে তাদের মতো সুখী আর কে আছে? কী বলেন?

স্ত্রী : সুখী?

বৃদ্ধ : (হঠাৎ থেমে গিয়ে) কথাটা ভুল বললাম, না? সুখ নয়। অন্য কিছু। সুখের চেয়ে অনেক বড়ো কিছু। কী নাম তার? আনন্দ? (পুরুষের দিকে ফিরে) কিন্তু আপনার এ সব ভালো লাগছে না বোধহয়। তাস খেলবেন?

পুরুষ : তাস? তাস আছে? (বৃদ্ধ পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করলেন) কিন্তু দু'জনে কী খেলবো?

স্ত্রী : আমি তাস খেলতে পারি না।

বৃদ্ধ : তাই তো। তাহলে? ম্যাজিক দেখবেন তাসের?

স্ত্রী : (ছেলেমানুষি উৎসাহে) আপনি পারেন ম্যাজিক দেখাতে?

বৃদ্ধ : আলবাৎ! বেছে নিন একটা তাস এর মধ্যে থেকে। দেখাবেন না আমায়।

(স্ত্রী একটা তাস তুললো। পুরুষের উৎসাহের প্রকাশ অতোটা নয়। তবু তাসটা ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো।)

দেখে নিয়েছেন ভালো করে? আচ্ছা রাখুন এর মধ্যে যেখানে ইচ্ছে। এবার ফেটিয়ে দিন। (স্ত্রী আনাড়ি হাতে ফেটিয়ে দিলো। পুরুষ তার হাত থেকে নিয়ে কায়দা করে ফেটালো। তারপর বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিলো।) না না আমাকে দিতে হবে না। খুঁজে দেখুন তো তাসটা আছে কি না? (এরা খুঁজলো)

স্ত্রী : কই, নেই তো?

বৃদ্ধ : নেই? ভালো করে খুঁজেছেন?

পুরুষ : (খুঁজে) না, নেই।

বৃদ্ধ : নেই? হারিয়ে গেছে? (তাস নিয়ে) আচ্ছা আর একটা ম্যাজিক দেখুন—

পুরুষ : সে কী, এটা শেষ করুন?

বৃদ্ধ : কোন্‌টা?

স্ত্রী : তাসটা বার করবেন না, বা?

বৃদধ : কোন্ তাস?

স্ত্রী : যেটা আমি বেছে নিলাম?

(বৃদ্ধ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রী চোখের উপর চোখ রাখলেন সোজা।)

বৃদ্ধ : (গম্ভীরভাবে) আপনি বেছে নিয়েছিলেন। হারিয়ে গেছে। খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে? (স্ত্রী চট করে কিছু বলতে পারলো না)

পুরুষ : তাহলে আর ম্যাজিক কী হোলো?

বৃদ্ধ : (পুরুষের দিকে তাকিয়ে) ফিরে না পেলে আপনার শান্তি হচ্ছে না?

পুরুষ : তা না হলে তো শেষ হয় না খেলাটা?

বৃদ্ধ : শেষ একটা চাই?

পুরুষ : নিশ্চয়ই?

বৃদ্ধ : সে যেমনই শেষ হোক? যদি তাসটা ফিরিয়ে দিই দুমড়ে মুচড়ে পিষে থেৎলে চটকে—তবু শেষ চাই?

(বৃদ্ধের শেষ কথাগুলোয় একটা তীব্রতা। যেন সত্যি সত্যি কী একটা দুমড়ে মুচড়ে পিষে থেৎলে চটকে ফেলছে। নির্ঘাৎ বুড়োর মাথায় ছিট আছে।)

পুরুষ : তা, তা কেন হবে?

বৃদ্ধ : তাই হয়—দাঁড়ান। ফেলবেন না!

(পুরুষ এর মধ্যে শেষ সিগারেট বার করে প্যাকেটটা মুচড়ে ফেলতে যাচ্ছিলো)

পুরুষ : কেন—কী—

বৃদ্ধ : ফেলবার আগে দেখুন ভালো করে কী ফেলছেন—

পুরুষ : প্যাকেটটা। সিগারেট নেই, খালি—

(কিন্তু স্ত্রী বুঝেছে। প্যাকেটটা টেনে নেয়। ভিতরে হাতড়ায় একটা অহেতুক ব্যস্ততায়। দোমড়ানো মোচড়ানো একটা বস্তু বেরোয়।) কী ওটা?

স্ত্রী : (প্রায় অস্ফুট স্বরে) হরতনের বিবি।

(কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে স্ত্রী। দোমড়ানো তাসটা হাতের মুঠোয় নিয়ে।)

পুরুষ : সাবাস! কী করে করলেন?

বৃদ্ধ : (স্ত্রীর দিকে চেয়ে, ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে) আমি চাইনি ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু—

(দুই বাহু মেলে একটা হালছাড়া ভঙ্গী করলেন)

পুরুষ : কেন, কী হয়েছে?

বৃদ্ধ : (হঠাৎ) খিচুড়িটা হয়ে গেছে বোধহয়।

(অদৃশ্য হয়ে গেলেন)

পুরুষ : কী হোলো তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?

স্ত্রী : না, হ্যাঁ—একটু ক্লান্ত লাগছে।

পুরুষ : লাগবে না? কম হাঁটা হয়েছে আজ? তার উপর এতোক্ষণ উপোস— (থেমে গেলো। খাওয়ার কথাটা না তুললেই ভালো হোতো।) একটু শুয়ে পড়ো না। এইখানটায়।

(ধুলো ঝেড়ে একটা জায়গা খানিকটা পরিষ্কার করে দিলো। নিজের ওয়াটারপ্রুফটা পাকিয়ে বালিশ বানাবার চেষ্টা করতে লাগলো।)

স্ত্রী : ঠিক আছে, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না।

পুরুষ : এই নাও। এসো।

স্ত্রী : না, আমি শোবো না এখন।

পুরুষ : কেন? একটু জিরিয়ে নাও। এর পরে তো আবার—কী আছে কপালে কে জানে? (স্ত্রী আরও অধৈর্য হয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলো, পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শুলো। পুরুষ মাথার কাছে বসলো।) মাথা ধরেছে?

স্ত্রী : একটু।

পুরুষ : কপালটা টিপে দেবো?

স্ত্রী : দেবে?

(পুরুষ কপালটা টিপে দিতে আরম্ভ করলো। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলো।)

পুরুষ : কী হোলো? (স্ত্রী অল্পক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনলো।)

স্ত্রী : আচ্ছা তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?

পুরুষ : কী?

স্ত্রী : একটা যেন—একটা যেন—কী একটা যেন আছে এই ঘরে—এই বাড়িতে। ঐ বুড়ো—আর—এই সব—(হাত দিয়ে চারপাশের নামহীন বস্তুগুলো দেখালো)

পুরুষ : হ্যাঁ কেমন যেন অদ্ভুত!

স্ত্রী : না না, অদ্ভুত নয়, অদ্ভুত নয়! অদ্ভুত লেগেছিলো প্রথমে। কিন্তু এখন—এখন ঠিক—আমি বোঝাতে পারছি না।

পুরুষ : কী, বলো না?

স্ত্রী : মনে হচ্ছে যেন—সব কী রকম—সরে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে যেন। যা কিছু ধরছি, যা কিছু ধরেছিলাম—সব যেন কেমন পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। পায়ের নিচের জমিটাও কেমন যেন সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

পুরুষ : ও কিছু না। ক্লান্তি। তাছাড়া অনেকক্ষণ খা—(থেমে গেলো)।

স্ত্রী : তা হবে। কিন্তু ক্লান্ত তো লাগছে না? বরং উল্টো! খুব বেশি—খুব বেশি জেগে থাকলে যেমন হয়। যেন এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখছি, অনেক কিছু ভাবছি এক সঙ্গে, এতো বেশি এক সঙ্গে যে তাল রাখতে পারছি না।

পুরুষ : বেশি ক্লান্ত হলে অনেক সময় ওরকম হয়।

স্ত্রী : না না, তা নয়, তা নয়। আচ্ছা—তোমার কিছু মন হচ্ছে না?

পুরুষ : আমার কী হচ্ছে শুনলে তো ভালো লাগবে না তোমার।

স্ত্রী : কী হচ্ছে?

পুরুষ : সত্যি কথা বলতে কী, আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

স্ত্রী : ক্ষিদে? (একটু ভেবে) আমার তো ক্ষিদে পাচ্ছে না? বরং মনে হচ্ছে আর কোনোদিন না খেলেও কিছু হবে না।

(এ কিন্তু খোঁচা নয়। যেন ক্ষিদের মতো বাস্তব কিছু একটা খোঁজা—যাতে ভর করে ফেরা যায়। চেনা জগতে ফেরা যায়। কিন্তু খুঁজলেই কি পাওয়া যায়?)

পুরুষ : ও কিছু না। খেতে বসলে দেখবে ঠিক হয়ে গেছে। শুয়ে পড়ো।

স্ত্রী : না, আর শোবো না।

(উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে গিয়ে বৃদ্ধের মুখোমুখি হয়ে থেমে গেলো।)

বৃদ্ধ : অন্যায় হয়ে গেছে। আপনার কাপড়ের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। বহুদিন পরে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি তো?

(বৃদ্ধের হাতে একখানা শাড়ি। রঙিন এবং পাড় সমেত।)

স্ত্রী : বললেন যে—শুধু থান ধুতি আছে?

বৃদ্ধ : (অনুতপ্ত) অন্যায় হয়ে গেছে। ঠাট্টা করছিলাম। তার ফলে এতোক্ষণ আপনাকে ভিজে কাপড়ে থাকতে হোলো।

স্ত্রী : কিন্তু কাপড় তো ভেজেনি বলতে গেলে। যা ভিজেছিলো তাও শুকিয়ে গেছে এতোক্ষণ। দরকার নেই ছাড়বার।

বৃদ্ধ : আপনার দরকার না থাক, আমার আছে। নইলে অন্যায়টা রয়েই যায়। এমনিই ছাড়ুন না হয়। অনেকক্ষণ তো এক কাপড়ে আছেন।

(কাপড় ছাড়তে সত্যিই ইচ্ছে করছিলো। কাপড়টা নিলো স্ত্রী।)

স্ত্রী : কিন্তু কাপড় পেলেন কোথায়? আপনি তো একা থাকেন বললেন?

বৃদ্ধ : (হেসে) চিরদিন একা থাকতাম বলি নি তো! (কিন্তু আর প্রশ্ন করতে দেওয়া চলে না। পুরুষের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ।) এই নিন। (এক প্যাকেট সিগারেট)

পুরুষ : সিগারেট?

বৃদ্ধ : আপনার সিগারেট তো শেষ। প্যাকেট ফেলে দিলেন।

পুরুষ : আপনি কি সব কিছু খেয়াল করেন?

বৃদ্ধ : কই আর করতে পারি? কাপড়টা দিলাম ঠিক সময়ে?

পুরুষ : কিন্তু—সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন বললেন যে?

(বৃদ্ধকে অগত্যা স্ত্রীর দিকে ফিরতে হোলো)

বৃদ্ধ : ঐ ঘরটায় চলে যান। এই দিক দিয়ে। একটা বাথরুম জাতীয় ঘর আছে—জল ধরা আছে বালতিতে। আলো জ্বেলে রেখেছি, চলে যান।

(স্ত্রী চলে গেলো। বৃদ্ধ এসে বসলেন পুরুষের কাছে মজলিসি ভঙ্গীতে)

তারপর—বলুন। কলকাতার খবর-টবর বলুন।

পুরুষ : আমি ভাবছি—সিগারেট খান না তবু ঘরে সিগারেট রাখেন—ব্যাপারটা কী?

বৃদ্ধ : (হালছাড়া হেসে) না আপনি ভোলবার পাত্র না। ভেবেছিলাম চেপে যাবো। দুর্বলতা মশাই দুর্বলতা। দিন কয়েক হোলো আবার শুরু করে ফেলেছি! তবে খুব কম। দিন, একটা দিন না হয়। (সিগারেট ধরালেন) আপনি কলকাতায় চাকরি করেন?

পুরুষ : হ্যাঁ।

বৃদ্ধ : গভর্নমেন্টে?

পুরুষ : হ্যাঁ। পি-ডব্লিউ-ডি।

বৃদ্ধ : এদিকে বেড়াতে এসেছিলেন? ছুটিতে?

পুরুষ : হ্যাঁ। ওর খুব বেড়াবার শখ। তাই প্রতি পুজোতেই দিন কতক আর্নড্ লীভ নিয়ে বেরোই।

বৃদ্ধ : এ দিকটা পুজোর সময়ে খুব ভালো। তবে বৃষ্টি হলে—দেখছেন তো কী অবস্থা?

পুরুষ : আর বলবেন না। আর ওর হয়েছে—রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভাঙতে পেলে আর কিছু চাই না। একেবারে ছেলেমানুষ।

বৃদ্ধ : ছেলেপুলে নেই আপনাদের, না?

পুরুষ : না।

বৃদ্ধ : কেন, ছেলেপুলে চান না?

পুরুষ : না, মানে—ঠিক তা নয়—

বৃদ্ধ : যাক ও কথা। বয়স হলে কৌতূহল অশিষ্ট হয়ে ওঠে। মাপ করবেন।

পুরুষ : না না তাতে কী হয়েছে? এমন কিছু গোপন কথা নয়।

বৃদ্ধ : আপনি সন্তান খুবই চান মনে হয়।

পুরুষ : হ্যাঁ চাই। আমরা দু'জনেই চাই—মানে—

বৃদ্ধ : মানে দু'জনেই চাইতেন, কিন্তু এখন উনি চান না?

পুরুষ : না না, চাইবে না কেন? চায়, তবে—

বৃদ্ধ : আপনি আগের চেয়ে বেশি চান, উনি আগের চেয়ে কম চান?

পুরুষ : হ্যাঁ তাই। তাই বোধহয়।

বৃদ্ধ : আপনি আগের চেয়ে বেশি চান কেন?

পুরুষ : কী জানি? আমার মনে হয় ছেলেপুলে হলে ও একটু—একটু বদলাবে।

বৃদ্ধ : কী রকম বদল?

পুরুষ : ও যেন কেমন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। একটুতেই মেতে ওঠে, একটুতেই দমে যায়। কিছুতেই যেন ঠিক করে মন বসাতে পারে না।

বৃদ্ধ : কিছুতেই মানে—সংসারে?

পুরুষ : হ্যাঁ সংসারেও বটে। সব কিছুতেই।

বৃদ্ধ : সন্তান হলে এটা বদলে যাবে মনে করেন?

পুরুষ : নিশ্চয়ই।

বৃদ্ধ : সংসারে মন লাগবে?

পুরুষ : লাগবে না?

বৃদ্ধ : আপনার দিকেও মন লাগবে বেশি করে?

পুরুষ : অ্যাঁ?

বৃদ্ধ : না, কিছু না। আপনার স্ত্রী এখন কম চান কেন?

পুরুষ : কম চায়—সেটা আমার ধারণা। হয় তো কী চায় ঠিক জানে না। ছটফট করে বেড়ায়, যা দেখে তাই নিয়ে খুব মেতে ওঠে, তারপর আবার ছেড়ে দেয়।

বৃদ্ধ : বরাবরই এই রকম?

পুরুষ : না, বরাবর নয়। ক'দিন ধরে একটু বেশি অস্থির দেখছি। কখন যে কী মেজাজে কী মুড়ে থাকবে—বোঝা মুস্কিল।

বৃদ্ধ : (অল্প হেসে) চার সাত্তে আঠাশ?

(বুড়ো কি এতোক্ষণ তার আজগুবি থিওরী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলো নাকি? নাঃ, এতো কথা হড়বড় করে বলা উচিত হয়নি। কিন্তু কী বলা যায় এখন?)
ছেড়ে দিন ও কথা। ও একটা বাজে থিওরী আমার। একা থাকি তো, তাই আবোল তাবোল মাথায় আসে। (বুড়োই বাঁচালো যা হোক) কলকাতায় ফিরছেন কবে?

পুরুষ : সতেরোই—পরশু। আঠারোই জয়েন করতে হবে।

বৃদ্ধ : আমি একটু বেশি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছি, না? আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে?

পুরুষ : না না, তাতে কী হয়েছে? (এখন অতোটা খারাপ লাগছে না তো বলেছে বলে?)

বৃদ্ধ : আপনাকে দেখে একটা কথা আমার মনে হয়।

পুরুষ : কী?

বৃদ্ধ : আপনার দু'টো পা শক্ত জমির উপরে আছে। ফাঁকা ব্যাপারে আপনি গা ভাসান না।

পুরুষ : (খুশি হয়ে) আমি মশাই চিরকাল প্র্যাক্‌টিক্যাল।

বৃদ্ধ : খুব ভালো গুণ। প্র্যাক্‌টিক্যাল না হলে এই দুনিয়ায় চলে না।

পুরুষ : ঠিক বলেছেন।

বৃদ্ধ : আপনার স্ত্রী যেদিন সেটা বুঝতে পারবেন, এখনকার চেয়ে অনেক শান্তিতে থাকবেন।

পুরুষ : (উৎসাহিত) আমারও তাই মনে হয়। আপনি এতো বেশি বোঝেন কী করে?

বৃদ্ধ : যে অন্ধ, তার স্পর্শের অনুভূতি, শ্রবণের অনুভূতি প্রখর হয়, জানেন তো? আমি একা থাকি, অনিদ্রায় ভুগি। তাই বোধহয় আমার বোঝবার অনুভূতি বেশি।

পুরুষ : অনিদ্রা থাকলে বেশি বোঝা যায়?

বৃদ্ধ : সারারাত্তির ঘুম না হলে মানুষ ভাবে। ভাবলে বোঝা যায়।

পুরুষ : আপনি সারা রাত্তির জাগেন?

বৃদ্ধ : সারারাত্তির সারারাত্তির।

(স্ত্রী প্রবেশ করেছে, কাপড় বদলে)

স্ত্রী : কী সারা রাত্তির?

বৃদ্ধ : সারারাত্তির সারারাত্তির
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি
দুই চোখ মেলে জেগেছি দেখেছি
তন্দ্রাবিহীন দুই চোখ মেলে
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি জেনেছি।

স্ত্রী : (প্রায় ফিসফিস করে) কী জেনেছেন?

বৃদ্ধ : যা জানতে নেই। যা জানলে শান্তি নষ্ট হয়। সান্ত্বনা ধ্বসে পড়ে। স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়।

স্ত্রী : জানলে?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, জানলে।
স্বপ্নে নরম স্নিগ্ধ ছবিকে
গুঁড়িয়ে দিয়েছি মাড়িয়ে দিয়েছি
জেগে-থাকা চোখে তাড়িয়ে দিয়েছি

যন্ত্রণাঘন খোলা দুই চোখে
সারারাত্তির দেখেছি জেনেছি মেনেছি।

স্ত্রী : তারপর?

বৃদ্ধ : তারপর আর নেই।

স্ত্রী : হ্যাঁ আছে। নিশ্চয়ই আছে।

বৃদ্ধ : থাকলেও এখন নয়। খিচুড়ি তৈরি। (পুরুষকে) আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন। কাপড় ছাড়বেন?

পুরুষ : না না।

বৃদ্ধ : আসুন, এইদিকে।

(পুরুষ চলে গেলো)

স্ত্রী : আপনি রাতে জেগে থাকেন কেন?

বৃদ্ধ : মাঝরাত্রে উঠে আপনি কেন জানলায় বসে থাকেন?

স্ত্রী : কে বললে?

বৃদ্ধ : কেউ বলে নি। আমার চার সাত্তে আঠাশের থিওরী। থাকেন কি না বলুন?

স্ত্রী : হ্যাঁ থাকি। কেন থাকি জানি না।

বৃদ্ধ : ভাবেন।

স্ত্রী : হ্যাঁ ভাবি। কী ভাবি জানি না।

বৃদ্ধ : ভাবেন—এতোটা বয়েস হোলো—কী পেলাম? সত্যিই কিছু পেলাম কি?
(স্ত্রী বৃদ্ধের দিকে তাকালো। ভাবলো।)

স্ত্রী : হ্যাঁ ভাবি। আপনি কি সব জানেন?

বৃদ্ধ : ঐ রকম মাঝরাত্তিরে আর কিছুদিন জানলায় বসে থাকলে আপনিও জানবেন।

স্ত্রী : (আপন মনে) এখন বুঝতে পারছি।

বৃদ্ধ : কী বুঝতে পারছেন?

স্ত্রী : এখানে—এই ঘরে বসে—কী একটা যেন মনে হচ্ছিলো। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। প্রথমে ভেবেছিলাম ভয়। ভয় ছিল প্রথমে। আপনাকে দেখবার আগে। ভয় নয়। ক্লান্তিও নয়। একটা অস্বস্তি—না অস্বস্তিও নয়। কী তা এখনো বলতে পারবো না। এখন শুধু বুঝতে পারছি—ঠিক ঐ রকম মনে হয় আমার, যেদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে যায়।—আচ্ছা, কী হয় বলুন তো?

বৃদ্ধ : চিন্তা করেন।

স্ত্রী : চিন্তা তো সব মানুষ সব সময়ে করছে।

বৃদ্ধ : কে বললে?

স্ত্রী : করছে না? সব সময়েই তো আমরা কিছু না কিছু চিন্তা করি।

বৃদ্ধ : তাকে কি 'চিন্তা করা' বলে?
(স্ত্রী ভাবলো। তবে কি সারাদিন সে চিন্তা করে না? শুধু এক একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙে যখন? আর এইখানে, এই ঘরে? এই ছায়ায় আলোয় মেশা অবাস্তব বস্তুতে ঠাসা ঘরে?)

স্ত্রী : কিন্তু চিন্তা করে তো কিছুই পাই না? বরং সারাদিন সারজীবন যতো কিছু পেয়েছি—তাও যেন নেই বলে মনে হয়।

বৃদ্ধ : মনে হয়? তবু বলছেন চিন্তা করে কিছু পান না?

স্ত্রী : (আপন মনে) এখন যেন রঞ্জনের কথা খানিকটা বুঝতে পারছি।

বৃদ্ধ : (নীরস কণ্ঠে) রঞ্জনের কথা এখন থাক।

স্ত্রী : রঞ্জনকে আপনি চেনেন?

বৃদ্ধ : মনে হচ্ছে চিনি। সে কে তা জানি না। তার চেহারা কী রকম জানি না।

স্ত্রী : তবে?

বৃদ্ধ : এখন যার কথা আপনি 'খানিকটা বুঝতে পারছেন'—তাকে চিনি। সে আমার উত্তরপুরুষ। আমি হয়েছি, সে হবে। আমি জেনেছি, সে জানবে। আমি জেগে থাকি, সে জেগে থাকবে। তার কথা এখন থাক।

স্ত্রী : কেন?

(বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। জ্বালাধরা দুই চোখ রাখলেন স্ত্রীর মুখের উপর।)

বৃদ্ধ : কেন? জেগে থাকতে চান? জেগে থাকা মানে কী—তা জানেন? সারারাত্তির জেগে থাকা?

স্ত্রী : (অস্ফুট স্বরে) কী?

(বৃদ্ধ প্রশ্নটা শুনলেন কিনা বলা শক্ত। তাঁর চোখ এখন অন্যদিকে।)

বৃদ্ধ : সা—রা—রা—ত্তি—র

সারারাত্তির প্রহরে প্রহরে
দণ্ডে দণ্ডে পলে অণুপলে
কতো অর্বুদ অণু পরমাণু
তিলে তিলে মিশে একটি রাত্রি বেঁধেছে।
অন্ধকারের দীর্ঘ সুতোয়
চূর্ণ চূর্ণ কণিকা কণিকা
কতো মুহূর্ত মুহূর্তমালা গেঁথেছে।
(চোখ ফিরে এলো স্ত্রীর দিকে)
জেগে-থাকা চোখ মেলে-রাখা চোখ
ঘুমের বিরামে বঞ্চিত চোখ
জ্বালাধরা দু'টো নির্মম চোখ
স্বপ্ন-কোমল ধবল অঙ্গে
দৃষ্টি-কঠিন চাবুকের দাগ পেতেছে।
(বৃদ্ধ থামলেন)

স্ত্রী : তারপর?

বৃদ্ধ : তারপর? কিছু নেই। তার পরেও কিছু নেই, আগেও কিছু নেই। শুধু কথা। কথা, কথা, কতকগুলো কথা, কী হবে শুধু কতকগুলো কথা দিয়ে, বলুন?

(শেষ প্রশ্নটা পুরুষকে। সে যে এসেছে, এ যেন বৃদ্ধ জানতে পারলেন মাথার পেছনের দু'টো চোখ দিয়ে।)

পুরুষ : কী কথা?

বৃদ্ধ : সব বাজে কথা মশাই। বিলকুল বাজে কথা। খিচুড়ি প্রস্তুত, আসতে আজ্ঞা হোক।

(থিয়েটারি ভঙ্গীতে বৃদ্ধ ভিতরের পথে আহ্বান জানালেন। পুরুষ ও স্ত্রী বেরুলো। বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সামনে অনেকদূরে চোখ রেখে। হাত রাখলেন একটা নির্দিষ্ট বস্তুর ছায়ায়। দপ করে ঘরের আলো নিভে গেলো। পর্দা নেমে এলো আস্তে আস্তে। বৃদ্ধের প্রস্থান দেখা গেলো না।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পর্দা সরলো অন্ধকারেই। বেরুবার আগে বৃদ্ধ যেখানে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, এবারেও ঠিক সেইখানে সেইভাবে দাঁড়িয়ে। সেবারে আলো নিভিয়েছিলেন, এবার জ্বাললেন।)

বৃদ্ধ : আসুন।

(পুরুষ আর স্ত্রী এলো ঘরের ভিতর।)

পুরুষ : উঃ, খাওয়াটা বড়ো বেশি হয়ে গেলো। দারুণ রাঁধেন আপনি!

বৃদ্ধ : রান্নার গুণ নয়, প্রয়োজনের গুণ। চায়ের প্রয়োজন ছিল—চা ভালো লেগেছিলো। খাদ্যের প্রয়োজনে অন্তরাত্মা হাহাকার করছিলো, তাই আমার রাঁধা খিচুড়িও দারুণ লাগলো।

স্ত্রী : আমার তো ক্ষিদেয় অন্তরাত্মা হাহাকার করছিলো না? আমি অতো খেলাম কী করে?

বৃদ্ধ : কই আর খেলেন?

স্ত্রী : খাইনি, বাঃ? তিনবার খিচুড়ি নিয়েছি আমি। খাবার সময়ে তো খেয়াল ছিল না, এখন ভাবছি কী করে এতোটা পথ হাঁটবো।

বৃদ্ধ : হাঁটবেন কেন?

স্ত্রী : ফিরতে হবে না?

পুরুষ : দশটা দশ।

বৃদ্ধ : একটা কথা বলা হয়নি আপনাদের। খাওয়ার আগে বলে শান্তিভঙ্গ করতে ইচ্ছে করলো না।

পুরুষ : কী কথা?

বৃদ্ধ : আসবার পথে একটা নদী পার হয়েছিলেন মনে আছে?

পুরুষ : নদী? কই না তো?

স্ত্রী : হ্যাঁ হ্যাঁ—একটা নালা-মতো ছিল বটে।

পুরুষ : কোন্‌টা?

স্ত্রী : ঐ যে একটা মাটি ফেলা বাঁধের মতো ছিল না? বাঁধে নামতে গিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম একবার?

পুরুষ : ও, ঐ নালাটা?

বৃদ্ধ : ঐ নালাটা এতোক্ষণে নদী হয়েছে। বাঁধ এখন পাঁচ হাত জলের নিচে। সাঁতরে পার হতে পারেন, তবে ঐ স্রোতে অতি বড়ো সাঁতারুও চট করে নামতে ভরসা পাবে না।

পুরুষ : পোল নেই কাছাকাছি?

বৃদ্ধ : সব চেয়ে কাছের পোলটা মাইল পঁচিশ হবে। (অল্পক্ষণ কথা বন্ধ)

পুরুষ : তা হলে?

বৃদ্ধ : তা হলে এখানে রাত্রি যাপন। আর কোনো উপায় নেই।

স্ত্রী : কিন্তু—

বৃদ্ধ : কিন্তু কী?

স্ত্রী : আপনার অসুবিধে—

বৃদ্ধ : অসুবিধে আমার নয়—আপনাদের। চাদর বালিশ যে ক'টা আছে তাই দিয়ে বিছানা জাতীয় একটা কিছু হয়তো করে দিতে পারি, কিন্তু ঘুমোতে পারবেন কি না জানি না।

পুরুষ : কেন?

বৃদ্ধ : ঘুমোনো যায় না এ বাড়িতে। তবু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নদীর স্রোত নিরীক্ষণ করার চেয়ে ভালো। এ ঘরটা আর কিছু না হোক—শুকনো।

পুরুষ : কী করবে?

স্ত্রী : আমি কী বলবো? তুমি ঠিক করো।

বৃদ্ধ : পরামর্শ করে ঠিক করবার সান্ত্বনা হয় তো পেতে পারেন, কিন্তু আমরা যা যা ঠিক করবার প্রকৃতি ঠিক করে রেখেছে।

পুরুষ : কাল কিন্তু ভোরবেলা বেরিয়ে পড়তে হবে। পরশু সকালে গাড়ি—বাঁধা ছাঁদা বিস্তর কাজ বাকি।

বৃদ্ধ : কালকের কথা কাল হবে। আজ এবং কালকের মাঝখানে যা আছে, সেইটাই এখন বড়ো কথা।

পুরুষ : কী?

বৃদ্ধ : রাত্তির। সারারাত্তির। দশটা দশ থেকে পাঁচটা দশ। সাত ঘণ্টা।

পুরুষ : (ঘড়ি দেখে) দশটা পনেরো এখন।

(ঘড়ি পুরুষের জীবনের একটা বড়ো অংশ। নিজের ঘড়ির সময় প্রায় নিজের কথার মতো নির্ভুল মনে করে সব পুরুষ।)

বৃদ্ধ : পাঁচ মিনিট কমলো। এখনো চারশো পনেরো মিনিট বাকি।

স্ত্রী : আপনি রাত্রিকে খুব ভয় করেন, না?

বৃদ্ধ : ভয়? না। ভয় আগে করতাম। এখন সয়ে গেছে। এখন রাত্রি জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। নেশার মতো।

পুরুষ : আচ্ছা ঘুমের ওষুধ খেয়েও কিছু হয় না?

বৃদ্ধ : ঘুমের ওষুধ আর খাই না। খাবার দরকার হয় না।

পুরুষ : একেবারে না ঘুমিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে?

বৃদ্ধ : জানি না। বোধহয় পারে না। বসুন, দেখি কী যোগাড় করা যায়।

(বৃদ্ধ ছায়ার আড়ালে হারিয়ে গেলেন)

পুরুষ : আচ্ছা ভোগান্তি হোলো যা হোক আজ।

স্ত্রী : ভোগান্তি আর হোলো কোথায়? এ বাড়িটা না পেলে কী হোতো ভাবতে পারছো?

পুরুষ : তা ঠিক। বুড়োর মাথায় ছিট থাক আর যাই থাক, লোক অত্যন্ত ভালো। বিদেশে অবশ্য বাঙালি মাত্রেই একেবারে অন্যরকম। চেনাই যায় না।

স্ত্রী : তবে বিদেশেই চাকরি খোঁজো।

পুরুষ : কেন?

স্ত্রী: অন্যরকম হওয়া যাবে।

পুরুষ : সে আবার কী?

স্ত্রী : কিছু না। তোমার ঘুম পাচ্ছে?

পুরুষ : ঘুম তো পাচ্ছে। কিন্তু বললো যে ঘুমোনো যাবে না এখানে? তার মানে মশা কিংবা ছারপোকা কিছু একটার উৎপাত আছে নিশ্চয়ই।

(স্ত্রীর হঠাৎ মনে পড়লো একটা কথা)

স্ত্রী : এই তুমি বেরুবার সময়ে ঘরের জানলাটা বন্ধ করেছিলে?

পুরুষ : আমি কখন করলাম? আমি তো তোমার আগে ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম! তুমি বন্ধ করোনি?

স্ত্রী : একদম ভুলে গেছি। যা তাড়া লাগালে তুমি! তালাচাবি হাতে করে বাইরে দাঁড়িয়ে—

পুরুষ : আমার দোষ হোলো? এই হয়ে গেছে এই হয়ে গেছে—বলতে বলতে আধঘণ্টা কাটিয়ে দিলে তুমি—

স্ত্রী : ঘর বোধ হয় ভেসে গেছে জলে!

বৃদ্ধ : কী ভেসে গেলো?

(বৃদ্ধ এসেছেন। হাতে কাঁথা চাদর বালিশ।)

স্ত্রী : আমাদের ঘর। জানলাটা বন্ধ করা হয়নি।

বৃদ্ধ : ঘর কি অতো সহজে ভেসে যায়? ঘর অতি পোক্ত পদার্থ, অতি বড়ো দুর্যোগেও ভাসতে চায় না।

পুরুষ : আপনি সব কিছুতেই একটা কাব্যিক অর্থ বার করে ফেলেন দেখছি।

বৃদ্ধ : কাব্যিক অর্থ মিথ্যে নয়। বরং বেশি সত্যি। বেশি সত্যি বলেই বিশ্বাস হতে চায়না সহজে। (বৃদ্ধ বিছানা পাততে শুরু করলেন। স্ত্রী সাহায্য করতে লাগলো।) এই যে আপনাদের সাত বছরের ঘর। যতো বড়ো দুর্যোগই আসুক, এ কি সহজে ভাসবে?

স্ত্রী : (হেসে) দুর্যোগ তো কখনো আসেনি। কী করে জানবো?

পুরুষ : (দৃঢ় বিশ্বাসে) দুর্যোগ আসবে না। এলেও কিছু হবে না।

বৃদ্ধ : (স্ত্রীকে হঠাৎ) আপনার রাত্রে দাঁত মাজার অভ্যেস আছে?

(বুড়ো কি সব কিছুই ভাবে!)

স্ত্রী : হ্যাঁ, আছে, কিন্তু—

বৃদ্ধ : যান, চলে যান, আপনি তো সব চিনে গেছেন এ বাড়ির। টুথব্রাশ অবশ্য দিতে পারবো না, আঙুল দিয়ে মাজতে হবে। টুথপেস্ট রয়েছে বাথরুমে।

স্ত্রী : টুথপেস্ট আছে? কই দেখলাম না তো মুখ ধোবার সময়ে?

বৃদ্ধ : এই মাত্র রেখে এসেছি। দেখুন গিয়ে।

(স্ত্রী চলে গেলো)

কী বলছিলেন আপনি?

পুরুষ : কী বলছিলাম?

বৃদ্ধ : বলছিলেন—দুর্যোগ আসবে না, এলেও কিছু হবে না।

পুরুষ : কী দুর্যোগ আসতে পারে বলুন? আমি তো কিছু ভেবে পাই না।

বৃদ্ধ : কতো কী ঘটতে পারে। দু'টো মানুষ। দু'টো আলাদা মানুষ, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী, আলাদা চিন্তাধারা।

পুরুষ : ভুল করছেন। এই সাত বছর আমরা এক সঙ্গে আছি। স্রেফ আমরা দু'জন—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক কম। ওর সব কিছু আমি জানি। আমার সব কিছু ও জানে। প্রতি ব্যাপারে আমরা পরস্পরের উপরে নির্ভর করি।

বৃদ্ধ : কখনো কিছু ঘটে নি?

পুরুষ : ঘটবে না কেন? ঝগড়া ঝাঁটি রাগ অভিমান—সব কিছুই হয়। কিন্তু সে সব উপরের জিনিস। ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যাতে দাগ পড়ে না।

বৃদ্ধ : কী সেটা?

স্ত্রী : আমি ওকে অসম্ভব ভালোবাসি। ওকে ছাড়া আমার চলে না এক মুহূর্তও। ওরও আমাকে ছাড়া চলে না।

বৃদ্ধ : এবং উনিও আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসেন?

পুরুষ : নিশ্চয়ই বাসে।

বৃদ্ধ : তারপর?

পুরুষ : তারপর কী?

বৃদ্ধ : ভালোবাসলেই সব কিছু হয়ে গেলো? আর কিছু নেই?

পুরুষ : আর কী থাকতে পারে?

বৃদ্ধ : চেনা? জানা? বোঝা?

পুরুষ : বললাম তো—আমার সব কথা ও জানে, ওর সব কথা—

বৃদ্ধ : আপনি জানেন। কিন্তু আজ অবধি আপনাদের কারো জীবনে না-জানাবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেছে?

পুরুষ : যদি ঘটে, তাহলেও অজানা থাকবে না।

বৃদ্ধ : আপনি রাত্রে সাধারণত ক'ঘণ্টা ঘুমোন?

পুরুষ : অ্যাঁ?

বৃদ্ধ : মাপ করবেন। বয়স হয়েছে, কথাবার্তাগুলোর সঙ্গতি কমে গেছে। আজকে তো ঘুমের বেশ খানিকটা ব্যাঘাত হবে, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

পুরুষ : ঘুমোই ঘণ্টা আষ্টেক। তা একদিন কম হলে কি আর মরে যাবো?

বৃদ্ধ : আট ঘণ্টা। আপনার স্ত্রী ক'ঘণ্টা ঘুমোন বলতে পারেন?

পুরুষ : তা কী করে বলবো? ঐ রকমই হবে। কিছু কম হবে। সকালে ও চা করে আমার ঘুম ভাঙায়।

বৃদ্ধ : ধরুন, সাত সাড়ে সাত?

পুরুষ : তা হবে।

বৃদ্ধ : আপনি কখনো মাঝরাতে উঠে দু'ঘণ্টা জেগে বসে থাকেন না তো?

পুরুষ : মাঝরাতে? কোন্ দুঃখে?

বৃদ্ধ : আপনার স্ত্রী?

পুরুষ : কী বলছেন আপনি? মাঝরাতে উঠে বসে থাকবে কেন?

বৃদ্ধ : এই দেখুন! অন্ধ সবাইকে অন্ধ ভাবে। আমি ঘুমোতে পারি না তো, তাই ভাবি কেউই বুঝি ঘুমোয় না।

(স্ত্রীর প্রবেশ)

কোনো অসুবিধে হয়নি?

স্ত্রী : অসুবিধে কী হবে? আপনি তো সব কিছু বুঝে নিয়ে একেবারে নিজের বাড়ির মতো করে দিচ্ছেন।

পুরুষ : তবে আমিও দাঁতটা মেজেই আসি।

বৃদ্ধ : নিশ্চয়ই। (স্ত্রীকে) এই দেখুন। আপনার স্বামীরও যে রাতে দাঁত মাজার অভ্যেস থাকতে পারে—সেটা তো মাথায় আসেনি!

পুরুষ : (হেসে) সেটা আপনার দোষ নয়। আমি রোজ মাজি না।

(পুরুষের প্রস্থান)

বৃদ্ধ : আপনাদের স্বামী-স্ত্রীতে খুব মিল। আমার বড়ো ভালো লাগছে দেখে।

স্ত্রী : কিসে মিল দেখলেন? রাতে দাঁত মাজায়?

(বৃদ্ধ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন—সেই প্রাণখোলা হাসি।)

বৃদ্ধ : না না, দাঁত মাজাটা কিছু নয়।

স্ত্রী : তবে?

বৃদ্ধ : আপনার স্বামী আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসেন।

স্ত্রী : তা বাসে। আমাকে ছাড়া ও থাকতে পারে না। ওর তো আত্মীয় বলতে কেউ নেই আর।

বৃদ্ধ : আপনার স্বামী ভাগ্যবান পুরুষ। শুধু যদি একটি সন্তান থাকতো আপনাদের।

স্ত্রী : (অল্প তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) কেন বলুন তো?

বৃদ্ধ : কেন, আপনি সন্তান চান না?

স্ত্রী : (একটু থেমে) না, এখন চাই না।

বৃদ্ধ : কেন?

স্ত্রী : চাইবো কেন?

বৃদ্ধ : সারাদিন একা বাড়িতে বসে থাকেন, ভালো লাগে?

স্ত্রী : সারাদিন তা বাড়িতে বসে থাকি না? আমিও তো চাকরি করি।

বৃদ্ধ : চাকরিটা কি একটা বড়ো কথা হোলো?

স্ত্রী : (অল্প থেমে) হ্যাঁ। আমার কাছে। টাকার জন্যে নয়। চাকরিটা আমার ভালো লাগে। ওটা আমি ছাড়তে চাই না।

বৃদ্ধ : তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আপনার স্বামীও কি তাই ভাবেন?

স্ত্রী : হ্যাঁ, ও-ও তাই ভাবে। ও বলে—বেশ আছি দু'জনে, কোনো ঝক্কি ঝামেলা নেই।

বৃদ্ধ : তবে তো আর কোনো প্রশ্নই নেই। আপনারা যদি নিজেরাই পরস্পরের সব অভাব মেটাতে পারেন, কী হবে আর তৃতীয় ব্যক্তি?

(স্ত্রী হঠাৎ ফিরে একদৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইলো)
কী?

স্ত্রী : (ধীরে ধীরে) আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি ঠাট্টা করছেন কি না।

বৃদ্ধ : ঠাট্টা করবো কেন? কী আশ্চর্য!

স্ত্রী : হ্যাঁ সত্যি। ঠাট্টা করবেন কেন? কিন্তু তবু মনে হচ্ছে আপনি একটা কিছু টেনে বার করে আনতে চাইছেন। অনেক ভিতর থেকে। অনেক নিচ থেকে।

বৃদ্ধ : কী?

স্ত্রী : জানি না কী। একটা কিছু যা আমরা কেউ জানি না, কেউ জানতাম না,—কিন্তু আছে। কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনি যেন খুঁজে খুঁজে দেখছেন। বার করে আনতে চাইছেন। আমাদের দেখাতে চাইছেন।

(স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের মুখের হাসি চোখের কৌতুক মুছে যেতে লাগলো। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেঙে পড়তে লাগলো মুখের প্রতিটি মাংসপেশী। গভীর হয়ে কেটে বসে যেতে লাগলো মুখের প্রতিটি রেখা।)

কী? কী সেটা? কী আছে ভিতরে? আপনি জানেন। নিশ্চয়ই জানেন। বলুন কী সেটা?

বৃদ্ধ : (প্রায় আর্তকণ্ঠে) না জানি না। আমি জানি না। বিশ্বাস করুন—আমি জানি না।

(কিন্তু স্ত্রী নির্মম। বৃদ্ধের দুর্বল অস্বীকার ছাপিয়ে তার তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা চলতে লাগলো।)

স্ত্রী : হ্যাঁ জানেন। নিশ্চয়ই জানেন। আপনি সব জানেন। কেন একবারে বলছেন না? কেন অল্পে অল্পে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখাচ্ছেন?

বৃদ্ধ : আমি জানি না।

স্ত্রী : হ্যাঁ জানেন। কী জেনেছেন আপনি? আমিও জানবো!

বৃদ্ধ : (প্রায় চিৎকার করে) না!

স্ত্রী : হ্যাঁ জানবো। এ আমাদের কথা, আমার জানবার অধিকার আছে।

বৃদ্ধ : বলছি তো নেই! কিছু নেই জানবার!

স্ত্রী : হ্যাঁ আছে!

বৃদ্ধ : কে বলেছে আছে?

স্ত্রী : আপনি বলেছেন। আপনার প্রতিটি কথা প্রতিটি হাসি দিয়ে বলেছেন।

বৃদ্ধ : কেন এলে তুমি এ বাড়িতে? কেন এলে তোমরা? কেন নেমেছিলে রাস্তা ছেড়ে মাঠে? আমি তো একা ছিলাম। আমার নিজের জানা নিয়ে, আমার নিজের সারারাত্তির নিয়ে, আমার নিজের দু'টো খোলা চোখ নিয়ে! কেন এসেছো তোমরা?

(স্ত্রীর উদগ্র প্রশ্ন হঠাৎ শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়লো। একরাশ অবসাদ নিয়ে বসে পড়লো সে।)

স্ত্রী : জানি না কেন এসেছি। আপনি শান্ত হোন। আপনাকে বলতে হবে না। (বৃদ্ধ চেয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে) আপনাকে বলতে হবে না, কিন্তু আমি জানবো। এই ঘরে বসে, এই রাত্রে আমি জানবো। সারা রাত্তির জেগে থেকে জানবো।

বৃদ্ধ : না! এ ঘরে তোমরা থাকবে না। তোমাদের বিছানা আমি অন্য ঘরে করে দিচ্ছি।

(দু'হাতে সাপটে বিছানা তুলতে লাগলেন। স্ত্রী লাফিয়ে উঠে বৃদ্ধের বাহু চেপে ধরলো।)

স্ত্রী : কেন?

বৃদ্ধ : (রূঢ়স্বরে) আমার হুকুম। এটা আমার বাড়ি। এ আমার ঘর! ছেড়ে দাও আমাকে! (বিছানার বোঝা ছিনিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে বসলো। তারপর হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হেরে যেতে যেতে জিতবার পথ খুঁজে পাবার এক হাসিতে উজ্জ্বল। উঠে ঘুরতে লাগলো নামহীন বস্তুগুলির ছায়ায় ছায়ায়। আলতো করে হাত বুলিয়ে যেন মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলো অনেকদিনের চেনা একটা ঘর। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে জানলায় বসে মনে করবার চেষ্টা করেছে কতোদিন সেই স্বপ্ন—যে স্বপ্ন ঘুম ভাঙিয়েছে। কী ছিল সে স্বপ্ন? এই ঘর? এই অনামী অবাস্তব গৃহসজ্জা? এই আলোয় ছায়ায় মেশা অশান্ত অনুভূতি? পুরুষ এলো ঘরে।)

পুরুষ : বুড়ো চলে গেছে?—এ কী! বিছানা কোথায় গেলো?

স্ত্রী : নিয়ে গেছে।

পুরুষ : নিয়ে গেছে? সে কী?

স্ত্রী : এ ঘরে আমাদের থাকা হবে না। অন্য ঘরে বিছানা পাতছে।

পুরুষ : তাই বলো। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

স্ত্রী : কিসের ভয়?

পুরুষ : বুড়োর তো মাথার ঠিক নেই। হয়তো বলে বসলো—থাকতে হবে না এখানে, বেরোও!

স্ত্রী : বললে আর কী হবে? বেরিয়ে যাবো।

পুরুষ : বেরিয়ে যাবে? বেরিয়ে কোথায় যাবে শুনি? শুনলে না নদীর বাঁধ ডুবে গেছে?

স্ত্রী : যদি এ বাড়িটা না থাকতো? যদি এতো খাতির করে না রাখতো?

পুরুষ : যদি তালগাছটা বেগুনগাছ হোতো! যদি আমরা মানুষ না হয়ে জন্তু হতাম! এসব কথার কোনো মানে আছে?

স্ত্রী : এ বাড়িটারই কি কোনো মানে আছে?

পুরুষ : কাব্য রেখে ব্যাপারটা কী হয়েছে বলো দেখি? কোথায় বিছানা হচ্ছে?

স্ত্রী : জানি না। অন্য কোনো ঘরে।

পুরুষ : যে ঘরেই হোক, এ ঘরের চেয়ে ভালো। এমন জঞ্জাল আর কোনো ঘরে নেই বাবা। (বৃদ্ধ এসেছেন। সংযত।)

বৃদ্ধ : হ্যাঁ এ ঘরটায় বড়ো জঞ্জাল। তাই যে ঘরে বসে আমরা খেলাম, সেই ঘরে বিছানা করে দিলাম।

পুরুষ : (অপ্রস্তুত হয়ে) না না জঞ্জাল কোথায়? এখানেই তো বেশ থাকতাম। আপনি কেন আবার অসুবিধে করে—

বৃদ্ধ : অসুবিধে কার?

পুরুষ : আপনার অসুবিধে—

বৃদ্ধ : ঠিক উল্টো। রাত্রে সাধারণত আমি এই ঘরেই থাকি।

পুরুষ : এই ঘরে? আপনার বিছানা কই? সব আমাদের দিয়ে দিলেন নাকি?

বৃদ্ধ : আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন—আমি রাত্রে ঘুমোই না।

পুরুষ : হ্যাঁ, না, কিন্তু— শোবেন তো?

বৃদ্ধ : শুইও না। ও বিছানাটা অকেজো পড়ে থাকে। ঐ শাড়িটার মতো। আরো বহু অকেজো জিনিসের মতো। এ বাড়ির খুব কম জিনিসই আমার কাজে লাগে।

পুরুষ : এতো অকেজো জিনিস জমিয়ে রাখেন কেন?

বৃদ্ধ : ফেলবার উপায় নেই আমার। কোনো কিছু ফেলবার উপায় নেই, ভোলবার উপায় নেই। এ সব বোঝা। আমার বোঝা। এই বোঝা বয়ে যেতে হবে আরো কতো ক—তো দিন—(হঠাৎ স্বর বদলে) যান শুয়ে পড়ুন গে। ঘুম পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব।

পুরুষ : তা পেয়েছে।

স্ত্রী : আমার পায় নি।

বৃদ্ধ : (আদেশের সুরে) তবু শুয়ে পড়ুন। অনেক ধকল গেছে আজ।

স্ত্রী : যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলবেন?

বৃদ্ধ : (প্রায় ভয়ে) না না, আর কথা নয়, অনেক রাত হয়ে গেছে—

স্ত্রী : একটা কথা শুধু—

পুরুষ : আচ্ছা কেন ওঁকে বিরক্ত করছো?

স্ত্রী : (কর্ণপাত না করে) আপনি এ ঘরে প্রথম বিছানা করেছিলেন কেন?

বৃদ্ধ : (একটু থেমে) শুনতে চান?

স্ত্রী : বলুন না?

বৃদ্ধ : স্বার্থপরতা। রোজ আমি একা জাগি, ভেবেছিলাম—আপনাদেরও জাগিয়ে রাখবো। কথা বলবো সারা রাত।

পুরুষ : ইয়ে, আপনার যদি ইচ্ছে হয়—রাত জেগে গল্প করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

(প্রায় শহীদ হয়ে ভদ্রতা করার চেষ্টা করে পুরুষ। মনে ভয়—পাছে বুড়ো রাজি হয়ে যায়।)

বৃদ্ধ : (মৃদু হেসে) না, আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। অনেক কথা বলা হয়েছে আজ অনেকদিন পরে। বাকি রাতটা আমি একা থাকতে চাই।

স্ত্রী : ইস, আর একটু ভদ্রভাবে তাড়াতে পারতেন!

(বৃদ্ধের চোখের কৌতুক কি স্ত্রীর চোখে জমা হচ্ছে?)

পুরুষ : আঃ কী বলছো কী? চলো—

স্ত্রী : আমাদের সঙ্গে কথা বলতে কি এতোই খারাপ লাগলো?

বৃদ্ধ : না, বরং খুব ভালো লাগলো।

স্ত্রী : তবে তাড়াচ্ছেন কেন?

বৃদ্ধ : আপনি বোধ হয় ভাবছেন—আমি বিরাট স্বার্থত্যাগ করছি আপনাদের ঘুমোতে দিয়ে, তাই না? এবং আপনি বিশ্রাম ত্যাগ করে—

স্ত্রী : একটু আগে তো 'তুমি' বলছিলেন। এখন আবার আপনি শুরু করলেন কেন?

(স্ত্রীর কণ্ঠে প্রায় চটুলতা। পুরুষ অবাক হোলো একটু। বৃদ্ধ সতর্ক।)

বৃদ্ধ : হঠাৎ বলে ফেলেছি। আমার বয়সটা বিবেচনা করে মার্জনা করবেন।

পুরুষ : না না, কী বলছেন? আমাকেও তুমি বলবেন—

স্ত্রী : কতো বয়স আপনার?
পুরুষ : আরে?
স্ত্রী : বলুন না!
বৃদ্ধ : আপনিই বলুন না?
স্ত্রী : ছয় সাত্তে বিয়াল্লিশ। হয়েছে?
বৃদ্ধ : না, হয় নি।
স্ত্রী : তবে? পঁয়ত্রিশ? আঠাশ?
বৃদ্ধ : (পুরুষকে) ক'টা বাজে?
পুরুষ : দশটা—চৌত্রিশ।
বৃদ্ধ : ঐ যাঃ! আপনাদের ঘরে খাবার জল রাখা হয়নি।
(অদৃশ্য হয়ে গেলেন)
পুরুষ : আচ্ছা কী আরম্ভ করেছো কী? বুড়ো মানুষের সঙ্গে—
স্ত্রী : কে বুড়ো মানুষ?
পুরুষ : বুড়ো মানুষ না? কী মানে হয় ওরকম ছ্যাবলামি করবার?
স্ত্রী : কী মানে হয়—তুমি বুঝবে না।
পুরুষ : বোঝবার কিছু থাকলে তো বুঝবো?
স্ত্রী : তুমি যা কিছু বোঝো না, তাতেই বোঝবার কিছু থাকে না!
পুরুষ : (অল্প চটে) কী বোঝবার আছে শুনি?
স্ত্রী : অনেক কিছু বোঝবার আছে। অনেক কিছুই বোঝো না তুমি।
পুরুষ : (বিরক্ত হয়ে) বুঝি না তোমার পাগলামি!
স্ত্রী : তবে আমাকেও বোঝো না।
(স্ত্রী এ কথা যেন শুধু কথার পিঠে কথা নয়। এ যেন অনেক ভিতরের, অনেক দিনের জমে থাকা কথা। জবাব দিতে গিয়ে পুরুষ থেমে গেলো। বৃদ্ধের কোনো কথা যেন মনে পড়ে গেলো তার।)
পুরুষ : তোমাকে—বুঝি না?
স্ত্রী : না, বোঝো না! বুঝতে চাও না। বুঝতে চাও নি কোনোদিন।
পুরুষ : বুঝতে চাই নি?
স্ত্রী : না চাও নি। যা কিছু বলতে চেয়েছি, ছেলেমানুষি বলে পাগলামি বলে থামিয়ে দিয়েছো।
পুরুষ : ছেলেমানুষি করেছো তাই থামিয়ে দিয়েছি। যদি ছেলেমানুষি ছেড়ে একটু বড়ো হবার চেষ্টা করতে তা হলে তুমিও অনেক কিছু বুঝতে পারতে।
স্ত্রী : তার মানে?
পুরুষ : তুমি জানো আমার সব কথা? তুমি খবর রাখো, আমি কী চাই না চাই?
(এসব কী কথা? এ সব তো বলবার কথা নয়? এরা যে পরস্পরের সব কিছু জানে চেনে বোঝে! এ সব তবে কী কথা! এ কথা থামা দরকার। থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। পুরুষের কথা শেষ হবার আগেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।)
বৃদ্ধ : (আদেশের স্বরে) না, এ ঘরে আর নয়। এ ঘরে থাকলেই কথা হবে, কথা বাড়বে।

স্ত্রী : (প্রায় অশিষ্টভাবে) বাড়ুক না। আপনার তাতে কী?

পুরুষ : আঃ কী হচ্ছে?

বৃদ্ধ : আমার অনেক কিছু।

স্ত্রী : কী অনেক কিছু? বলুন না শুনি?

(প্রায় রুখে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী। এ ভঙ্গী পুরুষ চেনে না। থমথমে একটা নীরবতা খানিকক্ষণ। বৃদ্ধ চোখ রাখলেন স্ত্রীর চোখে। তারপর সে চোখ চলে গেলো অন্যদিকে, ঘরের প্রতিটি কোণে। যেন অনেক দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগলো।)

বৃদ্ধ : এই ঘরে বহু কথা জমা হয়ে আছে। বহু বহু কথা। অনেক কথা। ওরা যায় না। ওরা ভাসতে থাকে। ভারি বিষাক্ত বাষ্প হয়ে জমে থাকে—এই ঘরে, ঐখানে, ঐ কোণে, ঐ দেয়ালে, ঐ সব জিনিসের কোণে খাঁজে আনাচে-কানাচে। রাত্রে ওরা বেরোয়, ওরা ঘোরে, ছড়ায়, জড়ায়, কুণ্ডলী পাকায়। শত শত বিষাক্ত কিলবিলে সাপের মতো ওরা কুণ্ডলী পাকায়। আর চেনায়। আর জানায়। আর সারারাত্তির ধরে আমি ওদের মধ্যে বসে থাকি, ঘুরে বেড়াই, পায়চারি করি। ওরা আমাকে চেনায়। আর জানায়। আর বোঝায়। আর চেতনার বিষে বিষে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সব বিষ গিয়ে জমা হয় আমার এই দু'টো চোখে। এই দু'টো চোখে। এই দু'টো জেগে থাকা, খুলে রাখা, মেলে ধরা চোখে। এই দু'টো চোখ!

সারারাত্তির! সারা রাত্তির!
সারারাত্তির খোলা দুই চোখে
জমে থাকা বিষ ছোবলে ছোবলে
বিষাক্ত যতো কথার ছোবলে
কতো হলাহল চেতনার বিষ
সারারাত্তির এই দু'টো চোখে নিয়েছি।
পুষে রাখা কথা জমে থাকা কথা
চেতনার বিষে বিষাক্ত কথা
এই ঘরে এই বিষের আধারে
সারারাত্তির ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়েছি।
তবু এ আমার—এ আমার কথা,
এ ঘর আমার, এ আমার বিষ,
যতো কথা আছে আনাচে-কানাচে
ছায়াতে ছায়াতে কোণে খাঁজে মিশে
যতো কথা আছে সবই একা আমি
একে একে এনে পুষে পুষে রেখে দিয়েছি।

হ্যাঁ, আমি একা! আর কেউ নয়! আমি একা! এ আমার ঘর! তোমরা যাও! শুতে যাও।

(নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো ওরা। না বেরোনো পর্যন্ত বৃদ্ধ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই পুরোনো জায়গায়, পুরোনো ভঙ্গীতে। হাত দিলেন পুরোনো ছায়ায়। আলো নিভে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো।)

সারারাত্তির আমি তো একাই
যতো কথা সবই আমি তো একাই
একে একে এনে পুষে-পুষে রেখে দিয়েছি।

(পর্দা নেমে এলো অন্ধকারে)

তৃতীয় দৃশ্য

(অন্ধকার। বৃদ্ধের ছায়ামূর্তি ঘরের এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে ওদিক, থেকে এদিকে আসছে। নিয়মিত ছন্দে শুণে শুণে পদশব্দ বাজছে। এদিক থেকে ওদিক। ওদিক থেকে এদিক। আজব একটা ঘড়ি যেন নির্ভুল স্পন্দনে একে একে শুণে শুণে সারা রাত্রের মুহূর্তগুলিকে পার করে দিচ্ছে। সহসা ঘড়ি থামলো। ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ আলো নিভিয়েছিলেন, সেইখানে থামলো।)

বৃদ্ধ : কে?
(আলো জ্বলে উঠলো। বৃদ্ধের হাত সেই আলো-জ্বলা ছায়াতে। ঘরের দরজার কাছে স্ত্রী। চুল খোলা। ঘাড় ছাপিয়ে পিঠ ছাপিয়ে চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য, এতো চুল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলো এতোক্ষণ? এতো দীর্ঘ, এতো ঋজু, এতো অসাধারণও তো লাগে নি ওকে আগে? এক মুহূর্ত, এক দীর্ঘ মুহূর্ত ওরা চেয়ে রইলো পরস্পরের দিকে। দৃষ্টি স্থির। দেহ স্থির।)
কেন এলে?

স্ত্রী : ঘুম ভেঙে গেলো।

বৃদ্ধ : কেন?

স্ত্রী : মাঝরাত্তির যে? ঘুম ভাঙবে না?

বৃদ্ধ : তবে যাও, জানলায় বসে থাকো গে।

স্ত্রী : জানলায় বসেছিলাম এতোক্ষণ।

বৃদ্ধ : কতোক্ষণ?

স্ত্রী: সারাক্ষণ। আমি ঘুমোই নি।

বৃদ্ধ : উঠে এলে কেন? .

স্ত্রী : জানলায় বসে থাকতে ভালো লাগলো না।

বৃদ্ধ : কেন?

স্ত্রী : বিশ্রী ভাঙা একটা চাঁদ উঠেছে। ফ্যাকাসে তার আলো। মাঠের জলে সে আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। মাঠের পর মাঠ। আর জল। চারদিক থম্‌থম্ করছে। ভয় করলো।

বৃদ্ধ : ভয় করলো?

স্ত্রী : হ্যাঁ, ভয় করলো। বড়ো একা লাগলো।

বৃদ্ধ : একা? ঐ ঘরে তো তোমার স্বামী আছে?

স্ত্রী : ও তো ঘুমোচ্ছে।

বৃদ্ধ : জাগিয়ে দাও।

স্ত্রী : লাভ নেই।

বৃদ্ধ : কেন?

স্ত্রী : আরো তো কতোবার এরকম ভয় করেছে রাত্রে। বাড়িতে। বিদেশে। ওকে জাগিয়েছি। কিছু হয় না।

বৃদ্ধ : কেন?

স্ত্রী : পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ : তুমি কী করো?

স্ত্রী : আমি সেই ভয় বুকে করে বসে থাকি। শুয়ে থাকি। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

বৃদ্ধ : তবে তাই করো গে। এ ঘরে এলে কেন?

স্ত্রী : এ ঘরে তুমি আছো তাই।

বৃদ্ধ : 'তুমি'?

স্ত্রী : ক্ষতি কী? কাল সকালে আবার আপনি বলবো।

বৃদ্ধ : আমার বয়স কতো বেশি জানো?

স্ত্রী : তোমার বয়সে আমি বিশ্বাস করি না।

বৃদ্ধ : তার মানে?

স্ত্রী : তোমার যে বয়স আছে তাই বিশ্বাস করি না। (বৃদ্ধ এক মুহূর্ত কথা বললেন না)

বৃদ্ধ : তুমি এ ঘরে এসেছো কেন?

স্ত্রী : বললাম তো—তুমি আছো বলে।

বৃদ্ধ : আমি আছি তো কী?

স্ত্রী : তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

বৃদ্ধ : এই ঘরে?

স্ত্রী : এই ঘরেই তো তোমার যতো কথা।

বৃদ্ধ : এই মাঝরাত্তিরে?

স্ত্রী : মাঝরাত্তিরেই তো তোমার যতো কথা।

বৃদ্ধ : এ ঘরে মাঝরাত্তিরে আমার কথা তুমি কবে শুনেছো যে বলছো?

স্ত্রী : অনেকদিন শুনেছি। এই ঘরের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে। মাঝরাত্তিরে জানলায় বসে তোমার কথা শুনেছি। তোমার সঙ্গে কথা বলেছি।

বৃদ্ধ : তুমি কি উন্মাদ?

স্ত্রী : না।

বৃদ্ধ : তবে আবোল তাবোল বলছো কেন?

স্ত্রী : কী বলেছি?

বৃদ্ধ : আজ সন্ধ্যার আগে তুমি আমাকে চিনতে?

স্ত্রী : চিনতাম। এখানে দেখে চিনতে একটু দেরি হয়েছিলো। এখন চিনেছি।

বৃদ্ধ : তবু বলতে চাও তুমি উন্মাদ নও?

স্ত্রী : তুমি জানো আমি উন্মাদ নই। তুমি জানো আমি কী বলছি, কেন বলছি। জানো না? (বৃদ্ধ নিরুত্তর) বলো? জানো না?

বৃদ্ধ : (ধীরে ধীরে) হ্যাঁ, জানি। আমার উত্তরপুরুষ। রঞ্জন।

স্ত্রী : রঞ্জন!

(প্রতিধ্বনির মতো নামটা ছড়িয়ে পড়লো ঘরে। অপূর্ব তার অনুরণন।)

বৃদ্ধ : এখানে রঞ্জনের নাম করবার মানে কী তা বোঝো?

স্ত্রী : খানিকটা বুঝলাম। নাম করে। আরো বুঝতে চাই। আরো জানতে চাই। এই ঘর। মাঝরাত্তির। তুমি। এখন যদি না জানি তবে কোনোদিনই যে জানা হবে না জীবনে।

বৃদ্ধ : নাই বা হোলো?

স্ত্রী : আমি জানবো।

বৃদ্ধ : দুনিয়ায় বহু কথা আছে যা না জানাই ভালো।

স্ত্রী : আমি জানবো।

বৃদ্ধ : জানার যন্ত্রণা কী তা জানো?

স্ত্রী : মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছো।

বৃদ্ধ : যন্ত্রণা নেই?

স্ত্রী : আছে। তার আগে আরো কিছু আছে। সেটকে কেন বার বার চাপা দিয়ে যন্ত্রণার ভয় দেখাচ্ছো?

বৃদ্ধ : তার আগে কী আছে?

স্ত্রী : আনন্দ। (আবার সেই অনুরণন। রঞ্জনের মতো। আনন্দ।)

বৃদ্ধ : কতোক্ষণের?

স্ত্রী : যতোক্ষণই হোক!

বৃদ্ধ : তার জন্য কী দাম দিতে হয় জানো?

স্ত্রী : কী দাম?

বৃদ্ধ : সুখ! শান্তি!

স্ত্রী : (স্ত্রী ভাবলো) আমি সুখে আছি। আমি শান্তিতে আছি। প্রতি দিন। প্রতি মাস। প্রতি বছর। সাত বছর। আঠাশ বছর। সুখ আর শান্তি।

বৃদ্ধ : কী বলছো?

স্ত্রী : ওজন করছি। দেখছি—সাত বছরের, আটাশ বছরের সুখ আর শান্তির কতোটা ওজন। দাঁড়িপাল্লার একদিকে সমস্তটা তুলছি। সমস্ত সুখ আর শান্তি।

বৃদ্ধ : আর অন্যদিকে?

স্ত্রী : এক কণা আনন্দ। সে আনন্দের সবটা পাই নি। তার আভাস পেয়েছি। বুঝতে পারছি না তার ওজন।

বৃদ্ধ : অনেক কম হবে তার ওজন।

স্ত্রী : জানি না। এদিকে বেশি নেই।

বৃদ্ধ : যখন জানবে তখন আর ফিরিয়ে নেবার পথ থাকবে না যে?

স্ত্রী : তবু জানতে চাই। (এক নীরবতা। বৃদ্ধ ভাবছেন।)

বৃদ্ধ : রঞ্জনকে তুমি চেনো?
স্ত্রী : যেটুকু চেনা আমার সাধ্যে কুলোয়।
বৃদ্ধ : রঞ্জনকে তুমি ভালোবাসো?
স্ত্রী : (হেসে) রঞ্জনকে ভালোবাসবো—সে সাহস আমার কোথায়?
বৃদ্ধ : রঞ্জন কি তোমাকে ভালোবাসে?
স্ত্রী : আকাশের তারা কি মাটির ফুলকে ভালোবাসে?
বৃদ্ধ : রঞ্জন কি এতো দূরের?
স্ত্রী : আমি তাই ভাবি।
বৃদ্ধ : কেন?
স্ত্রী : আমার কী আছে? আমি অতি সাধারণ।
বৃদ্ধ : রঞ্জন কি অসাধারণ?
স্ত্রী : আমার চোখে।
বৃদ্ধ : তুমি স্বপ্ন দিয়ে তৈরি করেছো রঞ্জনকে। কল্পনা দিয়ে। রঞ্জন তা নয়।
স্ত্রী : রঞ্জন তাই। আমি যে রঞ্জনকে দেখি। সে রঞ্জন আকাশ, মাটি তাকে বাঁধতে পারে না। সে রঞ্জন বাতাস, স্পর্শ পাই, কিন্তু ধরতে পারি না। রঞ্জন এক ব্যাপ্তি। তার দু'চোখ চলে যায় মাটি পেরিয়ে, পৃথিবী পেরিয়ে, প্রতি দিনের মুহূর্তদের পেরিয়ে, দিগন্তের ওপারে। তার চোখে বিশ্ব, অনেক বড়ো বিশ্ব, এতো বড়ো যে সে আমাদের প্রতিদিনের খুঁটিনাটিতে ধরা পড়ে না।
বৃদ্ধ : তার চোখে বিশ্ব, তাই তার চোখে জ্বালা। তাই তার চোখ নিমেষহীন, পলকহীন। তার চোখ খোলা থাকে, মেলা থাকে, অন্ধকারে, প্রতি রাত্রে, সারা রাত। তার চোখের আগুন তাকে পোড়ায়। যন্ত্রণা দেয়। শেষ করে ফেলে। রঞ্জন বৃদ্ধ। রঞ্জন শেষ। তাকে ভুলে যাও।
স্ত্রী : তাকে আমি চাই।
বৃদ্ধ : তুমি তাকে চাও?
স্ত্রী : আমি তাকে চাই। কতোদিন রাত্রে, মাঝরাত্রে, আঠাশটা বছর ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে মিশে গেছে। আমি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছি—অর্থ খুঁজেছি, সঙ্গতি খুঁজেছি, মূল্য খুঁজেছি। ও শূন্যতার ভার সহ্য করতে পারিনি। অস্থির হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে খুঁজেছি। তখন বুঝতে পারিনি। আজ যতো মাঝরাত্রের ঘুমভাঙা জানলা এসে মিশেছে এই ঘরে, এ জেগে-থাকা রাতে। আমার যতো শূন্যতা যতো রিক্ততা সব এই ঘরে, এই জেগে থাকা রাতের আগুনে জ্বলে গলে ঝালাই হয়ে তৈরি হয়েছে একটা ধারালো অভাব। আমি চাই। আমি রঞ্জনকে চাই।
বৃদ্ধ : তোমার স্বামী?
স্ত্রী: আমি জানি না।
বৃদ্ধ : তোমার জগৎ?
স্ত্রী: আমি জানি না।
বৃদ্ধ : আর রঞ্জন?
স্ত্রী : আমি জানি না। রঞ্জন আমাকে চায় না। চাইবে না। চাইতে পারে না। কিন্তু তাতে

কী এসে যায়? আমার চাওয়া—সে আমার। আমার চাওয়া—সে আমি। যতদিন জানতে পারিনি—শূন্য হয়ে ছিলাম। আজ জেনেছি—আজ আমি পূর্ণ। আজ আমার একটা অর্থ আছে। আজ আমি আছি। আজ থেকে আমি থাকবো।

বৃদ্ধ : শুধু একটা চাওয়া নিয়ে তুমি থাকবে?

স্ত্রী : (স্ত্রীর দু'চোখ জ্বলে উঠলো হঠাৎ) শুধু একটা চাওয়া! আঠাশ বছরের শূন্যতা ভাসতে ভাসতে এসে আজ এই চাওয়ার চড়ায় ঠেকেছে, আর তুমি বলছো শুধু একটা চাওয়া?

(বৃদ্ধ সহসা দু'হাত শূন্যে ছড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন)

বৃদ্ধ : রঞ্জন! তুমি শোনো!

(গমগম করে উঠলো সারা ঘর। নাম-না-জানা বস্তুদের ছায়ারা যেন নড়েচড়ে বসলো। প্রতিধ্বনি হয়ে পরস্পরের কানে কানে ফিস ফিস করে বলতে লাগলো—তুমি শোনো, তুমি শোনো। স্ত্রী চেয়ে রইলো বৃদ্ধের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে।

বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করলেন স্ত্রীর দিকে না চেয়ে, কোনো কিছুর দিকে না চেয়ে, ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন। মেলে ধরতে লাগলেন যেন অনেকদিনের লুকিয়ে রাখা এক ইতিহাস।)

রঞ্জনের চোখে বিশ্ব, রঞ্জনের চোখে জ্বালা, আর রঞ্জনের মনে স্বপ্ন। রঞ্জনের চোখ, আর রঞ্জনের মন। চোখ যা দেখেছে, মন তা দেখতে চায়নি। চোখ যা মেনেছে, মন তা চিৎকার করে অস্বীকার করতে চেয়েছে। রঞ্জনের মন স্বপ্ন বুনেছে। দিনের পর দিন পরম যত্নে পরম ধৈর্যে স্বপ্ন বুনেছে। আর রঞ্জনের চোখ ছুরির ফলা হয়ে একদিনে সে স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। একবার, দু'বার, বার বার। রঞ্জনের রক্তাক্ত মন প্রতিবার নতুন করে আবার বুনেছে স্বপ্নের জাল। জানে ছিঁড়ে যাবে। জানে থাকবে না। চেনে তার পরম শত্রু দু'টো চোখের ধারালো নির্মমতাকে। তবু এক নির্বোধ তাগিদে বার বার বুনে গেছে সেই একই স্বপ্নের জাল।

স্ত্রী : কী সে স্বপ্ন?

বৃদ্ধ : একটি মেয়ের মানসমূর্তি।

স্ত্রী : কে সে?

বৃদ্ধ : কে সে? কেউ না। সে যে কেউ হতে পারে। শুধু একটা শর্তে।

স্ত্রী : কী শর্ত?

বৃদ্ধ : তাকে নির্বোধ হতে হবে। চূড়ান্ত নির্বোধ হতে হবে। একটা কারণহীন যুক্তিহীন বুদ্ধিহীন ভালোবাসায় তাকে ভালোবাসতে হবে। চাইতে হবে রঞ্জনকে একমুখী একান্ত নির্বোধ চাওয়া দিয়ে। এক সর্বত্যাগী, সর্বগ্রাসী, সর্বাঙ্গিক চাওয়া দিয়ে। যতো মেয়ে সে দেখেছে, যতো মেয়েকে সে চিনেছে, প্রত্যেককে ঘিরে তার মন এই একই স্বপ্নের জাল বুনেছে। প্রত্যেকের মধ্যে খুঁজেছে তার অলীক অসম্ভব মানসমূর্তি। খুঁজেছে এক আজগুবি অবাস্তব সৃষ্টিছাড়া চাহিদা নিয়ে।

স্ত্রী : পায় নি?

বৃদ্ধ : কী করে পাবে? তার দুই চোখ, মনের পরম শত্রু দু'টো জেগে-থাকা মেলে-রাখা চোখ প্রতিবার ছিঁড়ে দিয়েছে স্বপ্ন। প্রতিবার প্রমাণ করেছে—রক্তমাংসের মানুষ

মেলে না, কোনোদিন মিলবে না তার স্বপ্নের সঙ্গে।

স্ত্রী : কেন?

বৃদ্ধ : কেন? তুমি মূর্খ। তুমি জানো না! ওরা রঞ্জনকে দেখেছে বাইরে থেকে। কাছে গেছে। চেয়েছে। বলেছে—ভালোবাসি। দু' হাত ভরে এগিয়ে দিয়েছে রাশি রাশি স্বপ্নের সুতো। রঞ্জনের মন সেই সুতো দিয়ে স্বপ্ন বুনেছে। কিন্তু তারপর? দু'টি নির্মম চোখের আলোয় ফুটে উঠেছে সে দানের কার্পণ্য। ফুটে উঠেছে রক্তমাংসের মানুষ। সে মানুষের আছে অনেক কিছু। অনেক অন্য চাওয়া, অনেক পিছুটান। কেন থাকবে না? কেন সে সমস্ত কিছু তুলে দেবে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে?

স্ত্রী : দেবে না?

বৃদ্ধ : কেন দেবে? কিছু তো পাবার নেই তার বদলে? রঞ্জনের মন তো বলে নি—তুমি দাও, তাহলে আমি দেবো? সে শুধু বলেছে—আমি চাই, তুমি দাও। শুধু দাও নয়, সব দাও। সে শুধু বলেছে—তুমি চাও, তুমি ভালোবাসো। তোমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, চেতনা দিয়ে, সমগ্রতা দিয়ে আমাকে চাও, আমাকে ভালোবাসো, আমাকে দাও। তার বদলে আমি কিছু দেবো না। শুধু বলবো—হ্যাঁ, তোমাকেই স্বপ্ন দেখেছি এতোদিন।

স্ত্রী : তবুও দেবে না?

বৃদ্ধ : তবুও? কে দেবে এই অসম্ভব দেওয়া?

স্ত্রী : (চিৎকার করে) রঞ্জন! আমি দেবো।

বৃদ্ধ : তুমি— দেবে?

স্ত্রী : (চিৎকার করে) তুমি শুধু বলো—আমাকে স্বপ্ন দেখেছো।

(ঘরের মধ্যে রাত্রি থেমে দাঁড়ালো এক মুহূর্ত। সময়ের অমোঘ গতি স্তব্ধ হোলো মুহূর্তের জন্য। ঘরের ছায়ারা চেয়ে রইলো বিস্ময়ে। এক মুহূর্ত। তারপর অনেক দূর থেকে অনেক গভীর থেকে বৃদ্ধ ঘোষণা করলেন।)

বৃদ্ধ : তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

(স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পড়লো বৃদ্ধের বুকে। বিশ্ব উজাড় করে ঢেলে দিলো বৃদ্ধের বুকে। নিজেকে নিঃশেষ করে মিশিয়ে দিলো বৃদ্ধের বুকে। বৃদ্ধ গ্রহণ করলেন একখানি হাতে। রাশি রাশি চুলের মধ্যে একখানি হাত—স্বপ্নের স্বীকৃতি। অন্য হাত সেই পুরোনো ছায়ায়। আলো নিভে গেলো। অন্ধকারে দু'জনে এক। দু'জনে একটি অন্ধকার।)

সারারাত্তির কথার পাথরে
শান দিয়ে দিয়ে কথার পাথরে
আমার দু' চোখে শান দিয়ে দিয়ে
খোলা দুই চোখে নির্মম শান রেখেছি।
স্বপ্নের ভয়ে সজাগ প্রহরী
সারারাত্তির ধারালো দু'চোখে জেগেছি।
তবু মনে মনে আবার আবার,
স্বপ্ন বুনেছি আবার আবার,
নির্বোধ এক অধ্যবসায়ে

প্রতি বার বার নির্বোধ মনে
তোমাকে স্বপ্ন তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।
(পর্দা কি নামবে? শেষ কি হবে? এ ঘর কি সার্থক হবে একটা গভীর স্বীকৃতিতে? নিঃশেষে মিশে থাকা একটা গভীর ছায়ার সমাপ্তিতে?)
কে?
(শেষ হোলো না। আলো জ্বললো। বৃদ্ধের বুক ঢেকে এখনো সেই স্বপ্ন। স্ত্রীর চুলের রাশিতে এখনো সেই স্বীকৃতি। ঘরে এখনো সেই পুরোনো আলো, পুরোনো ছায়া। কিন্তু সামনে, তার বাইরে, অন্যদিকে ফিরে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে—পুরুষ।)
তুমি?

পুরুষ : হ্যাঁ আমি।
(স্বীকৃতি সরে গেলো, স্বপ্ন খসে গেলো বুক থেকে। ছায়া চিরে গেলো দু'ভাগে, আলাদা আলাদা, দূরে দূরে।)

বৃদ্ধ : কী চাও তুমি?

পুরুষ : মৃত্যু!

বৃদ্ধ : কেন?

পুরুষ : লজ্জায়। দুঃখে। ঘৃণায়।

স্ত্রী : কেন?
(মুখ তুললো পুরুষ। উঠে দাঁড়ালো। স্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ।)

পুরুষ : কেন তুমি জানো না?

স্ত্রী : না।

পুরুষ : তোমার লজ্জা হয় না!

স্ত্রী : কেন লজ্জা হবে?

পুরুষ : তোমার পাপ তোমাকে লজ্জা দেয় না?

স্ত্রী : আমার—পাপ?

পুরুষ : হ্যাঁ, তোমার পাপ। জানো না পাপ কাকে বলে?

স্ত্রী : জানি।

পুরুষ : জানো? তবে বুঝতে পারছো না কী পাপ তুমি করেছো?

স্ত্রী : না পারছি না। আমি পাপ করিনি।

পুরুষ : পাপ করোনি? তুমি ছাড়া আমার কেউ ছিল না!

স্ত্রী : ছিল না বলছো কেন? তোমার যা ছিল, তা আছে।

পুরুষ : মিথ্যে কথা!

স্ত্রী : না। সত্যি কথা। আর যে কিছু দেবার ছিল আমার—সে খবর তা তুমি রাখো নি।

পুরুষ : আমি তোমার সব কিছু চেয়েছি।

স্ত্রী : আমার সব কিছু? আমার সব কিছু কী—তা তুমি কোনোদিন জেনেছিলে? জানতে চেয়েছিলে?

পুরুষ : তুমি জানিয়েছো কোনোদিন?

স্ত্রী : কী করে জানাবো? কাকে জানাবো? যার কাছে আমি একটা সঙ্গদানের যন্ত্র—

তাকে? যার কাছে আমি শুধু প্রতিদিনের অভ্যস্ত আরামের ব্যবস্থা করবার যন্ত্র—তাকে?

পুরুষ : কী বলছো তুমি?

স্ত্রী : সত্যি কথা। এই ঘরে, এই রাত্রে, সত্যি ছাড়া আমার মুখ দিয়ে কিছু বেরোবে না।

পুরুষ : তুমি আমাকে ভালোবাসোনি?

স্ত্রী: বেসেছি। যেটুকু তুমি চেয়েছো দরকারে। তোমার সংসার চালাবার, সাজাবার, সুন্দর করবার দরকারে। তোমার অভ্যস্ত জীবনের ছন্দরক্ষার দরকারে। সে দরকার তো আমি মিটিয়েছি।

পুরুষ · এইটুকু? আর কিছু নয়?

স্ত্রী : আর কী?

পুরুষ : আমি তোমায় ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।

স্ত্রী : জানি। আমিও তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।

পুরুষ : আমার ভালোবাসায় কোনো ফাঁকি ছিল না।

স্ত্রী : আমার ভালোবাসাতেও কোনো ফাঁকি ছিল না।

পুরুষ : আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি।

স্ত্রী : আমিও ভালোবাসি।

পুরুষ : মিথ্যে কথা!

স্ত্রী : বলেছি তো—এ ঘরে এ রাত্রে মিথ্যে বলা সম্ভব নয়।

পুরুষ : তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে—অন্যের কাছে যেতে না।

স্ত্রী : আমাদের ভালোবাসা! কতোটুকু তার গণ্ডী? কতোটুকু তার সীমানা? যতোটুকু ভালোবেসে তোমাকে বিয়ে করেছি, যতোটুকু ভালোবেসে তোমার সঙ্গে সাত বছর ঘর করেছি, তার এক ফোঁটা কমে নি, এক ফোঁটা বাড়ে নি।

পুরুষ : সে ভালোবাসা মিথ্যে! তুমি আমাকে ঠকিয়েছো!

স্ত্রী : যদি তাই হয়, তুমি তো ঠকেই বিয়ে করেছো। তুমি তো এতোদিন ধরে ঠকে এসেছো। কাল আমরা হোটেলে ফিরবো। পরশু আমরা কলকাতায় ফিরে যাবো। যদি মাঝরাত্রে এমনভাবে তুমি না আসতে, চিরদিন তো ঠকে যেতে, জানতেও পারতে না।

পুরুষ : তুমি আমাকে বলতে না? তুমি আমাকে ঠকিয়ে যেতে?

স্ত্রী : কেন বলবো? তুমি তো জানতে চাইতে না? এতোদিন ধরে তোমাকে যেটুকু ভালোবেসেছি, তোমার যেটুকু অভাব মিটিয়েছি, তার বাইরে যে আমার কিছু আছে তা তো তুমি জানতে চাও নি?

পুরুষ : তুমি কি জানিয়েছো?

স্ত্রী : আবার সেই এক কথা! একই কথা ঘুরে ফিরে আসছে। একই কথার চক্রে ঘুরছি আমরা। চলো যাই।

পুরুষ : কোথায় যাবো?

স্ত্রী: ঘরে।

পুরুষ : ঘর? কোথায় ঘর? আমার ঘর ভেসে গেছে। তুমি ভাসিয়ে দিয়েছো।

স্ত্রী : তোমার ঘর যা ছিল, তাই আছে। তাই থাকবে।

পুরুষ : অসম্ভব।

স্ত্রী : কেন অসম্ভব?

বৃদ্ধ : জানা। জানার যন্ত্রণা। ও এখন জানে।

পুরুষ : লজ্জা করছে না তোমার কথা বলতে? তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।

বৃদ্ধ : কেন?

পুরুষ : কেন? তোমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম!

বৃদ্ধ : হ্যাঁ নিয়েছিলে। আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম।

পুরুষ : নিঃসঙ্কোচে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমাকে মিশতে দিয়েছিলাম!

বৃদ্ধ : হ্যাঁ দিয়েছিলে। আমি নিঃসঙ্কোচে মিশেছিলাম।

পুরুষ : তুমি সে বিশ্বাসকে অপমান করেছো। আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আমার স্ত্রীকে পাপের পথে টেনে নিয়ে গেছো!

বৃদ্ধ : বিশ্বাস! অপমান! পাপ! শুনছো? শোনো! তোমরা শোনো!

(ছায়ারা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো। প্রতিধ্বনি হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগলো—শোনো, তোমরা শোনো।)

বিশ্বাস। অপমান। পাপ। প্রেম। বিবাহ। সংসার। শুনছো তোমরা? শোনো!

পুরুষ : তুমি অতি নীচ! আমার ঘর ভেঙে দিয়েছো। আমার একমাত্র সম্বল কেড়ে নিয়েছো। আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছো। তার পরেও আমাকে নিয়ে তামাসা করছো তুমি—তোমার নীচতার সীমা নেই!

স্ত্রী : চুপ করো!

পুরুষ : কেন, গায়ে লাগছে বুঝি!

স্ত্রী : না। কানে লাগছে। চেঁচিও না।

পুরুষ : নির্লজ্জ বেহায়া তুমি!

স্ত্রী : আচ্ছা, তাই। তুমি থামো।

পুরুষ : আর ক'জন আছে তোমার এরকম? আর ক'জনের কাছে গিয়ে ঠকিয়েছো আমায়?

স্ত্রী : চুপ করবে তুমি?

পুরুষ : কেন চুপ করবো? তোমাকে বিশ্বাস করে সকলের সঙ্গে মিশতে দিয়েছি। যা চেয়েছো তাই করতে দিয়েছি। এই তার শোধ?

(স্ত্রী দৃঢ় পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। পুরুষ এক লাফে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো।)

কোথায় যাচ্ছো!

স্ত্রী : চলে যাচ্ছি।

পুরুষ : কোথায় চলে যাচ্ছো!

স্ত্রী : জানি না। তোমার কাছ থেকে দূরে। তুমি তো আমাকে আর চাও না?

পুরুষ : থাক হয়েছে। অনেক নাটক করেছো!

স্ত্রী : নাটক কিসের?

পুরুষ : এই রাত্রে দুর্যোগের মধ্যে কোথায় যাবে শুনি?
স্ত্রী : সে আমি বুঝবো।
পুরুষ : তুমি তো সব বোঝো! ভাবছো ও তোমায় আশ্রয় দেবে? ভুলেও ভেবো না।
স্ত্রী : কারো আশ্রয়ের ভরসা আমি রাখি না। পথ ছাড়ো!
পুরুষ : তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কোথায় যাবে?
স্ত্রী : জানি না। রাস্তায়।
পুরুষ : রাস্তা? সমস্ত রাস্তা জলে ডুবে গেছে—জানো না?
স্ত্রী : সে আমি বুঝবো। তুমি পথ ছাড়ো।
পুরুষ : কেন যাবে?
স্ত্রী : কী করবো না হলে? সারা জীবন তোমার ঐ সব কথা শুনবো?
পুরুষ : কথা আমি এমনি এমনি বলছি?
স্ত্রী : ঐ আবার। ছাড়ো, যেতে দাও।
পুরুষ : না! না! বলবো না। কিছু বলবো না। তুমি ঘরে যাও। আমি আর কিছু বলবো না।
স্ত্রী : ঠিক তো?
পুরুষ : ঠিক।

(স্ত্রী ফিরে সোজা চলে গেলো ঘরে। পুরুষ বৃদ্ধের দিকে ফিরলো।)

কেন তুমি এমন করলে? কেন নষ্ট করে দিলে আমার জীবন? কী করেছি আমি তোমার? কী করেছি? (বৃদ্ধ নিরুত্তর। নিশ্চল।) আমার কেউ নেই। ও ছাড়া আমার কেউ নেই। কেন এমন করলে? কেন ওকে কেড়ে নিলে? ও না থাকলে আমি কী করে বাঁচবো?

বৃদ্ধ : ও তো আছে?
পুরুষ : (চিৎকার করে) ও আছে? ওকে থাকা বলে? আমি ভুলতে পারবো ভেবেছো আজ রাত্রের কথা? এই ঘর, এই অন্ধকার, তোমরা দু'জন—উঃ আমি আর সহ্য করতে পারছি না—

(ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলো পুরুষ। বৃদ্ধ আবার নিশ্চল। একটি দীর্ঘ মুহূর্ত।)

বৃদ্ধ : মন বসে তবু আবার আবার
স্বপ্ন বুনেছে আবার আবার
নির্বোধ এক অধ্যবসায়ে
প্রতি বার বার নির্বোধ মনে
তোমাকে স্বপ্ন তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

(বৃদ্ধ থামলেন। এখানেই থামবার কথা। কিন্তু না। আবার শুরু হোলো।)

নির্মম শান ধারালো দু' চোখ
ধারালো ছুরিতে আবার কাটবে?
আবার কি দেবে বাতাসে ছড়িয়ে
ছিঁড়েখুঁড়ে সব বাতাসে ছড়িয়ে?
এ ঘরের রাতে আবার কি চোখ
স্বপ্নের দেনা ধারালো ছুরিতে চোকাবে?

আবার কি মন ধ্বংসাবশেষ
স্বপ্নের যতো ধ্বংসাবশেষ
ভিখিরি এ মন কুড়িয়ে কুড়িয়ে
আবারও কি সব স্মৃতির থলিতে ঢোকাবে?

(কে জবাব দেবে? দিতে পারে বৃদ্ধের জেগে থাকা চোখ। কিন্তু সে চোখে যেন প্রশ্ন, যেন সংশয়। প্রায় যেন আশা। ছুটে ঘরে এলো স্ত্রী। ভেঙে পড়লো একটা আসনে।)

স্ত্রী : আমি এ পারছি না, পারছি না, কতো সহ্য করা যায়?

(কাছে এলেন বৃদ্ধ। খুব কাছে। ঝুঁকে পড়লেন পরম স্নেহে। কিন্তু স্পর্শ করলেন না।)

বৃদ্ধ : কী হয়েছে?

স্ত্রী : পাগল করে দিচ্ছে আমাকে! ঐ একই কথা। বার বার ঐ একই কথা। এক মুহূর্ত শান্তি দেবে না আমায়?

বৃদ্ধ : শান্তি? (সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ) শান্তি খুঁজছো?

স্ত্রী : হ্যাঁ। আমি আর কিচ্ছু চাই না। শুধু একটু শান্তিতে থাকতে চাই।

বৃদ্ধ : শান্তি চাও?

স্ত্রী : হ্যাঁ শান্তি।

বৃদ্ধ : রঞ্জনকে চাও না?

স্ত্রী : (তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসলো স্ত্রী) কে বলে চাই না?

বৃদ্ধ : দু'টো এক সঙ্গে কী করে হবে বলো?

স্ত্রী : (স্ত্রী ভাবলো) হয় না, না?

বৃদ্ধ : কিছুদূর হয়। তারপর আর হয় না। আনন্দ আর শান্তি—এরা বোধহয় শত্রু।

স্ত্রী : তবে চাই না শান্তি। আনন্দ চাই। রঞ্জনকে চাই। রঞ্জনকে এনে দাও।

বৃদ্ধ : রঞ্জন তোমার সারা জীবনের শান্তি নষ্ট করবে।

স্ত্রী : করুক।

বৃদ্ধ : রঞ্জন তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নেবে।

স্ত্রী : নিক!

বৃদ্ধ : কিচ্ছু দেবে না।

স্ত্রী : না দিক। শুধু বলুক—তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি। এনে দাও তাকে।

বৃদ্ধ : আমার হাত ধরো।

(স্ত্রী বসে, বৃদ্ধ তার পিছনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতখানা বৃদ্ধের দু'হাতে ধরা, বুকের কাছে। চোখ অনেক দূরে।)

এসেছে রঞ্জন?

স্ত্রী : জানি না। বড়ো ঠাণ্ডা তোমার হাত। এতো ঠাণ্ডা কেন?

(বৃদ্ধ কথা বললেন না। স্ত্রী তার হাতটা এনে নিজের গালের উপর রাখলো।)

এতো ঠাণ্ডা কেন তোমার হাত রঞ্জন?

বৃদ্ধ : আমি বৃদ্ধ।

স্ত্রী : তুমি রঞ্জন।

বৃদ্ধ : রঞ্জন বৃদ্ধ।

স্ত্রী : না।

বৃদ্ধ : রঞ্জন মৃত। আমি রঞ্জনের প্রেতাত্মা। আমার মনে রঞ্জনের মনের স্বপ্ন। আমার চোখে রঞ্জনের চোখের জ্বালা। আমার এ ঘর রঞ্জনের ঘর। আমার এ রাত রঞ্জনের রাত। সারারাত। সারারাত্তির।

স্ত্রী : না, না, না!

বৃদ্ধ : সারারাত্তির। কিন্তু রাত শেষ হয়ে আসছে। বৃষ্টি থেমে আসছে। আমিও শেষ হয়ে যাচ্ছি।

স্ত্রী : আমার তবে কী থাকবে?

বৃদ্ধ : তোমার ঘর।

স্ত্রী : আমার ঘর ভেসে গেছে।

বৃদ্ধ : (প্রায় দুঃখিতভাবে) ঘর ভাসে নি। ভেবেছিলাম ভাসবে। প্রায় চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাসেনি। ঘর ভাসে না। অতি বড়ো দুর্যোগেও ভাসে না।

স্ত্রী : কিসের উপর দাঁড়াবে ঘর?

বৃদ্ধ : জানি না। ভালোবাসা নয়। বিশ্বাস নয়। চেনা জানা নয়। আর কিছু। হয়তো অভ্যাস। হয়তো দিনের আলো। হয়তো রাতের ঘুম।

স্ত্রী : আর রঞ্জন?

বৃদ্ধ : বৃষ্টি থেমে গেছে। ভোর হয়ে আসছে। এখুনি আলো ফুটবে। জল নেমে যাবে। ফেরার পথ জেগে উঠবে দিনের আলোয়। রাত শেষ হয়ে যাবে।

স্ত্রী : আর রঞ্জন?

বৃদ্ধ : রঞ্জন একটা রাত। একটা জেগে-থাকা রাত। অসম্ভব একটা ঘরে অসম্ভব একটা জেগে-থাকা রাত। যদি ভুলতে না চাও, ভুলো না।

স্ত্রী : ভুলবো না। ভুলবো না, ভুলবো না! এ রাত আমার! একটা রাত। সারারাত। সারারাত্তির।

বৃদ্ধ : যা হবার হোক। সারারাত্তির
তবু তো দু'চোখ সারারাত্তির
মনের স্বপ্ন তবু তো দু' চোখ মেনেছে।
শেষ হয় হোক। তবু তো রাত্রি—
অসম্ভবের সম্ভাবনাকে জেনেছে।
(ছায়ারা কি মিলিয়ে আসছে? বৃদ্ধের চোখে কি ঘুম? আলো কি ফুটছে? জানি না। পর্দা নেমে এসেছে। সব কিছু পর্দার আড়ালে। ঐ ঘর, ঐ রাত—সব কিছু।)

ফ্রান্স
জুলাই-আগস্ট
১৯৬৩

বল্লভপুরের রূপকথা

মুখবন্ধ

এই নাটকের মূল রসিকতাটুকুর অনুপ্রেরণা একটি বহু পুরাতন বিদেশী চলচ্চিত্র। কিন্তু গল্পের কাঠামো থেকে শুরু করে নাট্যশৈলী, চরিত্র, সংলাপ সবই স্বকপোলকল্পিত। সে হিসাবে নাটকটিকে বোধহয় মৌলিক বলা চলে।

নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩-৬৪। প্রথম অভিনয় করেন 'অনামিকা' হিন্দী ভাষায় কলকাতা শহরে। তারপর হয় বোম্বাই শহরে মারাঠি ভাষায়, এবং একবার ঐ শহরেই বাংলায়। কলকাতায় বাংলা নাটকটি. 'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা আমার পরিচালনায় প্রথম মঞ্চস্থ করেন ১৯৭০ সালের ২৮শে নভেম্বর। এবং তারপর বহুবার অভিনয় করেছেন কলকাতা, পাটনা, হায়দরাবাদ, ভিলাই, চিরিমিরি, ইম্ফল, দুর্গাপুর ইত্যাদি নানা স্থানে।

বাদল সরকার

বল্লভপুরের রূপকথা

চরিত্রলিপি

ভূপতি	বল্লভপুরের রাজা
সঞ্জীব	ভূপতির সতীর্থ
মনোহর	পুরাতন ভৃত্য
হালদার	এক শিল্পপতি
চৌধুরী	আর এক শিল্পপতি
সাহা	বল্লভপুরের দোকানদার
শ্রীনাথ	আর এক দোকানদার
পবন	আরও এক দোকানদার
স্বপ্না	হালদার পত্নী
ছন্দা	হালদার কন্যা

এবং রায়-রায়ান রঘুপতি ভূইঞা,
কিন্তু তাঁকে নিয়ে এখনই মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

প্রথম দৃশ্য

(পর্দার সামনে বাহির হইয়া আসিল সঞ্জীব। পরিধানে অ্যাপ্রন।)

সঞ্জীব : নমস্কার। আমার নাম সঞ্জীব বোস, আপনাদের নামগুলো দয়া করে বলবেন না। অতো নাম আমি মনে রাখতে পারবো না।

বল্লভপুরের রূপকথা আপনারা শোনেননি, কারণ এটা ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝোলা, দাদুর দপ্তর—কোনোটাতেই নেই। ভূপতি আমাকে পাঠালো আপনাদের বল্লভপুরের রূপকথা শোনাতে। আমি খুব একটা দরকার দেখি না। কোনোদিনই এটাকে খুব একটা জমাটি রূপকথা বলে মনে হয়নি আমার। দু'এক জায়গা তো একেবারে কাঁচা, রূপকথা বলাই চলে না। কিন্তু কী করি বলুন, ভূপতি ছাড়লো না।

এক ছিল রাজা, তার নাম ভূপতি রায়। তার ছিল—না, তার রানি ছিল না। একটাও না। আসলে তাকে রাজপুত্র বলা উচিত রানি যখন নেই—কিন্তু তার বাবা-মা নেই। এইখানেই দেখুন—প্রথম গোলমাল। রূপকথায় কখনো দেখেছেন কোনো রাজা পুত্রের বিয়ে না চুকিয়ে মারা গেছে? আমি ঐ জন্যে ভূপতিকে বললাম—

(কোনও দর্শকের কাল্পনিক প্রশ্ন শুনিল)

কী বলছেন? নাটক কোথায়? নাটক দেখবেন? কেন, আমার বলাটা ভালো লাগলো না বুঝি? দেখুন তবে। পরে আমাকে দোষ দেবেন না।

(চলিয়া গেল। পর্দা খুলিতে আরম্ভ করিল। সঞ্জীব সহসা ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল।)

দাঁড়াও দাঁড়াও!

(পর্দা বন্ধ হইয়া গেল)

একটা কথা বলে দিই। পর্দা সরলে দেখবেন—একজন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। সেই হোলো রাজা। ঠিক আছে, নাও এবার।

(ছুটিয়া চলিয়া গেল। পর্দা খুলিল। ঘরটি বড়ো এবং সেকেলে। অতিমাত্রায় সেকেলে। পিছনে এক অংশ উঁচু—বেদির মতো। তাহার উপর একটি প্রকাণ্ড কারুকার্য করা সিংহাসন। এককালে সিংহাসনই ছিল। এখনো বিয়েবাড়িতে বরাসন হিসাবে এই ধরনের সিংহাসন ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালের কারুকার্য, থাম ইত্যাদি পুরাতন রাজকীয় আড়ম্বরের পরিচয় দিতেছে—কিন্তু সব কিছুই ভগ্নদশায়। ঘরের নিচু অংশে কিছু পলকা আসবাবপত্র—সস্তা আধুনিক মাল। ঘরের একদিকে বাহিরের দরজা, অন্যদিকে অন্দরমহলের।

যে চেয়ারটি উহারই মধ্যে একটু বড়ো এবং আস্ত তাহাতে ত্রিভঙ্গমুরারি হইয়া ভূপতি

ঘুমাইতেছে। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ঘুমের অসুবিধা হইতেছে না। সকালের আলো আসিয়া পড়িয়াছে ঘরে। চেয়ারের পাশে একটি ছোট স্যুটকেস্।

মনোহরের প্রবেশ। কিছুটা উৎকণ্ঠিত। ঘর পার হইয়া তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে যাইতেছিল, ভূপতিকে দেখিয়া থামিয়া গেল। তারপর কাছে আসিয়া ডাকিল।)

মনোহর : রাজাবাবু, রাজাবাবু!

(ভূপতি অঘোরে ঘুমাইতেছে। মনোহর নাড়া দিয়া ডাকিল।)

রাজাবাবু!

ভূপতি : উঁ? মনোহর?

মনোহর : বলিহারি তোমায়। বলি ফিরলে কিসে? হেঁটে না কি?

ভূপতি : হেঁটে কিরে? মাথা খারাপ না কি? রাতের ট্রেনে ফিরেছি।

মনোহর : আমি কি রাতের গাড়ি না দেখেই ঘুমিয়েছি ভেবেছো?

ভূপতি : চাঁদ উঠেছিলো না কাল? দীঘির পাড়ে বসেছিলাম।

মনোহর : কাব্যি?

ভূপতি : হ্যাঁ রে! কাব্যি। ভাবলাম আমাদের রঘুদা কাব্যিতে জীবন উৎসর্গ করে দিলো, আর আমি এমন চাঁদের আলোয় বসে দু'টো লাইনও মেলাতে পারবো না!

মনোহর : হয়েছে হয়েছে। তোমার আর জীবন উচ্ছুগ্‌গু করতে হবে না। যতো সব অলক্ষুণে কথা।

ভূপতি : এই দেখো। অলক্ষুণে কোন্ কথাটা হোলো? উৎসর্গ মানে জানিস?

মনোহর : না জানিনে। জেনে কাজ নেই আমার। কিসে ফিরলে—তাই বলো দিকি?

ভূপতি : বললাম তো! রাতের ট্রেনে।

মনোহর : কেন মিছে কথা বলছো বলো দিকিনি?

ভূপতি : (একটু থেমে) তুই স্টেশনে গিয়েছিলি?

মনোহর : হ্যাঁ গিয়েছিলুম।

ভূপতি : বলি বয়স কতো হোলো খেয়াল আছে? রাত্তিরে হিমে অতোটা রাস্তা হেঁটে স্টেশনে গেলি? মরতে চাস?

মনোহর : বুড়ো হলে সবাই মরে একদিন।

ভূপতি : আর ক'টা দিন বেঁচে থাক বাবা দয়া করে! দেনাটা ঘাড়ে চাপিয়ে পালাসনি।

মনোহর : (চটিয়া) ফের বাজে কথা?

ভূপতি : হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ও সব বাজে কথা ব'লেও লাভ নেই, ভেবেও লাভ নেই। দেখ তো জামার পকেটে বিড়ি আছে না কি?

(মনোহর অবাক হইয়া গেল প্রথমে। তারপর ঠাট্টা ভাবিয়া জামার পকেটে হাত দিল।)

মনোহর : এ যে সত্যি সত্যি বিড়ি?

ভূপতি : হ্যাঁ হ্যাঁ, দে।

মনোহর : বিড়ি খাবে?

ভূপতি : সিগারেট খেলে ক্যান্সার হচ্ছে আজকাল, শুনিস নি? দে।

মনোহর : দোকান খুলে সিগারেট এনে দেবো আমি—

ভূপতি : (হঠাৎ চড়া গলায়) না, সিগারেট আনতে হবে না তোকে! ধার করে নবাবি!
(যেন মনোহরই ধার করিয়া নবাবি করিতেছে। মনোহর আর কিছু বলিল না। বিড়ি দিল। তারপর স্যুটকেশটা তুলিয়া লইয়া শয়নকক্ষের দিকে গেল।)
কী রে? কোথায় চললি?

মনোহর : স্যুটকেসটা রেখে আসি শোবার ঘরে।

ভূপতি : আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না?

মনোহর : কী আবার জিজ্ঞেস করবো?

ভূপতি : জলপাইগুড়ি কিসের জন্যে গিয়েছিলাম, তুই জানিস না?
(মনোহর মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপতি আরও চড়া গলায় কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তারপর সহসা হাসিয়া উঠিল। ছেলেমানুষের মতো প্রাণখোলা হাসি। মনোহর কী করিবে বুঝিতে না পারিয়া দুর্বলভাবে অল্প অল্প হাসিতে শুরু করিল।)
ঐ তোর একটা মস্ত গুণ মনোহর। আর মস্ত দোষ। সব জানবি, বুঝবি, তবু ভান করবি যেন কিছু হয়নি। নে, একটা বিড়ি ধরা।

মনোহর : না।

ভূপতি : ধরা না, আমি বলছি। (মনোহর বিড়ি ধরাইল, কিন্তু আড়াল করিয়া) আজ তুই পালাচ্ছিলি, আর কাল আমি তোর ভয়ে পালিয়েছিলাম।

মনোহর : পালিয়েছিলে?

ভূপতি : ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালে গাড়িটা দাঁড়ালো—নেমে পড়লাম, ভাবলাম, এলেই তো জিজ্ঞেস করবি, কী হোলো।

মনোহর : কতো বলছে?

ভূপতি : কী কতো বলছে?

মনোহর : কতো দর বলছে মাড়োয়ারি?

ভূপতি : দর? বাড়ি দেখতেই রাজি হোলো না—দর! (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া জামার পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিল) সাহা, শ্রীনাথ, পবন—সাতশো সাতান্নো, তোর দু'শো কুড়ি—নশো সাতাত্তর। আমার চেম্বার—সব মিলিয়ে ধর পাঁচ হাজার। পাঁচ হাজার ন'শো সাতাত্তর—ছ'হাজার বললে দিয়ে দিতাম।

মনোহর : (চোখ কপালে তুলিয়া) ছ'হাজারে দিয়ে দিতে?

ভূপতি : ছ'হাজার দিচ্ছে কে? আজ অবধি বাড়ি দেখতেই কাউকে আনতে পারলাম না।

মনোহর : সাত বিঘে বাগান, দু'মহলা—

ভূপতি: জানি জানি। সাত বিঘে বাগান তার ছ'বিঘে আগাছা। দু'মহলা বাড়ি, তার দু'টি ঘর বাসযোগ্য। রাজপ্রাসাদ—তার চতুর্দিকে খাঁ খাঁ! বাজার দু'মাইল, স্টেশন তিনমাইল, ডাক্তার ডাকতে রেলগাড়ি চড়তে হয়।

মনোহর : তবু—

ভূপতি : তবু বল্লভপুরের রাজবাড়ি, কী বলিস? ওরে, তুই না হয় সাতপুরুষ এই বাড়িতে চাকরি করছিস। মাইনে না পেলেও নড়িস না। যে কিনবে তার কাছে এ একটা ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ি ছাড়া কি?

মনোহর : ছেড়ে দাও ও কথা। আমি চা করি।

ভূপতি : চা আছে? আমি তো এতোক্ষণ ভয়ে চাইতে পারিনি।

মনোহর : কাল সব এনেছি সা-মশাইয়ের দোকান থেকে। চাল ডাল সব। সিগ্রেটটাই আনতে ভুলে গেছি শুধু।

ভূপতি : দিলো?

মনোহর : দেবে না কেন? শুধু—(থামিয়া গেল)।

ভূপতি : শুধু আজ সব লাইন করে আসবে, এই তো? এখনো আসছে না কেন ভাবছি। ওঃ, কোমরটা ব্যথা হয়ে গেছে চেয়ারে শুয়ে!

মনোহর : তা চেয়ারে শুয়েছিলে কেন? বিছানা তো করে রেখেছিলুম।

ভূপতি : আরে দূর! ঢুকেই রঘুদার পাল্লায় পড়ে গেলাম। দু'ঘণ্টা ঝাড়া কাব্য শোনালো। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

মনোহর : তুলে দেয়নি?

ভূপতি : ভোরের আগে টের পায়নি বোধ হয়। কাব্যে মশগুল ছিল।

(বাহিরে দ্বারে করাঘাত। সেই সঙ্গে হাঁক—মনোহর!)

ঐ এলো।

মনোহর : সা-মশাই।

ভূপতি : (খাতা দেখিয়া) চারশো আটচল্লিশ টাকা ছ'আনা! আবার কালকের চালডাল! মনোহর, চা না খেয়ে আমি সামলাতে পারবো না, তুই ওকে বসিয়ে রেখে আগে চা-টা দিয়ে যা ভেতরে। (যাইতে গিয়া থামিয়া) ওকেও এক কাপ দিয়ে একটু ভিজিয়ে রাখিস।

(ভূপতি শয়নকক্ষে পলায়ন করিল। মনোহর বাহিরে। আবার প্রবেশ করিল সাহা মহাশয়কে লইয়া।)

সাহা : কখন ফিরলেন?

মনোহর : রাতের গাড়িতে।

সাহা : কিছু শুনলে?

মনোহর : আজ্ঞে না।

সাহা : হাবভাব কেমন দেখলে?

মনোহর : মনে তো হোলো মেজাজ ভালো। লেগে যাবে বোধ হয়।

সাহা : লেগে যাবে? লেগে যায়নি তাহলে?

মনোহর : অতো কথা আমি কী জানি? রাজাবাবুর মুখেই শুনবেন।

সাহা : রাজাবাবু কখন উঠবেন?

মনোহর : এই চা করে এনে তুলছি।

সাহা : একটু হাত চালিয়ে নাও। দোকান খুলতে হবে গিয়ে।

(মনোহর অন্দরের দিকে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথের প্রবেশ।)

কী শ্রীনাথ? এসে জুটেছো?

শ্রীনাথ : না এসে উপায় কী দাদা? ঐ সামান্য কারবার, কতো আর চাপ সয়। (সাহাকে) ইয়ে রাজাবাবু—?

সাহা : ঘুমোচ্ছেন। মনোহর গেছে ডাকতে। বোসো শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ : কিছু শুনলে খবর?

সাহা : নাঃ, মনোহর তো বলছে কিছু শোনেনি।

শ্রীনাথ : তার মানে হয়নি!

সাহা : টাকা মারা যাবে না জানি। বাড়িটা বিক্কিরি হলেই—কিন্তু এ বাড়ি কিনবে কে?

(পবনের প্রবেশ। পবনের আদি বাস ছিল উড়িষ্যায়। এখন বাংলা ভালোই বলে, সামান্য টান রহিয়া গিয়াছে শুধু।)

পবন : নমস্কার সাহা দাদা, নমস্কার শ্রীনাথ দাদা।

সাহা : কী পবন, তুমিও চলে এলে দোকান বন্ধ করে?

পবন : না দাদা, দোকান বন্ধ করলে কি আমার চলে? জগবন্ধুকে বসিয়ে রেখেছি।

শ্রীনাথ : জগবন্ধু পারে চালাতে?

পবন : পারে না ঠিকমতো। সিগারেট সব চেনে না। বিড়ি গুণতে পয়সা গুনতে ভুল করে। তা আর কী করি বলুন, এ খোঁজটাও তো না নিলে নয়।

(বাহির হইতে ডাক আসিল)

নেপথ্যে : ও মনোহবদা! মনোহরদা!

সাহা : পবন দেখো না? ডাক পিওন মনে হচ্ছে!

(পবনের বাহিরে প্রস্থান)

শ্রীনাথ : পিওন এতো ভোরে?

সাহা : তাও তো বটে।

(মনোহরের প্রবেশ)

শ্রীনাথ : কেউ ডাকলো?

(পবনের উত্তেজিত প্রবেশ)

পবন · টেলিগেরাম্! মনোহরদা—টেলিগেরাম্ রাজাবাবুর!

মনোহ : কই?

পবন : পিওন আমাকে দিলো না। তুমি যাও।

(টেলিগ্রাম এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নহে। মনোহর শশব্যস্তে বাহির হইল। ঘরেও প্রচুর উত্তেজনা।)

সাহা : টেলিগ্রাম! তাই বলি এতো ভোরে পিওন কেন?

শ্রীনাথ : টেলিগ্রাম! সব্বোনাশ!

সাহা : কেন, সব্বোনাশ কেন?

শ্রীনাথ : সব্বোনাশ নয়? টেলিগ্রামে কখনো ভালো খবর থাকে?

(মনোহর টেলিগ্রাম হাতে দ্রুত ঘর পার হইয়া শয়নকক্ষে গেল।)

সাহা : খারাপ খবর আসবে কোত্থেকে? রাজাবাবুর আর আছে কে?

শ্রীনাথ : বন্ধু-বান্ধব হতে পারে তো!

পবন : তাই তো!

সাহা : কী!

পবন : এ রকম সময়ে আমাদের বসে থাকাটা কি ভালো দেখাবে?

শ্রীনাথ : হ্যাঁ—এই শোকের সময়! হাজার হোক, আমরা তো পাওনার তাগিদেই এসেছি।

সাহা : বলছো! কিন্তু—ব্যাপারটা জেনে যাবো না?

(মনোহরের দ্রুত প্রবেশ। ইহারা কৌতূহলে অগ্রসর হইল। কিন্তু মনোহব বিনা বাক্যব্যয়ে স্যুটকেসটি তুলিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।)

শ্রীনাথ : দেখেছো, স্যুটকেস নিয়ে গেলো! এক্ষুনি যাবেন বোধ হয়!

পবন : কঠিন অসুখ-বিসুখ কারো নিশ্চয়ই।

সাহা : এখন ট্রেন কোথা যে যাবেন? আপ ট্রেন ছেড়ে গেছে এতোক্ষণে। ডাউন ট্রেন তো অনেক দেরি।

শ্রীনাথ : সে কথা কি বিপদের সময় মনে থাকে কারো?

(ভূপতি দ্রুত প্রবেশ করিল। পিছনে মনোহর। ভূপতি ছাড়া জামার পকেট ঘাঁটিয়া চাবি বাহির করিয়া মনোহরকে ছুঁড়িয়া দিল।)

ভূপতি : এই নে চাবি!

(মনোহর অন্দরের দিকে বাহির হইয়া গেল। ইহারা তিনজন শোকসন্তপ্ত মূর্তিতে দাঁড়াইয়া। ভূপতি ফিরিতেই মুখোমুখি হইল।)

অ্যাঁ? ওহো—তোমাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

সাহা : না না, আমাদের নিয়ে ভাববেন না, আমরা ওজন্যে আসিনি।

শ্রীনাথ : ওসব তুচ্ছ কথা। এখন যাতে গিয়ে ভালো দেখতে পান, সেইটাই বড়ো কথা।

ভূপতি : অ্যাঁ?

পবন : কিন্তু এখন তো কোনো গাড়ি নেই রাজাবাবু?

ভূপতি : গাড়ি?

শ্রীনাথ : জলপাইগুড়ির গাড়ি তো ছেড়ে গেছে এতোক্ষণে।

ভূপতি : জলপাইগুড়ি?

সাহা : তবে? কলকাতার দিকে? তাও তো আপনার এগারোটা—কতো শ্রীনাথ?

শ্রীনাথ : এগারোটা কুড়ি কি পনেরো। পনেরোই ধরুন।

ভূপতি : কী পনেরো?

শ্রীনাথ : এগারোটা পনেরো। ডাউন গাড়ি।

(মনোহব প্রবেশ করিল। হাতে ময়লা ধুতি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি।)

ভূপতি : হবে তো?

মনোহর : আমি এক্ষুনি ধুয়ে দিচ্ছি। রোদ আছে, শুকিয়ে যাবে।

ভূপতি : ধুয়েই চলে আয়। বহু কাজ আছে।

(মনোহরের প্রস্থান)

শ্রীনাথ তোমার দোকানে টেবিল-ক্লথ হবে?

শ্রীনাথ : টেবিল-ক্লথ?

ভূপতি : না থাকে তো চাদর। বোম্বাই চাদর। আছে?

শ্রীনাথ : আজ্ঞে তা আছে, কিন্তু—

ভূপতি: ধার—ধার চাইছি। আজকের রাত্তিরের মতো! আর সাহা—আজ বেশ কিছু মাল চাই।

সাহা : মাল? আজকে? কিন্তু—

ভূপতি : অ্যাদ্দিন ধরে দিলে, আর আজ সব 'কিন্তু' শুরু করলে কেন? বুঝতে পারছো না—আজ জীবন-মরণ সমস্যা।

শ্রীনাথ : আজ্ঞে সে আর বুঝবো না? টেলিগ্রাম দেখেই বুঝেছি।

(পবন আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না)

পবন : কে রাজাবাবু? কার খবর এলো?

ভূপতি : বি. পি. হালদার। স্বপ্নছন্দা কসমেটিক্স লিমিটেড।

সাহা : মানে ইয়ে, অর্থাৎ—আছেন তো?

ভূপতি : আছেন মানে?

শ্রীনাথ: মানে—বেঁচে আছেন তো?

ভূপতি : কী বকছো পাগলের মতো? বেঁচে না থাকলে টেলিগ্রাম করলো কী করে?

শ্রীনাথ : না হ্যাঁ তা তো বটেই। তবে টেলিগ্রাম তো অন্য কেউও—

(ভূপতি কিন্তু স্থির হইয়া নাই। আগাগোড়া ঘরের জিনিস-পত্র নাড়াইতে গুছাইতে ব্যস্ত।)

ভূপতি : পবন সিগারেটও চাই কিছু। ভালো চুরুট হবে তোমার দোকানে?

পবন : চুরুট?

ভূপতি : কে জানে, হয় তো চুরুট খায়।

পবন : কে খান রাজাবাবু?

ভূপতি : কে? কী বলছি এতোক্ষণ? বি. পি. হালদার। স্বপ্নছন্দা সাবানের মালিক। স্বপ্নছন্দা সাবানের নাম শোনোনি?

পবন : তিনি—চুরুট খাবেন?

ভূপতি : খাক না খাক, আমাকে তো রাখতে হবে ঘরে? জীবন-মরণ সমস্যা—কোনো খুঁত রাখলে চলবে না। মনোহর! ওহো, মনোহর তো গেলো কাপড় কাচতে। বাসনের কী করি বলো দেখি সাহা? তোমার দোকানে তো সব কিছু রাখো, টি সেট আছে? আর অ্যাশ-ট্রে, অ্যাশ-ট্রে দরকার। ধুত্তোর কাল জলপাইগুড়ি গেলাম, তার আগে যদি জানতাম! এখন সন্ধের মধ্যে কোত্থেকে কী জোগাড় করি বলো দিকিনি এই পাড়াগাঁয়ে?

(ইহারা হতবাক)

তোমরা সব ওরকম হাঁ করে থেকো না, দোহাই তোমাদের! একটু ভাবো, একটু উঠে-পড়ে লাগো। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছো, যেন এতে তোমাদের কিছুই আসে যায় না।

শ্রীনাথ : না না সে কী কথা?

সাহা : মানে—আমরা—আমরা আর কতোটুকু করতে পারি বলুন?

ভূপতি : তোমরা? তোমরাই তো একমাত্র ভরসা। রাত আটটায় আসবে বলছে, আমাকে তো খেতে বলতেই হবে? তা আমার আছে কী যে খাওয়াবো?

পবন : কে খাবেন রাজাবাবু?

ভূপতি : আঃ পবন! তোমার মাথায় কি কিছুতেই ঢুকবে না কথাটা? খাবেন হালদার

সাহেব। খাবেন কি না তিনিই জানেন, কিন্তু আমাকে তো ব্যবস্থা করতেই হবে? রাত আটটায় আসবে কলকাতা থেকে, নিজের গাড়িতে। আবার এই রাত্রেই চলে যাবে। খেতে না বললে হয়?

পবন : তিনিই আসবেন?

ভূপতি : (অসীম ধৈর্যে) হ্যাঁ পবন, তিনিই আসবেন, তিনি—বি. পি. হালদার। স্বপ্নছন্দা সাবানের মালিক। সপরিবারে। উইথ ফ্যামিলি। ফ্যামিলিটি যে ক'জন, সেটা যদি দয়া করে লিখতেন।

সাহা : তাই বলুন, আসছেন!

ভূপতি : তোমার আবার কী হোলো? তুমিও পবনের মতো জিজ্ঞেস করবে না কি কে আসছেন?

সাহা : আজ্ঞে না, আমরা ভেবেছিলুম—

শ্রীনাথ : মানে—টেলিগ্রাম কি না। তার উপর আপনি বললেন—জীবন-মরণ সমস্যা—তাই—

ভূপতি : জীবন-মরণ সমস্যা নয়? শুধু কি আমার? তোমাদেরও!

সাহা : আমাদের!

ভূপতি : সব শোধ হয়ে যাবে একসঙ্গে সাহা—যদি লেগে যায়। যেমন করে হোক ঠাটটা বজায় রাখতে হবে। জমিদারি ঠাট। ভেবে না বসে—ঠেকায় পড়ে বাড়ি বেচছি।

পবন : বাড়ি দেখতে আসছেন?

ভূপতি : বাঃ পবন! এই তো মাথা খুলছে তোমার। এইবার বলো দিকি—চুরুট আছে কি না?

পবন : এনে দেবো রাজাবাবু।

ভূপতি : ভালো চুরুট চাই কিন্তু। আর সাহা—তুমি মেনুটা ঠিক করে ফেলো দেখি। এই নাও, কাগজ। পোলাওয়ের সরু চাল আছে তো তোমার? (মনোহরের প্রবেশ) ধুয়ে দিয়েছিস?

মনোহর : হ্যাঁ।

ভূপতি : শুকোলে হয়। ভালো করে রোদে মেলে দিয়েছিস তো?

মনোহর : হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমায় ভাবতে হবে না। সা-মশাই, আপনার ইস্ত্রীটা একবার নেবো। আমাদের ইস্ত্রীটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

(ভূপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

ভূপতি : খারাপ হয়নি সাহা। বেচে খেয়েছি!

মনোহর : আঃ!

ভূপতি : কেন ওদের কাছে লুকোচ্ছো মনোহর? আজকে মাংস কেনবার পয়সা আসবে কী বাঁধা দিয়ে সেই কথা ভাবো।

সাহা : (লজ্জিত) আজ্ঞে ওজন্যে ভাববেন না।

ভূপতি : তুমি ধার দেবে? বাঁচালে। কিছু ভেবো না সাহা—কোনোরকমে সবাই মিলে এইটা লাগিয়ে দাও, সব শোধ হয়ে যাবে। আমিও কলকাতায় গিয়ে চেম্বার খুলে দাঁত উপড়োতে শুরু করবো।

মনোহর : (রাগিয়া) বলি চাকরিটা নিয়ে দাঁত উপড়োলেই তো পাবতে? আমার হাড় জুড়োতো!

ভূপতি : হয় না মনোহর, হয় না। কতোবার বলবো তোমাকে? চাকরি আর নিজের চেম্বারে অনেক তফাৎ।

মনোহর : অনেক যে তফাৎ—সে কথা আমার থেকে বেশি বুঝবে কে?

ভূপতি : কেন অমন করছিস বাবা? এই দেখ না, এবার লেগে যাবে ঠিক। এর আগে দেখতে এসেছে কেউ?

মনোহর : দেখতে এলেই কিনবে তার কোনো মানে আছে?

ভূপতি : আরে মানে নেই বলেই তো এতো উঠে পড়ে লাগতে চাইছি। বাদশাহী চাল চালবো, বাদশাহী খানা খাওয়াবো,—তারপর জলের দর বলবো। কেনবার ইচ্ছে নিয়ে আসছে। ফক্কুড়ি করতে তো আসছে না?

মনোহর : বাদশাহী চাল চালবে! কী দিয়ে চালবে শুনি?

ভূপতি : ধার করে মনোহর, ধার করে! অ্যাদ্দিন সংসার চালাতে ধার করেছি, আজ ধার শোধ করবার জন্যে ধার করবো।

মনোহর : ধার করে বাদশাহী খানা না হয় তৈরি হোলো। সেটা পরিবেশন তো করবে এক এই বুড়ো টিম টিম করে?

ভূপতি : অ্যাঁ?

(এ সমস্যা ভূপতির মাথায় আসে নাই। সে একেবারে বসিয়া পড়িল।)

তাই তো? (ভাবিয়া) লোক ভাড়া করা যাবে না?

মনোহর : (রাগিয়া) হ্যাঁ যাবে। জনমজুর। তারা ঘরের চাল ছাইতে পারে। ধান কাটতে পারে। পরিবেশন করতে গেলে পাতে না দিয়ে মাথায় ঢালবে।

ভূপতি : তুই শিখিয়ে নিতে পারবি না?

মনোহর : এক বেলায় বল্লভপুরের ক্ষেতমজুরকে রাজবাড়ির আদব-কায়দা শেখাবে, এমন গুরুমশাই মনোহর নয়।

ভূপতি : তা হলে?

(ভূপতি ভাবিতেছে, কিন্তু পবন ও শ্রীনাথ উসখুস করিতেছে।)

পবন : তা হলে আমি যাই রাজাবাবু, ছেলেটাকে বসিয়ে এসেছি দোকানে। আবার চুরুট আনতেও যেতে হবে।

শ্রীনাথ : হ্যাঁ, আমারও দোকান খোলবার সময় হোলো। চাদর তাহলে ক'টা, কী রকম? (চিন্তিত ভূপতি পবনের দিকে চাহিয়াছিল। তারপর শ্রীনাথের দিকে। তাহার মাথা দ্রুত খেলিতেছে।)

ভূপতি : (সহসা টেবিল চাপড়াইয়া) পেয়েছি।

মনোহর : কী পেয়েছো?

ভূপতি : (ধীরে ধীরে) পবন! শ্রীনাথ! সাহা!

পবন : আজ্ঞে?

ভূপতি : (সুর বদলাইয়া) সাহা, তুমি আমার কাছে কতো পাও জানো?

সাহা : আজ্ঞে—

ভূপতি : (খাতা খুলিয়া) পরশু অবধি চারশো আটচল্লিশ টাকা ছ' আনা। শ্রীনাথ একশো নিরানব্বুই। পবন, তুমি পাবে একশো দশ।

পবন : আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এখন সে কথা—

ভূপতি : বলি, টাকাটা না পেলে কি তোমার চলবে?

পবন : গরিব মানুষ রাজাবাবু—

ভূপতি : শ্রীনাথ, তোমার?

শ্রীনাথ : আজ্ঞে, ছোট কারবার—

ভূপতি : সাহা?

সাহা : সবই তো বোঝেন রাজাবাবু। সংসারী লোক—

বৃপতি : তবে আমার কথাটা রাখো।

সাহা : কী কথা?

ভূপতি : এক সন্ধের মতো। শুধু একটি সন্ধের মতো! শ্রীনাথ! পবন!

পবন : কী রাজাবাবু?

ভূপতি : আজ সন্ধেটার মতো একটু থিয়েটার করে দাও।

শ্রীনাথ : থিয়েটার?

ভূপতি : শুধু একটা সন্ধে। ঘণ্টা দু'এক।

সাহা : আমরা!

ভূপতি : হ্যাঁ, সাহা তোমার। জীবন-মরণ সমস্যা সাহা। আমারও যেমন তোমাদেরও তেমনি। এ না হলে বাড়ি বিক্রি হবে না, আর বাড়ি বিক্রি না হলে দেনাও শোধ করতে পারবো না।

সাহা : কিন্তু গাঁয়ের লোক শুনলে—

ভূপতি : গাঁয়ের লোক শুনবে না। আমি আর মনোহর ছাড়া আর কে জানছে?

পবন : আজ্ঞে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু দোকানটা—

ভূপতি : দোকান একদিন দু'ঘণ্টা বন্ধ রাখো পবন। লোকসান পুষিয়ে দেবো আমি।

শ্রীনাথ : কিন্তু আমরা কি পারবো?

ভূপতি : খুব পারবে? তোমরা বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক—তোমরা না পারলে কে পারবে? কী মনোহর?

মনোহর : সে তো বটেই। তবে একটা কথা আছে। সা-মশাই, শ্রীনাথবাবু, কিছু মনে করবেন না। হেড-খানসামা আমাকেই সাজতে হবে। নইলে আপনারা চালাতে পারবেন না।

শ্রীনাথ : তাতে ক্ষতিটা কি? থিয়েটার তো।

সাহা : ক্ষতি কী বলছো ভায়া? তা না হলে চলবেই না। আমরা জানি কী যে হেড্-খানসামা হবো?

পবন : হ্যাঁ, ঠিক কথা। এ মনোহরদা হুকুম করে গেলো আমরা মেনে গেলাম। কোনো গোলমাল নেই।

ভূপতি : এই জন্যেই বলছিলুম—তোমরা ছাড়া আমরা কেউ নেই! কিন্তু উর্দি? উর্দি লাগবে না মনোহর?

মনোহর : সে আমি চালিয়ে দেবো। পুরানো কিছু আছে আমার ঘরে। ক'টায় আসবেন তেনারা?

ভূপতি : আটটা।

মনোহর : সন্ধে সাতটার ভেতর তাহলে চলে অসুন সবাই। তখন সব বুঝিয়ে দেবো। (ভূপতিকে) আমি ভেতরে যাচ্ছি, ঘরগুলো যতোটা পারি গুছিয়ে রাখি। তুমি বাজারের ফর্দটা করে ফেলো।

(মনোহরের প্রস্থান)

শ্রীনাথ : (সহসা) সন্ধে? মানে—রাত্তিরে?

ভূপতি : সন্ধে, আর সকালবেলা কী করে হবে শ্রীনাথ?

শ্রীনাথ! কিন্তু—কিন্তু—(সাহার দিকে চাহিল)

সাহা : তাই তো—রাত্তির হয়ে যাবে যে!

ভূপতি : আরে আটটার সময়ে তো আসছে। সাড়ে নয়—কি বড়ো জোর দশটার মধ্যে সব খতম করে দেবো।

পবন : কিন্তু রাজাবাবু—আমার যে বারণ আছে?

ভূপতি : কী বারণ আছে?

পবন : রাত্তিরে এদিকে আসবার বারণ আছে।

ভূপতি : কে বারণ করেছে?

পবন : আজ্ঞে—জগবন্ধুর মা।

ভূপতি : কে জগবন্ধু?

পবন : আজ্ঞে—আমার ছেলে।

ভূপতি : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, জগবন্ধুর মা, বুঝেছি। তা এদিকে আসছো সে কথা জগবন্ধুর মাকে নাই বা বললে?

পবন · বলবো না?

ভূপতি : কী দরকার?

পবন : চেপে যাবো?

ভূপতি : গেলেই বা?

পবন : কিন্তু—কিন্তু জগবন্ধুর মার কাছে আমি যে কিছু লুকোই না?

ভূপতি : লুকোবে কেন? কাল বোলো। একশো দশ টাকা পবন। প্লাস চুরুট। যাও তুমি দোকান সামলাও এখন। ঠিক সাতটায় চলে এসো, বুঝলে? রাত্তিরের খাওয়া এখানে, বলে দিও জগবন্ধুর মাকে।

(পবনের প্রস্থান)

শ্রীনাথ : আমিও যাই রাজাবাবু, দোকান খুলি গে।

ভূপতি : যাবে? কিন্তু চাদর?

শ্রীনাথ : মনোহরকে বলে দেবেন কী লাগবে। ও তো যাবেই ওদিকে?

ভূপতি : হ্যাঁ, সেই ভালো।

(শ্রীনাথের প্রস্থান)

কি মেনু করলে সাহা, বলো।

সাহা : পোলাও, বেগুনভাজা, রুই মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল—(পবনের প্রবেশ)

পবন : ভুলে গিয়েছিলাম রাজাবাবু, দু'প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম। মনোহরদা আনেনি কাল—

ভূপতি : বেঁচে থাকো তুমি পবন! জগবন্ধুর মা ভাগ্যবতী—তোমার মতো জগবন্ধুর বাবা পেয়েছে।

পবন : কী যে বলেন রাজাবাবু—

(পবনের প্রস্থান)

ভূপতি : হ্যাঁ, বলো সাহা। (সিগারেট ধরাইল)

সাহা : মুড়ো দিয়ে ডাল, মাছের কালিয়া—

ভূপতি : রুইমাছ পাওয়া যাবে?

সাহা : কেন পাওয়া যাবে না? আজ হাটবার তো?

বৃপতি : ও হ্যাঁ। আজ তো হাটবার। এটা জোর বেঁচে গেছি। মাছের কালিয়া। তারপর?

সাহা : মাছের কালিয়া। মাংস—

ভূপতি : (সহসা) আচ্ছা সাহা! একটা ম্যানেজার থাকলে ভালো হোতো না?

সাহা : ম্যানেজার?

ভূপতি : মানে বাড়ি বিক্রির ব্যাপার তো?

সাহা : তা আজ রাত্তিরেই তো লেখাপড়া হচ্ছে না?

ভূপতি : না না তা নয়। তবে শো-টা আরো জমকালো হোতো বুঝলে না?

সাহা : আমাকে দিয়ে কি হবে?

ভূপতি : তুমি স্যুট পরতে পারবে?

সাহা : স্যুট—মানে কোট-প্যান্টালুন? কখনো তো পরিনি আগে।

(ভূপতি সাহার স্যুটপরা মূর্তি কল্পনা করিয়া ভরসা পাইল না)

ভূপতি : নাঃ থাক। তা ছাড়া মনোহরের টীমেও লোক কমে যাবে।

(মনোহরের প্রবেশ। হাতে ঘর সাজাইবার পুরাতন সরঞ্জাম)

এই যে মনোহর। তোর কি তিনজনের কমে হবে?

মনোহর . তিনজনের কমে? তিনজনেই হয় না কি? তিনজন তো এখানেই লাগবে খাবার সময়ে। তারপর ফটকে একজন। সদর দরজায় একজন। এ ঘরের দরজায় একজন—

ভূপতি : সে কী রে? অতো লোক পাবি কোথায়?

মনোহর : এই দিয়েই চালাবো। উর্দি আর পাগড়ি।

ভূপতি : তাতে কি হবে?

মনোহর : কেন হবে না? ওরা কি আর আমাদের চেহারা দেখবে না কি খেয়াল করে? ফটক থেকে এই অবধি এনে দিয়ে সব রান্নাঘরে গিয়ে ভোল পাল্টে ফেলবে। তুমি খালি দেখো—দলশুদ্ধু যেন একসঙ্গে থাকে। ছিটকে ছাটকে কেউ যেন না বেরোয়।

ভূপতি : (সাহাকে) তবে তো আরোই হোলো না।

মনোহর : কী হোলো না?

ভূপতি : ভাবছিলাম সাহাকে ম্যানেজার বানানো যায় কি না। তুই যে তিনজনকে ছ'জন বানাচ্ছিস তা কে জানতো?

মনোহর : ম্যানেজারের অসুখ করেছে বলে দিও। কই, ফর্দ হোলো? বাজারটা আগে করা দরকার।

ভূপতি : হ্যাঁ, এই যে, বলো সাহা।

সাহা : মাছের কালিয়া, মাংস, পাঁপড়ভাজা—

ভূপতি : মাংসটা কি পাঁঠা হবে, না মুরগি?

সাহা : (দৃঢ়ভাবে) যদি মুরগি হয় তো আমি এর মধ্যে নেই।

ভূপতি : (শশব্যস্তে) না না, পাঁঠা পাঁঠা! মুরগি হলে আমিও এর মধ্যে নেই। পাঁঠা, কী বলিস মনোহর? (মনোহর ঘর সাজাইতে ব্যস্ত ছিল)

মনোহর : হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁঠা হলে আমিও এর মধ্যে—না না, কী বলে, মুরগি মানে—আমি পাঁঠা হলে—ইয়ে, মানে—পাঁঠা হোক!

ভূপতি : নিশ্চয়ই। পাঁঠা সাহা! মানে—পাঁঠার মাংস, সাহা। তারপর বলো।

সাহা : পাঁঠার মাংস, পাঁপড়ভাজা, চাটনি, দই, দু'রকম মিষ্টি, পান।

ভূপতি : কিন্তু এ যেন ঠিক বিয়েবাড়ির খাওয়া হয়ে গেলো।

সাহা : আজ্ঞে হ্যাঁ। অনন্ত পোদ্দারের মেয়ের বিয়ে গেলো সেদিন—ঠিক এমনি হয়েছিলো।

ভূপতি : ঠিক আছে। এই বেশ হয়েছে! মনোহর কী বলিস?
(মনোহর চেয়ারে উঠিয়া গৃহসজ্জার কোনো দুরূহ কার্যে ব্যস্ত ছিল। কথাবার্তার ধারা অনুসরণ করে নাই।)

মনোহর : অ্যাঁ? হ্যাঁ—পাঁঠা! পাঁঠা! ওর আর কোনো কথা নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সন্ধ্যা। সেই ঘর, কিন্তু ভোল অনেক পাল্টাইয়াছে। সিংহাসন সুসজ্জিত। ঝাড়লণ্ঠন দুলিতেছে। চেয়ারে গদি। টেবিল চাদরে আবৃত। ভাঙা আসবাব অন্তর্হিত হইয়াছে। দুই-একটি ধার-করা আসবাব আমদানি হইয়াছে।

মনোহরের পরিধানে জমকালো উর্দি। লক্ষ্য না করিলে উর্দিতে মেরামতের চিহ্ন ধরা পড়ে না। পবনের উর্দি পরা হইয়াছে। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহাতে প্রায় অর্ধেক মুখ ঢাকা পড়িয়াছে। একটি পুরাতন ভাঙা বন্দুকের সাহায্যে সেলাম ঠুকিবার কায়দা তাহাকে শিখাইতে মনোহর আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ঘরের অন্য দিকে সাহা উর্দি পরিতে ব্যস্ত। তাহার ভুঁড়িটি কিছুতেই সম্পূর্ণ ডাকিতেছে না।)

মনোহর : হেই-ই-ই হপ্! বলে এমনি করে সিধে হয়ে দাঁড়াবে। সিধে তাকিয়ে, একেবারে পাথরের মূর্তির মতো। নাও—করো দিকি?

(পবন চেষ্টা করিল, কিন্তু একেবারেই হইল না)

ওটা কী হোলো? এতোক্ষণ ধরে কী দেখালুম তবে? বন্দুকখানাকে অতো তফাতে ধরেছো কেন?

পবন : বন্দুক যে?

মনোহর : বন্দুক—তা কী? ফটকের দারোয়ান—বন্দুক ছাড়া হয়?

পবন : যদি ফুটে যায়?

মনোহর : (বিরক্ত হইয়া) কতোবার বলবো এক কথা! ফুটবে যে—গুলি আছে এতে?

পবন : না, গুলি নেই। তবু—বন্দুক তো?

সাহা : গুলি ছাড়া বন্দুক ফোটে না পবন। কেন ভয় পাচ্ছো?

পবন : না না, ভয় পাবো কেন? এইবার দেখো। হে-ই-ই হপ্! (অনেকটা হইয়াছে)

মনোহর : করেই ছেড়ে দিও না অমনি! একদম সিধে—থির হয়ে দাঁড়াবে।

পবন : দাঁড়িয়েই থাকবো?

মনোহর : খানিকক্ষণ দাঁড়াবে। তারপর এমনিভাবে ফিরবে। ফিরে এমনি করে হেঁটে আসবে সদর অবধি—লেফ্ট্ রাইট লেফ্ট্। করো দিকি? (পবন করিল) অতো দুলো না। মাথা নাড়াচ্ছো কেন? মাথা সিধে। হ্যাঁ লেফট্ রাইট লেফ্ট্। লেফ্ট্ রাইট। ঐ হয়েছে। তারপর সদরে শ্রীনাথবাবুর কাছে এসে অমনি করে দাঁড়াবে। লেফট্ রাইট, হেই—হপ্। বুঝলে?

পবন : দাঁড়িয়েই থাকবো?

মনোহর : দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? শ্রীনাথবাবু ওদের নিয়ে ভেতরে ঢুকবে, তুমি অমনি লেফট্-রাইট করে গেটের দিকে যাবে। যখন দেখবে চোখের আড়াল হয়েছে—ও দিক দিয়ে ঘুরে চলে যাবে রান্নাঘরে।

পবন : বন্দুকটা?

মনাহর : বন্দুকটা নিয়ে আসবে রান্নাঘরে! না কি—ফেলে দেবে?

পবন: না না ফেলবো কেন? নিয়ে আসবো।

(কিন্তু ভাব দেখিয়া মনে হইল ফেলিতে পারিলে বাঁচে)

মনোহর : কই, শ্রীনাথবাবু কোথায় গেলো?

সাহা : শ্রীনাথ মাংস দেখছে। কেউ না গেলে আসবে কী করে?

মনোহর : তাও তো বটে। (প্রস্থানোদ্যত) কতোদিক সামলাই।

সাহা : আরে যাচ্ছো কোথায়? আমারটা বলে দিয়ে যাও।

মনোহর : কিন্তু মাংসটা—

সাহা : পবন তুমি যাও—গিয়ে শ্রীনাথকে ছেড়ে দাও।

(পবন এতক্ষণ বন্দুক ঘাড়ে লেফট্-রাইট হেই-হপ্ করিতেছিল। হুকুম পাইয়া সাহাকে হেই-হপ্ করিল এবং লেফ্ট্-রাইট্ করিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হইল।)

মনোহর : মাংসটা দেখো—ধরে না যায়। রান্নাঘরে লেফট্ রাইট করতে হবে না, হাঁড়ি-কুঁড়ি ওল্টাবে।

পবন : তবে বন্দুকটা এখানেই থাক।

(সাবধানে বন্দুকটি শোয়াইয়া রাখিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।)

সাহা : আমি এই ঘরের দরজায় তো?

মনোহর : আপনি থাকবেন বারান্দার মুখটাতে। শ্রীনাথবাবু যখন আনছে—ওদিক তাকাবেন না। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন থির হয়ে। যেই শ্রীনাথবাবু এমনি করে দাঁড়ালেন, অমনি সেলাম।

(মনোহর দেখাইতেছে, সাহা নকল করিতেছে। সেলামটা কাঁচিয়া গেল।)

ওরকম না—এমনি ঝুঁকে।

সাহা : কিন্তু শ্রীনাথকে যে তখন এই রকম দেখালে?

মনোহর : তা শ্রীনাথবাবু হোলো সদরের। আপনি হলেন ভেতরের দরবারের দরজায়—একরকম সেলাম হবে?

সাহা : না না, তা কী করে হবে?

মনোহর : পবনের তো ওরকম সেলামই নেই—ওর হোলো বন্দুক নিয়ে স্যালুট। বলুন?

সাহা : ঠিক কথা, ঠিক কথা। আমারটা তাহলে কীরকম হবে—আর একবার দেখাও তো?

মনোহর : এই রকম। (দেখাইল)

সাহা : এমনি?

মনোহর : পিঠ বাঁকাবেন না। কোমর থেকে ঝুঁকবেন—পিঠ সিধে। আঙুলগুলো জোড়া রাখুন! হ্যাঁ—অমনি। নিন, করুন আর একবার। আর একটু ঝুঁকুন। আর একটু—

সাহা : আর হয় না হে, পেটে লাগে।

মনোহর : আচ্ছা থাক থাক, ওতেই হবে। সেলাম করে এই দরজা অবধি আসবেন। তারপর পর্দাটা তুলে ধরে এমনিভাবে ঝুঁকে দাঁড়াবেন—হাতটা এদিকে বাড়িয়ে।

(সাহা শিখিল)

অ্যাই, এই তো! হবে না? আপনারা হলেন বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তি। কতোক্ষণ লাগে এ সব শিখতে।

(সাহা প্রীত হইয়া মনোহরকে সেলাম ঠুকিল। শ্রীনাথের অন্দর হইতে প্রবেশ। সাহা তাহাকেও সেলাম জানাইল। প্রত্যুত্তরে শ্রীনাথ তাহার সদরী সেলাম দেখাইল।)

বাঃ বাঃ। এই তো শ্রীনাথবাবুর চমৎকার এসে গেছে। এক পবনটাকেই দাঁড় করাতে পারলুম না।

শ্রীনাথ : তুমি যাও মনোহর। পবন রান্নাঘরে চ্যালাকাঠ ঘাড়ে নিয়ে হেই-হপ্ করছে—মাংস ধরিয়ে ফেলবে।

মনোহর : হ্যাঁ, যাই। আপনি উর্দিটা পরে ফেলুন শ্রীনাথবাবু। আর পাগড়ি।

সাহা : আমারও পাগড়ি?

মনোহর : পয়লা দফায় সব পাগড়ি। বুঝতে পারছেন না, পাগড়িগুলো খুলে ফেললেই চেহারার অনেক তফাৎ হয়ে যাবে।

সাহা : তুমি গোঁফ মোটে একটা পেলে?

মনোহর : এই দিতে চায় না লক্ষ্মণ। হাজারো প্রশ্ন—কী হবে, কী করবে—

শ্রীনাথ : কী বললে তুমি?

মনোহর : বললাম—রিটায়ার করে তোর মতো বহুরূপীর ব্যবসা ধরবো।

শ্রীনাথ : গোঁফটা কাকে লাগাবে? পবনকে?

মনোহর : পবনের কথাই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু ওর রোগা মুখে মানাচ্ছে না। আপনি নেবেন সা-মশাই?

সাহা : না না। আমায় ঝুঁকে সেলাম করতে হবে—পড়ে টড়ে গেলে বিপদ।

শ্রীনাথ : কই দেখি গোঁফটা?

(মনোহর গোঁফ বাহির করিল। লক্ষ্মণ বহুরূপী এই গোঁফের সাহায্যে বোধহয় ভীম সাজে। অথবা কীচক। শ্রীনাথ নাকের নিচে চাপিয়া আয়না দেখিল।)

মনোহর : আপনি লাগাবেন?

শ্রীনাথ : নাঃ! দাদা ঠিক কথা বলেছে। খসে গেলে সব্বোনাশ হয়ে যাবে।

(ফেরৎ দিয়া দিল)

মনোহর : (সহসা) মাংস!

(ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। শ্রীনাথ উর্দি পরিতে লাগিল, সাহা পাগড়ি। ভূপতি শয়নকক্ষ হইতে হাঁকিল।)

ভূপতি : (নেপথ্যে) মনোহর! মনোহর!

সাহা : (চেঁচাইয়া) মনোহর রান্নাঘরে রাজাবাবু, মাংসটা দেখছে।

ভূপতি : (নেপথ্যে) আচ্ছা, এলে পঠিয়ে দিও ভিতরে।

সাহা : আজ্ঞে দেবো। (শ্রীনাথকে) দেখো তো, পাগড়িটা ঠিক হোলো কি না?

শ্রীনাথ : দাঁড়াও, দেখছি।

(শ্রীনাথ সাহার পাগড়ি বাঁধিতে লাগিল। পবন লেফট্-রাইট্ করিয়া প্রবেশ করিল এবং হেই-হপ্ করিয়া চ্যালাকাঠের 'স্যালুট' জানাইল।)

চ্যালাকাঠটা এখানে নিয়ে এলে—রাখবে কোথায়?

পবন : তাই তো! হেই-হপ্। লেফ্ট্—রাইট্—

(পবন রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল)

শ্রীনাথ : এবার আমারটা দেখো তো দাদা।

(শ্রীনাথ পাগড়ির এক মুড়ো মাথায় চাপিয়া ধরিল। সাহা অন্য মুড়ো ধরিয়া ঘানির বলদের মতো চক্রাকারে শ্রীনাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাগড়ি পেঁচাইতে লাগিল। মনোহরের প্রবেশ।)

মনোহর : ক'টা বাজে সা-মশাই?

(সাহা একটি ট্যাক-ঘড়ি বাহির করিল। অন্যহাতে এখনো পাগড়ি।)

সাহা : সাড়ে সাতটা। এখনো আধঘণ্টা।

মনোহর : মাংস নেমে গেছে। ওদিকে আর বেশি ঝামেলা নেই।

(ভূপতির প্রবেশ। চুড়িদার পাজামা পাঞ্জাবি।)

ভূপতি : এই যে মনোহর। পাঞ্জাবিতে লাগাবো কী? এই চার পয়সার বোতাম?

মনোহর : এই যাঃ, বোতামের কথা একদম ভুলে গেছি।

সাহা : আমার এটা গিল্টি করা—চলবে?

ভূপতি : খুব চলবে—দাও দাও।

(ভূপতি বোতাম লাগাইল। শ্রীনাথের পাগড়ি বাঁধা হইয়াছে। পবন খালি হাতে লেফট্-

রাইট্ করিয়া ঢুকিল। ভূপতিকে দেখিয়া বন্দুক লইয়া স্যালুট জানাইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথ ও সাহাও তাহাদের খেল দেখাইল। ভূপতি ঘাবড়াইয়া হাত তুলিয়া ফেলিল।)

মনোহর : (গর্জাইয়া) এই খবরদার! তুমি একদম হাত তুলবে না! যে যতো সেলাম করুক, তাকাবে না একদম!

ভূপতি : হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে সেলাম কোরো ভাই, একেবারে নাকের ডগায় এসে কোরো না।

মনোহর : দেখি একবার গোড়া থেকে হয়ে যাক।

(মনোহর একে একে সবাইকে স্বস্থানে দাঁড় করাইতে লাগিল)

এইটে ধরো বাইরের ফটক, পবন এখানে দাঁড়াও এদিকে ফিরে। আচ্ছা, এইটে হোলো গে বাড়ির সদর, শ্রীনাথবাবু এখানে। সা-মশাই এদিকটায় আসুন। মনে করুন এইটে বারান্দার মুখ। আর ঐ—দরজা। আমি রইলাম—এখানে। (ভূপতিকে) তুমি ভিতরে আছো। ঐ ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়াও, আমি নাম বলে হাঁকলে তবে ঢুকবে।

(সবাই দাঁড়াইয়াছে। মনোহর এমনভাবে সাজাইয়াছে, যাহাতে ঘরের মধ্যেই প্রত্যেকে খানিকটা হাঁটিবার সুযোগ পায়।)

নাও এইবার, রেডি, পবন!

পবন : হেই—ই—হপ্!

মনোহর : (গর্জাইয়া) ঠিক জানি আসল কথাটি ভুলবে!

পবন : (ঘাবড়াইয়া) কেন কী হোলো?

মনোহর : বলি সর্বপ্রথম ঘণ্টার দড়িটি টেনে দিতে বল্লুম না? আমরা জানতে না পারলে রেডি হবো কী করে?

পবন : ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তা, এখানে দড়ি কোথায়?

মনোহর : ধরে নাও না ঝুলছে তোমার পাশে? হাত দিয়ে দেখাও। নাও এবার।

(পবন কাল্পনিক দড়ি টানিল। মুখে ঘণ্টাধ্বনি জানাইল।)

পবন : ঢং! লেফ্ট্-রাইট্ লেফ্ট্—হেই হপ্।

(শ্রীনাথের কাছে থামিল। শ্রীনাথ সেলাম করিয়া সাহার দিকে আগাইল। পবন লেফ্ট্-রাইট্ করিয়া অর্ধেক পথ ফিরিয়ে অন্য দিকে গিয়া রান্নাঘরে যাওয়া বুঝাইল। সাহা সেলাম সারিয়া পর্দা তুলিয়া ধরিল। মনোহর একখানি মোগল আমলের কুর্নিশ দেখাইল। ভূপতির মুগ্ধ মুখব্যাদানে রাজকীয় মর্যাদা একেবারে নাই।)

মনোহর : বন্দেগী আমীর-মেহমান! গরিবখানায় তস্‌রিফ রাখতে হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

ভূপতি : ও কী রে, ও সব কী বলছিস?

মনোহর : তুমি চুপ করো তো। তুমি ভেতরে আছো।

ভূপতি : তুই কি লুকিয়ে ডি. এল. রায়ের শাজাহান পড়িস না কি?

মনোহর : আঃ! কেন সময় নষ্ট করছো? সরে দাঁড়াও। আমি তোমার নাম বললে তবে ঢুকবে।

(ভূপতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা জানাইল)

রায়-রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভুইঞা বাহাদু—র।

(বলিয়া মোগলাই কায়দায় ঝুঁকিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। ভূপতি নড়িল না।)

কই, এসো!

ভূপতি : নাম বললে তবে তো ঢুকবো?

মনোহর : নাম বললাম না তো কী বললাম তাহলে?

ভূপতি : আমার চোদ্দপুরুষেরও ও নাম নয়।

মনোহর : (রাগিয়া) চোদ্দপুরুষের খবর তুমি কী জানো? নিজের কথা বলো।

ভূপতি : নিজের কথাই তো বলছি। আমার নাম বললি কখন?

মনোহর : ভূপতি রায় বলিনি আমি?

ভূপতি : তুই তো চক্রবর্তী ভুইঞা বাহাদুর টাহাদুর কী সব বললি। ভূপতি রায় বললি কোথায়?

মনোহর : ছিল—ওর মধ্যেই ছিল। শুনবে না খেয়াল করে!

ভূপতি : আচ্ছা, আবার বল।

মনোহর : রায়-রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভুইঞা বাহাদুর—র! (এবারে ভূপতি রায় নামটিতে জোর দিল। ভূপতি রাজকীয় ভঙ্গীতে অগ্রসর হইল।)

ভূপতি : নমস্কার মিস্টার হালদার।

মনোহর : ঐ রকম করে বলবে না কি?

ভূপতি : দেখ বাবা, তুই তো একবার আমীর তস্‌রিফ বলে খালাস। আমি তো আর ঝাড়া দু'ঘণ্টা মোগলাই বুলি ছোটাতে পারবো না? তার চেয়ে গোড়া থেকেই সিধে বাংলা বলা ভালো না?(মনোহর খুব প্রীত না হইলেও মানিয়া লইল)

মনোহর : আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু তোমার গোলাপফুল কই?

ভূপতি : ঘরে, জল দিয়ে রেখেছি।

মনোহর : ওটা ভুলো না। কথায় না হোক. কায়দায় ঠাটটা রেখো। কই, শুঁকে দেখাও দিকি একবার?(ভূপতি মামুলি কায়দায় আঙুলে কাল্পনিক গোলাপ শুঁকিল) কিচ্ছু হোলো না! অমনি করে শোঁকে বাগানের মালি।

ভূপতি : আমি ও বরাবর এমনি করেই শুঁকি।

মনোহর : আচ্ছা, বাদ দাও এখন বরাবরের কথা। এই, দেখো—এই, এমনি। (মনোহর হাতের কব্জি ঘুরাইয়া বাদশাহী গোলাপ শোঁকা দেখাইল। ভূপতি নকল করিল।) হ্যাঁ, ভুলে যেও না।

ভূপতি : সাহা, ক'টা বাজে?

সাহা : সাতটা চল্লিশ।

ভূপতি : কুড়ি মিনিট! রান্না হয়েছে?

মনোহর : ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। নাও, আর একবার গোড়া থেকে করে নাও। নিয়ে যে যার দাঁড়িয়ে যেও জায়গামতো।

(আবার সকলে কাল্পনিক ফটকে সদরে অন্দরে অধিষ্ঠিত হইল)

রেডি? এক, দুই—তিন!

(পবন কাল্পনিক দড়ি টানিল। সশব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল বাহিরে। সকলে স্তব্ধ। পবন

হাতের মুঠোর দিকে একবার চাহিয়া উপরে ঘণ্টা খুঁজিতেছে। অন্যরাও এদিকে ওদিক চাহিতেছে। প্রথম সম্বিত ফিরিল মনোহরের।)

মনোহর : (চেঁচাইয়া) আরে এসে গেছে। বুঝতে পারছো না? বাইরে গেটে ঘণ্টা বাজিয়েছে! পবন শিগ্‌গির।

(পবনের দ্রুত প্রস্থান)

ভূপতি : যাঃ, সব কেঁচে গেলো!

মনোহর : শ্রীনাথবাবু দৌড়োন। সা-মশাই, দাঁড়িয়ে যান।

(শ্রীনাথ ও সাহার প্রস্থান)

ভূপতি : এতো কাণ্ড করে শেষকালে আগে এসে পড়লো?

মনোহর : হয়ে যাবে হয়ে যাবে, তুমি ভিতরে যাও। গোলাপফুলটা হাতে নাও। পানের থালাটা সাজানো হয়নি, যা পারো একটু সাজিয়ে রেখো, আমি যেতে পারছিনে এখন।

(ভূপতি শয়নকক্ষে গেল। মনোহর বাহিরের দরজার পর্দা তুলিয়া দেখিল।)

(চেঁচাইয়া) আর একটু পাশ করে দাঁড়ান সা-মশাই। পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন যে! হ্যাঁ।

(ভিতরে আসিয়া জায়গামতো স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সাহার ছাড়া পাঞ্জাবিটি চেয়ারে ঝুলিতেছে, যে চেয়ারে আমীর-মেহমানের তস্‌রিফ রাখার কথা। যখন দেখিল তখন প্রায় শেষ মুহূর্ত। প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতায় মনোহর পাঞ্জাবিটা ছিনাইয়া লইল, কিন্তু কোথাও লুকাইবার আগেই সাহা পর্দা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব তাল পাকাইয়া এক হাতে পিছনে লুকানো ছাড়া উপায় রহিল না।

প্রবেশ করলি ভূপতির বয়সী এক ব্যক্তি। শার্ট ট্রাউজার পরিধানে। শার্টের আস্তিন গুটানো। পোশাকে চুলে দীর্ঘ ভ্রমণের সাক্ষ্য। হাতে একটি বড়ো ব্যাগ। মুখে হতচকিত ভাব। মনোহরের মোগলাই কুর্নিশে যেন আরও ঘাবড়াইয়া গেল। প্রত্যুত্তরে হাতের একটা অর্ধ-অভিবাদনের ভঙ্গী করিল। মনোহরের চোখ পড়িল—আগন্তুকের হাতে ব্যাগ।)

মনোহর : (সাহাকে প্রচণ্ড ধমকাইয়া) ব্যাগটা হুজুরের হাত থেকে নিতে পারোনি —বেয়াদব কোথাকার?

সাহা : (চূড়ান্ত ঘাবড়াইয়া) ব্যাগের কথা তো বলে দাওনি-–

মনোহর : (সগর্জনে) ফের বাজে কথা?

(সাহা ধমক খাইয়া মনোহরকে সেলাম করিয়া ফেলিল। তার পর বুঝিয়া ব্যাগটি লইল।)

আগন্তুক : থাক থাক ঠিক আছে—

মনোহর : গোস্তাকি মাপ হয় হুজুর। নতুন নফর—জানে না।

আগন্তুক : না না, কী হয়েছে—(কিন্তু মনোহর ততক্ষণে শুরু করিয়া দিয়াছে।)

মনোহর: বন্দেগী আমীর মেহমান! গরিবখানায় তসরিফ রাখতে হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

আগন্তুক : রাজা-বাহাদুর!

(কিন্তু মনোহর শয়নকক্ষে চলিয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবি লুকাইতে গিয়া তাহাকে পিছুহটা কুর্নিশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সাহা ব্যাগ হাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, হুকুমের অভাবে নামাইতে ভরসা পাইতেছে না।)

ইয়ে, এটা ভূপতি রায়ের বাড়ি তো?

(কিন্তু সাহা কথা বলিল না, কথা বলিবার হুকুম নাই। মনোহরের প্রবেশ।)

মনোহর : রায়-রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভুইঞা বাহাদু—র!

(রাজকীয় প্রবেশ ভূপতির। বাদশাহী ভঙ্গীতে গোলাপ-ধরা হাত নাকে উঠিতেছে—ভূপতি থামিয়া গেল। হাতটি যেন নৃত্যের মুদ্রায় রহিয়াছে।)

ভূপতি : সঞ্জীব!!

সঞ্জীব : যাক্ তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আমি ভাবছি—নির্ঘাৎ ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছি!

ভূপতি : তুই—হঠাৎ—কোত্থেকে—কী করে—?

সঞ্জীব : বলছি বলছি, একটু হাঁফ ছাড়তে দে। যা খেল দেখিয়েছে—

(সহসা মনোহর ও সাহার উপস্থিতি খেয়াল হওয়াতে অপ্রস্তুত হইয়া থামিয়া গেল। ভূপতির এতক্ষণে সঞ্জীবের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

ভূপতি : ও সাহা, ব্যাগটা রাখো। মনোহর, স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ্ বাবা। এ আমার কলেজের বন্ধু—সঞ্জীব!

(সাহা নিশ্চিত হইয়া ব্যাগ রাখিল। মনোহর বোকা বানিয়া একটু চটিয়াছে। ভঙ্গীটি একেবারে ত্যাগ করিল না।)

মনোহর : ইনি তিনি নন?

ভূপতি : না রে, ইনি তিনি নন।

সঞ্জীব : তিনিটা কে?

ভূপতি : আরে সে একজন—বাড়ি দেখতে আসছে। তার জন্যেই তো এতো সব।

মনোহর : আটটা বাজে কিন্তু, খেয়াল রেখো।

ভূপতি : অ্যাঁ? আটটা বাজে না কি? সাহা?

সাহা : পাঁচ মিনিট বাকি।

ভূপতি : দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও সাহা—দেরি কোরো না।

মনোহর : সা-মশাই শুধু দাঁড়ালে কী হবে? পবন শ্রীনাথবাবু—সব তো রান্নাঘরে চলে গেছে। পাগড়িও খুলে ফেললো বোধ হয় এতক্ষণে।

ভূপতি : বলিস কী?

মনোহর : আমি দেখছি। সা-মশাই দাঁড়িয়ে যান। তুমিও তৈরি থেকো কিন্তু।

(সাহা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মনোহরও দ্রুত বাহির হইয়া গেল।)

সঞ্জীব : কী ব্যাপার বল দেখি?

ভূপতি : আরে, সে অনেক ব্যাপার। মানে—বাড়িটা বেচতেই হবে! এই একটা খদ্দের পেয়েছি দেড় বছরে, তাই ধার করে নবাবি চাল দেখাচ্ছি—বুঝলি না?

সঞ্জীব : ধার করে? কিন্তু স্টেশনে তোর নাম করতে বললে—রাজাবাবু! বাড়ির কথায় বললো—রাজবাড়ি!

ভূপতি : হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজাবাবু, রাজবাড়ি—নাম সবই আছে। ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন! ঐ দারোয়ান ফারোয়ান যা দেখলি—সব এখানকার দোকানদার, এবং আমার পাওনাদার।

সঞ্জীব : পাওনাদার? তা ওরা—

ভূপতি : বলবো বলবো। এই ঝামেলাটা উৎরে সব বলবো। কিন্তু তুই, তুই হঠাৎ এলি কী করে?

সঞ্জীব : কী করে আবার? ট্রেন, স্টিমারে, হেঁটে! বাব্বা, এতো হাঙ্গামা আসতে কে জানতো?

ভূপতি : এতো হাঙ্গামা করে তুই আসবি—আমি কীরকম বিশ্বাস করতে পারছি না। কোনো খারাপ খবর নেই তো?

সঞ্জীব : না না, খারাপ খবর নয়! বলবো এখন ধীরে সুস্থে—

ভূপতি : বল না। এখন না বললে বহুক্ষণ শোনা হবে না।

সঞ্জীব : পার্টনারশিপে চেম্বার খুলবি?

ভূপতি : চেম্বার!

সঞ্জীব : দারুণ দাঁওয়ে পাচ্ছি। অদ্ভুত লোকেশন। সাতদিন মোটে সময় আছে। তোকে ছাড়া আর কাউকে পার্টনার করার কথা ভাবতে পারলাম না। তাই একেবারে চলে এলাম চিঠিপত্রের ভরসা না রেখে।

ভূপতি : কিন্তু টাকা?

সঞ্জীব : জলের দর! হাজার তিন কোনোরকমে জোগাড় করতে পারবিনে? বাকি আমার জমা আছে।

ভূপতি : তিন হাজার? দেখছিস না, পাওনাদাররা টাকা আদায় হবার আশায় বাড়ির চাকর সাজতে রাজি হয়েছে।

সঞ্জীব : কিন্তু চেম্বারটা—

ভূপতি : চেম্বার আমাকে কী বলবি তুই? দেড় বছর ধার করে এই বাড়ি নিয়ে পড়ে আছি—শুধু চেম্বার খোলবার আশায়। কী বলবো তোকে, তুই এতোদূর এলি—আচ্ছা, ঠিকানা পেলি কোথায় আমার?

সঞ্জীব : ওঃ আর বলিসনি। কলেজের অফিসে, কেরানিবাবুকে তেলিয়ে। তুই তো জীবনে কাউকে কখনো ঠিকানা জানাসনি! এরকম রাজবাড়ি তোর আছে জানলে কতো ছুটি কাটানো যেতো।(ভূপতি সহসা সচেতন হইয়া উঠিল)

ভূপতি : ছুটি—তুই—তোকে তো রাত্তিরে থাকতে হবে এখানে!

সঞ্জীব : ভয় পেয়ে গেলি যে?

ভূপতি : না না, ভয় নয়, ভয় নয়, কিন্তু—

সঞ্জীব : আমায় বিছ্না দিতে হবে না তোকে, ব্যাগ মাথায় দিয়ে শোবো।

ভূপতি : না না, বিছ্না নয়—রঘুদা—(থামিয়া গেল)

সঞ্জীব : রঘুদা কে? তোর দাদা?

ভূপতি : না না, দাদা নয়। কী করে বা বোঝাই এর মধ্যে। আটটা বেজে গেলো বোধ হয়?

সঞ্জীব : (ঘড়ি দেখিয়া) ঠিক আটটা।

ভূপতি : খেয়েছে! এখুনি এসে পড়বে—কোনদিকে মন দি? আচ্ছা, তুই তো আছিস, ওরা চলে গেলে তোকে—(সহসা) আচ্ছা, তুই কী হবি?

সঞ্জীব : আমি কী হবো মানে?

ভূপতি : মানে—তুই কে? তোর কথা কী বলবো ওদের?

সঞ্জীব : কী আবার বলবি? বলবি—বন্ধু!

ভূপতি : না না। তুই বুঝতে পারছিস না। এই বাদশাহী স্কীমে বন্ধু ঢোকাই কী করে?

(মনোহরের প্রবেশ)

মনোহর, রাজার কি বন্ধু থাকতে পারে এরকম?

মনোহর : বন্ধু?

ভূপতি : তুই রায় রায়ান চক্রবর্তী সব ঝাড়লি। আমি গোলাপ শুঁকলাম। তারপর বললাম—আমার বন্ধু সঞ্জীব বোস! কীরকম ইয়ে হয়ে যাচ্ছে না?

(সত্যিই যেন কীরকম 'ইয়ে' হইয়া যাইতেছে)

মনোহর : (ভাবিয়া) উনি যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

ভূপতি : কী কী বল বল। কিচ্ছু মনে করবে না, ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড! তুই ব[illegible]।

মনোহর : তুমি তো ম্যানেজারবাবু খুঁজছিলে—

ভূপতি : দি আইডিয়া! মনোহর, তুই মরলে যে আমার কী হবে! সঞ্জীব—তুই [illegible]জার!

সঞ্জীব : সে কী রে—ম্যানেজার কী?

ভূপতি : ম্যানেজার ম্যানেজার। আমার এস্টেটের!

সঞ্জীব : তোর এস্টেটের আমি জানি কী যে ম্যানেজার সাজবো?

ভূপতি : এস্টেটই নেই তার জানবি কী? এস্টেট এই চারশো বছরের পুরোনো ভাঙা বাড়ি, আর সাত বিঘে আগাছার জঙ্গল। সে সব বলে ফেলিসনি যেন ওদের!

সঞ্জীব : কিন্তু আমায় কী করতে হবে—সে সব—

ভূপতি : সময় কোথায়? চালিয়ে দিবি একরকম করে। তুই তো ভালো থিয়েটার করতিস? কিন্তু একটু ছোকরা হয়ে গেলো যেন, প্রবীণ ম্যানেজার হলে ভালো জমতো! (মনোহরের মাথা সব সময়েই ভালো খেলে)

মনোহর : উনি যদি কিছু মনে না করেন—

ভূপতি : কেন—কী? (মনোহর লক্ষ্মণ বহুরূপীর সেই ভীম-সাজা গোঁফটি বাহির করিল) অ্যাঁ? এ কোথায় পেলি রে? দেখি দেখি—লাগা তো সঞ্জীব!

সঞ্জীব : যাঃ!

ভূপতি : কী হয়েছে, লাগা না দেখি।

সঞ্জীব : মাথা খারাপ হয়েছে না কি তোর?

ভূপতি : আচ্ছা একবার লাগিয়ে দেখতে দোষটা কী? (সঞ্জীব লাগাইল) দেখি দেখি? বাঃ! অদ্ভুত! দারুণ! খুলিস না খুলিস না।

সঞ্জীব : যাঃ! এ হয় না কি?

ভূপতি : হবে হবে, দারুণ হবে। গোঁফ ছাড়া হচ্ছেই না ম্যানেজার!

সঞ্জীব : এ তো দেখেই বুঝতে পারবে রে!

ভূপতি : কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। আমি তোকে আড়াল করে রাখবো। পর, পরে ফেল। আমাদের চেম্বার, জীবন-মরণ সমস্যা।

সঞ্জীব : জীবন-মরণ সমস্যা কি এই গোঁফের উপর নাকি?

ভূপতি : তুই বুঝতে পারছিস না! মনে কর ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি মনস্থির হয়েছে—কিনবো, কিনবো না, কিনবো, কিনবো না—তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—ঐ গোঁফ! ঐ জমকালো গোঁফওয়ালা ম্যানেজার। আর কথা নেই---কিনে ফেলো! (ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল) ঐ এসে গেছে, পরে ফেল শিগ্‌গির! (সঞ্জীব থতমত খাইয়া গোঁফ পরিয়া ফেলিল)

মনোহর : ভেতরে যাও, ভেতরে যাও! (দরজায় উঁকি মারিয়া সাহাকে দেখিয়া লইল)

ভূপতি : সঞ্জীব? সঞ্জীব কোথায় থাকবে?

(এ সব দুরূহ প্রশ্ন এ অবস্থায় মীমাংসা করা কঠিন)

মনাহর : উনি—এখানেই, না না এখানে থাকলে হবে না। উনি ভিতরেই থাকুন তোমার সঙ্গে।

ভূপতি : তারপর?

মনোহর : তোমার পেছনে পেছন ঢুকবেন এখন। যাও যাও! পানের থালাটা সেই সাজানো হোলো না!

ভূপতি : আমি দেখছি। চলে আয় সঞ্জীব!

(শয়নকক্ষে গেল। মনোহর ব্যাগটা দেখিতে পাইল। ছুটিয়া তুলিয়া আনিল।)

মনোহর : ব্যাগটা। ব্যাগটা নিয়ে যাও ভেতরে!

(ভূপতি ফিরিয়া মনোহরের হাত হইতে ব্যাগ লইয়া ভিতরে গেল। মনোহর দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত। তারপর সাহা পর্দা সরাইয়া ধরিল। হালদার প্রবেশ করিলেন। মুখে পরম তৃপ্তির হাসি। ফিরিয়া সাহার ভঙ্গিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন---যেন যাদুঘরের অতি চিত্তাকর্ষক বস্তু। ফলে সাদা পর্দাও ফেলিতে পারিল না, ভঙ্গীও ছাড়িতে পারিল না। শেষে মনোহর বাধ্য হইয়া অল্প কাশিল। হালদার ধীরে ধীরে ফিরিলেন। ফিরিয়া বিপুল আগ্রহে মনোহরের কুর্নিশ পর্যবেক্ষণ করিলেন। সাহা এই সুযোগে চলিয়া গেল। মনোহর প্রায় তোৎলাইয়া গেল।)

মনোহর : বন্দেগী আমীর মেহমান। গরিবখানায় তসরিফ রাখতে হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

(মনোহর ভিতরে গেল। হালদারের মুখের বিস্ময় আবার মুগ্ধতায় পরিণত হইল।)

হালদার : ক্যাপিট্যাল! ক্যাপিট্যাল! সুপার্ব।

(পরম তৃপ্তিতে দুই হাত ঘষিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চোখ আটকাইল সিংহাসনটিতে। মনোহরের প্রবেশ। পিছন ভূপতি ও সঞ্জীব। মনোহরের ঘোষণায় মিঃ হালদার চমকাইয়া ফিরিলেন।)

মনোহর : রায়রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভুইঞা বাহাদু—র!

(ভূপতি এক পা অগ্রসর হইয়া রাজকীয় কায়দায় ঘাড় ঝুঁকাইল। অর্থাৎ যে কায়দা তাহার রাজকীয় মনে হইল।)

ভূপতি : বসুন মিঃ হালদার।(হালদার প্রচণ্ড উৎসাহে ভূপতির করমর্দন করিলেন)

হালদার : কনগ্র্যাচুলেশনস্ মিস্টার রায়। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্!

ভূপতি : অ্যাঁ? কেন?

হালদার : এ এক অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেছেন এখানে!

ভূপতি : (অপরাধী বিবেক) রচনা করেছি?

হালদার : না না, আপনি রচনা করবেন কেন? রচনা হয়েছে, মানে আমাদের কাছে রচনা হয়েছে। আমরা বর্তমানে বাস করি, বুঝলেন না? অতীত ভুলে যাচ্ছি, ইতিহাস ভুলে যাচ্ছি।

(হালদারের মনে হইল কথাগুলি খুব ভালো বলিয়াছেন। পরিতৃপ্ত অট্টহাস্য হাসিলেন। ভূপতি দুর্বলভাবে হাসিল। মনোহর ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়াছে।)

ভূপতি : ইয়ে—আমার এস্টেটের ম্যানেজার—শ্রীসঞ্জীব বসু।

সঞ্জীব : নমস্কার।

হালদার : নমস্কার। (ভূপতিকে) ম্যানেজার? (বোঝা গেল হালদার হতাশ, যদিও সঞ্জীবের গোঁফটি ভালো লাগিয়াছে। ভূপতির বুদ্ধি খেলিয়া গেল।)

ভূপতি : মানে, আপনার বোঝবার সুবিধের জন্যে ম্যানেজার বললাম। আমরা বলি দেওয়ান সাহেব!

হালদার : (পুনরায় উৎসাহিত) তাই বলুন—দেওয়ান সাহেব! (সজোরে সঞ্জীবের সঙ্গে করমর্দন করিলেন)

হালদার : দেওয়ান সাহেব! অপূর্ব! অদ্ভুত! ক্যাপিট্যাল! তাক লেগে যাবে সকলের!

(মনোহর পানের থালা লইয়া প্রবেশ করিল। ফুলপাতা দিয়া থালাটি সাজাইয়াছে ভালো। হালদার পান লইবেন না ফুল লইবেন ঠিক করিতে পারিলেন না।)

ইয়ে—আপনি আগে মিস্টার রায়!

ভূপতি : সে কি হয়? আপনি অতিথি!

(অগত্যা হালদারকে বাছিতেই হইল। ভূপতির হাতে গোলাপ দেখিয়া তিনি গোলাপ তুলিলেন। ভূপতি চুরুট ও সিগারেট আগাইয়া দিল।)

সিগার? সিগারেট?

হালদার : থ্যাঙ্কস্। (সিগারেট লইলেন। মনোহর এতো ক্ষিপ্র হস্তে দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরলি যে চমকাইয়া গেলেন। মনোহরকে) থ্যাঙ্কস্।

ভূপতি : আপনি একা এলেন যে? সপরিবারে আসবার কথা ছিল—

হালদার : একা নই, একা নই, একা আসিনি। সবাই আছে। (গোলাপ শুঁকিলেন, যেমন করিয়া আমরা শুঁকিয়া থাকি।)

ভূপতি : সে কী? কোথায় আছেন?

হালদার : গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। আমি ভ্যানগার্ড—অ্যাডভান্স পার্টি। (এ কথাটাও বেশ বলিয়াছেন হালদার। প্রীত হইলেন বলিয়া আবার গোলাপ শুঁকিলেন)

ভূপতি : কী আশ্চর্য! মনোহর শিগ্‌গির বলো ওদের!

মনোহর : জী-সরকার!

(মনোহরের আচমকা সেলামে ভূপতি একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সামলাইতে গোলাপ

শুঁকিল, যেমন করিয়া রাজরাজড়ারা শোঁকেন। একটু বরং বাড়াবাড়িই হইয়া গেল। হালদার কিন্তু লক্ষ্য করিলেন। মনোহর দরজার নিকট গিয়া হাঁকিল।)

মনোহর : সাহু! (হাঁকিয়াই খেয়াল হইল—সব তো রান্নাঘরে।) আমি—আমি নিজেই যাচ্ছি হুজুর!

ভূপতি : কেন সা—? (বুঝিয়া) ও হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। তুমি নিজেই যাও। ওরা আবার কোন্ উজবুকি করে বসবে!

হালদার : উজবুকি? না না—অদ্ভুত! ওরা অদ্ভুত! বিশেষ করে এই দরজায় যেটি আছে! (দরজার দিকে গেলেন। মনোহর সাধ্যমতো পথ আটকাইল।)

মনোহর : হুজুর কেন কষ্ট করবেন? আমি বলে দিচ্ছি। (দরজা আটকাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া) সাহু! গাড়িতে মেহমান—জলদি দেখো!

(হালদার প্রীত হইয়া গোলাপ শুঁকিলেন। এবার যথাসম্ভব রাজকীয় ভঙ্গীতে।)

হালদার : খুব ইম্প্রেসড্ হবে ওরা। আই ডোন্ট্, ওয়ান্ট্ দেম টু মিস্ এনিথিং অফ ইট্।

মনোহর : (ভূপতিকে) হুজুরের যদি হুকুম হয়—আমি, আমি—সরবৎ নিয়ে আসি।

ভূপতি : (বুঝিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যাও।

(মনোহর ভূপতির উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই অন্দরে চলিয়া গিয়াছে।)

হালদার : (ব্যস্ত হইয়া) না না, ও চলে গেলে কী করে হবে? এ দিকে ক্লাইম্যাক্সটাই তো হবে না। (দরজার দিকে গেলেন। কিন্তু ভূপতি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে পথ আটকাইয়াছে। সঞ্জীব এতোক্ষণ ক্রমাগত ভূপতির আড়ালে থাকিবার চেষ্টা করিতে নাজেহাল হইতেছিল—তাহার গোঁফটি ভালো আটকায় নাই। এবারে আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া একেবারে পিছন ফিরিয়া গোঁফ চাপিয়া ধরিল।)

ভূপতি : এক্ষুনি ফিরে আসবে। সব হবে, আপনি ভাবেন না। মনোহর বাবার আমলের খাস খানসামা—ওর আদবকায়দায় কোনো খুঁত পাবেন না।

হালদার : সুপার্ব! সুপার্ব লোকটি। কী নাম বললেন?

ভূপতি : মনোহর।

হালদার : মনোহর! মার্ভেল! খাস খানসামা, অ্যাঁ? সুপার্ব! (গোলাপ শুঁকিলেন কায়দা করিয়া)

ভূপতি : আপনি বসবেন না?

হালদার : বসবো বসবো। আয়্যাম্ টু এক্সাইটেড! এইটা বোধহয় কোর্টরুম?

ভূপতি : হ্যাঁ, দরবার।

হালদার : দরবার দরবার—আয়্যাম সরি! দরবার—টু বি শিওর! আচ্ছা কতো পুরোনো হবে বলুন তো বাড়িটা?

ভূপতি : (আমতা আমতা করিয়া) তা, তা—একটু পুরোনো হয়েছে।

হালদার : একটু পুরোনো? আমার ধারণা বেশ পুরোনো। অন্তত—ধরুন দু'শো বছর! হবে না?

ভূপতি : (মানিতেই হইল) হ্যাঁ—তা হবে।

হালদার : আরো বেশি বোধ হয়, তাই না?

(ভূপতির আশা নিভিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাড়ির অন্যান্য মহলের চূড়ান্ত ভগ্নদশা ভাবিয়া মিথ্যা বলিতে সাহস হইতেছে না।)

ভূপতি : না, হ্যাঁ, তা একটু বেশিই হবে।

হালদার : এক্স্যাক্টলি! আমি বার বার করে বলেছি চৌধুরীকে—দু'শো বছরের একদিন কম হবে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না!

ভূপতি : চৌধুরী?

হালদার : চৌধুরী—মানে মন্দাকিনী সাবানের চৌধুরী। আমরা স্কুলে কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। মন্দাকিনী সাবানের নাম শুনেছেন?

ভূপতি : শুনেছি বই কি। আমি তো মন্দাকিনী, ব্যবহার করি?

হালদার : বলেন কী? সর্বনাশ! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, খালি মোড়কের বাহার—ভিতরে কিছু নেই! তা ছাড়া ওর প্রোসেসে গোলমাল আছে, ও সাবান মাখলে কী হতে কী হবে কিছু ঠিক নেই!

ভূপতি : বলেন কী?

হালদার : টেক ইট ফ্রম মি! চৌধুরী সাবান তৈরির জানে কী যে তৈরি করবে? কতোবার বলেছি ওকে—কাপড়কাচা সাবান ছাড়া কিছু বানিও না তুমি। শুনবে কথা?

ভূপতি : কিন্তু খুব চলে তো বাজারে?

হালদার : চলবেই। পাব্‌লিসিটি! সাবান মানেই পাবলিসিটি। ফিল্মস্টারের ছবি দিয়ে মাৎ করে দিচ্ছে। (কাছে আসিয়া) আমার কথা শুনুন। ট্রাই স্বপ্নছন্দা। নিজের সাবান বলে বলছি ভাববেন না। এর প্রোসেস একেবারে আপ-টু-ডেট। আমার রিসার্চ ল্যাবরেটরি দেখাবো আপনাকে।

ভূপতি : বিলক্ষণ! যখন জানলাম, তখন আর মন্দাকিনী বাড়িতে আনি?

হালদার : ঠকবেন না! ঠকবেন না! লীভার ব্রাদার্সকে হঠিয়ে দিতুম এতোদিনে। শুধু চৌধুরী শত্রুতা করে হতে দিলো না। সব জিনিসে আমার সঙ্গে রেষারেষি করবে। আমি যেটি বলবো, তার উল্টোটি বলবে। এই ধরুন বাড়িটা। আমি জানি এটা দু'শো বছরের কম পুরোনো নয়, তবু ও বলবে—না।

ভূপতি : পুরোনো হলেও—খুব বেশি ভাঙেনি। মানে—অতো পুরোনো বোঝা যায় না।

হালদার : বোঝা যায় না? বলেন কী আপনি? রাত হয়ে গেছে, তবু ফটকের সামনে আসবার আগে গাড়ি থামিয়ে টর্চ জ্বেলে দেখেছি। ওদিকটার ছাদ ধ্বসে গেছে বিলকুল! পাঁচিলে বিরাট বিরাট ফাঁক। ফাঁক দিয়েই খানিকটা ভেতরেও গেছিলাম, মাপ করবেন, আপনার অনুমতি না নিয়েই। টর্চের আলো পড়তেই এক ঝাঁক বাদুড় ঝপ ঝপ করে উড়ে বেড়াতে শুরু করে দিলো।

(ভূপতির অবস্থা কাহিল)

ভূপতি : হ্যাঁ, না, ওদিকটা একটু—

হালদার : একটু? রুইনস্‌! বিলকুল রুনিস্‌! দু'শো ভেবেছিলাম, এখন দেখে মনে হচ্ছে তিনশো। (কাছে আসিয়া) কাম অন নাও, কন্‌ফেস্‌! তিনশো বছর হবে না?

ভূপতি : তা, তা বোধ হয় হবে। তবে—

হালদার : (বিজয়গর্বে) দেয়ার ইউ আব! আর চৌধুরী বলে কি না—দেখো গিয়ে, ও অঞ্চলে একশো বছরের চেয়ে পুরোনো বাড়ি কোথায়? ইডিয়াট্‌ একটা। ইম্‌বেসিল! আমি জানি! আই নো!

ভূপতি : (শেষ চেষ্টা) তবে এদিকে অনেকটা ভালো আছে। যদি মেরামত করে নেন—
(হালদার স্তম্ভিত)

হালদার : মেরামত! এই বাড়ি মেরামত! কী বলছেন আপনি?
(ভূপতির আর কিছু বলিবার নাই। অতিথি না বসিলেও সে বসিয়া পড়িয়াছে। মনোহর প্রবেশ করিল সহসা।)

মনোহর : ওঁরা আসছেন হুজুর।
(বলিতেই ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। মনোহর একটু চমকাইল। এটা পবনকে বারণ করিয়া দেওয়া হয় নাই।)

হালদার : অ্যাঁ? ওহো—তাই ভাবছিলুম, এতো দেরি হচ্ছে কেন! তুমি কিন্তু —কী নাম তোমার? মনোহর! তুমি কিন্তু ঠিক সেই রকম সব কিছু বোলো। কিছু বাদ দিওনা।

মনোহর : কিন্তু হুজুর—রাজবাহাদুর যে এখানে বসে?

হালদার : অ্যাঁ? তা হোক তা হোক। তাতে কিছু এসে যায় না।

ভূপতি : (উঠিয়া) আমি না হয় ভেতরেই যাচ্ছি—
(কিন্তু সেই মুহূর্তেই সাহা পর্দা সরাইয়া ধরিল। তাহার মাথায় পাগড়ি আবার চড়িয়াছে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে টলমল অবস্থা। স্বপ্না এবং ছন্দা প্রবেশ করিলেন। ছন্দার চোখে প্রচুর বিস্ময় এবং প্রশংসা। সেও হালদারের মতো শিশুসুলভ আনন্দে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সাহাকে দেখিতে লাগিল। হালদারের আনন্দ ধরিতেছে না। মনোহরকে সোৎসাহে ইশারা জানাইতেছেন হাতের ভঙ্গীতে। অর্থাৎ—এবার তোমার খেলটা দেখাও। ভূপতি যতোটা পারে দরজার দিকে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঞ্জীব তাহারও পিছনে।)

মনোহর : বন্দেগী হুজুরাইন মেহ্‌মান রিয়াসৎ। গরিবখানায় তসরিফ রাখবার হুকুম হোক। আমি রাজাবাহাদুরকে এত্তেলা দিই।

হালদার : (আপন মনে) সুপার্ব! হুজুরাইন! সুপার্ব!
(মনোহর সরিয়া ভূপতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল)

মনোহর : রায়রায়ান রাজচক্রবর্তী শ্রীল শ্রীমান রাজা ভূপতি রায় ভুইঞা বাহাদু—র।
(মনোহরের কথা আরম্ভ হইতে ছন্দা ভিতরে আগাইয়া আসিয়াছে, সাহাও পলাইয়া বাঁচিয়াছে। ছন্দা মনোহরকে প্রায় ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন ছুঁইয়া দেখিবার ইচ্ছা—সত্য না কল্পনা। ভূপতি তাহার অভিবাদন দেখাইয়াছে।)

হালদার : আলাপ করিয়ে দিই রাজাবাহাদুর। আমার স্ত্রী স্বপ্না, আমার মেয়ে ছন্দা। 'স্বপ্নছন্দা' নামটা কোথা থেকে এলো বুঝতে পারছেন তো? আর উনি হলেন দেওয়ান সাহেব—ইয়ে—ইয়ে—

ভূপতি : সঞ্জীব বসু।

হালদার : সঞ্জীব বসু। দেওয়ান সাহেব—মাইন্ড ইউ! ম্যানেজার নয়! আর এ হচ্ছে মনোহর, রাজাবাহাদুরের—কী যেন?—খাস খানসামা! হ্যাঁ, খাস খানসামা! একেবারে মোগল আমল মনে হচ্ছে না? বলো?

ভূপতি : বসুন মিসেস হালদার। মিস হালদার—বসুন।

ছন্দা : (অল্প নিরাশ) মিস হালদার?

ভূপতি : যদি চান, ছন্দাদেবী বলতে পারি! তবে—সেরকম বলে কী?

হালদার : এক্স্যাক্টলি! আমার ধারণা ছিল দেবী টেবী বাংলা নভেলেই বলে, এমনিতে কেমন বোকা বোকা শোনায়। কিন্তু এই বাড়িতে—এই অ্যাটমোস্ফীয়ারে—পারফেক্ট, তাই না? ছন্দাদেবী! স্বপ্নাদেবী! পারফেক্ট! পারফেক্ট!

(মনোহর ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়ে পানের থালা আনিয়াছে। স্বপ্না সুপারি লইলেন। ছন্দা মনোহরকে সিধা প্রশ্ন করিল।)

ছন্দা : কোন্‌টা নিতে হয়? পান, না সুপুরি, না ফুল?

হালদার : (মেয়ের নির্বুদ্ধিতায় ক্ষুণ্ণ) কী আশ্চর্য!

ভূপতি : আপনার যেটা ইচ্ছে নিন। তিনটেই নিতে পারেন।

(ছন্দা বাছিয়া একটি গোলাপ লইল এবং খানিকটা সুপারি। হালদার অন্যের অলক্ষ্যে তাহাকে গোলাপ শুঁকিবার কায়দা দেখাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। মনোহরের অন্দরে প্রস্থান।)

মিস্টার হালদার, আপনারা কি বাড়িটা প্রথমে ঘুরে দেখবেন—না আগে—

হালদার : বাড়ি? বাড়ি কী দেখবো? বাড়ি দেখা আমার হয়ে গেছে!

ভূপতি : (প্রায় আর্তস্বরে) হয়ে গেছে?

হালদার : আলবাৎ! (স্বপ্নাকে) কী? বলেছিলাম কি না? বলো? বলেছিলাম কি না?

স্বপ্না : কী বলেছিলে?

হালদার : কী বলেছিলাম? আশ্চর্য! দশবার বলেছি! কমপক্ষে দশবার বলেছি—এ বাড়ি দু'শো বছরের কম পুরোনো হতে পারে না। বলিনি?

স্বপ্না : তা বলেছো। দশবারের বেশিই বলেছো।

হালদার : তবে? আর চৌধুরী কী বলেছে? বলো, বলো এঁদের।

স্বপ্না : কী বলেছে?

হালদার : বা বা বা, কী বলেছে? চৌধুরী বারবার বলে যাচ্ছে—এ অঞ্চলে একশো বছরের উপর পুরোনো বাড়ি নেই। বলেনি?

স্বপ্না : তা বলেছে।

হালদর : তবে? নিজের চোখে তো দেখলে? ছাত ভেঙে গেছে! অশ্বত্থ গাছ! রুইন্‌স্‌। বাদুড়! চামচিকে! দেখলে না?

স্বপ্না : তা দেখলাম।

হালদার : রাজবাহাদুর নিজের মুখে বলছেন তিনশো বছরের কম হবে না। তাই না রাজাবাহাদুর?

ভূপতি : (দুর্বলভাবে) তিনশো হলেও এ পাশটা ভালোই আছে—

হালদার : থাক ভালো। ওদিকটা তো একেবারে ধ্বসেছে? রুনইস্‌? বলুন, তাই না?

ভূপতি : (স্বপ্নার কাছে এক শেষ আবেদন) আমি মিস্টার হালদারকে বলছিলাম—এদিকে পুরো একটা মহল ভালো আছে, মেরামত করে নিলে দিব্যি—

হালদার : মেবামত? রাজমিস্ত্রীকে হাত দিতে দেবো ভেবেছেন এ বাড়িতে?

ভূপতি : অ্যাঁ?

স্বপ্না : তোমার আবার বাড়াবাড়ি! এদিকে একটু সারিয়ে না নিলে একরাত্তির বাস

করাও যে যাবে না!

হালদার : (বহু কষ্টে) আচ্ছা, এদিকটা বরং—কিন্তু ওদিকে একদম নয়। যে মহলটা দেখলাম টর্চ জ্বেলে। ঐ রুইনস্, ঐ বাদুড়—সব ইনট্যাক্ট থাকবে।

স্বপ্না : তা থাক।

হালদার : আর এদিকেও—খুব পাকা রাজমিস্ত্রী লাগাতে হবে। প্রতিটি ফাটল ঠিক মতো রেখে ভেতরে ভেতরে মেরামত করতে হবে। মেরামতের একটি চিহ্ন যেন ধরা না পড়ে। কী বলিস ছন্দা?

(ভূপতি হতবাক হইয়া শুনিতেছিল। বুঝিয়াও যেন বুঝিতে কষ্ট হইতেছে। সঞ্জীব গোঁফ ভুলিয়া তাকাইয়া আছে।)

ভূপতি : আপনি—আপনারা কি পুরোনো বাড়িই চাইছেন?

হালদার : আলবাৎ! তা না হলে এতো দূর ছুটে এসেছি?

ভূপতি : যতো পুরোনো হয়, ততো ভালো?

হালদার : নিশ্চয়ই! খুঁজেছি কম? পাওয়াই যায় না! সবাই বলে দু'শো, তিনশো, গিয়ে দেখি বাজে মেকি মাল—একশো হয় কি না সন্দেহ!

ভূপতি : কিন্তু—কিন্তু কেন?

হালদার : কেন? ঠকাবার ইচ্ছে, আবার কেন? বাঙালির কী স্বভাব জানেন না?

ভূপতি : না না, তা নয়। বলছিলাম—পুরোনো বাড়ি খুঁজছেন কেন?

হালদার : তবে কী খুঁজবো? নতুন বাড়ি? নতুন বাড়ি নেই কার? টিনের চালা বেঁধে যে গোলাসাবান বানাচ্ছে তারও তো নতুন বাড়ি আছে!

স্বপ্না : আমি বলছি শুনুন। চৌধুরী সাহেব বীরভূম জেলায় একটা তিনশো বছরের পুরোনো রাজবাড়ি কিনেছেন—

হালদার : তিনশো! ঐ বাড়ি যদি তিনশো বছরের হয়, তবে আমাদের সাদার্ন অ্যাভিন্যুর বাড়িও একশো!

স্বপ্না : বাঃ, পাথরের খোদাই দেখালো দু'শো সাতষট্টি বছবের—

হালদার : তো সেইটা বলো—দু'শো সাতষট্টি। দু'শো সাতষট্টি অবধি মানতে পারি। তিনশো! বলে দিলেই হোলো তিনশো!

(ভূপতির আর বুঝিতে কিছু বাকি নাই। তাহার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠস্বর গমগম করিতেছে! এতোক্ষণে যেন সত্যই খানিকটা রাজ-সুলভ ভাব আসিয়াছে।)

ভূপতি : মিস্টার হালদার! এ বাড়ি কবে তৈরি হয়েছে শুনবেন? পনেরো শো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে।

হালদার : পনেরোশো একষট্টি!! (তাঁহার কণ্ঠস্বর চাপা—বিস্ময়, আশা এবং অবিশ্বাসে ভারি।)

ভূপতি : পনেরোশো একষট্টি। দিল্লীর সম্রাট তখন কে মনে আছে? (হালদার ছন্দার দিকে চাহিলেন)

ছন্দা : আকবর।

ভূপতি : আকবর। বাংলাদেশে তখন কারা?

ছন্দা : বারো ভুইঞা।

ভূপতি : বারো ভুইঞা প্রসিদ্ধ, তাদের কথা বেশি করে আছে ইতিহাসে। কিন্তু আরো

ভুইএগ্রা ছিল। ছোট ছোট অনেক ভুইএগ্রা। তাদের একজন হোলো বল্লভপুরের রাজা রায় রায়ান রমাপতি ভুইএগ্রা।

হালদার . এই বল্লভপুর?

ভূপতি : এই বল্লভপুর। আর যে নদীটা পার হয়ে এলেন, তার ওপারে প্রতাপগড়। প্রতাপগড়ের রাজবাড়ি মোগল সেনাপতি মানসিংহ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নদী পার হয়ে বল্লভপুরে তিনি এলেন না। তাই বল্লভপুরের রাজবাড়ি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত খানিকটা দাঁড়িয়ে আছে।

হালদার : কিন্তু এ বাড়ি যে রমাপতি বাবুর তৈরি—

ভূপতি : এ বাড়ি রমাপতি ভুইএগ্রার তৈরি নয়। তৈরি করেছিলেন তাঁর বাবা।

হালদার : কিন্তু, আপনি—

ভূপতি : প্রমাণ দিতে পারি কি না?

হালদার : না, হ্যাঁ, মানে—চৌধুরী তো সহজে—

ছন্দা : আঃ বাবা, কী হচ্ছে!

ভূপতি : আপনার বাবা ঠিক কথা বলেছেন। প্রমাণ দিতে না পারলে কি শুধু গল্প শুনিয়ে বাড়ি বেচতে চাইছি ভেবেছেন?

হালদার : (অস্বস্তি বোধ করিয়া) না না, মানে, ইয়ে—

ভূপতি : (কর্ণপাত না করিয়া) যেখানে বাদুড় দেখলেন, ঐ ছিল পুরোনো নাটমন্দির। আসুন আমার সঙ্গে—প্রমাণ দেখাচ্ছি। টর্চটা আছে তো সঙ্গে? (দরজার দিকে গেল)

স্বপ্না : এই রাত্তিরে আবার ঐখানে যাবে?

হালদার : কেন টর্চ রয়েছে তো?

স্বপ্না : সাপখোপ থাকে যদি?

হালদার : সাপখোপ আছে না কি?

ভূপতি : সাপ? তা, তা—

স্বপ্না : না, ওখানে এখন রাত্রিবেলা যেতে হবে না।

ভূপতি : সাবধানে যাই যদি?

স্বপ্না : ঐ একখানা টর্চে আর কতো সাবধান হওয়া যাবে?

ভূপতি : আমি বাতি আনাচ্ছি! মনোহর!

স্বপ্না : না, ও সাপের ব্যাপারে বিশ্বাস নেই।

হালদার : এইখানে কাছে পিঠে প্রমাণ নেই কিছু?

ভূপতি : আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তো আপনি আমি ধরতে পারবো না। পণ্ডিতরা হয়তো পারবে। আজকেই প্রমাণ পেতে হলে ঐ নাটমন্দিরে ধাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

স্বপ্না . তা আজকে রাত্তিরেই প্রমাণের দরকারটা কি?

হালদার : ইয়েস, এক কাজ করা যেতে পারে। আমরা যদি রাতটা এখানে কাটাই, আপনার কি অসুবিধে হবে মিস্টার রায়? (ভূপতি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল)

ভূপতি : এখানে—রাত কাটাবেন? (বাঁচাইলেন স্বপ্না)

স্বপ্না : এখানে রাত কাটাবে? আর মালদায় বড়দারা রাত জেগে হাঁ করে বসে থাকবে

আমাদের পথ চেয়ে? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?

হালদার : আহা, না হয় কাল সকালেই মালদা গেলাম।

স্বপ্না : তা না? বড়দা একে নার্ভাস লোক, তার উপর হার্টের রোগ। সারা রাত্তির বসে ভাববে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এমনিতেই রাত্রে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথায় পৈ পৈ করে বারণ করেছিলো।

(মনোহর আসিয়া অন্দরের দরজায় দাঁড়াইয়াছে।)

হালদার : তা হলে?

স্বপ্না : তা হলে আবার কী? দু'দিন পরে দিনেমানে এসো। আজ রাতেই কিনে ফেলতে হবে না কি বাড়িটা? (হালদার ভূপতির দিকে চাহিলেন, কিন্তু ভূপতি প্রায় মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।)

হালদার : তবে তাই করা যাক, কী বলেন?

ভূপতি : (ধীরে ধীরে) আজ অবধি বাড়িটা আপনার জন্যে রেখেছিলাম মিস্টার হালদার। এর পরের কথা আমি বলতে পারি না।

হালদার : কেন কেন? আর কেউ আছে না কি?

ভূপতি : মাপ করবেন মিস্টার হালদার। ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার উচিত হবে না।

হালদার : (প্রায় আর্তচিৎকারে) নিশ্চয়ই চৌধুরীর লোক! (ভূপতি কথা কহিল না) (দৃঢ়কণ্ঠে) মনোহরকে বাতি আনতে বলুন।

ভূপতি : (মনোহরকে) একটা বাতি নিয়ে নাটমন্দিরে চলে যা, আমরা যাচ্ছি।

স্বপ্না : তুমি যাবে?

হালদার : চারশো বছর, স্বপ্না! পনেরোশো একষট্টি! চৌধুরী চোখের উপর দিয়ে নিয়ে যাবে?

স্বপ্না : কিন্তু তাই বলে—

হালদার : কিচ্ছু হবে না। দেখো! হাতে তালি বাজাতে বাজতে চলো যাবো। এই এমনি করে—সাপ থাকলেও পালিয়ে যাবে।

(ভূপতি বাহির হইল। পিছন পিছন হালদার—তালি দিয়া সাপ তাড়াইতে তাড়াইতে।)

স্বপ্না : দেখলি কাণ্ডটা তোর বাবার?

ছন্দা : কেন ভাবছো? কিচ্ছু হবে না।

স্বপ্না : না ভাববে না। কেন, ড্রাইভারকে আনতে কী হয়েছিলো? তাহলে বড়দা অতো চিন্তা করতো না, রয়ে যেতে পারতাম রাতটা! (সঞ্জীব অলক্ষ্যে ভূপতিদের পশ্চাদনুসরণের চেষ্টায় ছিল)

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

সঞ্জীব : কেন ভূপ্—ঐ ইয়ে—রাজবাহাদুরের সঙ্গে—

স্বপ্না : আর আমরা এখানে একা পড়ে থাকবো?

সঞ্জীব : একা? না, একা—মানে, তাতে কী হয়েছে?

স্বপ্না : না, আপনি থাকুন। এ বাড়িতে গোড়া থেকেই কেমন যেন গা ছম ছম করছে আমার। (অগত্যা সঞ্জীবকে ফিরিতে হইল। ভূপতির আড়াল নাই, কতোক্ষণ গোঁফ লুকানো যায়?)

ছন্দা : আপনি রাজাবাহাদুরের এস্টেটে অনেকদিন আছেন?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, তা অনেকদিন। অনেকদিন হয়ে গেলো।

ছন্দা : বিরাট এস্টেট বুঝি?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, বিরাট। মানে বেশ বড়ো।

ছন্দা : আচ্ছা, এ বাড়িটা রাজাবাহাদুর মেরামত করেন নি কেন?

সঞ্জীব : মেরামত? মানে—মেরামত—করেন নি—ইয়ে—একটা খেয়াল বলতে পারেন। এই—আপনার বাবার মতো। পুরোনো জিনিসের উপর ঝোঁক।

ছন্দা : এ বাড়িটার উপর তাহলে নিশ্চয়ই ওঁর খুব মায়া, তাই না?

সঞ্জীব : মায়া? হ্যাঁ, বটেই তো। মায়া তো হবেই। এতোদিনের বাড়ি। তার উপর পিতৃপুরুষের।

ছন্দা : তবে বেচে দিচ্ছেন কেন?

সঞ্জীব : বেচে? (সঞ্জীব বিপন্নভাবে এদিক ওদিকে চাহিল। সাহায্য করিবার কেহ নাই) ইয়ে—বেচে? তাই তো, বেচে দিচ্ছেন—বোধ হয় টাকার দরকার।

ছন্দা : এতো বড় এস্টেট, কী এমন টাকার দরকার যে এতোদিনের বাড়ি বেচবেন?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, তাই তো! এতো বড়ো এস্টেট, কী এমন টাকার দরকার?

স্বপ্না : (চাপাস্বরে) ছন্দা। (চোখ টিপিলেন। সঞ্জীব দেখিল। কিন্তু নিজের বিপন্ন অবস্থায় কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না।)

ছন্দা : (সামলাইয়া) বোধ হয় একা থাকতে ভালো লাগে না এখানে, তাই না?

সঞ্জীব : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এতো বড়ো বাড়িতে একা থাকতে ভালো লাগে কারো?

ছন্দা : উনি তো একাই থাকেন, না?

সঞ্জীব : একা—হ্যাঁ, ঐ চাকরবাকররা আছে।

ছন্দা : বিয়ে করেন নি?

সঞ্জীব : নাঃ।

ছন্দা : আর কেউ নেই? আত্মীয়-স্বজন?

সঞ্জীব : আত্মীয়স্বজন? না-ন্ নাঃ।

ছন্দা : কেউ নেই?

সঞ্জীব : না, কই কেউই তো—(মনে পড়ায়) হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। রঘুদা আছেন।

ছন্দা : রঘুদা?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, ঐ—রঘুদা।

ছন্দা : ওঁর দাদা?

সঞ্জীব : অ্যাঁ? না, দাদা তো নয়? দাদা নয়— (কেন যে বলিতে গেল রঘুদার কথা!) তবে দাদারই মতো একরকম।

স্বপ্না : আচ্ছা কেন ওসব প্রশ্ন করছিস! নিশ্চয়ই বলতে কোনো বাধা আছে।

ছন্দা : বলতে বাধা আছে দেওয়ান সাহেব? (সঞ্জীব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল দেওয়ান সাহেব কাহাকে বলিতেছে। তারপর খেয়াল হইল তাহাকেই।)

সঞ্জীব : দেওয়ান?—হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়ান—না না, মানে, বাধা নয় তবু, একটু—বাধাই বলতে পারেন। অর্থাৎ—আমি, আমি ঠিক জানি না আর কি?

ছন্দা : জানেন না?
সঞ্জীব : মানে—বাইরে বাইরে ঘুরি তো—এস্টেট দেখি। বাড়ির খবর খুব একটা—
ছন্দা : আপনি এ বাড়িতে থাকেন না?
সঞ্জীব : না আমি, আমার বাড়ি অন্য, মানে—আলাদা।
ছন্দা : কোথায় বাড়ি আপনার?
সঞ্জীব : কোথায়? আমার বাড়ি? ঐ দিকে— (একটি অনির্দিষ্ট অঙ্গুলিসংকেত করিল)
ছন্দা : কাছেই?
সঞ্জীব : হ্যাঁ, কাছেই বলতে পারেন,—কাছেই—
ছন্দা : কিন্তু এ বাড়ির ত্রিসীমানায় তো কোনো বাড়ি দেখলাম না?
সঞ্জীব : না, কাছে মানে—খুব কাছে না। ঐ—স্টেশন! স্টেশনের কাছে।
স্বপ্না: আচ্ছা, কী যে করছে ওরা! এতোক্ষণ লাগে কিসে?
সঞ্জীব : (তাড়াতাড়ি) আমি—আমি দেখি গে—
ছন্দা : না না, আপনি যাবেন না!
সঞ্জীব : এই—যাবো আর আসবো—যাবো আর আসবো—

(দ্রুত পলায়ন করিল)

ছন্দা : এ বাড়িটায় রাত্রে সত্যি কেমন যেন ভয় ভয় করে।
স্বপ্না : আচ্ছা, তুই বাড়ির কথা ও রকম করে বলছিলি কেন? তারপর যদি সত্যিই না বেচে—তোর বাবার কথা ভেবে দেখেছিস?
ছন্দা : কথা বলতে বড়ো ইচ্ছে করলো যে? অমন গোঁফ দেখেছো কোনোদিন কলকাতায়? আমার প্রায় টেনে দেখতে ইচ্ছে করছিল—আসল না নকল?
স্বপ্না : না না, পাগলামি করিসনি!
ছন্দা : সত্যি সত্যি করছি না কি?
স্বপ্না : ঐ ওরা আসছে বোধ হয়। দেখ তো?

(ছন্দা দেখিবার পূর্বেই হালদার ও ভূপতির প্রবেশ। হালদার অভিভূত।)

হালদার ন'শো সাতষট্টি শকাব্দ! ছন্দা হিসেব করে দেখ, এখন তেরোশো একাশি। (স্বপ্নাকে) চারশো বছর! ইনডিস্‌পিউটেব্‌ল। চৌধুরীর ট্যাঁ ফোঁ করবার রাস্তা নেই! কতো হোলো ছন্দা?
ছন্দা : পনেরোশো বিরানব্বুই খ্রিস্টাব্দ।
ভূপতি উঁহু। ভুল হয়েছে। এই নিন কাগজ—লিখে করুন। (ছন্দা অঙ্ক কষিতে বসিল)
হালদার চারশো বছর। থিঙ্ক অফ দ্যাট! (ভূপতির দিকে ফিরিয়া) কাজের কথায় আসা যাক মিস্টার রায়। মানে, বাড়িটা আমার একরকম পছন্দ হয়েছে। তবে এদিকটায় একটু যেন বেশি মেরামতের ছাপ, নতুন নতুন লাগে। তা আপনি কী দর ঠিক করেছেন, একটু যদি আইডিয়া দেন কাইন্ডলি!
ভূপতি (সহসা ঠিক করিতে পারিল না) আমি—মানে—
ছন্দা: পনেরোশো একষট্টি।
ভূপতি অ্যাঁ? পনেরোশো একষট্টি টাকা?
ছন্দা : পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ। আপনিই ঠিক বলেছিলেন।

হালদার : দেয়ার ইউ আর স্বপ্না। ন'শো সাতষট্টি শকাব্দ হোলো পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ! কী বলবে চৌধুরী, বলো? (সামলাইয়া) হ্যাঁ, যা কথা হচ্ছিলো মিস্টার রায়।

ভূপতি : (ভয়ে ভয়ে) আমি অতোটা ভেবে দেখিনি, তবে ঐ যে আর একজন কথা বলতে এসেছিলেন তিনি—

হালদার : (লাফাইয়া উঠিয়া) দর দিয়েছে না কি? কতো—কতো বলছে? তাকে কোনো কথা দেননি তো?

ভূপতি : না, কথা ঠিক দিইনি, আপনি আসবেন বলে—পরে আসবে বলেছে।

হালদার : কতো কতো? কতো বলছে সে?

ভূপতি : (সাবধানে) দশ হাজার—

হালদার : দশ হাজার! জাস্ট্ লিস্ন্ টু দ্যাট স্বপ্না! লিস্ন্ টু দ্যাট! দশ হাজার!

(ভূপতি ঘাবড়াইয়া গেল)

ভূপতি : সাত বিঘে বাগান আছে—বাগান মানে, জমি তো বটে—

হালদার : লিস্ন্ টু দ্যাট স্বপ্না! আবার সাত বিঘে বাগানও আছে! দশ হাজার! চীট! চীট একটা! সুইন্ডলার। দেখুন মিস্টার রায়, চিনে রাখুন চিনে রাখুন চৌধুরীকে! তবু আপনি ওর মন্দাকিনী মাখবেন। (ভূপতির মুখে কথা সরিল না। হালদার চেকবই খুলিয়া দ্রুত লিখিতে লাগিলেন। মুখে বিড়বিড় করিয়া চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।) চীট একটা। সুইন্ডলার! পনেরেশো একষট্টি, সাত বিঘে বাগান, বাদুড়, চামচিকে—বলে কি না দশ হাজার!—এই আমার দশ হাজারের চেক মিস্টার রায়, বায়নার টাকা—ফিফটি পারসেন্ট। বাকি দশ হাজার দলিল রেজিস্ট্রির সময়ে।

ভূপতি : (অস্ফুট কণ্ঠে) বাকি দশ হাজার?

হালদার : ও. কে., ও.কে.! এটাকে ফর্টি পারসেন্ট ধরুন। বাকি পনেরো হাজার! (ভূপতির বাকরোধ অনুনয়ের সুরে) জানি মিস্টার রায়, এ বাড়ি আপনার কাছে কতোখানি। কিন্তু আমি তো হাজার হোক—সংসারী লোক! আমার আর কতোটুকু ক্ষমতা? কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে—যেমনটি আছে তেমনই রাখবো। মেরামত যা হবে—কারুর ধরবার জো থাকবে না। আপনি যখন ইচ্ছে আসবেন। যতোদিন ইচ্ছে থাকবেন। অ্যাজ মাই মোস্ট অনারড্ অ্যান্ড রেস্পেক্টেড গেস্ট। ভেবে দেখুন মিঃ রায়—চৌধুরীর কাছে কখনো এরকম পাবেন না।

ভূপতি : না না, চৌধুরীর কথা ভাবছি না আমি!

হালদার : কারো কাছে পাবেন না! ভেঙে মাঠ করে দেবে মশাই। ফ্যাক্টরি বানাবে। ফিল্ম স্টুডিও খুলবে। বাদুড় চামচিকে সব কোথায় তাড়িয়ে দেবে তার ঠিকানা থাকবে না! প্লীজ মিস্টার রায়! রাজাবাহাদুর: অ্যাক্সেপ্ট ইট! (চেকটি হাতে গুঁজিয়া দিলেন) ও. কে.?

ভূপতি : (দুর্বলভাবে) ও. কে.।

হালদার : দেয়ার ইউ আর! (সজোরে হাত মিলাইলেন) স্বপ্না! ছন্দা! পনেরোশো একষট্টি!

ভূপতি : কিন্তু বায়নার লেখাপড়া?

হালদার : লেখাপড়া? টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট। ফর্টি পারসেন্ট বলেছি, ফর্টি পারসেন্ট! আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বাকি পনেরো হাজারও লিখে দিচ্ছি চেক। (লিখিতে বসিলেন)

ভূপতি : (ব্যস্ত হইয়া) না না, আমি সে কথা বলিনি! মানে আপনার দিক থেকে —দশ হাজার টাকার বেয়ারার চেক কেটে দিলেন, তার লেখাপড়া— (হালদার ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিলেন)

হালদার : আপনি হাতে হাত মিলিয়ে কথা দিলেন, তারপর লেখাপড়া চাইবো—আমি? সাবান তৈরি করি বলে কি মানুষ চিনি না? (ভূপতি থামিয়া গেল) না, আমি বাকি টাকারও চেক কেটে দিচ্চি। বেয়ারার চেক।

ভূপতি : না না—

হালদার : আচ্ছা, ক্রস করেই দিচ্ছি।

ভূপতি : না না ক্রস্ নয়। চেক নয়। চেক কাটবেন না আর!

হালদার : অ্যাজ ইউ উইশ। পরেই হবে।

ভূপতি : না না, পরেও নয়। এই দশ হাজারই ফুল পেমেন্ট। আর আমি চাই না।

(সকলে নিশ্চল এক মুহূর্তের জন্য)

ভূপতি : (থতমত খাইয়া) আমি—আমার আর দরকার নেই। এ বাড়ি—এ বাড়িটা — বিশেষ ভালো না। দশ হাজারই যথেষ্ট!

হালদার : কী বলছেন মিস্টার রায়? পনেরোশো—

ভূপতি : আমি—এ বাড়ি—প্লীজ মিস্টার হালদার। আমি—বিশ্বাস করুন, আমায় টাকার বড়ো দরকার—কিন্তু দশহাজার! ওর বেশি হয় না। ওর বেশি নিতে পারবো না আমি। আপনি পরে অভিশাপ দেবেন আমাকে।

হালদার : অভিশাপ দেবো?

(মনোহরের প্রবেশ)

মনোহর : খানা তৈয়ার! যদি হুকুম হয়—

ভূপতি : (সাগ্রহে) হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! অনেক রাত হয়ে গেছে, বহুদূর যেতে হবে ওঁদের, তাড়াতাড়ি করো।

(মনোহরের প্রস্থান)

হালদার : কিন্তু মিস্টার রায়—

ভূপতি : চুকে গেছে ও কথা মিস্টার হালদার। আমি টাকা পেয়ে গেছি, বাড়ি আপনার। এখন আসুন দয়া করে, সামান্য কিছু মুখে দিন।

স্বপ্না : আপনি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন না কি?

ভূপতি : আয়োজন করবো সে সাধ্য কোথায়? সামান্য ব্যবস্থা, আসুন— (হঠাৎ মনে পড়ায়) না, আচ্ছা, এক মিনিট—আমি একবার দেখে আসি সব তৈরি কি না। নতুন লোক সব—

(দ্রুত প্রস্থান)

হালদার : কিছু বুঝলে?

ছন্দা : এরা অন্য যুগের মানুষ বাবা।

হালদার : তাই বলে দশ হাজার? পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ—চৌধুরী এক লাখ দেবে। সাত বিঘে জমি, এই বাড়ি—এ তো নতুনের দামই দশ হাজারের অনেক বেশি।

ছন্দা : টাকা এদের কাছে কিছু নয়।

হালদার : কিছু নয় তবে বেচতে চাইছে কেন?

স্বপ্না : হয় তো দশ হাজারই বিশেষ দরকার।

হালদার : তাই বলে পঁচিশ দিলে নেবে না? বলি পঁচিশ হাজারটা কি দশ হাজারের কম?

ছন্দা : এদের হিসেব বোধ হয় আলাদা।

হালদার : তাই হবে। এ এক অন্য জগৎ। কিন্তু আমার বড়ো খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ঠকিয়ে নিলাম।

ছন্দা : তুমি তাহলে বলো—হয় পঁচিশ হাজার নিন, নয় আপনার বাড়ি আপনি রাখুন।

হালদার : (শশব্যস্তে) না না না—ক্ষেপেছিস নাকি? তারপর যদি চেক ফিরিয়ে দিয়ে বলে বসে—থাক বাড়ি। না না, সে হয় না। আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। রাজামহারাজার মেজাজ, ও আমরা বুঝবো না। ও আমরা বুঝবো না।

(ভূপতির প্রবেশ)

ভূপতি : কী বুঝবেন না মিস্টার হালদার?

হালদার : অ্যাঁ? ঐ ইয়ে—বলছিলাম—অবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কেন করতে গেলেন বুঝতে পারছি না।

ভূপতি : এই রাত্রে অতোদূর যাবেন, কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি? আসুন, সব তৈরি।

(সকলে অন্দরের দরজা দিয়া বাহির হইল। এক মুহূর্তে পরে বাহির হইতে সন্তর্পণে সঞ্জীব প্রবেশ করিল। ঘরে কেহ নাই দেখিয়া গোঁফ খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে একটি সিগারেট লইয়া ধরাইল। আরাম ও ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ প্রথম নিশ্বাসটি ছাড়িতে না ছাড়িতে ছন্দার প্রবেশ।)

ছন্দা : দেওয়ান সাহেব, আপনি খাবেন না?

(বিষম খাইয়া পিছন ফিরিয়া মুখ আড়াল দিয়া সঞ্জীব গোঁফ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু গোঁফ পিছনে। ছন্দার দিকে।)

সঞ্জীব : হ্যাঁ, না, আমার শরীরটা ভালো নেই।

(ছন্দা তাহার ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিতেছিল।)

ছন্দা : কেন, কী হয়েছে?

সঞ্জীব : না, বিশেষ কিছু না—একটু কাশি—

ছন্দা : কাশি হয়েছে বলে খাবেন না?

সঞ্জীব : হ্যাঁ খাবো, খাবো। একটু পরে খাবো। আপনারা বসে যান, আমি যাচ্ছি।

(ছন্দা পাউডার লাগাইতেছে, সঞ্জীব পায়ে পায়ে পিছু হটিয়া গোঁফটিকে হাতের নাগালে আনিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ছন্দা ওদিকের বড়ো আয়নাটায় ভালো করিয়া চেহারা দেখিতে গেল। সঞ্জীব সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে ঘুরিয়া নাকে গোঁফ চাপিয়া ধরিল।)

ছন্দা : (আয়না দেখিতে দেখিতে) আপনি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

সঞ্জীব : বলুন না, বলুন না।

ছন্দা : আপনার গোঁফটা আমরা বড়ো ভালো লেগেছে।

সঞ্জীব : (ঘাবড়াইয়া) গোঁফ? আমার—আমার গোঁফ!

ছন্দা : হ্যাঁ, আপনার গোঁফের কথাই তো বলছি। কলকাতায় অমন গোঁফ আমি কক্ষনো দেখিনি। এখানকার সবকিছুই কলকাতার উল্টো। আমার ভীষণ ভালো লাগছে!

(সঞ্জীব বোকা বোকা হাসিতে লাগিল। ভূপতির প্রবেশ।)

ভূপতি : কই মিস্ হালদার আসুন? সবাই বসে আছেন। দেওয়ান সাহেব আসুন।

ছন্দা : উনি পরে খাবেন বলছেন, শরীর খারাপ। (সঞ্জীব গোঁফ দেখাইয়া ভূপতিকে ইশারা করিল)

ভূপতি : শরীর খারাপ? তবে থাক, পরেই খাবেন এখন। আপনি আসুন—মিস হালদার।

ছন্দা : মিস হালদার?

ভূপতি : ভুল হয়ে গেছে, ছন্দা দেবী। আসুন, সবাই বসে আছেন।

ছন্দা : আপনি এমন তাড়া লাগাচ্ছেন, যেন আমরা বেরুলে বাঁচেন।

ভূপতি : (ঘাবড়াইয়া) অ্যাঁ? না না, বাঁচবো কেন? কী আশ্চর্য। আপনারা চলে যাবেন, আর আমি বাঁচবো? অনেকদূর যাবেন—তাই—

ছন্দা : তাই আপনিই ব্যস্ত হয়ে খেতে বসিয়ে দিচ্ছেন। কই, বাড়ির কারো সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না?

ভূপতি : বাড়িতে আছে কে যে আলাপ করাবো? থাকি তো আমি মনোহর আর চাকর-বাকর। আর দেওয়ান সাহেব।

ছন্দা : দেওয়ান সাহেব? ওঁর বাড়ি তো স্টেশনের কাছে। (ভূপতি সঞ্জীবের দিকে চাহিল। সঞ্জীব ইশারা করিল।)

ভূপতি : হ্যাঁ, তবে কাজকর্মে প্রায়ই এখানে রয়ে যেতে হয় তো, তাই ওঁকেও ধরলাম! ব্যস্ এই তো. আর আলাপ করবেন কার সঙ্গে?

ছন্দা : কেন, আপনার রঘুদা?

(ঘরে যেন বজ্রপাত হইল। ভূপতির মুখ বিবর্ণ। ছন্দা ভয় পাইয়া গিয়াছে। সঞ্জীবও গোঁফ ভুলিয়া অবাক হইয়া ভূপতির দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি জিভ দিয়া ঠোঁটটা ভিজাইয়া লইল। তাহার গলা কাঁপিতেছে।)

ভূপতি : রঘুদা?

ছন্দা : (ভয়ে ভয়ে) অন্যায় কিছু বলে ফেলেছি, না?

ভূপতি : রঘুদার কথা আপনাকে কে বললো? (ছন্দা সঞ্জীবের দিকে চাহিল। সঞ্জীব ভূপতির দৃষ্টিতে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। কেন যে মরিতে রঘুদার নাম করিয়াছিল? তারপর ভূপতি সামলাইল। তাহার গলা অল্প কাঁপিতেছে, কিন্তু কথাগুলির উচ্চারণ পরিষ্কার।)

ভূপতি : দেওয়ান সাহেব অনেকদিন মহালে মহালে ঘুরে আজ বিকেলে ফিরেছেন। উনি এখনো জানেন না যে রঘুদা মারা গেছেন। (কে কী বলিবে ইহার পর? ভূপতিই কথা কহিল।) আসুন ছন্দাদেবী।

(ভূপতি অন্দরের দরজার পর্দা তুলিয়া ধরিল। মাথা নিচু করিয়া ছন্দা দরজা পার হইয়া গেল। ভূপতিও গেল। বিহ্বল ও অনুতপ্ত সঞ্জীব আর একটি সিগারেট লইয়া ধরাইল। হাতে গোঁফ। ঝড়ের মত ভূপতি প্রবেশ করিল। সঞ্জীব ঘাবড়াইয়া গোঁফ পরিয়া ফেলিল।)

ভূপতি : রঘুদার নাম কে করতে বলেছে তোকে—গাধা কোথাকার!
(সঞ্জীব ভূপতির এ মূর্তি আশা করে নাই। ভূপতি কি তবে অভিনয়ের চূড়ান্ত খেলা দেখাইয়া গেল?)

সঞ্জীব : মানে—আমি তো জানি না—

ভূপতি : জানিস না তো কথা বলতে যাস কেন? বিলকুল চেপে যা। রঘুদার কথা যেন একদম না ওঠে আর, ভরাডুবি হয়ে যাবে!

সঞ্জীব : কী ব্যাপার আমি—রঘুদা কি তাহলে—

ভূপতি : চুপ! ও নাম একদম নয়, বলেছি না? এই দেখ চেক! দশ হাজার! আমাদের চেম্বার! সব ডুবে যাবে রঘুদার কথা যদি জানতে পারে!

সঞ্জীব : কিন্তু আমি তো কিছুই—

ভূপতি : বলবো বলবো—এখন ভালোয় ভালোয় ঠিক সময়ে এদের বাড়ি থেকে বের করতে পারলে বাঁচি। আমি গেলাম। ওরা বসে আছে—
(ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। সঞ্জীব গোঁফ খুলিতে গিয়াছিল, চমকাইয়া আবার পরিয়া ফেলিল।)
তুই বরং এক কাজ কর। ঐ ঘরে ঢুকে পড়, আর বেরুসনি একদম। শরীর খারাপ তো বলাই আছে, আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না।

সঞ্জীব : বাঁচালি বাবা!

ভূপতি : আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, চলে যা!

সঞ্জীব : গোঁফটা তা হলে আর—?

ভূপতি : না, আর লাগবে না, নিশ্চিন্তে কামিয়ে ফেল!
(ভূপতির প্রস্থান)

সঞ্জীব : যাক বাবা!
(সঞ্জীব মহানন্দে গোঁফটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শয়নকক্ষে গেল। এক সেকেন্ড। তারপরেই খেয়াল হইতে ঝড়ের মতো আসিয়া গোঁফটি কুড়াইয়া লইল। এদিক ওদিক চাহিয়া গোঁফ হাতে আবার ভিতরে গেলো।)

তৃতীয় দৃশ্য

(সেই ঘর। ঘণ্টা খানেক পরে। তবে কেহ নাই। অল্প পরে বাহিরে ভূপতির সাড়া পাওয়া গেল। হয় ছুটিয়া না হয় নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। চিৎকার করিয়া আবৃত্তি করিতেছে—রবীন্দ্রনাথ নয়, সুকুমার রায়।)

ভূপতি : বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু।
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।
আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা—
(ঘরে পা দিয়াই একটি গগনভেদী হাঁক ছাড়িল)
সঞ্জী—ব! আসবে সবাই মরবে ইঁদুর—সঞ্জী—ব! অ্যাই সঞ্জীব! ঘুমিয়ে পড়লি না কি?

সঞ্জীব : (নেপথ্যে) যাই, যাই।

ভূপতি : আসবে সবাই মরবে ইঁদুর বেচারা।
কাঁপচে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি—
(কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া শয়নকক্ষ হইতে সঞ্জীব ঢুকিল।)
ঘুমেচ্ছিলিস তুই?

সঞ্জীব : ঘুমোবো কেন? খেয়ে-দেয়ে একা বসে একটু তন্দ্রা এসেছিলো—

ভূপতি : তন্দ্রা? ভুলে যা ভুলে যা—তন্দ্রা ফন্দ্রা সব ভুলে যা! দশ হাজার! চেম্বার সঞ্জীব—তোর আমার চেম্বার। পটাপট দাঁত তুলবো তোতে আমাতে কটাস কটাস—ছুটবে ছুঁচো লাগবে দাঁতে কপাটি, দেখবে তখন ছিম্বি ছাঙা ছপাটি!
(ভূপতির স্ফূর্তি সঞ্জীবকেও চাঙ্গাইয়া তুলিল)

সঞ্জীব : অতো নাচিস নি রে, জিনিসপত্র ভাঙবি।

ভূপতি : ভাঙুগ গে! কী হবে জিনিসপত্র? (পদাঘাতে একটি চেয়ার উল্টাইল) ক'টা বাজে বল দিকিনি?

সঞ্জীব : সাড়ে দশ।

ভূপতি : সাড়ে দশ! বাপ্‌স্‌! কী কষ্ট যে গেছে এই সাড়ে দশটায় ওদের বের করতে—ওঃ। খাওয়া আর ফুরোয় না। কী করে ফুরোবে? বুড়োটা খালি গ্যাজর গ্যাজর—চারশো বছর, পনেরোশো একষট্টি, রাজাবাহাদুর—খালি ভাবছি দিলে বুঝি এগারোটা বাজিয়ে!

সঞ্জীব : কেন এগারোটা বাজলে কী হোতো?

ভূপতি : সর্বনাশ হয়ে যেতো! তোর আমার চেম্বার সুড়ুৎ করে পিছলে পালিয়ে যেতো! শেষ দিকে শুধু হাতে করে খাইয়ে দিতে বাকি রেখেছি। আর মনোহরটা রেঁধেছেও ছত্রিশ পদ—শেষ আর হয় না—
(মনোহরের অন্দর হইতে প্রবেশ। উর্দি ছাড়িয়া আসিয়াছে।)

ভূপতি : অত পদ কেন রেঁধেছিলে বাবা মনোহর?

মনোহর : আমি কেন রেঁধেছি? বলি ফর্দ করলো কে?

ভূপতি : ঐ বেটা সাহা! বিয়েবাড়ির ফর্দ বানিয়েছে!

মনোহর : ইস্‌! মাংস একরাশ ফেলা যাবে।

ভূপতি : (আনন্দের চিৎকারে) তুই ঐ কথা ভাবছিস মনোহর? বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে—তোর মাথায় ঢুকেছে? সব দেনা শোধ। তোতে আমাতে কলকাতায়—পটাপট দাঁত ওপড়াবো।

মনোহর : আমি দাঁত ওপড়াবো কী?

ভূপতি : আমি আর সঞ্জীব ওপড়াবো, তুই দেখবি। বলিস তো তোর দাঁত ক'টাও তুলে দিতে পারি।

মনোহর : থাক, যে ক'টা আছে থাক। তোমাকে আর তুলে দিতে হবে না।

ভূপতি : ঝকঝকে যন্তর দিয়ে তুলবো রে! গদি-আঁটা চেয়ার—এমনি করে ওঠে, নামে, চিৎ হয়—সে দেখলে তোর দাঁত রাখতেই ইচ্ছে করবে না।

মনোহর : চাই না আমার!

ভূপতি : চাস না? তবে তোকে কী দিই? আজ তোকে শাল দোশালা বক্‌শিশ দেবার দিন—কিস্যু নেই। হাতের ঘড়িটা থাকলেও দিয়ে দিতাম—তাও বেচে বসে আছি।

মনোহর : আচ্ছা থাক ও সব কথা।

ভূপতি : অল্ রাইট। আজ দরকার নেই ও-সব কথায়। করকরে দশ হাজার টাকার চেক পকেটে। আজ রাজাবাহাদুর, কী বলিস? তাও তো বাকি পনেরো নিলাম না।

সঞ্জীব : বাকি পনেরো?

ভূপতি : পঁচিশ দিচ্ছিলো তো!

মনোহর : পঁচিশ হাজার!

ভূপতি : হ্যাঁ রে। নিজে থেকে, সেধে।

মনোহর : তারপর?

ভূপতি : তারপর আর কী? দিলেই নেওয়া যায় না কি?

সঞ্জীব : কেন? সব দেখে জেনে নিজে দর দিচ্ছে! তুই তো আর ঠকিয়ে নিচ্ছিস না?

ভূপতি : ঠকিয়ে নিচ্ছি না? কী বলছিস রে!

সঞ্জীব : কেন, এ বাড়ি চারশো বছরের পুরোনো নয়?

ভূপতি : আলবত চারশো বছর! প্রমাণ দেখিয়েছি বুড়োকে!

সঞ্জীব : তবে?

ভূপতি : আরে গাধা, আসল কথাটাই তো চেপে গেছি!

সঞ্জীব : কী আসল কথা?

ভূপতি : আরে ধ্যাৎ! রঘুদার কথা রে—তোর ঘুম এখনো ছাড়ে নি বোধহয়। (সঞ্জীব হাঁ করিয়া আছে দেখিয়া) ও, তোকে রঘুদার কথা এখনো বলা হয়নি, না? বলে রাখা দরকার। থাকবি যখন এখানেই। আমার কেমন ধারণা হয়ে গেছিলো—তোকে বলেছি।

সঞ্জীব : হ্যাঁ, রঘুদা মারা গেছেন বলেছিস। (ভূপতি অবাক হইয়া চাহিল। তারপর মনে পড়ায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

ভূপতি : আঃ স্টান্ট্‌টা তখন কী রকম ঝাড়লাম বল দিকি? মেয়েটা একদম চুপ! রঘুদার নাম আর মুখে আনার পথ বন্ধ করে দিয়েছি একেবারে।

সঞ্জীব : রঘুদা তাহলে মারা যাননি? (ভূপতি খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

ভূপতি . মনোহর, শুনলি? সঞ্জীবের কথা?

মনোহর: আমি শুতে গেলাম। এগারোটা বাজে।

ভূপতি : আরে, কী হয়েছে তাতে? বোস বোস!

মনোহর : আমরা দম নেই রাত জেগে কাব্যি শোনবার। অনেক ধকল গেছে আজ।

ভূপতি : (হাসিয়া) হ্যাঁ, তা ঠিক। যা, শুয়ে পড় গে।

(মনোহরের বাহিরে প্রস্থান)

সঞ্জীব : কাব্যি? আমাদের কথার মধ্যে কাব্য কোথায় পেলো মনোহর?

ভূপতি : আমাদের কথা নয় রে। রঘুদার কাব্যি। এগারোটা বাজে তো?

সঞ্জীব : তোর সে অভ্যেসটা গেলো না, না?

ভূপতি : কোন্ অভ্যেস?

সঞ্জীব : তুই চিরকাল গল্প শুরু করবি শেষ থেকে। তারপর এখান থেকে খাবলে খানিকটা বলবি, ওখান থেকে খুবলে আর একটু বলবি—লোকে ক্ষেপে ওঠার আগে তুই গোড়া থেকে কখনো শুরু করবি না।

ভূপতি : কেন কেন, কোথায় কী? কোন গল্পটা ওরকম করে বলেছি শুনি?

সঞ্জীব : সব গল্প। এই তো রঘুদা। কখনো বলছিস—মারা গেছে, কখনো বলছিস্ কাব্য শোনায়, কখনো বলছিস রঘুদার জন্যে আমাকে রাত্রে রাখার অসুবিধে—

ভূপতি : মোটেই আমি সে কথা বলি নি—

সঞ্জীব : যাক গে, তর্ক করে—

ভূপতি : আমি বলেছি রঘুদার জন্যে 'তোর' থাকার অসুবিধে।

সঞ্জীব : আচ্ছা তাই। তুই শুধু রঘুদার সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য আছে আমাকে গোড়া থেকে বলবি?

ভূপতি : (অধৈর্য হইয়া) আরে তাই তো বলবার চেষ্টা করছি তখন থেকে। তুই তো খালি আজে বাজে কথা তুলে গুলিয়ে দিচ্ছিস।

সঞ্জীব : হ্যাঁ, তাই তো বটে!

ভূপতি : এগারোটা বাজে। রঘুদা যদি—!

সঞ্জীব : চোপ্!

ভূপতি : কী?

সঞ্জীব : ফের 'এগারোটা' দিয়ে শুরু করেছিস। একদম গোড়ায় যা। রঘুদা কে, তাই দিয়ে শুরু কর।

ভূপতি : রঘুদা হোলো রঘুপতি—রমাপতি ভুইঞার ছেলে। ছোটবেলা থেকে কাব্য কাব্য করে ক্ষেপে গেলো। ঘোড়ায় চড়া, লড়াই করা কিস্যু শেখে নি। তারপর যখন—

সঞ্জীব : দাঁড়া দাঁড়া! রমাপতি কে তা তো বললি নে?

বৃপতি : বললাম তো, রঘুপতির বাবা। তারপর যখন—

সঞ্জীব : বলি রঘুপতির বাবা ছাড়া কি রমাপতির আর কোনো পরিচয় নেই?

ভূপতি : থাকবে না কেন? তখন তবে কী শুনলি?

সঞ্জীব : কখন?

ভূপতি : বলি হালদারকে যখন রমাপতি ভুইঞার কথা বলছিলাম, তখন কী করছিলি? গোঁফ সামলাচ্ছিলি বোধ হয়?

সঞ্জীব : সে তো সেই বারো ভুইঞার আমলের গল্প বলছিলি?

ভূপতি : তা এখনো তো তাই বলছি! তুই তো শুনতে চাইলি গোড়া থেকে।

সঞ্জীব : আমাকে একটু বুঝতে দে। রঘুপতি ভুইঞা না হয় মোগল আমলের হোলো, কিন্তু তোর রঘুদা কে?

ভূপতি : এই! এখন কে টপকে গল্পের মাঝখানে আসছে স্যার?

সঞ্জীব : আচ্ছা বল্ বল্।

ভূপতি : কদ্দুর বলেছি?

সঞ্জীব : রঘুপতি লড়াই করতে শেখে না, কাব্যি করে—

ভূপতি : হ্যাঁ কাব্যি করে। আর—বলতে নেই—একটু মেয়েদের পেছনে ঘোরে। অনেকটা তোর মতো আর কি।

সঞ্জীব : (চটিয়া) কী?

ভূপতি : (ভাবিয়া) না না, তুই তো না? কী যেন নাম ওর? পরেশ পরেশ! ঐ যে ফর্সা মতো—

সঞ্জীব : চুলোয় যাক পরেশ! তুই বল।

ভূপতি : হ্যাঁ, তারপর যখন দেশে খুব গোলমাল, আকবর ফৌজের পর ফৌজ পাঠাচ্ছে, মানসিংহ ইত্যাদি—জানিস তো সব, তখন শ্রীপুরের কেদাররায় চাঁদরায় সব ভুইঞাদের এক করবার চেষ্টা করেছিলো। তাদের দূত প্রথম গেলো প্রতাপগড়ের ইন্দ্রনারায়ণ ভুইঞার কাছে।

সঞ্জীব : তুই যে নদীর ওপারে প্রতাপগড়ের কথা বলছিলি?

ভূপতি : হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই প্রতাপগড়। তা প্রথমে সেখানে যাবে না কেন বল? আসবার পথে সেইটেই তো আগে পড়ে। সে কথা রমাপতিকে বোঝায় কে? একে বুড়ো, তায় মাতাল। তার উপর ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বরাবর রেষারেষি। ইন্দ্ররও দোষ ছিল অবশ্য। সে আবার পাকামি করে আলাদা দূত পাঠিয়েছে বল্লভপুরে—রমাপতি চলো যাই, দেশের এই দুর্দিনে ইত্যাদি। ব্যস! রমাপতি ক্ষেপে লাল! বলে—আগে ইন্দ্রনারায়ণকে নাকে খৎ দিইয়ে তবে আমি মানসিংহের সঙ্গে লড়তে যাবো।

সঞ্জীব : তারপর?

ভূপতি : তা, বললেই তো হবে না? ইন্দ্রর তিনটে জোয়ান জোয়ান ছেলে। লোকবলও অনেক। রমাপতির সাবালক ছেলে বলতে ঐ একটি—তিনি তো কাব্যি আর—ঐ যে বল্লাম! তাকেই ডাকলো, ডেকে বললো—বৎস রঘুপতি, বেরিয়ে পড়ো বাবা, ইন্দ্রনারায়ণ না হোক, অন্তত তার বংশের কারো নাকে খৎ দিইয়ে বল্লভপুরের অপমান ঘোচাও। তা যদি না পারো—তোমার আত্মার মুক্তি নেই।

সঞ্জীব : তারপর?

ভূপতি : দাঁড়া রে বাবা, সিগারেটটা ধরাতে দে।—তারপর রঘুপতি আর কী করে? তবোয়াল টরোয়াল বেঁধে বাল্যসখীদের কাছ থেকে বিদায় টিদায় নিয়ে মনের দুঃখে ঘোড়ায় উঠে রওনা হোলো। পেছনে বল্লভপুরের ফৌজ। মানসিংহের সঙ্গে লড়বার আগে ইন্দ্রনারায়ণকে শায়েস্তা করতে চললো।

সঞ্জীব : করলো শায়েস্তা?

ভূপতি : আরে দূর! তা করতে পারলে আর এই যন্ত্রণা অ্যাদ্দিন ধরে?

সঞ্জীব : তার মানে?

ভূপতি : আরে হবি তো হ, ঠিক সেই সময়ে নদীর ওপারে ইন্দ্রর সেপাইরা তাদের নতুন কায়দার কামানের ট্রায়াল দিচ্ছে। শূন্যে গোলা চালিয়ে দেখছে কদ্দূর যায়। কামানটা কতোখানি আলট্রা মডার্ন লঙ রেঞ্জ—তারাও বোঝেনি। গোলা নদী টপকে রঘুপতিকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো।

সঞ্জীব : অ্যাঁ?

ভূপতি : রঘুপতির ফৌজ ফিরে গেলো। গিয়ে রমাপতিকে খবর দিলো। রমাপতি তখন অপমান ভুলতে মদ খেয়ে ধাতের বারে। ধাত ছেড়েছে, কিন্তু অপমানের জ্বালা ছাড়ে নি। বিড়বিড় করে পুরোনো অভিশাপটি কায়েম রেখে তিনি দু'চক্ষু মুদলেন।

সঞ্জীব : পুরোনো অভিশাপ?

ভূপতি : ঐ যে বলেছিলো না? ইন্দ্র বা তার বংশের কাউকে নাক খৎ না দেওয়াতে পারলে রঘুপতির আত্মার মুক্তি নেই? সেই অভিশাপ।

সঞ্জীব : (অল্প থামিয়া) কী বলতে চাস তুই?

ভূপতি : (নির্বিকার) ঐ তো বললাম। রমাপতি তো অভিশাপ দিয়ে খালাস। কিন্তু প্রতাপগড় ধুলো হয়ে গেছে। ইন্দ্রনারায়ণের বংশে কেউ আছে কিনা তার নেই ঠিক। থাকলেও এ বাড়িতে সে আসবে—সে কি সম্ভব? এদিকে রঘুদারও এ বাড়ি ছেড়ে বেরুবার ক্ষমতা নেই। বেচারা নিরীহ লোক এই চারশো বছর ধরে—

সঞ্জীব : ভূপতি!

ভূপতি : কী রে?

সঞ্জীব : (সামলাইয়া) নাঃ। গল্পটা ভালো বলেছিস।

ভূপতি : গল্প?

সঞ্জীব : তোর এ বাড়ির যা অ্যাটমোস্‌ফীয়ার, রাত্তিরে এই রকম গল্পই জমে।

(সঞ্জীবের কথা ভালো করিয়া শেষ হইল না। একটা রক্ত জল করা অট্টহাস্য ভাসিয়া আসিল ভাঙা প্রাসাদের কোনো মহল হইতে। সঞ্জীব প্রায় ভূপতিকে আঁকড়াইয়া ধরিল।)

ভূপতি : ভয় পেয়ে গেলি না কি? ওটা কিছু না, রঘুদা প্র্যাকটিস রাখবার জন্যে মধ্যে মধ্যে ওরকম চিৎকার করে, আসলে রঘুদার গলা খুব মিষ্টি। (সত্যই তাই। উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আরম্ভ হইল। ভূপতি উপভোগ করিতে লাগিল।)

নেপথ্যে আবৃত্তি : দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

ভূপতি : ভালো না গলাটা? (কিন্তু সঞ্জীবের ঠিক রসোপভোগের অবস্থা নহে)

সঞ্জীব : ভূপতি, আমি, আমি—আমি কি—আমাকে একটা চিমটি কাট্ তো? জোরে!

ভূপতি : ঐ দেখ্। ঐ জন্যেই তো কলেজে তোদের কিছু বলি নি। এ বাড়িতে আসতেও

বলতে পারি নি কোনোদিন। আমি ছোটবেলা থেকে জানি, দেখছি, রঘুদাকে ঘরের লোক ভাবা অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু কাউকে বলতে গেলে দেখি বলা যায় না।

নেপথ্যে আবৃত্তি : সংক্ষিপ্যেত ক্ষণইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা।
সর্ব্বাবস্থা স্বরপি কথং মন্দ মন্দাতপং স্যাৎ॥
ইত্থং চেতশ্চটুল নয়নে দুর্লভ প্রার্থনং মে।
গাঢ়োস্মাভিঃ কৃতমশরণং তদ্বিয়োগ ব্যথাভিঃ॥

ভূপতি : মেঘদূত। কী রে, ভালো লাগছে না তোর? (সঞ্জীব কথা কহিল না, কিন্তু বোঝা গেল ভালো লাগিতেছে না।) তবেই বুঝে দেখ, যদি হালদারদা জানতে পারতো রঘুদার কথা, কিনতো বাড়ি? আবার তুই বলছিলি পঁচিশ হাজারই কেন নিলাম না।

সঞ্জীব : এ কি, এ কি রোজ রাত্রেই?

ভূপতি : হ্যাঁ, এগারোটা থেকে। (সহসা আবৃত্তি থামিয়া কর্কশ অট্টহাস্য।) আঃ, রঘুদা বেশি চেঁচামেচি করছে আজ। বোধ হয় তুই আছিস বলে।

সঞ্জীব : অ্যাঁ?

ভূপতি : দাঁড়া, ডেকে আনি।

সঞ্জীব : (সভয়ে) ডাকবি কি রে?

ভূপতি : আলাপ করবি না?

সঞ্জীব : না! না!

ভূপতি : আরে খুব ভালো লোক। মানে, লোক নয় ঠিক, তবে খুব ভালো দেখিস।

সঞ্জীব : না! না!

ভূপতি : আচ্ছা আচ্ছা, তুই বোস আমি আসছি।

সঞ্জীব : কোথায় যাবি?

ভূপতি : বলে আসি যেন আজ আর বেশি চেঁচামেচি না করে।

সঞ্জীব : আমি—আমি এখানে একা থাকবো কী করে?

ভূপতি : তাতে কী হয়েছে? তোর কথা একবার না বললে রঘুদা সারারাত অমনি থেকে থেকে চেঁচাব। একবার বলে এলে নিশ্চিন্ত।

সঞ্জীব : না দরকার নেই, তুই বসে থাক এখানে!

(সহসা বাহিরে দূর হইতে মিঃ হালদারের গলা শোনা গেল)

হালদার : (নেপথ্যে) মিস্টার রায়! রাজাবাহাদুর!

ভূপতি : (শুষ্ককণ্ঠে) ফিরে এসেছে!

সঞ্জীব : ফিরলো কেন?

ভূপতি : কেন তা কী করে জানবো?

সঞ্জীব : কী করবি?

ভূপতি : সব পণ্ড হয়ে গেলো সঞ্জীব! আমাদের চেম্বার—(সহসা সচকিত হইয়া) সঞ্জীব, তুই সাড়া দে, আমি রঘুদার হাতে পায়ে ধরি—

সঞ্জীব : কিন্তু এর মধ্যে যদি এই হাসি—

ভূপতি : যা হয় বলে সামলাস, খবরদার যেন বুঝতে না পারে। আমি ছুটলাম।

(ভূপতি দ্রুত অন্দরমহলে চলিয়া গেল। সঞ্জীব হতচকিত।)

হালদার : (নেপথ্যে) রাজাবাহাদুর!

সঞ্জীব : (চেঁচাইয়া) আসুন।

(হালদার প্রবেশ করিলেন। পিছনে স্বপ্না ও ছন্দা। সঞ্জীব গুম্ফহীন।)

হালদার : রাজাবাহাদুর শুয়ে পড়েছেন?—এ কী! আপনি আপনি—দেওয়ান সাহেব না?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, ইয়ে, বসুন বসুন।

হালদার : আপনার—আপনার গোঁফ?

সঞ্জীব : গোঁফ? ইয়ে, মানে—আমার ঐ গোঁফটার কথা বলছেন? ঐ যেটা—তখন দেখেছিলেন?

হালদার : কামিয়ে ফেললেন?

সঞ্জীব : হ্যাঁ হ্যাঁ কামিয়ে ফেললাম, কামিয়ে ফেললাম।

ছন্দা : অমন সুন্দর গোঁফটা কামিয়ে ফেললেন?

সঞ্জীব : না, সুন্দর কোথায়? ওটা—ভালো লাগছিলো না, তাই কামিয়েই ফেললাম।

ছন্দা : ভালো লাগলো না? কক্ষনো না। নিশ্চয়ই ওটা আপনার খুব সখের গোঁফ ছিল।

সঞ্জীব : না না, আমার সখ একেবারেই না। বরং ভূপ্—ঐ রাজাবাহাদুরের সখ বলতে পারেন।

হালদার : রাজাবাহাদুরের সখে আপনি গোঁফ রেখেছিলেন?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, একরকম তাই। এখন সখ মিটে গেলো, হুকুম দিলেন কামিয়ে ফেলো, তাই কামিয়ে ফেললাম!

হালদার : রাজরাজড়ার সখই আলাদা রকমের।

সঞ্জীব : তা আপনারা—ইয়ে—

হালদার : মহা বিপদে পড়েছি দেওয়ান সাহেব। নইলে কি আর এই রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করতে আসি?

সঞ্জীব : কেন কেন? কী বিপদ হোলো?

(স্বপ্না এতোক্ষণ বসিয়া হাঁফাইতেছিলেন।)

স্বপ্না : আমি পৈ পৈ করে বলেছিলাম—নিজে গাড়ি চালাতে যেও না, রামশরণকে আনো।

হালদার : রামশরণকে আনলে গাড়ি খারাপ হোতো না? গাড়ির এঞ্জিন কি রামশরণের—রামশরণের শ্বশুর, যে খাতির করে বিগড়োতো না?

স্বপ্না : আহা রামশরণ জানে শোনে—

হালদার : জানে শোনে? আমার থেকে ভালো গাড়ি চালাতে জানে রামশরণ?

স্বপ্না : চালানোর কথা কে বলছে? যন্ত্রপাতি—

হালদার : যন্ত্রপাতি রামশরণ থাকলে বিগড়োতো না? বলি যন্ত্রপাতি টের পেলো কী করে যে রামশরণ নেই? বলো? সেটা বলো?

সঞ্জীব : গাড়ি খারাপ হয়ে গেলো বুঝি?

হালদার : খারাপ হবে না? বলুন তো! কলকজার ব্যাপার, মাঝে মধ্যে খারাপ হতে পারে

না? অতো কেয়ার নিই, তবু আমার ফ্যাক্টরির মেশিন বন্ধ হয়ে গেছে কতোবার!

ছন্দা : আচ্ছা এখন ও-কথা বলে আর লাভ কী?

হালদার : আমি তো সেই কথাই বলছি! জলে তো পড়ে নেই? রাজাবাহাদুর রয়েছেন—একটা তো রাত—ও হ্যাঁ, রাজাবাহাদুর শুয়ে পড়েছেন বুঝি?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, না, ঠিক শুয়ে—

(ঠিক এই মুহূর্তে সেই রক্তজলকরা অট্টহাস্য। সকলেই ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল। ছন্দা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল।)

হালদার : ও কী?

সঞ্জীব : কী?

(সঞ্জীবের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাণপণে তাহা লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে।)

হালদার : ও রকম করে হাসলো কে?

সঞ্জীব : হাসলো? অ্যাঁ? হে হে—হ্যাঁ—হাসলো বলেই তো মনে হোলো। হে হে—

স্বপ্না : কে হাসলো?

সঞ্জীব : কে? ঐ—কী বলে?—ঐ—

ছন্দা : রাজাবাহাদুর?

সঞ্জীব : হ্যাঁ হ্যাঁ রাজাবাহাদুর। আর কে হাসবে বলুন?

ছন্দা : ঐ রকম করে?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, ঐ রকম হাসেন মধ্যে মধ্যে—

ছন্দা : কেন?

সঞ্জীব : কেন? ঐ—খেয়াল আর কি? রাজারাজড়ার খেয়াল।

(আবৃত্তি শুরু হইয়াছে—সংক্ষিপ্যতে ক্ষণইব ইত্যাদি)

ছন্দা : ও কে?

সঞ্জীব : আর কে? রাজাবাহাদুর, সব রাজাবাহদুর!

ছন্দা : কিন্তু এ যে সংস্কৃত শ্লোক?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, সংস্কৃতই তো! উনি খুব ভালো সংস্কৃত জানেন।

ছন্দা : সুন্দর বলছেন, না বাবা?

(আবৃত্তি আচমকা থামিয়া গেল)

স্বপ্না : উনি এই রকম একা একা শ্লোক বলেন না কি?

সঞ্জীব : না না, সব সময় নয়। এই মাঝে মধ্যে—

স্বপ্না : এই রকম মাঝ রাত্তিরে?

সঞ্জীব : হ্যাঁ, এই তো বেশ ভালো সময়। চারিদিক নিস্তব্ধ, এই সময়েই তো কাব্য আসে।

হালদার : কিন্তু ঐ হাসিটা—ওটা তো কাব্যের উল্টো মনে হেলো।

সঞ্জীব : হে হে, যা বলেছেন! তবে—রাজারাজড়ার খেয়াল তো?

হালদার : হ্যাঁ, ঠিক কথা। রাজরাজড়ার খেয়ালে আপনাকে অমন গোঁফটাই কামিয়ে ফেলতে হোলো!

সঞ্জীব : অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, গোঁফ।

ছন্দা : গোঁফ ছাড়া কিন্তু আপনাকে একেবারেই ভালো দেখাচ্ছে না।

স্বপ্না : আঃ ছন্দা!

সঞ্জীব : হে হে, আবার রাখবো এখন। রাজাবাহাদুর বললেই রাখবো।

ছন্দা : ও গোঁফ কি আর একদিনে হবে?

সঞ্জীব : কেন হবে না? অ্যাঁ, না না, ও কি আর একদিনে হয়? অতো বড় গোঁফ!

(অন্দর হইতে ভূপতির প্রবেশ। হাঁপাইতেছে।)

হালদার : এই যে রাজাবাহাদুর! অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হোলো। কী করি বলুন? গাড়িটা গেলো বিগড়ে! কপালের দোষ থাকলে যা হয়—

স্বপ্না : কপালের দোষ না বুদ্ধির দোষ?

হালদার : বুদ্ধির দোষটা কোথায় হোলো?

স্বপ্না! আচ্ছা বাবা, আবার শুরু করলে?

হালদার : আমি কোথায় শুরু করলাম?

ছন্দা : (ভূপতিকে) রাজাবাহাদুর! আমাদের আজ রাতটার মতো থাকতে দিতে পারবেন?

ভূপতি : কী আশ্চর্য! এ কি একটা কথা হোলো?

ছন্দা : আপনার খুব অসুবিধে হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু—

ভূপতি : অসুবিধে আমার নয়, আপনাদের। সেই কথাই ভাবছিলাম। আপনাদের কাছে আর গোপন করে লাভ নেই। আমার এটা নামে রাজবাড়ি, কিন্তু আসলে আপনাদের ভালো করে বিছানাটা পর্যন্ত করে দেবার আমার ক্ষমতা নেই। কিছুই নেই আমার। থাকলে বাড়ি বেচি? (একটি অস্বস্তিকর নীরবতা) যা আছে, তাই দিয়ে যতোটা পারি করছি, কিছু মনে করবেন না। আসুন দেওয়ান সাহেব—এ কী! (ভূপতি গোঁফহীন সঞ্জীবকে দেখিয়া থামিয়া গেল) ইয়ে, আপনারা বোধহয়—একটু অবাক হয়ে গেছেন, দেওয়ান সাহেবের গোঁফ—

হালদার : না না, আমরা শুনেছি সব।

ভূপতি : শুনেছেন?

সঞ্জীব : (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ, আমি ওঁদের বলছিলাম, আপনার পছন্দ ছিল না বলে গোঁফটা কামিয়ে ফেলেছি।

ছন্দা : গোঁফটা আপনার ভালো লাগলো না রাজাবাহাদুর?

ভূপতি : না, মানে—

ছন্দা : আপনার কথাতেই তো প্রথম রেখেছিলেন উনি গোঁফটা!

ভূপতি : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, তা—আবার রাখবেন এখন, তাতে কী হয়েছে?

ছন্দা : (খুশি হইয়া) রাখবেন তো? দেখুন দেওয়ান সাহেব, হুকুম করিয়ে দিলাম।

ভূপতি : আমি যদি আগে জানতাম গোঁফটা আপনার এতো পছন্দ হয়েছে তবে কি আর কামাতে বলতাম? আবার রাখতে শুরু করুন—

হালদার : ভালো কথা, এখানে মোটর মিস্ত্রী পাওয়া যাবে?

ভূপতি : প্রতাপগড়ে পাবেন। কোথায় রয়েছে গাড়িটা?

হালদার : পোলের কাছাকাছি।

ভূপতি : ও, তবে তো বেশি দূর নয়। সকালে গাড়ি ঠেলবার লোক অনেক পাওয়া যাবে।

স্বপ্না : তবু ভালো।

ভূপতি : দেওয়ান সাহেব আসুন, দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়—

(ভূপতি ও সঞ্জীবের শয়নকক্ষে প্রস্থান)

স্বপ্না : আমি বুঝতে পারছি না।

হালদার : কী?

স্বপ্না : তিনজনকে থাকতে দিতে বিছানার ভাবনা, অথচ—

হালদার : এ আর না বোঝবার কী আছে? তেমন অবস্থায় না পড়লে কেউ এমন ঐতিহাসিক বাড়ি বেচে? পনেরোশো একষট্টি—

স্বপ্না : আঃ, সে কথা বুঝি নি বলেছি নাকি?

হালদার : তবে কী বোঝোনি?

স্বপ্না : বুঝতে পারছি না, এই যদি অবস্থা হয়, তবে পঁচিশ হাজার পেয়েও নিলো না কেন?

হালদার : সেই কথা? এ আর নতুন কী না বুঝলে তুমি? এ তো আমিও বুঝি নি!

ছন্দা : আমি কিন্তু বুঝেছি।

স্বপ্না : কী বুঝেছিস তুই?

ছন্দা : এ বাড়ির যে মালিক, তার এমনিই হবার কথা।

স্বপ্না : মস্ত বুঝেছিস!

ছন্দা : নিশ্চয়ই, দেখলে না, রাত এগারোটায় খেয়াল হোলো—দেওয়ানের গোঁফটা ভালো না—ব্যস কামিয়ে ফেলো! একে বলে রাজার মেজাজ।

স্বপ্না : আর মাঝরাত্তিরে শ্লোক আওড়ানো—এও রাজার মেজাজ বল্?

ছন্দা : নিশ্চয়ই। আমরা করি ওরকম?

স্বপ্না : চুপ কর। বাজে বকিসনি।

হালদার : না, কথাটা খুব ভুল বলেনি ছন্দা। এ ছাড়া পনেরো হাজার এক কথায় ছেড়ে দেবার আর কোনো এক্সপ্লেনেশন পাওয়া যায় না।

স্বপ্না : কেন পাওয়া যাবে না? হয়তো বাড়িটার এমন কোনো দোষ আছে—

হালদার : দোষ আছে? পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ।

স্বপ্না : তুমি তো পনেরোশো একষট্টি বলেই অজ্ঞান।

হালদার : কী দোষ থাকা সম্ভব বলো? এ কি নতুন বাড়ি যে, ছাত দিয়ে জল পড়ে কি না, ড্যাম্প ওঠে কিনা—এই সব প্রশ্ন উঠবে? এখানে একমাত্র কথা হোলো পনেরোশো একষট্টি, তার অকাট্য প্রমাণ দেখিয়েছে।

(স্বপ্না হঠাৎ কোনো জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না। তাই বলিয়া তর্কে তো হারা যায় না?)

স্বপ্না : তাই বলে মাঝরাত্তিরে এমন বিদঘুটে হাসবে?

হালদার : হাসুক না? নিজের বাড়িতে হাসছে। তোমার বাড়ি যখন হবে, তখন তো আর হাসতে যাবে না? তখন তুমি হেসো।

স্বপ্না : সুস্থ মাথায় কেউ ওরকম হাসে?

ছন্দা : তুমি কী বলতে চাও? পাগল?

হালদার : তা, বিচিত্র নয়। এতো বড়ো বংশ যদি এই অবস্থায় ঠেকে, তবে মাথার একটু গোলমাল হওয়া—

(ভূপতি ও সঞ্জীবের প্রবেশ)

হু-হুম্—মাথাটা একটু যেন গোলমাল গোলমাল লাগছে। ধরেছে যেন একটু।

ভূপতি : ধরা স্বাভাবিক। এতো হাঙ্গামা—

হালদার : হাঙ্গামা বলে হাঙ্গামা।

ভূপতি : আসুন, একরকম ব্যবস্থা হয়েছে, শুয়ে পড়ুন। তবে ঘুমোতে পারবেন কিনা জানি না।

হালদার : ঘুমোতে পারবো না কেন?

ভূপতি : বিছানাপত্র উপযুক্ত নেই, নতুন জায়গা, তার উপর আবার— (থামিয়া গেল)

হালদার : তার উপর কী?

ভূপতি : আমার একটা রোগ আছে। হাসি ফেলে চেঁচিয়ে হেসে ফেলি। হয় তো আপনারা আছেন খেয়াল থাকবে না। শুনলে ভয় পাবেন না যেন।

(হালদার দম্পতির দৃষ্টি বিনিময়)

হালদার : কিন্তু—আপনিও ঘুমোবেন তো?

ভূপতি : ঘুম সব দিন আসে না। আর ঘুমোতে না পারলেই থেকে থেকে হেসে ফেলি ঐরকম।

ছন্দা : আর সংস্কৃত শ্লোক বলেন?

ভূপতি : হ্যাঁ, শ্লোকও বলি।

ছন্দা : বড়ো সুন্দর শ্লোক। বলুন না একবার?

ভূপতি : অ্যাঁ?

ছন্দা : ঐ যেটা তখন বলছিলেন? বড়ো সুন্দর লাগলো। আর একবার বলবেন?

ভূপতি : (ব্যস্ত হইয়া) না না, এখন না। অনেক রাত হয়েছে। আপনাদের ধকলও গেছে কম না—শুয়ে পড়ুন।

ছন্দা : কিন্তু আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না।

ভূপতি : পাবে পাবে। আর না পেলেও, বিশ্রাম তো দরকার। আসুন, মিস্টার হালদার আসুন।

(প্রায় ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাহাদের শয়নকক্ষে লইয়া গেল। ছন্দা গেল নিতান্ত অনিচ্ছায়। সঞ্জীব একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘ একটি নিশ্বাস ছাড়িল। তারপর উঠিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। স্নায়বিক অবস্থা কীরূপ, সিগারেট ধরানো দেখিয়া আন্দাজ করা যায়। ভূপতির প্রবেশ।)

সঞ্জীব : শুয়ে পড়েছে?

ভূপতি : শোবে কি আমার সামনে গাধা?

সঞ্জীব : না, মানে—ঘরে দিয়ে এসেছিস?

ভূপতি : (রুক্ষকণ্ঠে) সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। জিজ্ঞেস করবার কি আছে? (সিগারেট ধরাইল। সঞ্জীবের মতোই প্রায় অবস্থা।) কিছু মনে করিসনি সঞ্জীব। মাথার ঠিক

থাকছে না। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, আমি ওদের সঙ্গে থাকতে রঘুদা যদি চেঁচায়—কী হবে? (দু'জনে নীরবে সিগারেটে কয়েকটি টান দিল)
এখন যদি চেঁচায় তবে অতোটা চিন্তা নেই। আমাকে পাগল ভাববে, কিন্তু রঘুদার কথাটা টের পাবে না।

সঞ্জীব : বারণ করেছিস—তোর রঘুদাকে?

ভূপতি : ঠিক সময়ে আর করতে পারলাম কই? খুঁজে পাবার আগেই হট্টগোল করে ডুবিয়ে দিলো একেবারে।

সঞ্জীব : সে তো তবু সামলে গেছে একবকম করে। কিন্তু আর করবে আজ রাতে?

ভূপতি : বলতে তো বাকি রাখিনি কিছু, কিন্তু কদ্দুর কাজ হবে কে জানে?

সঞ্জীব : কী বললেন?

ভূপতি : ওরা কেউ ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর কি না জানতে চাইলো। নতুন লোক দেখলেই জানতে চায়।

সঞ্জীব : নতুন লোক দেখলেই—তবে কি—আমার কথাও—

ভূপতি : হ্যাঁ তোর কথাও জিজ্ঞেস করলো।

সঞ্জীব : অ্যাঁ? (কাছে আসিয়া বসিল)

ভূপতি : তাতে কী হয়েছে? তুই তো আর ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর নোস।

সঞ্জীব : কী করে জানবো ভাই? আমি কি খবর রাখি?

ভূপতি : আরে ধ্যাৎ, তুই তো বাঙাল—পদ্মার ওপারের লোক।

সঞ্জীব : ইন্দ্রনারায়ণের ছেলে মানসিংহের তাড়া খেয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলো কিনা, কে বলতে পারে?

ভূপতি : পেরিয়েছিলো না তোর মাথা করেছিলো! ইন্দ্রর তিন ছেলেই মরে ভূ—ত হয়ে গেছিলো নির্ঘাৎ! (সঞ্জীব লাফাইয়া আসিয়া ভূপতির আস্তিন খামচাইয়া ধরিল) কী হোলো রে?

সঞ্জীব : বাবা, একজন তো রয়েছেন বাড়িতে, আবার রাত্তির বেলা আরো তিনটের নাম করিস কেন?

ভূপতি : আচ্ছা করবো না। কিন্তু এখন কী করা যায় বল তো?

সঞ্জীব : কী করবি?

ভূপতি : বিছ্না তো আর নেই। শুবি কিসে?

সঞ্জীব : শুয়ে কী হবে? ঘুমোতে পারবো?

ভূপতি : তবে কী করবি?

সঞ্জীব : এইখানে বসে রাত কাটিয়ে দিই কোনোরকমে দু'জনে।

ভূপতি : দু'জনে? আমি থাকবো কী করে এ ঘরে?

সঞ্জীব : কেন?

ভূপতি : তারপর রঘুদার চিৎকারে উঠে এসে যদি আমাকে এখানে দেখে? তখন?

সঞ্জীব : বলবি—তুই চেঁচিয়েছিলি।

ভূপতি : ওঃ তোর মাথায় যে কী হয় মধ্যে মধ্যে! বলি ওবা এ ঘরে এলেই রঘুদা দয়া করে চুপ করে যাবে—এ কথাটা ধরে নিচ্ছিস কী করে?

সঞ্জীব : ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। তা হলে?
ভূপতি : আমার ঘরে থাকা চলবে না। কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে।
সঞ্জীব : আর আমি?
ভূপতি : তুই বরং এ ঘরে থাক।
সঞ্জীব : একা? ক্ষেপেছিস?
ভূপতি : তবে? আমার সঙ্গে যাবি?
সঞ্জীব : সে বরং ভালো।
ভূপতি : কিন্তু—এদের সামলাবে কে?
সঞ্জীব : এদের আবার সামলাবার কী আছে?
ভূপতি : কেউ যদি উঠে বেরিয়ে রঘুদাকে দেখে ফেলে? রঘুদা তো বাড়িঘর ঘোরে। সেটা ঠেকাবে কে?
সঞ্জীব : সেটা কি—আমাকে ঠেকাতে বলছিস?

(ভূপতি কিন্তু রীতিমতো বিবেচনা করিল প্রস্তাবটা)

ভূপতি : তুই—তুই কি পারবি? সোজা নয় খুব। রঘুদা কখন খুচ করে কোথা দিয়ে এসে পড়ে, বোঝা মুস্কিল।
সঞ্জীব : এই কি তোর ঠাট্টার সময় বলে মনে হোলো ভূপতি?
ভূপতি : (বিরক্ত হইয়া) ঠাট্টা কে করছে?
সঞ্জীব : রঘুদা বাড়িময় ঘুরে বেড়াবে, যখন তখন কোথা দিয়ে খুচ করে এসে পড়বে—আর আমি তার কাছ থেকে এদের আড়াল করে রাখবো—এ কল্পনাটা তুই সিরিয়াসলি করছিস বলতে চাস?
ভূপতি : নাঃ তোকে দিয়ে যদি একটা কাজ হয়!
সঞ্জীব : ঠিক এই রকমের কাজ খুব কম লোককে দিয়েই হবে।
ভূপতি : (সহসা) ঠিক হয়েছে! আরে, এই কথাটা এতোক্ষণ মনে আসেনি।
সঞ্জীব : কী কথা?
ভূপতি : সেই 'জুতা আবিষ্কার' মনে আছে? পায়ে ধুলো লাগা বন্ধ করতে হবুচন্দ্র পৃথিবী ঝাঁট দিচ্ছিলেন, নিজের পা দু'টো না ঢেকে! আমিও এতোক্ষণ সেইরকম ভাবছিলাম গাধার মতো!
সঞ্জীব : একটু সরলভাবে বলবি?
ভূপতি : আরে বোকা, রঘুদাকে ছেড়ে আমি এদের সামলাচ্ছিলাম! তারচেয়ে রঘুদাকে ধরে রাখলেই তো হয়!
সঞ্জীব : বটে?
ভূপতি : আর কিছু ভাবতে হবে না! চল চল!
সঞ্জীব : কোথায়?
ভূপতি : কোথায় আবার? রঘুদার কাছে।
সঞ্জীব : রঘুদার—কাছে?
ভূপতি : রঘুদাকে একটা নিরিবিলি ঘরে নিয়ে গিয়ে বলি—কবিতা শোনাও। ব্যস, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে?

সঞ্জীব : ঢুকে যাবে?

ভূপতি : যাবে না? কাব্য শোনাতে পেলে রঘুদা আর এদিক আসবে কেন? চেঁচামেচিও করবে না। চল।

সঞ্জীব : ভাই ভূপতি—

ভূপতি : আবার দেরি করে—

সঞ্জীব : ভাই ভূপতি, তুই দয়া করে বোঝ্। আমি রঘুদার কাছে বসে কাব্য শুনতে পারবো না?

ভূপতি : কেন পারবি না?

সঞ্জীব : রঘুদাকে দেখলে আমিই এমন বিশ্রী চেঁচামেচি করে উঠাব যে এরা হয় ভির্মি যাবে, নয় ছুটে ওখানে গিয়ে হাজির হবে।

ভূপতি : কেন? তুই ভেবেছিস রঘুদার চেহারা খারাপ? মোটেই না। বরং বেশ ভালোই বলতে পারিস। ইন ফ্যাক্ট—রঘুদার চেহারা ঠিক কীরকম জানিস?

সঞ্জীব : আমার দরকার নেই জেনে।

ভূপতি : তুই তো মহা মুস্কিলে ফেললি!—আচ্ছা, এক কাজ কর, আমি রঘুদাকে আটকাই, তুই মনোহরের ঘরে চলে যা।

সঞ্জীব : এই এতোক্ষণ পরে একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছিস। মনোহরের ঘর কোথায়?

ভূপতি : ফটকের পাশে।

সঞ্জীব : চল দিয়ে আসবি।

ভূপতি : দিয়ে আসতে হবে? আর ততোক্ষণে যদি রঘুদা এদিকে এসে এদের কারো সামনে পড়ে, তখন?

সঞ্জীব : আর আমি বারান্দায় বেরুলেই তিনি যদি আমার সামনে পড়েন—তখন? তখন আমি চেঁচালে কোন্‌দিক বাঁচবে?

বূপতি : চল বাবা চল—তাই দিয়ে আসি।

(কিন্তু বাহির হইবার পূর্বেই সহসা শ্লোক আবৃত্তি শুরু হইল)

নেপথ্যে আবৃত্তি : অলিন্দে কালিন্দী কমলসুরভৌ কুঞ্জবসতে র্বসন্তে বাসন্তী নব পরিমলোদ্গার চিকুরাং—

ভূপতি : সর্বনাশ! তুই চলে যা মনোহরের ঘরে, আমি রঘুদাকে ঠেকাই।

(সঞ্জীব কিছু বলিবার পূর্বেই ভূপতি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। শ্লোক তাহার অল্প পরেই থামিয়া গেল সহসা। কিন্তু সঞ্জীব একা বাহির হইবার সাহস কিছুতেই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিল না। ঘরেও যেন চারিদিকে আওয়াজ কল্পনা করিয়া চমকাইয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে ফিরিতে লাগিল।

ছন্দা প্রবেশ করিল সন্তর্পণে। সঞ্জীব তাহার সাড়ায় একটা অস্ফুট আওয়াজ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভয়ে ছন্দাও চমকাইয়া উঠিল।)

সঞ্জীব : আ-আপনি!

ছন্দা : কী হয়েছে? আপনি ওরকম চমকে গেলেন যে?

সঞ্জীব : না ন্-না, কিক্-কিছু হয় নি। আপনি উঠে এলেন কেন?

ছন্দা : শুনতে।

সঞ্জীব : কী শুনতে?

ছন্দা : রাজবাহাদুর আবার আবৃত্তি শুরু করেছিলেন। ভালো করে শুনবো বলে বেরিয়ে এলাম।

সঞ্জীব : ঘুমোননি?

ছন্দা : ঘুম এলো না।

সঞ্জীব : ওঁরা?

ছন্দা : ওরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাবার নাক ডাকছে, তাতে আরো ঘুম এলো না।

সঞ্জীব : আপনার বাবা ভাগ্যবান।

ছন্দা : কেন?

সঞ্জীব : ঘুমোতে পারছেন। আপনিও যদি ঘুমোতে পারতেন—

ছন্দা : ঘুমোলে এমন আবৃত্তিটা শোনা হোতো না।

সঞ্জীব : আবৃত্তিটা—ভালো লাগছে আপনার?

ছন্দা : ভালো লাগবে না? এই চারশো বছরর পুরোনো বাড়ি, চারিদিক নির্জন থমথমে, তার মধ্যে ঐ অপূর্ব সংস্কৃত শ্লোক। এ কারো ভালো না লেগে পারে?

সঞ্জীব : পারে।

ছন্দা। আপনার ভালো লাগে না?

সঞ্জীব : না।

ছন্দা : কেন?

সঞ্জীব : কী জানি? বোধ হয় সংস্কৃতয় আমার অ্যালার্জি আছে।

ছন্দা : ইস্কুলে সংস্কৃত আমারও বিচ্ছিরি লাগতো, ধাতুরূপ মুখস্থ হোতো না বলে। তখন কি জানতাম—সংস্কৃত এই জিনিস! (আবার আবৃত্তি শুরু হইল। দূরে কোথাও।) ঐ! ঐ যে আবার।

নেপথ্যে আবৃত্তি : ত্বমসিমম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিথত্নম্।
ভবতু ভবতীময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিষত্নম্।।
(ছন্দা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। অল্প পরে আবৃত্তি বন্ধ হইল।)

ছন্দা : অপূর্ব! কী মনে হচ্ছিলো জানেন? (সঞ্জীব বসিয়া পড়িয়াছিল। শুধু ছন্দার দিকে চাহিল।) মনে হচ্ছিলো—এ যেন রাজাবাহাদুর নন। মনে হচ্ছিলো এ যেন এক অভিশপ্ত আত্মা—যুগ যুগ ধরে প্রতি রাত্রে বিরহী যক্ষের বেদনা বুকে করে ঘুরে বেড়ায় এই পুরোনো প্রাসাদের ঘরে ঘরে—কী হোলো আপনার? (সঞ্জীব দুই হাতে কান চাপিয়া বসিয়া কাঁপিতেছে। ছন্দা তাড়াতাড়ি কাছে আসিল।) শরীর খারাপ বোধ করছেন না কি?

সঞ্জীব : হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটু—আমাকে—আমাকে একটা সিগারেট দেবেন—দয়া করে? (ছন্দা ছুটিয়া সিগারেট আনিয়া দিল। সঞ্জীব পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ধরাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। হাত বড়ো কাঁপিতেছে। ছন্দা ধরাইয়া দিল।) ধ-ধ্-ধন্যবাদ।

ছন্দা : আপনি আজ সন্ধে থেকে এতো অসুস্থ—বাড়ি চলে গেলেন না কেন?

সঞ্জীব : বাড়ি? ও হ্যাঁ—বাড়ি।

(সঞ্জীব সিগারেট টানিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছে)

কই আর যেতে পারলাম?

ছন্দা : রাজাবাহাদুর যেতে দিলেন না বুঝি?

সঞ্জীব : হ্যাঁ—না, বললেন থেকে যেতে—

ছন্দা : কেন?

সঞ্জীব : কাজ ছিল কিছু, তাই—

ছন্দা : কাজের মধ্যে তো শুধু গোঁফটা কামিয়েছেন!

সঞ্জীব : না না, তা কেন? কাজও করছিলাম।

ছন্দা : আচ্ছা, আমাকে লুকোচ্ছেন কেন বলুন তো?

সঞ্জীব : (চমকাইয়া) কী—কী লুকোচ্ছি?

ছন্দা : আপনি কি ভাবেন আমি কিছু বুঝতে পারি না?

সঞ্জীব : কী বুঝেছেন?

ছন্দা : বুঝেছি—কেন রাজাবাহাদুর আপনাকে আজ ধরে রেখেছেন।

সঞ্জীব : কেন?

ছন্দা : আর কেনই বা এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাড়িময়।

সঞ্জীব : কেন?

ছন্দা : রঘুদার মৃত্যু।

সঞ্জীব : অ্যাঁ?

ছন্দা : সত্যি বলুন, তাই না? (সঞ্জীব নিরুত্তর) রঘুদা ওঁর কে হতেন আমি জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই খুব নিকট কেউ, খুব প্রিয়জন কেউ। উনি তো আমাদের মতো সাধারণ লোক নন, তাই আমাদের সামনে যতোক্ষণ থাকেন, কিছু বোঝা যায় না। কী বলুন? তাই নয়? (সঞ্জীব নিরুত্তর) আর আপনি—আপনিও নিশ্চয়ই রঘুদাকে খুব ভালবাসতেন। রঘুদার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর থেকেই—

(সঞ্জীব প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল)

সঞ্জীব : প্লীজ! রঘুদার কথা এখন থাক!

ছন্দা : (অল্প পরে) আমাকে মাপ করবেন। আমি বোকার মতো—

সঞ্জীব : না না, না না—সে কথা নয়। কিন্তু—আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমি —আমিও যাই।

ছন্দা : কোথায় যাবেন?

সঞ্জীব : বাড়ি।

ছন্দা : বাড়ি? সেই স্টেশনের কাছে?

সঞ্জীব : হ্যাঁ। স্টেশনের কাছে।

ছন্দা : এই অবস্থায় এতোখানি হাঁটবেন?

সঞ্জীব : এখানে থাকলে অবস্থা আরো খারাপ হবে।

ছন্দা : তাহলে যান। বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

সঞ্জীব : আপনিও তাই করুন। শুয়ে পড়ুন গিয়ে। এরকম করে ঘুরে বেড়াবেন না।

ছন্দা : হ্যাঁ যাই। জেগে থেকেও তো কিছু করতে পারবো না।

সঞ্জীব : কী করবেন আবার?

ছন্দা : একজন সারারাত ধরে বাড়িময় ঘুরে বেড়াবে মনে এক প্রকাণ্ড ভার নিয়ে। মনে হচ্ছিলো সে ভারের সামান্য একটুও যদি ভাগ করে নিতে পারতাম! কিন্তু সাধ্য কী আমার? তার চেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি গিয়ে।

(ছন্দা শয়নকক্ষের দরজার দিকে গেল, সঞ্জীব বাহিরে। কিন্তু সঞ্জীব ফিরিল।)

সঞ্জীব : একটু—একটু দাঁড়াবেন?

ছন্দা : কী?

সঞ্জীব : না, শুধু এক সেকেন্ড দাঁড়ান।

(ছন্দা দাঁড়াইল। সঞ্জীব দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দুইদিকে ভালো করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। তারপর ছন্দার দিকে চাহিল।) ঠিক আছে, এইবার আপনি শুয়ে পড়ুন গে। তাড়াতাড়ি!

(কথাগুলি তাড়াতাড়ি বলিয়া নিজেই খুব তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রান্ত হইল। ছন্দা অল্প বিস্মিত হইয়া বাহিরের দ্বার অবধি আসিল এবং গলা বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিল। সিংহাসনের পিছনে খানিকটা ধোঁয়া জমিতেছে। ধোঁয়া যেন অবয়ব লইতেছে ক্রমে। ছন্দা দরজার বাহিরে গিয়াছে। বারান্দায় খুঁজিতেছে যেন। সিংহাসনের পিছনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রঘুপতি। জরির কাজ করা দীর্ঘ একটি আঙরাখা পরিধানে। মাথায় উষ্ণীষ। কিন্তু এ কি রঘুপতি? না ভূপতি রাজবেশ পরিয়া আসিল? অবিকল এক চেহারা। রঘুপতি নামিয়া আসিল বেদি হতে। এদিক ওদিক চাহিল। যেন কাহাকে লুকাইয়া এখানে আসিয়াছে। ছন্দার প্রবেশ। রঘুপতি প্রথমে চমকাইয়া উঠিল, তারপর উৎসুক দৃষ্টিতে ছন্দাকে দেখিল।)

ছন্দা : রাজাবাহাদুর!

রঘুপতি : স্বপ্নোনু মায়ানু মতিভ্রমোনু ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।

ছন্দা : (মুগ্ধ) আপনি—আপনাকে—আপনি এ পোশাক আগে পরেননি কেন?

রঘুপতি : অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমল বিটপানুকারিনৌ বাহু কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।

ছন্দা : কালিদাস?

রঘুপতি : অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

ছন্দা : তখন যেটা বলছিলেন, মেঘদূতের, আর একবার বলবেন?

রঘুপতি : মেঘদূতম্!

(দৃষ্টি ফিরাইয়া অদৃশ্য যেন কোনও মেঘখণ্ডে রাখিলেন। দুই চোখ চারিশত বৎসরের অপেক্ষা।)

সংক্ষিপ্যতে ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা।

সর্বাবস্থাস্বরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।

(সহসা চোখ ফিরাইয়া ছন্দার চোখে রাখিলেন। বহু রাত্রে আবৃত্তি করা শূন্যগর্ভ শ্লোক যেন উদ্দেশ পাইয়া জীবন্ত হইয়া তীব্র হইয়া উঠিল।)

ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ।।

(ছন্দা সংস্কৃত বোঝে নাই, কিন্তু মনে হয় রঘুপতিকে বুঝিতে তাহার সংস্কৃত বোঝার প্রয়োজন নাই। ছন্দা আবিষ্টভাবে রঘুপতির দিকে অগ্রসর হইল। তাহার দুই বাহু অল্প প্রসারিত, দুই চোখ রঘুপতির চোখে। রঘুপতির অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্লভ প্রার্থনং-এর মাথায় স্বপ্না প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। কৃতমশরণং পর্যন্ত বাক্যস্ফূর্তিই হইল না। ইহাদের কাহারও সেদিকে নজর দিবার অবসর নাই।)

স্বপ্না : (ফাটিয়া পড়িলেন) ছন্দা! (ছন্দা ও রঘুপতি প্রচণ্ড চমকাইয়া উঠিল) যাও, ঘরে যাও!

ছন্দা : মা—

স্বপ্না : চুপ! যাও ঘরে!

(ছন্দা ঘরে গেল। রঘুপতি পায়ে পায়ে সরিতেছিলেন।)

দাঁড়ান, কোথায় যাচ্ছেন? (প্রচণ্ড ধমকে রঘুপতি দাঁড়াইয়া গেলেন) লজ্জা করে না আপনার? ঐটুকু মেয়ে, কিছু বোঝে না—তাকে এরকম করে ভোলাচ্ছেন?

রঘুপতি : না না, না না।

(পিছু হঠিতেছেন। 'না না' ছাড়া আর কিছু বাহির হইতেছে না মুখ দিয়া)

স্বপ্না : না মানে? আমার কান নেই? কেন? কিসের জন্যে সংস্কৃত? এ জমকালো সাজ কিসের জন্যে? (স্বপ্না আগাইয়া গেলেন, যেন পোশাক ধরিয়া টান দিবেন, রঘুপতি চকিতে সরিয়া গেলেন, এবং আর দাঁড়াইলেন না।) দাঁড়ান!

(কিন্তু রঘুপতি চলিয়া গিয়াছেন। শয়নকক্ষ হইতে হালদারের প্রবেশ।)

হালদার : কী, ব্যাপার কী? চেঁচামেচি করছো কেন?

স্বপ্না : না, চেঁচামেচি করবে না! চুপ করে বসে থাকবে!

হালদার : কী হয়েছে কী? ছন্দা বসে কাঁদছে, তুমি এখানে—

স্বপ্না: এক ছোটলোক অসভ্যর বাড়িতে এনে তুলেছো—

হালদার : কী বলছো যা তা?

স্বপ্না : যা তা? তোমার মতো পনেরোশো একষট্টি দেখে আমি তো আর অন্ধ হইনি।

হালদার : আরে কী হয়েছে বলবে তো?

স্বপ্না : হবে আবার কী? তোমার আদুরে কন্যা? পৈ-পৈ করে—

হালদার : ছন্দা?

স্বপ্না : আবার কে? আর ক'টা মেয়ে আছে তোমার?

হালদার : কী করেছে ছন্দা?

স্বপ্না! তুমি পনেরোশো একষট্টি দেখে মজেছো, আর তিনি মজেছেন সংস্কৃত শুনে আর রাজপোশাক দেখে।

হালদার : কার রাজপোশাক?

স্বপ্না : কার আবার? রাজা এখানে ক'টা আছে?

হালদার : রাজাবাহাদুর?

স্বপ্না : বাঃ! এতো তাড়াতাড়ি বুঝে ফেললে?

হালদার : তা রাজপোশাক দেখলে কোথায়? ওটা কি রাজপোশাক?

স্বপ্না : ওটা কেন হতে যাবে? রাজপোশাক তিনি পরেন রাত্রে চুপি চুপি, কচি মেয়েদের মাথা খেতে।

হালদার : তুমি কি বলতে চাও, রাজবাহাদুর—

স্বপ্না : আমি কিচ্ছু বলতে চাই না। যা হয়েছে, যা নিজের চোখে দেখেছি, তাই বলছি।

হালদার : কী দেখেছো?

স্বপ্না : কী দেখেছি? এতোক্ষণ তাহলে বলছি কী?

হালদার : কিছুই তো বলোনি এখনো।

স্বপ্না : বলবো কী? দু'ঘণ্টা ধরে বললেও তোমার মাথায় কিছু ঢুকবে না। তার চেয়ে যাও—তোমার আদুরে মেয়েকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

হালদার : সে তো কাঁদছে বসে!

স্বপ্না : তবে আর কি? কাঁদছে বসে। তবে যাও, তোমার সখের রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করো গে।

হালদার : রাজাবাহাদুরকে?

(কিন্তু স্বপ্না ততোক্ষণে দুম দুম করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। হালদার খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

হালদার : রাজাবাহাদুরকে এখন পাই কোথা?(দরজার কাছে গেলেন। বাহিরে চাহিলেন।) ঐ তো! রাজাবাহাদুর! আরে শুনুন শুনুন, কথা আছে—

(বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন। এক মুহূর্ত পরে ভূপতি প্রবেশ করিল অন্দরের দরজা দিয়া। ক্লান্ত, কিন্তু হাল ছাড়ে নাই। ঘরের আনাচে কানাচে খুঁজিতে লাগিল।)

ভূপতি : (চাপাস্বরে) রঘুদা! রঘুদা!

(স্বপ্নার প্রবেশ)

স্বপ্না : এই যে। ভোল পাল্টে ফেলেছেন দেখছি? (ভূপতি সাংঘাতিক চমকাইয়া উঠিল),

ভূপতি : কী পাল্টে ফেলেছি?

স্বপ্না : ভোল, ভোল। রাজপোশাক।

ভূপতি : (চমকাইয়া) রাজপোশাক? মাথায় পাগড়ি? দেখেছেন আপনি?

স্বপ্না : আকাশ থেকে পড়লেন যে! জিজ্ঞেস করবেন না—কেমন দেখতে?

ভূপতি : (হতাশায়) না, জানি। আমার মতো দেখতে।

স্বপ্না : হ্যাঁ, ঠিক আপনার মতো। আয়নায় আপনাকে যেমন দেখেন, ঠিক তেমনি! সন্ধে থেকে শুনছি—রাজাবাহাদুর, রাজার মেজাজ, রাজার হ্যানো, রাজার ত্যানো—শুধু রাজার চরিত্রটা কী, সে কথা কেউ বলেনি!

ভূপতি : চরিত্র?

স্বপ্না : রাজা যে মাঝরাত্তিরে রাজপোশাক পরে সংস্কৃত আউড়ে কচি মেয়েদের মাথা খাবার চেষ্টায় থাকেন—

ভূপতি : কে—কী—আমি? আমার কথা বলছেন?

স্বপ্না : তবে কার কথা? আর আছে কে এ বাড়িতে?

ভূপতি : অ্যাঁ? (তাড়াতাড়ি) না, আর কেউ তো নেই! আমি, আমিই তাহলে। আর কে হবে?

স্বপ্না : বাঃ! ভাবখানা যেন—যা করেছেন, ভুলে করে ফেলেছেন, টেরও পাননি!

ভূপতি: হ্যাঁ, না, মানে—কী করেছি বলুন তো?

স্বপ্না : দেখুন, আমার কাছে ও সব রাজমার্কা চাল চালাবেন না! আমি রূপকথায় ভুলি না!

(হালদারের প্রবেশ। ভূপতিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।)

হালদার : এ কী, আপনি এখানে?

ভূপতি : হ্যাঁ, আমি—

হালদার : আপনার পোশাক?

স্বপ্না : পোশাক আর কী হবে? পোশাক ছেড়ে এখন—

হালদার : কিন্তু আমি যে এইমাত্র বারান্দায়—

স্বপ্না : এখন বোঝাবার চেষ্টা—সে আমি নই, আমার চেহারার আর কেউ।

হালদার : (ভূপতিকে) আর কেউ?

ভূপতি : কে, কে আর কেউ?

হালদার : ঐ যাকে এইমাত্র দেখলাম বারান্দায়। ঠিক আপনার মতো চেহারা, কিন্তু জরির কোট, মাথায় পাগড়ি—

স্বপ্না : আচ্ছা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি? যাকে দেখেছো—সে এ-ই। এখন ভোল পাল্টে এসেছে—

হালদার : না না। তা কী করে হবে? আমি যে দেখলাম—

ভূপতি : আপনি—আপনি ভুল দেখেছেন।

হালদার : ভুল দেখেছি? স্পষ্ট দেখলাম—জরির কোট, মাথায়—

ভূপতি : সে আমি-ই।

হালদার : তিনি গেলেন ওদিকে, আর আপনি এখানে—

স্বপ্না : তোমার হয়েছে কী বলো তো? নিজের মুখে স্বীকার করছে, তুমি দোষ ঢাকতে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ছো কেন?

হালদার : কী আশ্চর্য! দোষ ঢাকা আবার কী?

স্বপ্না : দোষ ঢাকা ছাড়া কী? কেন, এ বাড়িটা না হলে বুঝি কিছুতেই চলে না? মেয়ের চেয়েও এ বাড়িটা বড়ো হোলো তোমার কাছে?

ভূপতি : (আর্তনাদে) বাড়ি! বাড়িটা—

হালদার : (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) কেন, কেন, বাড়ির কথা উঠছে কেন? বাড়ির কী হয়েছে?

স্বপ্না : বাড়ির কথা ছাড়া কী? খুব ভয় হয়েছে বুঝি মনে—বাড়িটা যদি না বেচে? তাই মেয়ের কথাও ভুলতে বসেছো?

হালদার : না বেচে মানে? বাড়ি তো বেচে দিয়েছেন! কী বলুন? বেচেন নি?

ভূপতি : নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

হালদার : তবে? (স্বপ্নাকে) কথা দিয়েছেন। এখন বেচবেন না বলতে পারেন কখনো?

ভূপতি : না না, তা কখনো হয়?

হালদার : তবে? ঐ শোনো। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো—

স্বপ্না : (প্রায় ফাটিয়া) ভয় পাচ্ছি কি তোমার এই ছাইভস্ম বাড়ির জন্যে? ভয় পাচ্ছি তোমার মেয়ের জন্যে!

হালদার : কেন, মেয়ের কী হোলো?

স্বপ্না : কী হোলো তা তোমার ঐ রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করো না! যে সংস্কৃত আউড়ে, পাগড়ি পরে মেয়েটার কাঁচা মাথাটা চিবিয়েছে—

হালদার : না না, পাগড়ি—সে ইনি নন, আমি দেখলাম বারান্দায় এইমাত্র—

ভূপতি : না মিস্টার হালদার। উনি ঠিকই বলছেন।

হালদার : ঠিক বলছেন?

ভূপতি : হ্যাঁ ঠিক বলছেন। আমি অন্যায় করেছি।

(ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল ছন্দা)

ছন্দা কিছু অন্যায় করেননি আপনি। কোনো অন্যায় করেননি।

স্বপ্না ছন্দা!

ছন্দা কেন আপনি অপমান সহ্য করবেন আমার জন্যে? কেন?

স্বপ্না ছন্দা তুই—

ছন্দা (কর্ণপাত না করিয়া) আপনার ঘরে আপনি এসেছেন—সেটা অন্যায়? আমি আবৃত্তি শুনতে চেয়েছি, সেটা আপনার অন্যায়?

স্বপ্না বাজে কথা বলিসনি ছন্দা। আমি কিছু দেখিনি ভাবছিস?

ছন্দা কী দেখেছো তুমি?

স্বপ্না ঐ রকম করে কেউ শ্লোক শোনায়?

চন্দা কী রকম করে শুনি? আমার কড়ে আঙুলটা পর্যন্ত ছোঁন নি উনি।

ভূপতি : তা ঠিক। ছোঁওয়া সম্ভব ছিল না।

স্বপ্না : আপনি নিজেই বলুন না! অন্যায় করেছেন কি করেন নি!

ছন্দা : কোনো অন্যায় করেন নি!

স্বপ্না : তুই চুপ কর। (ভূপতিকে) কই বলুন? সাহস থাকে বলুন—কোনো অন্যায় করেননি!

ভূপতি : (ধীরে ধীরে) আপনি যদি বলেন অন্যায় করেছি—মেনে নেবো।

স্বপ্না : দেখলি!

ছন্দা : মেনে নেবেন? কেন মেনে নেবেন?

ভূপতি : না মেনে উপায় কী? আমি তো জানি না, আমি কী করেছি!

স্বপ্না : নাঃ, সব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে করেছেন। (ভূপতি পথ পাইয়া গেল)

ভূপতি : ঠিক তাই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই করেছি। আমি সোম্‌নাম্‌বুলিস্ট।

স্বপ্না : কী বুলিস্ট?

ভূপতি : সোম্‌নাম্‌বুলিস্ট। ঘুমের মধ্যে আমি উঠি, হাঁটি, চেঁচাই, শ্লোক আওড়াই—কিছু টের পাই না। সব না জেনে করি।

ছন্দা : (পাংশু) সব না জেনে?

হালদার : দ্যাট্‌স্ ইট্! তাই ভাবছিলাম—ওরকম হাসি নইলে—(আবার মনে পড়িল) না কিন্তু—ঐ যে বারান্দায় দেখলাম পাগড়ি মাথায়—

ভূপতি : (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ হ্যাঁ, পাগড়িও পরি, জরির কোট পরি—সব ঘুমের মধ্যে—

হালদার : কিন্তু সে যে ঐদিকে গেলো—

ভূপতি : হ্যাঁ, ওদিকেও যাই—

হালদার : হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো এ ঘরে এলেন—

ভূপতি : হ্যাঁ হ্যাঁ, এ ঘরেও আসি—

হালদার : কিন্তু তা কী করে সম্ভব হয়?

ভূপতি : হয় হয়, ঘুমের মধ্যে সবই সম্ভব হয়।

হালদার : কিন্তু এর মধ্যে পোশাক বদলে এ ঘরে আসা—

ভূপতি : ঘুমের মধ্যে মানুষ ভীষণ তাড়াতাড়ি পোশাক বদলায়, আপনি জানেন না—

(ছন্দা সহসা মুখ ঢাকিয়া ঘরে চলিয়া গেল)

স্বপ্না : ছন্দা!

(স্বপ্নাও পিছন পিছন গেলেন)

ভূপতি : কী হোলো ওর?

হালদার : কী জানি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—তখন থেকে কান্নাকাটি চেঁচামেচি—আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ভূপতি : মিস্টার হালদার, আমি ঘুমের মধ্যে একটা অন্যায় করেছি হয় তো, কিন্তু তার জন্যে—

হালদার : না না, আপনি কী করেছেন? যা করবার করেছে নিশ্চয়ই ঐ যাকে দেখলাম—পাগড়ি মাথায়, জরির কোট—

ভূপতি : সে তো আমিই—

হালদার : (দৃঢ়স্বরে) না মিস্টার রায়! আমি ও কান্নাকাটি চেঁচামেচি বুঝি না। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখেছি, সেটা বুঝি।

ভূপতি : (দুর্বল স্বরে) বোঝেন?

হালদার : নিশ্চয়ই। শুনুন, আমি এই দরজায় এই খানটা দাঁড়ালাম। (বাহিরের দরজায় গিয়া দেখাইলেন) এদিকে তাকালাম, কেউ নেই। ওদিকে তাকালাম—পাগড়ি, জরির কোট, আপনার মতো চেহারা। ডাকলাম, চলে গেলেন। ঐ দিকে, মাইন্ড ইউ—ঐ দিকে, এদিকে নয়। আমি পেছন পেছন গেলাম। ঐ দিকে গেলাম—মাইন্ড ইউ। বারান্দাটা যেখানে ঘুরে গেছে বাঁদিকে, তিনি সেখানে বেঁকলেন। আমি ঐ বাঁকের মুখে গেলাম। আর দেখতে পেলাম না। ফিরে এলাম। এই দিকে ফিরে এলাম—মাইন্ড ইউ, দেখতে পাচ্ছি এ দরজাটা—কেউ নেই। ঘরে ঢুকলাম। কী দেখলাম ঢুকে?

ভূপতি : (প্রায় ফিস ফিস করিয়া) আমাকে।

হালদার : ইয়েস, আপনাকে। কোন্ দিক থেকে তা হলে এলেন আপনি? বলুন?
(ভূপতি নিরুত্তর)
অ্যান্ড মাউন্ড ইউ, নো পাগড়ি, নো জরির কোট। সেম্ ওল্ড পোশাক, যা সন্ধে

থেকে দেখছি! কী করে হোলো?

ভূপতি : (দুর্বল শেষ চেষ্টা) ঘুমের মধ্যে—

হালদার : ঘুমের মধ্যে কি বারান্দার ঐ কোণা থেকে এই ঘরে উড়ে আসা যায়? আর উড়ে এলেও সে আমি দেখতে পাবো না সে কি সম্ভব? বলুন?

ভূপতি : (হাল ছাড়িয়া) না।

হালদার : (বিজয়ী) এক্স্যাক্টলি। ওরা চেঁচামেচি করবে—ভেবে দেখবে না। তা হলে দাঁড়ালো কী? ঐ পাগড়ি আর জরির কোট আপনি না। তার মানে? তার মানে সে অন্য কেউ। ঠিক কিনা?

ভূপতি : হ্যাঁ, ঠিক।

হালদার : এবং অন্য কেউ নিশ্চয়ই ছন্দাকে—মানে ছন্দাকে—অর্থাৎ অল্ দিস্ কান্নাকাটি অ্যান্ড চেঁচামেচি—তার মূলে হচ্ছে দিস্ অন্য কেউ, নট্ ইউ। ঠিক কি না?

ভূপতি : হ্যাঁ, ঠিক।

হালদার : হতেই হবে ঠিক: এ সব ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখবার জিনিস। কান্নাকাটি চেঁচামেচি করে বোঝা যাবে এ সব? এখন বলুন, কে সে? (ভূপতি নিরুত্তর) আর কেনই বা তার দোষ আপনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন এমন করে? (ভূপতি নিরুত্তর) বলুন? হু ইজ দ্যাট্—অন্য কেউ?

ভূপতি : (হাল ছাড়িয়া) রঘুদা!

হালদার . রঘুদা? আপনার দাদা?

ভূপতি : না। আমার পূর্বপুরুষ।

হালদার : পূর্ব—(উপলব্ধি করিয়া) পূর্বপুরুষ?

ভূপতি : হ্যাঁ, রঘুপতি। রমাপতি ভুইঞার ছেলে। এই বাড়ি যে তৈরি করেছিলো, তার নাতি।

হালদার : তার মানে? এ বাড়ি তো তৈরি হয়েছে পনেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে?

ভূপতি : হ্যাঁ। রঘুদা মারা গেছে পনেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে।

হালদার : কাম অন নাও মিস্টার রায়। বী সীরিয়াস।

ভূপতি : সত্যি কথাই বলছি। এতোক্ষণ অনেক মিথ্যে কথা বলে চাপা দেবার চেষ্টা করেছি। আর লাভ নেই।

হালদার : ডু ইউ মীন টু সে—দিস্ রঘুপতি—অর্থাৎ আপনার এই রঘুদা—ভূত?

ভূপতি : হ্যাঁ। একটা বাজে অন্যায় অভিশাপ মাথায় করে চারশো বছর ধরে বেচারা আটকে আছে এ বাড়িতে। আমাকেও আটকে রেখেছে।—এই নিন।

হালদার : কী?

ভূপতি : আপনার চেক।

হালদার : চেক? চেক কিসের? চেক কেন?

ভূপতি : আপনার দশহাজারের চেক। আপনাকে ঠকিয়ে বাড়ি বেচেছিলাম।

হালদার : ঠকিয়ে? মিঃ রায়—আই মাস্ট কনফেস্। আমি আপনাকে ঠকিয়েছি।

ভূপতি : আপনি? আমাকে?

হালদার : ইয়েস, আমি। আপনাকে। আপনার এ বাড়ির দাম পঁচিশ হাজারের অনেক

বেশি! চৌধুরী আপনাকে অনেক বেশি দিতো। তবে স্বেচ্ছায় দিতো না, মাইন্ড ইউ! স্বেচ্ছায় দেবার মতো লোক চৌধুরী নয়। কিন্তু আমি—পঁচিশ হাজার অফার দিয়ে অবধি আমার বিবেক শান্ত হচ্ছিল না। বিশেষ করে যখন আপনি দশ হাজারের বেশি নিলেন না।

ভূপতি : কিন্তু মিস্টার হালদার, তখন তো আপনি রঘুদার কথা জানতেন না—

হালদার : এক্স্যাক্টলি। পনেরোশো একষট্টি দশ হাজারে কেনা যথেষ্ট অন্যায়। কিন্তু পনেরোশো একষট্টি প্লাস রঘুদা দশ হাজারে কেনা—দ্যাট্স্ এ ক্রাইম! সে পাপ!

ভূপতি : মিস্টার হালদার, আপনি—

হালদার : সাবান বানাই বলে কি আমার বিবেক বলে কিছু নেই? পাপপুণ্য বোধ নেই?

ভূপতি : আপনি—আপনি বলতে চান—ভূতে আপনার আপত্তি নেই?

হালদার : আপত্তি! কী বলছেন কী? চৌধুরী আজ দু'শো সাতষট্টি পেয়েছে, কাল হয়তো পাঁচশো সাতষট্টি খুঁজে বার করবে! চিরদিন ও আমাকে টেক্কা মেরে যায়, সেই ইস্কুল থেকে দেখছি। কিন্তু ভূত? ভূত কোথায় পাবে ও? জেনুইন্ ভূত, আমার নিজের চোখে দেখা!—কী হোলো আপনার?

(ভূপতি এলাইয়া পড়িয়াছিল)

ভূপতি : না, কিছু না। মাথাটা কী রকম ঘুরে উঠেছিলো। বলুন, কী বলছিলেন।

হালদার : দু'টো অনুরোধ আছে।

ভূপতি : বলুন!

হালদার : এক নম্বর—আপনাকে অন্তত আরো চল্লিশ নিতে হবে।

ভূপতি : আরো চল্লিশ হাজার?

হালদার : তাতেও রঘুদার দাম হয় না, তবু আমার বিবেক খানিকটা শান্ত হবে। বলুন নেবেন?

ভূপতি : আপনার যদি ভূতে আপত্তি না থাকে, আমরা আর নিতে আপত্তি কী?

হালাদর : থ্যাঙ্ক ইউ! দ্বিতীয়ত—স্বপ্না আর ছন্দা যেন এখন কিছু জানতে না পারে! আসছে রবিবার চৌধুরীকে এনে পনেরোশো একষট্টি দেখাবো, রঘুদা দেখাবো! ব্যাস্ আর কিছু চাই না। অতএব আপাতত ওদের বললে চলবে না। বিশেষ করে স্বপ্না। রাজি?

ভূপতি : এতে আর রাজি না হবার কী আছে?

হালদার : আছে বৈ কি! ওরা আপনার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকবে—

ভূপতি : তাতে আমার আপত্তি নেই।

হালদার : আপনি নোব্‌ল্ রাজাবাহাদুর, আপনি মহান্।—আচ্ছা, রোজ রাত্তিরেই উনি বেরোন?

ভূপতি : রোজ। এগারোটার পর। ভোর অবধি।

হালদার : ঐ পাগড়ি আর জরির কোট?

ভূপতি : হ্যাঁ।

হালদার : আর ঐ যে হাসি—সে নিশ্চয়ই আপনার নয়?

ভূপতি : না, রঘুদা। ..

হালদার : সংস্কৃত শ্লোক?

ভূপতি : সেও রঘুদা। আমি সংস্কৃতয় ম্যাট্রিকে সাঁইত্রিশ পেয়েছিলাম।

হালদার : ক্যাপিট্যাল! ক্যাপিট্যাল! সেট্‌ল্ড তাহলে? আঃ, আমার যে কী ফূর্তি হচ্ছে, আপনাকে কী বলবো!

ভূপতি : কিন্তু—একটা কথা!

হালদার : অবার কী কথা?

ভূপতি : আজ রাত্রেই যদি রঘুদা আবার হাসে, কিংবা শ্লোক আওড়ায়? তাহলে তো ওঁরা টের পেয়ে যাবেন?

হালদার : অ্যাঁ? তাই তো!

ভূপতি : না, পাবেন না। আমি চললাম। আপনি বলে দেবেন—রাজাবাহাদুর আবার ঘুমোচ্ছে!

হালদার : ঘুমোচ্ছে?

ভূপতি : না ঘুমোলে শ্লোক আওড়াবো কী করে? চললাম, কাল সকালে দেখা হবে।

(ভূপতির অন্দরমহলে প্রস্থান)

হালদার : দি আইডিয়া! ঘুমোচ্ছে! রাজাবাহাদুর ঘুমোচ্ছে!

(ঝড়ের মতো স্বপ্নার প্রবেশ)

স্বপ্না : কই, কোথায় গেলো?

হালদার : ঘুমোচ্ছে! মানে, ইয়ে—ঘুমোতে গেছেন।

স্বপ্না : ঘুমোতে গেছে না আরো কিছু! গেছে পাগড়ি পরতে! তুমি কি এমনি চুপ করে বসে থাকবে?

হালদার : কোথায় চুপ করে বসে আছি?

স্বপ্না : এতোক্ষণ করেছো কী বসে?

হালদার : এতোক্ষণ—সব—এই বাড়িটার সব ব্যবস্থা—

স্বপ্না : বাড়িটার ব্যবস্থা! বাড়ি যাড়ি করে জ্ঞান হারিয়েছো তুমি! কিনতে হবে না তোমায় এ বাড়ি!

হালদার : কী বলছো!

স্বপ্না : না! কেনা চলবে না এ বাড়ি! এই বাড়িতে এসে অবধি মেয়েটা বিগড়েছে। মুখের উপর এমন সব কথা বলছে—কোনোদিন শুনি নি!

হালদার : কিন্তু—বাড়িটার কী দোষ হোলো?

স্বপ্না : এ বাড়ি কিনলে ঘর-সংসার সব ভুলবে তুমি!

হালদার : না না, তা কেন হতে যাবে? আমি—

স্বপ্না : হতে যাবে কী? হয়ে বসে আছে দেখতে পাচ্ছি! কিনতে হবে না এ ভূতুড়ে বাড়ি!

হালদার : (ব্যস্ত হইয়া) ভূতুড়ে বাড়ি? ভূত—ভূত তুমি দেখেছো না কি? কখন দেখলে?

স্বপ্না : ঐ দেখো। এই বাড়ি দেখে অবধি তোমারও মাথা খারাপ হয়েছে! বলি—এরকম পোড়ো বাড়িকে ভূতুড়ে বাড়ি ছাডা আর কী বলে লোকে?

হালদার : তাই বলো। কথার কথা! ভুত কেন থাকবে? পুরোনো বাড়ি হলেই কি ভূত থাকে? আমি কি না দেখেশুনে কিনছি?

স্বপ্না : তুমি কিনছো না।

হালদার : অ্যাঁ?

স্বপ্না : তুমি কিনছো না এ বাড়ি! বাংলা কথা বুঝতে কতোক্ষণ লাগে তোমার?

হালদার : কী যা তা বলছো?

স্বপ্না : কিচ্ছু যা তা বলছি না। বাড়ি যদি কেনো—আমার মাথার দিব্যি রইলো।

হালদার : স্বপ্না!

(কিন্তু স্বপ্না চলিয়া গিয়াছে। হালদার বসিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে ভূপতির প্রবেশ।)

ভূপতি : মিস্টার হালদার—

হালদার : কে? ও আপনি! সর্বনাশ হয়ে গেছে। স্বপ্না—

ভূপতি : হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

হালদার : শুনেছেন?

ভূপতি : ওঁর গলা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। (এক মুহূর্ত নীরবতা) মিসেস হালদারের মত বদলাবার কোনো সম্ভাবনা আছে?

(হালদার ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বোঝা গেল—সম্ভাবনা নাই।)

চেক্‌টা কি ফেরৎ দেবো?

হালদার : (যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ স্বরে) একবার চৌধুরীকে যদি দেখাতে পারতাম!

(ভূপতি আস্তে আস্তে চেকটা বাহির করিয়া দিল। হালদার লইতেও পারিলেন না, আপত্তিও করিতে পারিলেন না। ভূপতি চেকটি হালদারের অনড় হাতে গুঁজিয়া দিল।)

ভূপতি : এই বোধহয় হবার কথা। বাড়ির সঙ্গে রঘুদাকে শুদ্ধু বেচে দেবার আমার হয়তো অধিকার ছিল না।

হালদার : (অসহায়ভাবে) রাজাবাহাদুর—আমি—

ভূপতি : (দৃঢ়স্বর) আপনি ঘরে যান মিস্টার হালদার। রঘুদা অনেক ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছে। গিয়ে সামলাতে পারেন কি না দেখুন।

(হালদার ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গেলেন। ভূপতি একটি সিগারেট ধরাইল।)

এইবার যতো ইচ্ছে কাব্য আওড়াও রঘুদা। এ বাড়ি তোমার আর আমার—যেমন ছিল চিরকাল।(রঘুদার সাড়া পাওয়া গেল না) কই, চুপ করে রইলে কেন? (রঘুদা নিরুত্তর) তোমার লুকিয়ে থাকা বার করছি আমি! আজ আমি তোমায় কাব্য শোনাবো সারারাত্তির। দেখবে তখন ছিষ্টি ছ্যাঙা ছপাটি—

(ভূপতি অন্দরের দরজার দিকে গেল। বাহির হইবার পূর্বেই পর্দা নামিয়া আসিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(একই ঘর। ভোররাত্রি। সিংহাসনের পায়ের কাছে ছন্দা চুপ করিয়া বসিয়া। চুপ করিয়া, কিন্তু উৎকর্ণ যেন। একবার উঠিল। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া দরজা অবধি গেল। কিন্তু বাহিরে যাইতে পারিল না। ফিরিয়া আসিল। আবার বসিল। তারপর আবার চমকাইয়া শুনিল কান পাতিয়া। পদশব্দ যেন। ভূপতি আসিল ঘরে। একরাশ ক্লান্তি লইয়া। সিগারেট আনিতে গেল টেবিলে। তখন দেখিল ছন্দাকে। দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল।)

ভূপতি : এ কী! আপনি? (ছন্দা শুধু চাহিয়া রহিল) আপনি, আপনি এখানে বসে যে? (ছন্দা উঠিল)

ছন্দা : আপনার অসুবিধে হলে যাচ্ছি।

ভূপতি : না না, আমার—আমার কী অসুবিধে? আমি—আমিই যাচ্ছি—

ছন্দা : কেন?

ভূপতি : কেন কী?

ছন্দা : আপনার ঘর, আপনি যাবেন কেন?

ভূপতি · না, মানে—

ছন্দা : আমার মায়ের ভয়ে?

ভূপতি : হ্যাঁ—কতকটা তাই বটে।

ছন্দা : কিসের জন্যে ভয়? কী করেছেন আপনি?

ভূপতি : ঘুমের মধ্যে কী করেছি তা যদি—

ছন্দা : কেন বাজে কথা বলছেন? ঘুমের মধ্যে নয়।

ভূপতি : ঘুমের মধ্যে নয়?

ছন্দা : না, নয়! আপনি যা করেছেন—জেগে করেছেন। জেনেশুনে করেছেন।

ভূপতি : জেনেশুনে?

ছন্দা : হ্যাঁ জেনে-শুনে! অথচ সব ভান! স্বীকার করতে পারলেন না যে—কোনো অন্যায় করেননি। কাপুরুষের মতো পালালেন।

ভূপতি : কাপুরুষ?

ছন্দা : হ্যাঁ, কাপুরুষ। এই কথাটা আপনাকে মুখের উপর বলবার জন্যে এতোক্ষণ এখানে বসে আছি। আপনার মতো কাপুরুষ আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এর পরেও যেন না দেখতে হয়।

(দ্রুত চলিয়া গেল শয়নকক্ষে)

ভূপতি : বাঃ রঘুদা! বাঃ! তুমি প্রেম করে পালালে—আর আমি হলাম কাপুরুষ? (বসিয়া পড়িল, তারপর সহসা উপলব্ধি আসিল।) আরে! আমি এখনো চেপে যাচ্ছি কেন? আর চেপে লাভ কী?

(মনোহর ও সঞ্জীবের বাহির হইতে প্রবেশ)

এই যে মনোহর! আর চেপে যাবার কোনো দরকার আছে?

মনোহর : কী চেপে যাবার?
ভূপতি : সঞ্জীব? মানে হয় চেপে যাবার? মুখের উপর কাপুরুষ বলে গেলো—আর আমি ঢোক গিলে বসে রইলাম?
সঞ্জীব : কী হয়েছে কী?
ভূপতি : হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! রঘুদা সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে!
সঞ্জীব : টের পেয়ে গেলো বুড়ো?
ভূপতি : আরে বুড়ো টের পেয়ে তো ভালোই হয়েছিলো। রঘুদার জন্যে দর বাড়িয়ে দিলো আরো!
সঞ্জীব : তবে?
ভূপতি : গিন্নী! বাড়ি কেনা হবে না—বলে দিয়েছে।
সঞ্জীব : অ্যাঁ?
ভূপতি : আর রঘুদাও তেমনি। চারশো বছর বয়স হোলো, এখনো—ছি ছি ছি।
ভূপতি : কী করলো কী?
মনোহর : বুঝিছি, দিদিমণি?
ভূপতি : আর বলিস নি! বুড়ো বয়সে—
মনোহর : ওনাদের কি আর বয়স হয়?
ভূপতি : (সঞ্জীবকে) তুই পালিয়ে গিয়ে আরো সব গণ্ডগোল করে দিলি—
সঞ্জীব : কেন আমি, আমি কী করতাম থেকে—
ভূপতি : আরে, তুই ঘরে থাকলে রঘুদা সাহস পেতো আসতে?
সঞ্জীব : (প্রায় হতবাক) আমি থাকলে—রঘুদা সাহস পেতো না?
ভূপতি : কী করে পেতো? ফাঁকা ঘর পেয়ে যা তা করে গেলো!
সঞ্জীব : একটু খুলে বলবি? কী করে গেলো?
ভূপতি : আরে কী করে গেলো তা কি আমি জানি ছাই?
সঞ্জীব : জানিস না?
ভূপতি: কী করে জানবো? আমি কি ছিলাম নাকি ওখানে? আমি থাকলে ওসব হতে পারতো?
সঞ্জীব : কী হতে পারতো?
ভূপতি : নাঃ তোর মাথায় যদি একটা জিনিস ঢোকে!
সঞ্জীব : কী করে ঢুকবে? তুই একবার বলছিস—কিছু জানিস না, আবার বলছিস যা তা কী সব হয়ে গেলো।
ভূপতি : তা কোন্‌টা ভুল বলেছি? যা তা কিছু না হলে অমন কান্নাকাটি হয়?
সঞ্জীব : কান্নাকাটি?
ভূপতি : গিন্নীই বা নইলে অমন ক্ষেপবে কেন?
সঞ্জীব : গিন্নী—ক্ষেপেছে?
ভূপতি : (ধৈর্যের সীমায়) তা না ক্ষেপলে খামোকা বাড়ি কেনা বন্ধ করতে যাবে কেন?
সঞ্জীব : না, আমি ভেবেছিলাম রঘুদাকে দেখে ভয়ে বুঝে—
ভূপতি : ভয়? রঘুদাকে? হা ভগবান! বলে রঘুদা কেঁচো হয়ে কোথায় লুকোবে ভেবে

পাচ্ছে না—

সঞ্জীব : রঘুদা কেঁচো হয়ে—? ভূপতি, একটু দাঁড়া! আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে!

ভূপতি : সহজ কথা চিরদিনই তোর গুলিয়ে যায়! আমাদের পরীক্ষাটা সহজ হলে তুই বোধ হয় পাস করতে পারতিস না!

মনোহর : বুঝিছি।

ভূপতি : বুঝবি নে কেন? না বোঝবার কী আছে?

সঞ্জীব : মনোহর, তবে তুমিই আমাকে বলো। তোমার মনিবের কথা জ্যোতিষ না জানলে বোঝা যায় না।

ভূপতি : বা বা বা—তখন থেকে আমি—

সঞ্জীব : তুই থাম্।

মনোহর : হয়েছে কী—গিন্নীমা ভেবেছেন রাজাবাবুই বুঝি দিদিমণিকে—

ভূপতি : তুই কী শুরু করেছিস মনোহর? গিন্নীমা, দিদিমণি—যেন সব ঘরের লোক!

মনোহর : তা আর কী করে বলবো? তোমাদের মতো মিস্টার মিসিস্ আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না বাপু!

সঞ্জীব : আঃ! তুমি বলো মনোহর, গিন্নীমা কী ভেবেছেন বলো।

মনোহর : মানে তেনার চেহারা অবিকল রাজাবাবুর মতো কি না, তাই—

সঞ্জীব : তাই না কি? অবিকল তোর মতো?

ভূপতি : কাল থেকে তোকে বলছি কী তবে?

সঞ্জীব : কাকে কী বলেছিস তুই জানিস, আমায় কিছু বলিস নি।

ভূপতি : বলিনি? পুরো ইতিহাস শোনালাম তোকে—

সঞ্জীব : হ্যাঁ ইতিহাস বলেছিস। চেহারার কথা বলিসনি।

ভূপতি : বললেই হোলো? বললাম না তোকে—রঘুদার চেহারা মোটেই খারাপ নয়?

সঞ্জীব : চেহারা খারাপ না হলেই তোর মতো হবে সেটা কী করে বুঝবো?

ভূপতি : কেন? কেন? আমার চেহারা কি খারাপ?

সঞ্জীব : আ গেলো যা! তোর চেহারা—

(সহসা ছন্দার প্রবেশ)

হুঁ-হুম্—চেহারা—আপনার চেহারাটা বড়ো খারাপ দেখাচ্ছে রাজাবাহাদুর। রাতে ভালো ঘুম হয়নি বোধ হয়?

ভূপতি : (ছন্দাকে দেখে নাই) কী হোলো তোর?

সঞ্জীব : (অগত্যা ছন্দাকে) নমস্কার। (ভূপতি চমকাইয়া ফিরিল)

ছন্দা : (সঞ্জীবকে) নমস্কার। আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে। বাবা মা যদি আমার খোঁজ করেন—বলে দেবেন আমি গাড়িতে আছি। (ভূপতিকে যেন দেখিতেই পাইল না। দরজার দিকে গেল।)

ভূপতি : মিস হালদার! মানে—ছন্দা দেবী—

ছন্দা : মিস হালদারই বলুন। ছন্দা দেবী আপনার মুখে মানায় না।

ভূপতি : অ্যাঁ? আচ্ছা, আচ্ছা বেশ, মিস হালদার। (থামিয়া গেল।)

ছন্দা : আর কিছু বলবার আছে?

ভূপতি : আর কিছু মানে? কিছুই তো বলিনি এখনো!
ছন্দা : তবে একটু তাড়াতাড়ি বলুন দয়া করে।
ভূপতি : আমি—আমি কাপুরুষ নই, বুঝলেন?
ছন্দা : তা হবে। আপনি হয়তো পালাননি—আমার চোখের ভুল!
ভূপতি : যে পালিয়েছিলো—সে আমি নই! সে আর একজন।

(সঞ্জীব ও মনোহর ভূপতিকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে অসম্ভব।)

ছন্দা : তখন বললেন—আপনিই—ঘুমোচ্ছিলেন। এখন বোধ হয় বলতে চাইছেন, আপনার যমজ ভাই?
ভূপতি : যমজ ভাই হতে যাবে কেন?
ছন্দা : যমজ ভাইদেরই তো একরকম চেহারা হয় শুনেছি।
ভূপতি : যমজ ভাই না হলেও একরকম চেহারা হতে পারে! রঘুদাই তার প্রমাণ!
ছন্দা : রঘুদা?
ভূপতি : রঘুদা এসে আপনার সঙ্গে—মানে আপনাকে—কী বলে গেলো—আর আপনার মায়ের ভয়ে পালিয়ে গেলো—আর আপনি—
ছন্দা : আপনার বোধ হয় মনে নেই, কাল রাত্রে বলেছিলেন আপনার রঘুদা মারা গেছেন।
ভূপতি : মারা তো গেছেই! আকবরের আমলের লোক—এখনো বেঁচে থাকবে না কি?
ছন্দা : আকবরের আমল?
ভূপতি : আকবরের আমল হোলো না? ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দ। আকবরের রাজত্বকাল ধরুন ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫! তবে?
সঞ্জীব : আমি বলছি, শুনুন—
ভূপতি : তুই চুপ কর! তুই আরো গুলিয়ে দিবি—
ছন্দা : তুই?
সঞ্জীব : হ্যাঁ, ইয়ে—রাজাবাহাদুর অনেক সময়ে স্নেহ করে আমাকে—
ভূপতি : তুই কিসের জন্যে আর লুকাচ্ছিস বল্ তো সঞ্জীব?
মনোহর : রাজাবাহাদুর!
ভূপতি : এই দ্যাখো! ইনি আবার সময় বুঝে রাজাবাহাদুর ঝাড়তে শুরু করলেন!
মনোহর : (ছন্দাকে, হাতজোড় করিয়া) আমাকে যদি দু'টো কথা বলবার অনুমতি করেন তো বলি।
ছন্দা : কী?
মনোহর : কাল রাত্রে আপনি রাজপোশাক পরা যাঁকে দেখেছেন—তিনি রাজাবাহাদুর নন। তিনি যুবরাজ ছিলেন চারশো বছর আগে, প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন।
ভূপতি : কী প্রাপ্ত হয়েছেন?
মনোহর : (গ্রাহ্য না করিয়া) তেনার চেহারা আজ্ঞে অবিকল রাজাবাহাদুরের মতো। ভুল হওয়া স্বাভাবিক।
ছন্দা : তুমি কি বলতে চাও রঘুদা, রঘুদা—
মনোহর : আজ্ঞে হ্যাঁ, ভূত। সহজ কথায় আমরা ভূতই বলি। তেনার পিতা-ঠাকুরের

অভিশাপ ছিল কিনা?

ছন্দা : আপনারও কি তাই অভিমত দেওয়ান সাহেব?

সঞ্জীব : মানে—অভিমতের প্রশ্ন তো নয়, ব্যাপারটা এইরকমই। তবে—

ছন্দা : আপনার তিন মাথা এক হয়ে এর চেয়ে ভালো একটা গল্প তৈরি করতে পারলেন না?

ভূপতি : গল্প? ঐ যে বিদঘুটে হাসি শুনলেন কাল রাত্তিরে—সেটা গল্প? সংস্কৃত শ্লোক শুনলেন—সেটা গল্প?

ছন্দা : হ্যাঁ—এই একটা কথা স্বীকার করছি।

ভূপতি : স্বীকার করতেই হবে!

ছন্দা : কাপুরুষই হোন আর যাই হোন, সংস্কৃত কাব্য আপনি সত্যিই ভালো আবৃত্তি করেন।

ভূপতি : আমি? আমি সংস্কৃতর 'স' জানি না—

ছন্দা : জানেন রাজাবাহাদুর। খুব জানেন। যখন কোন দায়িত্বের প্রশ্ন থাকে না, ভবিষ্যতের চিন্তা থাকে না—তখন সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু আপনার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ভূপতি : আপনি—

ছন্দা : আর যখন কেউ জানতে পারে—তখন মুখ দিয়ে গল্প ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

ভূপতি : আপনি— (কিন্তু ছন্দা রীতিমতো উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে)

ছন্দা : কী দরকার ছিল পালাবার? কী দরকার ছিল চোরের মতো 'অন্যায় করেছি' বলবার? কী ভেবেছিলেন আপনি? আমাকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে?

ভূপতি : অ্যাঁ?

ছন্দা : বলতে পারলেন না আপনি—ভালো লেগেছে, তাই কাব্য শুনিয়েছি? আর কোনো উদ্দেশ্য—

(ছন্দা সহসা উপলব্ধি করিল কী বলিতেছে। থামিয়া গেল। কিন্তু চোখে জল আসিয়া গিয়াছে। সেটা থামানো অতো সহজ হইল না। অতএব ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি সঞ্জীবের দিকে চাহিল, সঞ্জীব অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল। ভূপতি মনোহরের দিকে চাহিল। মনোহর অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। ভূপতি পুনরায় সঞ্জীবের দিকে চাহিল। সঞ্জীব ভ্রূ এবং দুই কাঁধ একবার উঁচু করিয়া সিগারেট লইতে গেল।)

ভূপতি : তোরা একটা কিছু বলবি তো? (সঞ্জীব সিগারেট লইয়া ভূপতির দিকে প্যাকেটটি বাড়াইয়া দিল। ভূপতি মনোহরের দিকে চাহিল।)

মনোহর : চা করে আনি।

(প্রস্থান করিল। যাইবার আগে একবার ঘাড় ফিরাইয়া ভূপতিকে দেখিয়া গেল।)

ভূপতি : কী বলতে চাস, শুনি?

সঞ্জীব : সিগারেট খাবি না?

ভূপতি : তোরা—তোরা কি ভেবেছিস—(সঞ্জীব ভূপতির মুখে সিগারেট গুঁজিয়া দিল। তারপর ধরাইয়া দিয়া নিজেরটা ধরাইল।) তোরা ভেবেছিস—

সঞ্জীব : বোস, মাথা গরম করিস নি।

ভূপতি : (চটিয়া) কে মাথা গরম করেছে?

সঞ্জীব : আমি। তুই অমন ছটফট করলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।

ভূপতি : ছটফট করলাম কোথায়?

সঞ্জীব : বোস্ এখানে। (বসাইয়া দিল) বল্।

ভূপতি : কী বলবো?

সঞ্জীব : গিন্নীর বাড়ি কেনায় আপত্তিটা কী?

ভূপতি : ঐ যে রঘুদা এসে মেয়ের সঙ্গে কী সব—মানে মেয়েকে ঐ কাব্য টাব্য—

সঞ্জীব গিন্নী ভেবেছেন—তুই?

ভূপতি : তা না হলে আর—

সঞ্জীব : বুঝেছি, বুঝেছি, তুই শুধু হ্যাঁ না জবাব দে। গিন্নী যদি ভেবে থাকে—তুই মেয়ের সঙ্গে—মানে ঐ কাব্য টাব্য—তাতে বাড়ি কেনায় আপত্তি কেন? বাড়ির সঙ্গে তোকেও তো আর কিনতে হচ্ছে না?

ভূপতি : অ্যাঁ? হ্যাঁ আমিও তো তাই ভাবছি। কিন্তু—

সঞ্জীব : গিন্নী ঠিক কী ভাষায় বলেছে বলতে পারিস?

ভূপতি : (ভাবিয়া) বললো—মেয়ে কান্নাকাটি করছে, মুখের উপর কথা বলছে, আর কর্তার সে দিকে মন নেই—শুধু বাড়ি বাড়ি করে পাগল। অতএব বাড়ি কেনা চলবে না।

সঞ্জীব : বুঝলাম।

ভূপতি : কী বুঝলি?

সঞ্জীব : গিন্নী দেখলেন—কন্যা তোর প্রেমে পড়েছে—

ভূপতি : কী?

সঞ্জীব : শোন্ না কথাটা! তোর মানে রঘুদার। আর রঘুদা-ই তুই। এখন রঘুদা যে রঘুদা, মানে—তুই না. এ কথা যদি গিন্নীকে বলা যায়—

ভূপতি : একজনকে তো বললি। কতোটা কাজ হোলো?

সঞ্জীব : শুধু বলা নয়, রঘুদাকে দেখাতে হবে। দু'জনকেই।

ভূপতি : সকালবেলা রঘুদাকে কোথায় পাবো?

সঞ্জীব : আর একদিন বাত্রে আনতে হবে ওদের।

বৃপতি : খুব প্ল্যান বার করেছিস!

সঞ্জীব : কেন?

ভূপতি : প্রথম কথা—এ বাড়িতে আবার আসবে কোন্ দুঃখে বলতে পারিস? দ্বিতীয়ত—যদি বা আসে, রঘুদাকে দেখলে আমার উপর রাগটা কমবে। তাই বলে জেনেশুনে ভুতুড়ে বাড়ি কিনবে?

সঞ্জীব : (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তবে কী করবি?

ভূপতি : বুড়ো আঙুল চুষবো! আঃ মনোহরটা চা আনতে এতো দেরি করছে কেন?

(শয়নকক্ষ হইতে হালদারের প্রবেশ)

হালদার : গুড মর্নিং মিস্টার রায়। গুড মর্নিং দেওয়ান সাহেব। ইয়ে—ছন্দা—ছন্দাকে দেখেছেন?

সঞ্জীব : তিনি বেরুলেন—বললেন গাড়িতে বসে থাকবেন।

হালদার : অ্যাঁ? গাড়ি তো চাবি দেওয়া?

সঞ্জীব : চাবি দেওয়া? তবে বোধ হয় কাছাকাছি থাকবেন। কিংবা ফিরে আসবেন।

হালদার : নাঃ! কখন যে কী এদের মাথায় চাপে! আমি— (ভিতরের দিকে ফিরিলেন। তারপর আবার ফিরিয়া) রাজাবাহাদুর, আমি যে কী করে আপনার কাছে মাপ চাইবো—

ভূপতি : মাপ চাইবেন কেন?

হালদার : আমি অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কী যে এক গোঁ চেপেছে।

ভূপতি : ও কথা থাক।

হালদার : সব চেয়ে দুঃখ রইলো—আপনার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে রইলো—

সঞ্জীব : ইয়ে, আমার মনে হয় সে ধারণাটা কাটানো দরকার। অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের সম্মানের কথা বিবেচনা করে—

ভূপতি : আঃ—

হালদার : একশোবার! কিন্তু কী করে কাটাবো?

সঞ্জীব : ওঁকে যদি রঘুদার কথা খুলে বলা যায়—

হালদার : বলেছি।

সঞ্জীব : বলেছেন?

হালদার : হ্যাঁ, যখন কিছুতেই কিছু হোলো না, তখন শেষ অবধি খুলেই বললাম।

সঞ্জীব : তারপর?

হালদার : বিশ্বাস করাতে পারলাম না।

ভূপতি : কিন্তু আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন?

হালদার : আমার চোখকেও উনি খুব একটা—মানে, তেমন বিশ্বাস করলেন না।

সঞ্জীব : যদি নিজের চোখে দেখেন?

হালদার : নিজের চোখে তো দেখেছে। দেখে রাজাবাহাদুর ভেবেছে।

(স্বপ্নার প্রবেশ)

স্বপ্না : কী হোলো তোমার? (ইহাদের দেখিয়া থামিলেন। তারপর সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হালদারকে) ছন্দা কোথায়?

হালদার : গাড়ির কাছে চলে গেছে না কি। কী যে খেয়াল চাপে—

সঞ্জীব : মিসেস হালদার—

স্বপ্না : তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো?

হালদার : আমি? আমি তো তোমাকে—

সঞ্জীব : মিসেস হালদার, একটা কথা—

স্বপ্না : (কর্ণপাত না করিয়া হালদারকে) যাও, কোট পরে এসো তাড়াতাড়ি। আমি এগোচ্ছি।

সঞ্জীব : (মরিয়া হইয়া) মিসেস হালদার! এরকমভাবে আপনাদের চলে যাওয়া হতে পারে না। (স্বপ্না সঞ্জীবের দিকে চাহিলেন। অর্থাৎ এরকমভাবে চলিয়া যাওয়া কে ঠেকাইবে তিনি একবার দেখিয়া লইতে চান। কিন্তু সঞ্জীব মরিয়া।) আপনি—আপনি রাজাবাহাদুরকে অপমান করেছেন—

ভূপতি : আঃ, কী হচ্ছে কী?

সঞ্জীব : আপনি থামুন! (প্রায় 'তুই থাম্'-এর মতো) আমি, আমি দশ বছর চাকরি করছি এখানে। আমার তিন পুরুষ চাকরি করেছে এখানে—আমি কিছুতেই রাজাবাহাদুরের সম্মানের হানি সহ্য করবো না। রাজাবাহাদুরের দেবতুল্য চরিত্রে আজ অবধি—

স্বপ্না : কী বলতে চান কী আপনি?

(বক্তৃতার মধ্যপথে ঘা খাইয়া সঞ্জীবের গুলাইয়া গেল)

সঞ্জীব : রঘুদা!

স্বপ্না : কী রঘুদা?

সঞ্জীব : তিনি রঘুদা। যিনি মিস হালদারকে—মানে যিনি ঐ—তিনি ইনি নন। তিনি অন্য—অর্থাৎ তিনি—

স্বপ্না : যিনি-তিনি-গুলো বাদ দিয়ে বলতে পারেন?

সঞ্জীব : তিনি—মানে—রঘুদা অন্য লোক। মানে—অন্য ভূত! না না, অন্য নয়—তিনি ভূত—রঘুদা ভূত।

স্বপ্না: (হালদারকে) ও! ঐ আষাঢ়ে গল্পটা তোমরা সব পরামর্শ করে ঠিক করেছো?

হালদার : কী আশ্চর্য—

সঞ্জীব : আষাঢ়ে নয়! আপনাকে দেখিয়ে দেবো। না না—আমি না, আমি না—রাজাবাহাদুর দেখিয়ে দেবেন। আপনার চোখের সামনে—

স্বপ্না : কই দিন দেখিয়ে।

সঞ্জীব : দিনের বেলা কী করে হবে?

স্বপ্না : তা আমরা রাত্তির অবধি বসে থাকবো না কি?

সঞ্জীব : আজ না হোক, অন্য কোনো দিন রাত্রে যদি—

স্বপ্না : (হালদারকে) যাও, কোট পরে এসো।

সঞ্জীব : কিন্তু আপনি—

স্বপ্না : দেখুন দেওয়ান সাহেব। ভূত এসে হাঁটু গেড়ে বসে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়, আর তাড়া খেলে পালিয়ে যায়—এই আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন আপনি?

সঞ্জীব : ইনি একটু—ইয়ে—খুব সাহসী ভূত নন আর কি—

স্বপ্না : (ভূপতির দিকে চাহিয়া) তা দেখাই গেছে।

ভূপতি : মানে? আপনি কী বলতে চান—

স্বপ্না : (হালদারকে) কী হোলো তোমার? নড়বে না?

হালদার : না শোনো—এ প্রশ্নটা—

স্বপ্না : কোনো প্রশ্ন নেই।

হালদার : নিশ্চয়ই আছে। তুমি রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে এটা ভুল ধারণা—

সঞ্জীব : শুধু আপনি না। মিস হালদারও—

ভূপতি : আঃ, কী সব—

স্বপ্না : (কড়া গলায়) দেখুন দেওয়ান সাহেব! ছন্দার কথা—

সঞ্জীব : না, আমাকে বলতেই হবে। এ রাজাবাহাদুরের—বাহাদুরের মর‍্যাল রিহ্যাবিলিটেশনের প্রশ্ন। বাড়ি বিক্রি অতি তুচ্ছ কথা এর কাছে!

হালদার : বাড়ি বিক্রি তুচ্ছ কথা?

স্বপ্না : আমি ছন্দা সম্বন্ধে কোনো কথা আপনাদের মুখে শুনতে চাই না।

সঞ্জীব : না শুনলে হবে কেন? তিনি রাজাবাহাদুরকে কাপুরুষ বলেছেন!

স্বপ্না: কাপুরুষ?

ভূপতি : কোনো মানে হয়—

সঞ্জীব : আপনি থামুন!

স্বপ্না: কাপুরুষ বলেছে?

সঞ্জীব : বলবেন না? তিনি যদি আপনার মতো রঘুদাকে রাজাবাহাদুর ভাবেন—

স্বপ্না : ছন্দা, ছন্দা তাহলে—

সঞ্জীব : নিশ্চয়ই। আপনি বুঝতে পারেন নি সে কথা?

হালদার : কী কথা?

স্বপ্না: তুমি চুপ করো।

ভূপতি : আমি—

স্বপ্না: আপনি চুপ করুন! (সকলে চুপ করিল। স্বপ্নার মুখ থমথমে হইয়া উঠিয়াছে।) বেশ, সেই কথাই রইলো। আমরা পরশু রাত্তিরে আসবো। ছন্দাকেও নিয়ে আসবো। যদি ভূত দেখাতে পারেন—আমি সকলের সামনে মাপ চাইবো রাজাবাহাদুরের কাছে।

সঞ্জীব : রাজি।

স্বপ্না: আর যদি না দেখাতে পারেন?

সঞ্জীব : উনি মাপ চাইবেন সকলের সামনে।

স্বপ্না: শুধু মাপ চাইলে হবে না।

সঞ্জীব : তবে?

স্বপ্না: ছন্দার সামনে স্বীকার করতে হবে—ও সব সংস্কৃত কাব্য টাব্য সব ভান—কচি মেয়েদের মাথা খাবার কায়দা। এবং আরো অনেক মেয়েকে একা পেয়ে ঠিক এই রকম করে—

হালদার : কী বলছো কী?

স্বপ্না : ঠিকই বলছি। এ দরকার। তুমি বুঝবে না!

ভূপতি : হ্যাঁ, আমি রাজি।

হালদার : আর বাড়িটা?

স্বপ্না : কী বাড়িটা?

হালদার : আমি কথা দিলাম, চেক দিলাম—

স্বপ্না : পরশু রাত্তিরের পর ভেবো। এখন চলো—

হালদার : না, এ কথাটার একটা মীমাংসা না করে—

স্বপ্না: কী মীমাংসা আবার?

হালদার : পরশু রাত্তিরে যদি রঘুদার কথা সত্যি বলে প্রমাণ হয়, তবে এ বাড়ি কেনা হচ্ছে কি না?

স্বপ্না : পরশু রাত্রে বাড়ির কথা কিছু নেই!

হালদার : না, বাড়ির কথা ছিল গতকাল রাত্রে। কথা দিয়েছি, চেক দিয়েছি—ও প্রশ্ন একেবারে চাপা পড়ে কী করে?

সঞ্জীব : আর যদি প্রমাণ হয় কাল রাত্রের ব্যাপারেব জন্যে রাজাবাহাদুর দায়ী নন, তাহলে বাড়ি কেনায় বাধা কি?

হালদার : ঠিক কথা।

স্বপ্না : আচ্ছা ঠিক আছে। যদি ভূত দেখা যায়, তুমি কিনো বাড়ি!

ভূপতি : (লাফাইয়া উঠিয়া) ঠিক?

স্বপ্না: যদি ভূত দেখাতে পারেন।

হালদার : ব্যস, আর যেন নড়চড় না হয় কথার।

স্বপ্না: আমার কথার কোনো দিনই নড়চড় হয় নি। বাড়ি কিনবার কথা দিয়েছো তুমি, আমি দিইনি।

ভূপতি : ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরশু রাত্তির! এগারোটায় রঘুদা বেরোয়। কখন আসবেন? খাওয়া-দাওয়া—

স্বপ্না: না, খাওয়া দাওয়া সেরে আসবো। দশটার পরে। (হালদারকে) চলো এখন।

হালদার : হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। (রওনা হইলেন)

স্বপ্না : বলি কোটটা পরতে হবে না?

হালদার : কোট? ও হ্যাঁ হ্যাঁ কোট।

(স্বপ্না বাহির হইয়া গেলেন, হালদার ছুটিলেন ভিতরে।)

ভূপতি : সঞ্জী—ব!

সঞ্জীব : চুপ!

(ভূপতি উদ্যত নৃত্য সংবরণ করিল ধমক খাইয়া। হালদারের প্রবেশ। তিনি ভূপতির হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকাইতে লাগিলেন।)

হালদার : আমি কী করে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো রাজাবাহাদুর—

ভূপতি : আমি কী করলাম? সব তো ঐ—ঐ দেওয়ান সাহেব!

হালদার : ইয়েস! (সঞ্জীবের হাত ঝাঁকাইবার পালা) ভেরি ব্রাইট অফ ইউ—দেওয়ান সাহেব! রাজাবাহাদুরের এস্টেটে তিনপুরুষ আছেন, নইলে আমি আপনাকে টেনে নিয়ে যেতাম আমার এন্টারপ্রাইজে।

(মনোহরের প্রবেশ। হাতে ট্রেতে চা। চার কাপ করিয়াছে।)

ভূপতি : একটু চা খেয়ে গেলেন না?

হালদার : চা? (ইতস্তত করিয়া হাত বাড়াইলেন। বাহির হইতে স্বপ্নার হাঁক আসিল।)

স্বপ্না : কই, কী হোলো?

হালদার : না, চা থাক, পরে হবে এখন। গুড বাই!

(আর কেহ নাই, মনোহর একাই সেলাম ঠুকিল। হালদার প্রস্তুত ছিলেন না। ছুটিবার মুখে চমকাইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর একগাল হাসিয়া মনোহরেরও হাত ঝাঁকাইয়া দিলেন।)

হালদার : ও ইয়েস! গুড বাই। টিল পরশু রাত্তির।

(মনোহরের কাঁধে এক চাপড় মারিয়া দ্রুত প্রস্থান। মনোহর এ-সবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময় কাটাইয়া ভিতরে ফিরিয়া আরও চমৎকৃত হইল। ভূপতি ও সঞ্জীব হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে। তখনও নিঃশব্দে, কারণ হালদার পরিবার বেশি দূরে যান নাই।)

ভূপতি : (চিৎকার করিয়া) মনোহর বাড়ি—(থামিয়া গিয়া গলা নামাইয়া চাপা স্বরে) বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে।

মনোহর : হয়ে গেছে?

ভূপতি : সঞ্জীব ম্যানেজ করে দিয়েছে! সঞ্জীবকে তুই যতো বোকা ভাবছিস, মোটেই ও অতো—

মনোহর : আমি আবার কখন ওনাকে বোকা ভাবলুম?

ভূপতি : ভাবিস নি তো? ভালো করেছিস। কক্ষনো ভাবিস নি! ও যা তিন পুরুষের দেওয়ানী খেল ঝেড়েছে—তোর খাস-খানসামা কোথায় লাগে?

মনোহর : ব্যাপারটা কী হোলো?

ভূপতি : বলছি দাঁড়া। চা দে আগে। (দু'জনে চায়ে চুমুক দিল)

মনোহর : সা-মশাই, শ্রীনাথবাবু আর পবন রান্নাঘরে বসে আছে।

ভূপতি : দু'টো দিন! ওদের বলে দে আর দু'টো দিন! পরশু রাত্তিরে রঘুদার বাড়ি রঘুদা নিজে বেচবে!

মনোহর : বলি ব্যাপারটা খুলে বলবে?

ভূপতি : এতোক্ষণ কী বলছি তাহলে? তুইও যে সঞ্জীবের মতো বোদা মেরে গেলি রে!

সঞ্জীব : তার মানে?

(উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্রুত যবনিকা।)

পঞ্চম দৃশ্য

(ঐ ঘর। সেই দিনই—রাত দশটা। মনোহর এক বয়স্ক ভদ্রলোককে লইয়া প্রবেশ করিল। ভদ্রলোকের পরিধানে ধুতি-চাদর।)

মনোহর : আপনি বসুন। ওনাদের খাওয়া হয়ে এসেছে প্রায়।

ভদ্রলোক: না না, কোনোরকম তাড়াতাড়ি যেন না করেন। এতো রাতে আসা আমারই অন্যায় হয়েছে।

মনোহর : কোত্থেকে আসছেন বলবো?

ভদ্রলোক: কলকাতা থেকে।

মনোহর : কী নাম বলবে?
ভদ্রলোক: নাম বললে তো চিনবেন না?
মনোহর: তবু—নামটা?
ভদ্রলোক: বলো জলধর বিশ্বাস।
মনোহর : যে আজ্ঞে। বসুন আপনি।
(মনোহর বাহির হইয়া গেল। ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, কিন্তু মনোহর বাহির হইবামাত্র উঠিয়া চতুর্দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেওয়াল, বেদি, সিংহাসন। শুধু দেখা নয়, রীতিমতো নিরীক্ষা-পরীক্ষা করিয়া দেখা। ঝুঁকিয়া, ঘষিয়া, ঠুকিয়া—যেন যাচাই করিতেছেন। সহসা বাহিরে সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বসিলেন। ভূপতির প্রবেশ।)
ভদ্রলোক: (উঠিয়া) নমস্কার।
ভূপতি : নমস্কার, বসুন।
ভদ্রলোক: আপনিই ভূপতিবাবু?
ভূপতি : হ্যাঁ, আপনি—?
ভদ্রলোক: জলধর বিশ্বাস। এতো রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু রাস্তা ভুল করে উল্টোপথে প্রায় মাইল পঞ্চাশ চলে গিয়েছিলাম।
ভূপতি : উল্টোপথে? ও, আপনি নিজের গাড়িতে আসছেন?
ভদ্রলোক: হ্যাঁ, গাড়িতে, তবে নিজের গাড়ি নয়। আমার এমপ্লয়ারের গাড়ি। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।
ভূপতি : কী ব্যাপার বলুন?
ভদ্রলোক: তিনি শুনেছেন, আপনি এই বাড়িটা বিক্রি করতে চান।
ভূপতি : হ্যাঁ, কিন্তু বিক্রি তো হয়ে গেছে।
ভদ্রলোক: হয়ে গেছে?
ভূপতিপ্র: হ্যাঁ, একরকম হয়েই গেছে বলতে পারেন।
ভদ্রলোক: একরকম? রেজিস্ট্রেশন হয়নি তো?
ভূপতি : না, এখনো হয় নি।
ভদ্রলোক: বায়না?
ভূপতি : বায়না, তা একরকম বলা যেতে পারে—
ভদ্রলোক: ও, বায়নাও একরকম?
ভূপতি : পরশু রাত্রে সব পাকাপাকি হবে।
ভদ্রলোক: পরশু! তা বেশ। আমি শুধু দু'একটা কথা জানতে চাইছি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।
ভূপতি : বলুন।
ভদ্রলোক: এ বাড়িটা তো দেখছি খুবই পুরোনো। অন্তত শ দুই বছর হবে, তাই না?
ভূপতি : না, চারশো বছর।
ভদ্রলোক: চারশো বছর? চারশো বছর কোনো বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে?
ভূপতি : দেখতেই তো পাচ্ছেন—দাঁড়িয়ে আছে। সবটা নেই অবশ্য।

ভদ্রলোক: তা হলে এ বাড়ি যিনি কিনছেন, তিনি শুধু জমিটার জন্যেই কিনছেন বলুন।
ভূপতি : তা কেন হতে যাবে?
ভদ্রলোক: নইলে এই ভাঙা পুরোনো বাড়ি কী কাজে লাগতে পারে তার?
ভূপতি : এমন লোকও আছে যারা বাড়ি পুরোনো বলেই কিনতে চায়।
ভদ্রলোক: সে কী? কেন?
ভূপতি : সখ মশাই, সখ। যতো পুরোনো হয় ততো বেশি দর দেয়।
ভদ্রলোক: এমন তো কখনো শুনিনি। কতো দর দিয়েছে?
ভূপতি : পঞ্চাশ হাজার।
ভদ্রলোক: পঞ্চা—শ হা—জার! চারশো বছর শুনেই পঞ্চাশ হাজার অফার দিয়ে দিলো?
ভূপতি : শুনে কেন? দস্তুর মতো প্রমাণ দেখিয়েছি!
ভদ্রলোক: প্রমাণ?
ভূপতি : অকাট্য প্রমাণ। পাথরে খোদাই—সন, তারিখ সব। না দেখে শুনেই পঞ্চাশ হাজার দিয়ে দিলো ভেবেছেন?
ভদ্রলোক: এখনো তো দেয়নি, দেবে বলেছে।
ভূপতি : ঐ হোলো।
ভদ্রলোক: আচ্ছা, আর একটা কথা। এই বাড়িটার সম্বন্ধে একটা—

(ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল।)

ভূপতি : কী ব্যাপার? এখন আবার কে এলো?
ভদ্রলোক: আর একটা কথা শুধু মিস্টার রায়। শোনা যায়—

(সঞ্জীবের প্রবেশ)

ভূপতি : কী রে, কে এলো?
সঞ্জীব : জানি না।
ভূপতি : দেখ তো একটু বারান্দা থেকে।

(সঞ্জীবের প্রস্থান)

হ্যাঁ, কী বলছিলেন আপনি?

ভদ্রলোক: বলছিলাম—এ অঞ্চলের লোকে বলে আপনার এ বাড়িটায় না কি—

(সঞ্জীবের প্রবেশ)

সঞ্জীব : ভূপতি! ওরা এসেছে দেখছি!
ভূপতি : ওরা মানে—ওরা?
সঞ্জীব : হ্যাঁ হ্যাঁ—ওরা।
ভূপতি : সে কী রে? পরশু আসবার কথা তো?
ভদ্রলোক: (লাফাইয়া উঠিয়া) কে? কে? হালদার?
ভূপতি : হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?

(প্রবেশ করিলেন হালদার। পিছনে স্বপ্না ও ছন্দা।)

হালদার : এ কী! চৌধুরী?
ভূপতি : চৌধুরী?
হালদার : আমি ঠিক জানতাম!

চৌধুরী : কী জানতে তুমি?

হালদার : জানতাম—তুমি আসবে! চিরদিন তুমি এই করে এসেছো!

চৌধুরী : কী করে এসেছি?

হালদার : আমার উপর টেক্কা মারতে তুমি সব কিছু করতে পারো।

চৌধুরী : বাজে কথা বোলো না!

হালদার : বাজে কথা মানে? এ বাড়ির খোঁজ আগে কে পেয়েছে? তুমি না আমি? তুমি ফাঁকতালে চুপি চুপি কিনতে আসো কী বলে?

চৌধুরী : আমি ফাঁকতালেও আসিনি, চুপি চুপিও আসিনি। তুমি না কিনে ভদ্রলোককে আশা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছো কেন? কিনে নিলেই পারতে?

হালদার : আলবাৎ কিনবো। কিনবো কী, কিনেছি বলা যেতে পারে। কী বলেন মিস্টার রায়?

ভূপতি : বটেই তো।

স্বপ্না: মোটেই 'বটেই তো' নয়!

হালদার : আঃ, স্বপ্না—

চৌধুরী : তাই বলো!

ভূপতি : দেখুন জলধরবাবু, এটা আমাদের—

হালদার : জলধরবাবু? ও তো চৌধুরী। শিবনারায়ণ চৌধুরী।

ভূপতি : আপনিই তা হলে আপনার এম্প্লয়ার?

হালদার : তার মানে?

চৌধুরী : ও কিছু না।

ভূপতি : উনি বলেছিলেন—ওঁর নাম জলধর বিশ্বাস।

চৌধুরী : তাতে কিছু আসে যায় না।

হালদার : আলবাৎ আসে যায়! তাতে প্রমাণ হয় তুমি কী ধাতুতে তৈরি।

স্বপ্না : আঃ কী হচ্ছে, থামো!

হালদার : থামবো? তুমি তো পরশু অবধি বসে থাকছিলে।

স্বপ্না : তা পরশুই তো আসবার কথা ছিল।

হালদার : হ্যাঁ, কথা ছিল। এখন দ্যাখো, আমি ঠিক বলেছিলাম কিনা? বুঝলেন, মিস্টার রায়, আমার ঠিক আন্দাজ হয়েছিল—চৌধুরী আসবে। কলকাতায় ওর অফিসে ট্রাঙ্ককল করলাম মালদা থেকে, শুনি বেরিয়ে গেছে গাড়ি নিয়ে, আজ ফিরবে না।

চৌধুরী : ও, টেলিফোন করেছিলে? তাতে বুঝি প্রমাণ হয় না—তুমি কোন ধাতুতে তৈরি?

হালদার : তার মানে?

চৌধুরী : দেখুন মিস্টার রায়—কথা দিয়েছি কথা দিয়েছি, তখন থেকে যে বলছেন, সেই কথায় ওর কতোটা বিশ্বাস দেখুন।

হালদার : মোটেই না। ওঁর কথায় আমার পুরো বিশ্বাস।

চৌধুরী : সেইজন্যেই তো পরশু অবধি ভরসা করে অপেক্ষা করতে পারলে না।

হালদার : সে তোমাকে বিশ্বাস করি না বলে! তোমার—তোমাব ধূর্ততাকে বিশ্বাস করি না—

স্বপ্না : আঃ, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে—

সঞ্জীব : রাজাবাহাদুর—এঁদের বসতে বলবেন না?

ভূপতি : অ্যাঁ? কী আশ্চর্য? নিশ্চয়ই। বসুন বসুন।

ছন্দা : ধন্যবাদ।

(ঝুপ করিয়া বসিল। ধন্যবাদ কথাটিতে মেজাজের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।)

চৌধুরী : আচ্ছা, মিস্টার রায়, আমি চলি, এগারোটা বাজে—

হালদার : (ব্যস্ত হইয়া) এগারোটা বাজে না কি? হ্যাঁ, তাই তো।

ভূপতি : বেজে গেছে?

হালদার : না, মিনিট সাতেক বাকি।

চৌধুরী : কেন, এগারোটায় কী?

হালদার : না, কিছু না।

ভূপতি : কিছু না কেন, মিস্টার হালদার? আপনি তো ওঁকে দেখাতেই চেয়েছিলেন?

হালদার : হ্যাঁ, কিন্তু সে তো, সে তো পরে—মানে—আমাদের বাড়ি হলে—

ভূপতি : সবই তো একসঙ্গে ঢোকানো যায়। রঘুদাকে দেখলে আপনাদের বাড়িই তো হচ্ছে। মিস্টার চৌধুরীকেও দেখানো হয়ে গেলো।

হালদার : হ্যাঁ, কিন্তু—আপনি চৌধুরীকে চেনেন না।

চৌধুরী : ওহে হালদার—তোমার এই চারশো বছরের বাড়িতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। এবাড়ির কথা আসলে আমি তোমার চেয়ে আগে জানতাম। তুমি বোধ হয় খবর রাখো না—আমি চারশো সাতাশি বছরের পুরোনো বাড়ি পেয়ে গেছি।

হালদার : চারশো সাতাশি?

চৌধুরী : হ্যাঁ। আর তোমার মতো আল্গা ব্যাপার নয়। বায়নাটা পাকা। আসছে সপ্তায় এসো একদিন, দেখাবো।

হালদার : সত্যি কথা?

চৌধুরী : মিথ্যে বলে লাভ কী আমার? তুমি তো প্রমাণ না দেখে মানবেন না? কবে আসবে বলো? বুধবার?

হালদার : (সহসা) চারশো সাতাশি তো কী হয়েছে? ভূত আছে সে বাড়িতে?

চৌধুরী : ভূত! ভূত থাকবে কী?

হালদার : হ্যাঃ হ্যাঃ! তবে?

চৌধুরী : তবে কী? তোমার এ বাড়িতে ভূত আছে না কি? (হালদার শুধু পরিতৃপ্তির হাসি হাসিলেন। চৌধুরী সহসা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।) তুমি ভূতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলে না কি?

হালদার : তুমিও করবে, তুমিও করবে। যখন দেখবে।

চৌধুরী : তোমাকে এতো কাঁচা ভাবিনি আমি! ছ্যা-ছ্যা—শেষে এই সব ধাপ্পায় ভুলতে শুরু করেছো!

ভূপতি : ধাপ্পা!

চৌধুরী : (হাসি না থামাইয়া) মাপ করবেন, ধাপ্পা বলা উচিত হয়নি। কিন্তু আর কোনো নাম চট করে মাথায় এলো না!

ভূপতি : (কষ্টে সংযত হইয়া) আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই না এখন। শুধু সাত মিনিট বসে দেখে যান।

সঞ্জীব : চার মিনিট।

(সঞ্জীব এতক্ষণ ঘড়ি ছাড়া অন্য কোনো দিকে বিশেষ মন দিতে পারে নাই। এবং যতোই দেখিতেছে, ততই অস্বস্তি বাড়িতেছে তাহার।)

ভূপতি : চার মিনিট।

চৌধুরী : চার মিনিট পরে ভূত বেরুবে?

ভূপতি : একটু সম্মান করে কথা বলুন। তিনি আমার পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা।

হালদার : হ্যাঁ, ঠিক কথা।

স্বপ্না : হুঁঃ!

ভূপতি : মিসেস হালদার—

ছন্দা : হুঁঃ।

(ছন্দার 'হুঁঃ তাহার মা-কেও ছাড়াইয়া গেল। ভূপতি চাহিয়া দেখিল। হজম করিল আপাতত।)

চৌধুরী : (হাসিতে হাসিতে) তুমি এইরকম বোকা বনলে শেষে হালদার?

হালদার : বোকা বনলাম! আমি নিজের চোখে দেখেছি।

চৌধুরী : তোমার গিন্নী, তোমার মেয়ে,—তারা পর্যন্ত তোমার ছেলেমানুষি দেখে হাসে।

হালদার : হাসুক। কতোক্ষণ হাসে দেখবো।

সঞ্জীব : তিন মিনিট।

হালদার : অ্যাঁ?

ভূপতি : (ছন্দার দিকে চাহিয়া) আর তিন মিনিট হাসবেন।

হালদার : রাইট, আর তিন মিনিট হাসবে।

চৌধুরী : খুব পাংচুয়াল ভূত বুঝি? ভূত কে সাজে মিস্টার রায়? (ভূপতি জবাব দেওয়া সম্মানহানিকর মনে করিল।) বলুন না? ঐ চাকরটা বুঝি!

স্বপ্না : উনি নিজেই সাজেন।

হালদার : স্বপ্না!

চৌধুরী : নিজেই সাজেন? তবে তাড়াতাড়ি যান, আর তিন মিনিট মাত্র বাকি!

সঞ্জীব : দু'মিনিট।

ছন্দা : অমন করে গুণছেন কেন দেওয়ান সাহেব?

চৌধুরী : না না, বারণ কোরো না ছন্দা। বেশ অ্যাটমোস্ফীয়ার তৈরি হচ্ছে, যেন রকেট ছাড়া হবে—টেন, নাইন, এইট, সেভেন—দেখোনি সিনেমায়?

হালদার : আঃ চৌধুরী, থামো!

চৌধুরী : কেন হে? তোমার ভাব কেটে যাচ্ছে? তাই তো চাইছি! নইলে ধাপ্পায় ভুলে অতোগুলো টাকা লোকসান দেবে, সেটা বন্ধু হিসেবে আমার ঠেকানো উচিত

না?

ভূপতি : দেখুন, মিস্টার চৌধুরী! আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি—

চৌধুরী : কেন মশাই? ধাপ্পাকে ধাপ্পা বললে এতো রাগ কেন?

ভূপতি : ধাপ্পা?

চৌধুরী : বাড়ি বেচবেন, সিধে বেচুন। ভূত-টুত সাজানো কেন? হালদারকে বোকা-সোকা পেয়ে—

হালদার : কে বোকা—আর দু'টো মিনিট পরেই টের পাওয়া যাবে।

সঞ্জীব : এক মিনিট।

হালদার : হ্যাঁ—এক মিনিট। আর একটা মিনিট বকর বকর না করে চুপ করে থাকো।

চৌধুরী : কী করবো, আমার যে বড়ো হাসি পাচ্ছে! তোমরা এমন সব মুখ করে বসে আছো ভূতের জন্যে—থুড়ি মিস্টার রায়—ভূত নয়, প্রেতাত্মা। (ভূপতি জবাব দিল না। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। সঞ্জীবের চোখ ঘড়িতে। সে পায়ে পায়ে ভূপতির দিকে সরিতেছে। হালদার উত্তেজিত ও উৎকর্ণ। স্বপ্নার নির্বিকার অবিশ্বাস। কিন্তু ছন্দার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে।) ও কী মশাই, আপনার কী হোলো?

(সঞ্জীব ভূপতির গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার চোখ আর ঘড়িতে নাই। মুখ সাদা, ঠোঁট কাঁপিতেছে।)

সঞ্জীব : (প্রায় ফিস ফিস করিয়া) এগারোটা।

চৌধুরী : আই সী! আপনার পার্ট করছেন!

হালদার : আঃ চৌধুরী, চুপ করো না!

চৌধুরী : কেন হে? আমার গলা পেলে ভূত যদি না আসে?

ভূপতি : (সঞ্জীবকে) কী হোলো? এগারোটা বেজে গেছে তো।

চৌধুরী : প্রেতাত্মার ঘড়ি বোধ হয় একটু স্লো হয়ে গেছে। মিলিয়ে রেখেছিলেন?

(চৌধুরীর কথা শেষ হইতে না হইতে সেই রক্ত জল-করা অট্টহাস্য। খুব বেশি দূরে নয়। সঞ্জীব ভূপতির আস্তিন খামচাইয়া ধরিয়াছে। ভূপতি নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিল। স্বপ্না খাড়া হইয়া বসিয়া ভূপতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। ছন্দা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হালদার দরজার দিকে চাহিয়া, চৌধুরী হাসিলেন।)

চৌধুরী : বাঃ! হাসিটা মন্দ দেয়নি আপনার লোক।

ভূপতি : (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) আর একটু সবুর করুন মিস্টার চৌধুরী! আমার 'লোক'কে ঘরে আসতে দিন।

চৌধুরী : (এবার গম্ভীর) মিস্টার রায় আমি হালদারের মতো সরল লোক নই। এটা কী চেনেন? (পকেট হইতে একটি বস্তু বাহির করিলেন)

ভূপতি : রিভলভার?

চৌধুরী : ঠিক ধরেছেন। খেলনা নয়। যখন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম, তখন লাইসেন্স পেয়েছিলাম।

ভূপতি : বেশ করেছিলেন, তাতে আমার কী?

চৌধুরী : আপনার লোককে এইবেলা একটু সাবধান করে দিয়ে আসুন। সে বোধ হয় জানে না, আমার কাছে রিভলবার আছে।

ভূপতি : আপনার ও জিনিস রঘুদার উপর কোনো কাজে লাগবে না।

চৌধুরী : আপনার লোকের নাম রঘুদা বুঝি?

(বলিতে বলিতে আবার হাসি। দরজার বাহিরেই। চৌধুরী রিভলভার তুলিলেন। হাসি সহসা মধ্যপথে থামিয়া গেল। কিন্তু ভূপতি হাসি থামামাত্র এক লাফে দরজার বাহিরে গিয়াছে। সঞ্জীব হুমড়ি খাইয়া পড়িল—সে ভূপতিকে আঁকড়াইয়া ছিল।)

ভূপতি : (চিৎকার করিয়া) রঘুদা! রঘুদা!

(কিন্তু রঘুদা সম্ভবত পলায়ন করিতেছেন। ভূপতি ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল। চৌধুরী টেবিলের উপর পিস্তল রাখিলেন। হালদার দরজায় গিয়া উঁকি মারিলেন।)

চৌধুরী : পালিয়েছে।

হালদার : পালিয়েছে মানে?

চৌধুরী : পালাবে না? রিভলভারকে ভয় পায় না, এমন 'ভূত' আমি দেখি নি আজ অবধি।

সঞ্জীব : (শুষ্ক কণ্ঠে) রিভলভার নয়।

চৌধুরী : বটে! তবে কী শুনি?

সঞ্জীব : রাজাবাহাদুরকে আসতে দিন।

স্বপ্না : রাজাবাহাদুর বোধ হয় পোশাক পরতে গেলেন, না?

হালদার : স্বপ্না, তুমি—

স্বপ্না : তুমি আর কথা বোলো না। সব বোঝা গেছে।

ছন্দা : কিছুই বোঝা যায়নি।

স্বপ্না : কোন্‌টা বোঝা যায়নি? বল্?

ছন্দা : আর খানিকক্ষণ দেখো না?

স্বপ্না : কী আবার দেখবো?

চৌধুরী: আর কিছু দেখা যাবে না ছন্দা। রিভলভারটা বার করে তোমাদের এমন এন্টারটেনমেন্টটা মাটি করে দিলাম।

হালদার : আমি কাল নিজের চোখে দেখেছি—

স্বপ্না : তুমি কাল কী দেখেছো তার কথা হচ্ছে না। আজ আমাদের সকলের দেখবার কথা।

হালদার : দেখবে! নিশ্চয়ই দেখবে। একটু ধৈর্য ধরে বোসো না?

স্বপ্না: আর বসে কী হবে? বরং এখন বেরোলে মালদায় গিয়ে খানিকটা ঘুমও হতে পারে!

সঞ্জীব : না না—তা কী করে হবে?

স্বপ্না : কেন হবে না? কতোক্ষণ লাগবে মালদা যেতে?

সঞ্জীব : না না—সে কথা নয়। এখন চলে গেলে হবে কেন?

স্বপ্না : কী আর হবার আছে?

হালদার : আলবাৎ আছে। তা ছাড়া কথা আজ রাত্রের!

স্বপ্না : রাত মানে কি সারারাত?

হালদার : নিশ্চয়ই! রাত্তির যখন বলেছো—তখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত রাত্তির! তোমার

কথার নড়চড় হয় না বলছো—মনে আছে?

চৌধুরী : ভোর অবধি বসে থাকবে?

হালদার : যদি দরকার হয়—নিশ্চয়ই থাকবো!

চৌধুরী : তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

হালদার : মোটেই মাথা খারাপ হয়নি। আমি নিজের চোখে দেখেছি কাল!

চৌধুরী : কাল রিভলভার ছিল না ভাই, রিভলভার ছিল না!

সঞ্জীব : না রিভলভার নয়।

চৌধুরী : আবার কী?

সঞ্জীব : রাজাবাহাদুরকে আসতে দিন।

স্বপ্না : রাজাবাহাদুর বোধ হয় আজ ভালো করে সাজছেন।

(স্বপ্নার কথায় ছন্দা হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

ছন্দা : (চৌধুরীকে) চৌধুরীকাকা?

চৌধুরী : কী?

ছন্দা : রাজাবাহাদুর—মানে—ঐ—ভূত এলে আপনি কি গুলি করবেন?

চৌধুরী : নিশ্চয়ই!

ছন্দা : কিন্তু যদি সত্যিই—কোনো মানুষ ভূত সেজে আসে?

চৌধুরী : (হাসিয়া) তাই তো আসবে!

ছন্দা : তবে—গুলি করলে—

চৌধুরী : ঘাবড়াচ্ছো কেন? কেউ যদি আসে, রিভলভার দেখলেই পালাবে, গুলি করতে হবে না।

ছন্দা : যদি না পালায়?

স্বপ্না : ছন্দা কী বকছিস যা তা?

ছন্দা : কিন্তু—

স্বপ্না : কিন্তু আবার কিসের? রিভলভার আছে, ভালোই হয়েছে। চালাকি চলবে না।

সঞ্জীব : না, রিভলভার নয়।

চৌধুরী : আপনার পার্টে কি ঐ একটাই কথা? বড়ো একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে না?

হালদার : আঃ, রাজাবাহাদুরকে আসতে দাও না?

চৌধুরী : ওটা তোমার পার্টের কথা নয় হালদার—এঁর পার্ট। (সঞ্জীবকে) কই, আপনি বলুন?

সঞ্জীব : (উৎকর্ণ হইয়া) বোধ হয় আসছেন।

(সকলে দরজার দিকে চাহিল। ভূপতির প্রবেশ। প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।)

সঞ্জীব ও হালদার : (একসঙ্গে) কী কী কী হোলো?

ভূপতি : রঘুদা আসবে না।

চৌধুরী : জানতাম।

হালদার : আসবে না? কেন কেন?

ভূপতি : ভয়ে।

চৌধুরী : আগেই বলেছি, রিভলভার দেখলে ভূত কেন, ভূতের—

ভূপতি : না, রিভলভার নয়।
চৌধুরী : আপনাদের সকলের কি ঐ এক পার্ট?
সঞ্জীব : (প্রায় ফিস ফিস করিয়া) মিসেস হালদার?
ভূপতি : হ্যাঁ।
হালদার : অ্যাঁ?
ভূপতি : কাল রাতে ঐ জন্যেই রঘুদাকে খুঁজে পাইনি।
হালদার : কী জন্যে?
ভূপতি : মিসেস হালদারের তাড়া খেয়ে রঘুদা নাটমন্দিরে লুকিয়ে বসেছিলো চুপচাপ।
স্বপ্না : আমার তাড়া খেয়ে?
ভূপতি : হ্যাঁ, আজও আপনাকে দেখে পালিয়ে সোজা নাটমন্দিরে গিয়ে লুকিয়েছে।

(চৌধুরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

চৌধুরী : দারুণ সাহসী ভূত আপনার মিস্টার রায়!
স্বপ্না : ভূত না আরো কিছু? (ভূপতির কিছু বলিবার নাই)
হালদার : একটু চেষ্টা করুন রাজাবাহাদুর, বলে কয়ে যেমন করে পারেন—
ভূপতি : চেষ্টা করিনি ভেবেছেন?
সঞ্জীব : কিছুতেই আসবে না?
চৌধুরী : আসবে আসবে। আমি চলে গেলেই আসবে।
স্বপ্না : কিংবা আমি চলে গেলে!
হালদার : আর একবার দেখুন রাজাবাহাদুর। হাতে পায়ে ধরুন!
ভূপতি : ধরবো আর কী করে? আর যা করবার আছে করেছি। ঐ এক কথা।
হালদার : কী বলছেন?
ভূপতি : উনি না থাকলে আসতে পারেন।
স্বপ্না : সে রকম তো কথা ছিল না রাজাবাহাদুর?
ভূপতি : না। সেরকম কথা ছিল না।
স্বপ্না : কী কথা ছিল মনে আছে তো?
ভূপতি : হ্যাঁ আছে। (সহসা চিৎকার করিয়া) কিন্তু এ সত্যি সত্যি সত্যি। রঘুদা আছে, চারশো বছর ধরে আছে!
চৌধুরী : বলি হালদার। বাড়িটা সত্যি চারশো বছরের কিনা, একটু দেখেশুনে নিও।
ভূপতি : আলবাৎ চারশো বছর। প্রমাণ দেখিয়েছি!
চৌধুরী : প্রমাণ তো ভূতেরও দেখালেন। আমি এ অঞ্চলের অনেক খবর রাখি, কখনো তো শুনিনি বল্লভপুরের সেই রাজবাড়ি এখনো দাঁড়িয়ে আছে!
ভূপতি : কিচ্ছু জানেন না আপনি তা হলে এ অঞ্চলের। বল্লভপুরের কোন্ খবর আপনি রাখেন?
চৌধুরী : আপনার চেয়ে কম রাখি না! আমারও আদি বাড়ি এই অঞ্চলে। আপনি ক'দিনের?
ভূপতি : আমি ক'দিনের? জানেন—বারো ভুইঞার আমল থেকে এই বাড়িতে আমার পূর্বপুরুষরা—

চৌধুরী : ও সব ভুইঞা শোনাবেন না আমাকে। আমারও পূর্বপুরুষ ভুইঞা ছিল।

হালদার : কেন বাজে চাল মারছো চৌধুরী?

চৌধুরী : চাল নয় হে। চৌধুরী খেতাব তো হোলো আলিবর্দী খাঁর আমলে। তার আগে অবধি ভুইঞা-ই উপাধি ছিল আমাদের। ইতিহাস ঘেঁটে দেখো—বারো ভুইঞার পরেই প্রতাপগড়ের ভুইঞার নাম পাবে।

(ভূপতি ও সঞ্জীব রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আগাইয়া আসিয়াছে)

ভূপতি : প্রতাপগড়?

চৌধুরী : হ্যাঁ মশাই, প্রতাপগড়। চেনেন?

ভূপতি : ইন্দ্রনারায়ণ ভুইঞা?

চৌধুরী : এই তো, তবু কিছু খবর রাখেন।

ভূপতি : আপনি—আপনি ইন্দ্রনারায়ণ ভুইঞার বংশধর?

চৌধুরী : আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়িতে বংশপঞ্জী এখনো রাখি। আজকাল কেউ বংশ নিয়ে বলে না বলেই আমি আর—

ভূপতি : (চিৎকার করিয়া) রঘুদা! তুমি শুনলে? তুমি শুনলে রঘুদা? ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর! রঘুদা!

(চেঁচাইতে চেঁচাইতে উন্মত্তের মতো ভূপতি বাহির হইয়া গেল)

চৌধুরী : কী হোলো? মাথা খারাপ আছে না কি?

(সঞ্জীব প্রচণ্ড শব্দে করতালি দিয়া যুক্ত কর মাথায় তুলিল)

সঞ্জীব : জয় রঘুদা। জয় ইন্দ্রনারায়ণ।

চৌধুরী : সবাই একসঙ্গে ক্ষেপে গেলো না কি?

স্বপ্না : তাই হবে।

হালদার : কী হোলো দেওয়ান সাহেব?

চৌধুরী : কী আবার হবে? নতুন কোনো ধাপ্পার চেষ্টা—

(বলিতে বলিতে হু হু করিয়া প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ। ঝাড় লণ্ঠন ঝন ঝন করিয়া দুলিয়া উঠিল। দপ ধরিয়া আলো নিভিয়া গেল। বিদ্যুতের ঝলকানির মতো ঘন ঘন লাল আলোর চমক। স্বপ্না ও ছন্দার আর্তনাদ, হালদারের চিৎকার, সঞ্জীবের গোঙানি—সে এক তাণ্ডব। সব ছাপাইয়া প্রচণ্ড চিৎকারে অট্টহাস্য। আগের হাসি কোথায় লাগে তাহার কাছে? চৌধুরী পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়াছেন। চিৎকার করিয়া কী বলিতেছেন, বোঝা যাইতেছে না। হাসি প্রচণ্ড হইয়া ফাটিয়া পড়িল ঘরের ভিতরে। সিংহাসনের পিছনে সশব্দে ধূম্রজালের উদ্গীরণ। তাহার মধ্যে রঘুপতি ভুইঞার রুদ্রমূর্তি। মাথায় উষ্ণীষ, অঙ্গে রাজবেশ, হাতে জ্বলন্ত এক তরবারি—চৌধুরীর দিকে তাহার অগ্রভাগ উদ্যত।)

চৌধুরী : (চিৎকার) এই খবরদার! খবরদার! চালাকি চলবে না। রিভলভার —রিভলভার দেখেছো? (রঘুদা অট্টহাস্য করিলেন) গুলি করবো। এক পা এগোলেই গুলি করবো।

ছন্দা : (চিৎকার করিয়া) চৌধুরীকাকা!

(রঘুদা চকিতে ছন্দার দিকে চাহিলেন। মুখের ভাব নিমেষের জন্য যেন কোমল হইল।

কিন্তু তারপরেই আবার চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া অট্টহাস্য করিলেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।)

চৌধুরী : এই খবরদার! গুলি করবো। আর এগোলেই—
(রঘুদা হাসিলেন। অগ্রসর হইলেন। চৌধুরী তিনহাত দূর হইতে গুলি করিলেন। একবার, দুইবার, পরপর ছয়বার, সোজা বুকে। রঘুদার অট্টহাস্য থামিল না। তরবারির অগ্রভাগ চৌধুরীর গলার কাছে। চৌধুরী কর্ণবিদারক আর্তনাদ করিলেন।)

সঞ্জীব : (চিৎকার করিয়া) নাক খৎ দিন! নাক খৎ দিন!
(রঘুদা সঞ্জীবের দিকে চাহিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া দুইবাব ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইলেন। তারপর আবার রুদ্রচক্ষু চৌধুরীর দিকে ফিরাইলেন। সঞ্জীবের প্রায় হইয়া আসিয়াছিল রঘুদার দৃষ্টিতে। চৌধুরী উপুড় হইয়া পড়িলেন। রঘুদা অট্টহাস্য করিলেন।)
থামবেন না। নাক খৎ দিন—না দিলে মরবেঁন!
(চৌধুরী দ্রুতবেগে নাক খৎ দিয়া চলিলেন। রঘুদা তরবারির অগ্রভাগ দিয়া নাক খতের পথ নির্দেশ করিতে লাগিলেন। হালদার পরিবার পিছনে তালগোল পাকাইয়া আছে। স্বপ্না সম্ভবত মূর্ছিতা। রঘুদা সিংহাসনের পিছনে ফিরিয়া দুই হাত শূন্যে তুলিয়া পরম মুক্তির অট্টহাস্য হাসিলেন! চৌধুরী তখনও ওঠেন নাই।)

রঘুদা : (ভীম নির্ঘোষে) মুক্তি! মুক্তি!! মুক্তি!!!
(প্রচণ্ড শব্দ, আলোর ঝলক, রঘুদা অদৃশ্য। ঝড়ের শব্দ থামিয়া আসিল। সব আবার শান্ত। প্রথম ধাতে ফিরিল সঞ্জীব। তারপর হালদার পরিবার। চৌধুরী উপুড় হইয়াই আছেন। তাঁহাকে তুলিয়া চেয়ারে শোয়াইলেন হালদার ও সঞ্জীব। তিনি মূর্ছিত। সঞ্জীব শয়নকক্ষ হইতে জল আনিয়া মুখে চোখে দিতে লাগিল। হালদার একটি পত্রিকার সাহায্যে হাওয়া করিতে লাগিলেন। সবেগে ভূপতির প্রবেশ। হাঁফাইতেছে।)

ভূপতি : কই, রঘুদা?

সঞ্জীব: চলে গেছেন।

ভূপতি : চলে গেলো? নাক খৎ?

সঞ্জীব : হয়ে গেছে।

ভূপতি : ইস্, দেখতে পেলাম না! সেই নাটমন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি দেখবো বলে। রঘুদা একেবারে ঝড়ের মতো ছুটলো!

সঞ্জীব : ঝড়ের মতোই এলেন।

ভূপতি : একটু সবুর করতে পারলো না?

সঞ্জীব : দেরি হয়ে গিয়েছিলো বোধ হয়। চারশো বছর তো! তাই ছুটলেন—মুক্তি মুক্তি বলতে বলতে!

বৃপতি : বড়ো ইয়ে তো? একবার দেখাটা পর্যন্ত করে যেতে পারলো না যাবার সময়ে? অ্যাদ্দিন আছি একসঙ্গে—

হালদার : আর মায়া বাড়ালেন না বোধ হয়।

ভূপতি : এ কী? চৌধুরী সাহেবের কী হোলো?

সঞ্জীব : অজ্ঞান হয়ে গেছেন। একটু জলের ঝাপটা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।
(সঞ্জীব আবার জলের ঝাপটা দিল। চৌধুরী চোখ মেলিয়া ভূপতিকে দেখিলেন।

দেখিয়াই মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িলেন নাক খৎ দিতে।)

ভূপতি : ও কী? ও কী করছেন?

হালদার : আপনাকে রঘুদা ভেবেছে। ও চৌধুরী, ওঠো। ইনি তিনি নন। (চৌধুরী উঠিলেন)

ভূপতি : যাচ্চলে! অ্যাদ্দিন রঘুদাকে সবাই আমি ভাবতো। আপনি আমাকে রঘুদা ভাবলেন?

চৌধুরী : (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) না—আমি—আমি—আমি বাড়ি যাবো।

ভূপতি : তা কি হয়? একটু মিষ্টিমুখ না করে—এতোদিনের প্রতিবেশী আপনি—

চৌধুরী : না! না, না—আমি বাড়ি যাবো। বাড়ি যাবো। চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ!

(বলিতে বলিতে অন্ধের মতো হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন)

ভূপতি : আহা—পড়ে যাবেন! পড়ে যাবেন!

সঞ্জীব : আমি দেখছি।

(ভূপতিকে থামাইয়া চৌধুরীকে অনুসরণ করিল)

ভূপতি : চন্দ্রনাথ কে? গৃহদেবতা না কি?

হালদার : না, ওর ড্রাইভার।

ভূপতি : তাই বলুন। ওঃ, হাঁপিয়ে গেছি দৌড়ে। (ধপ করিয়া বসিয়া ঘাম মুছিল)

স্বপ্না : রাজাবাহাদুর। আমার আপনার কাছে মাপ চাইবার কথা!

ভূপতি : (শশব্যস্তে উঠিয়া) ছি ছি—ছেড়ে দিন,. ছেড়ে দিন ওসব কথা—

স্বপ্না : না, আমি আপনাকে—

ভূপতি : ভুলে যান ওসব! আপনারা এলেন বলে ইন্দ্রনারায়ণের বংশধর এলেন, রঘুদাও মুক্তি পেলো, আমিও বাঁচলাম! এ যে কী—মানে, কী ইয়ে তা আপনাকে কী করে (সহসা) ভালো কথা! মিস্ হালদার! কে কাপুরুষ বলুন এবার! (ছন্দা মাথা নিচু করিয়া রহিল) কই বলুন? কে পালিয়েছিল আপনার মায়ের ভয়ে? (ছন্দা মাথা তুলিয়া সোজা ভূপতির দিকে চাহিল)

ছন্দা : তা হোক! অমন সংস্কৃত আপনি জীবনে কোনোদিন বলতে পারবেন না।

ভূপতি : (হকচকাইয়া) অ্যাঁ?

(দ্রুত যবনিকা। সঞ্জীব পর্দার বাহিরে আসিল। ডেন্টিস্টের অ্যাপ্রন চড়াইয়াছে। হাতে দাঁত তুলিবার যন্ত্র।)

সঞ্জীব : তারপরে অনেক খুচরো ব্যাপার আছে—সে সব বল্লভপুরের রূপকথার মধ্যে পড়ে না। ভূপতি আর আমি কলকাতায় চেম্বার খুলেছি—তিনশো বত্রিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট। ন'টা থেকে বারোটা, চারটে থেকে আটটা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়া ভালো, নইলে বসে থাকতে হবে। বুঝলেন? দাঁত জিনিসটাকে নেগলেক্ট করবেন না। প্রতি ছ'মাস অন্তর একবার করে ভালো ডেন্টিস্ট দিয়ে দাঁতগুলোকে চেক করিয়ে নেওয়া কতোটা দরকার অনেকেই সেটা বোঝেন না। ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম—বল্লভপুর। হালদার সাহেবরা তাঁদের বল্লভপুরের বাড়িতে প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যান। পুরোনো গল্প সব হয়। ভূপতিরাও যায় মাঝে মাঝে। আমিও গেছি দু'একবার। বেশি তো যেতে পারি না প্র্যাকটিস ছেড়ে—অ্যাঁ?

(যেন কোনো এক দর্শকের প্রশ্ন শুনিতেছে)

ভূপতিরা? ভূপতিরা কে? কী দেখলেন তাহলে এতোক্ষণ?

(ভূপতি পর্দার ফাঁক দিয়া মুণ্ড বাড়াইল।)

ভূপতি : সঞ্জীব, কেচ্ছা হয়ে গেছে! আমাকেও যেতে হবে ওদের সঙ্গে বল্লভপুর।

সঞ্জীব : (খিঁচাইয়া) আমাকেও যেতে হবে বল্লভপুর! বলি তোমার দাঁতগুলো তুলবে কে?

ভূপতি : অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলা যতোটা পারিস সরিয়ে দে, আর বাকি তুই তুলে দিস!

সঞ্জীব : আমি তোমার দাঁত তুলবো, আমার নিজের দাঁত নেই?

ভূপতি : কী করবো, কিছুতেই ছন্দাকে বোঝাতে পারছি না।

সঞ্জীব : তা পারবে কেন? বিয়ে করলে এই হালই হয়।

ভূপতি : তুই বিয়ে করলে আমি ছ'মাস তোর সব কটা দাঁত তুলে দেবো। চললাম গাড়ি রিজার্ভ করতে হবে।

(ভূপতির মুণ্ড পর্দার আড়ালে অর্ন্তহিত হইল। সঞ্জীব কাঁধ ঝাঁকানি দিল। তারপর আর এক দর্শকের কাল্পনিক প্রশ্ন শুনিল।)

সঞ্জীব : কী বলছেন? কবে হোলো? তা, ধরুন—রঘুদা যাবার মাস ছয়েক পরে। অ্যাঁ? কী করে হোলো? রূপকথার শেষে একটা বিয়ে হওয়া দরকার—হয়েছে, আবার কী করে হোলো, কেন হোলো—অতো খোঁজে দরকার কী মশাই?

(প্রস্থান)

কবিকাহিনী

মুখবন্ধ

অনেকে বলেছেন, আমি না কি হাসির নাটক লিখে হাত পাকিয়ে তারপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস' ইত্যাদি 'ভালো' নাটক লিখতে শুরু করেছি।

এ কথায় আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে—দু'টো কারণে। প্রথমত কথাটা পুরো সত্যি নয়। 'কবি-কাহিনী' এবং আরো কিছু হাসির নাটক আমি লিখেছি 'এবং ইন্দ্রজিৎ' লেখার পরে। পারলে আরো লিখবো। দ্বিতীয়ত, এ কথায় একটা ইংগিত আছে, যেন হাসির নাটকের জাতটা নিচু। আমি তা আদৌ মনে করি না। হাসির নাটকে বক্তব্য নেই, যুগ-সমস্যার আলোচনা নেই, বাণী নেই, এ সব কথা যদি মেনেও নিই, তবু হাসি বা হাসানোর মূল্য আমার কাছে কমে না। আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি আর হাসতে লজ্জা পাই, এ কথাটাও আমার মানতে ইচ্ছে করে না। আমার বরং বলতে ইচ্ছে করে—আমরা চরম দুঃখেও হাসতে পারি, চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিও হাসি দিয়ে ফোটাতে পারি, জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি। তাই হাসির দাম আমার কাছে কম নয়। হাসি যদি সুস্থ হয়, নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সাহায্য না নিয়ে যদি হাসানো যায়, তবে সে হাসি উদ্দেশ্যহীন বলে আমার মনে হয় না। অন্তত এখন অবধি।

বাদল সরকার

কবিকাহিনী

চরিত্রলিপি

মণিভূষণ মজুমদার	বাঘবন্দী কেন্দ্রে নির্বাচন-প্রার্থী
সুপ্রীতি	মণিভূষণের স্ত্রী
লিলি	মণিভূষণের কন্যা
সনৎ	বাঘবন্দী স্কুলের শিক্ষক
স্মরজিৎ সান্যাল	কবি
অটলবাবু	নির্বাচন-ব্যবস্থাপক
মোহন	মণিভূষণের পক্ষে নির্বাচন-কর্মী
পাঁচু	মণিভূষণের গৃহভৃত্য
অরবিন্দ	মণিভূষণের পক্ষে নির্বাচন-কর্মী

প্রথম দৃশ্য

(পর্দা উঠিবার পূর্বে নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠ শুনা যাইতেছে—"ভোট ফর, মণি মজুমদার।" ধ্বনি ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। এবার—"ভোট ফর, চিদানন্দ ব্রহ্মচারী,"—অনেক বেশি কণ্ঠস্বর, অনেক সতেজ ধ্বনি। এ ধ্বনি সম্পূর্ণ মিলাইবার পূর্বেই যবনিকা সরিল। একটি বৈঠকখানা। একপাশে একটি অফিস-টেবিল ও চেয়ার, মনে হয় এ ঘরে তাহাদের অনধিকার প্রবেশ—সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে। দেওয়ালে ঠেকা দেওয়া কয়েকটি বড়ো পোস্টার—মণি মজুমদারের জন্য ভোট প্রার্থনা করিতেছে। টেবিলটিতে প্রচুর কাগজপত্র, ভোটার্স লিস্ট প্রভৃতি। অরবিন্দ অফিস-টেবিলে কাগজ কলম লইয়া কোনো এক দুরূহ রচনার কাজে গলদঘর্ম। লিখিতেছে, পড়িতেছে, কাটিতেছে, ভাবিতেছে, আবার লিখিতেছে। একটি প্রকাণ্ড অভিধানও ঘাঁটিতেছে।

লিলির উচ্ছল প্রবেশ। কণ্ঠে সংগীত। প্রবেশ করিয়া অরবিন্দকে দেখিয়া থামিয়া গেল।)

লিলি : এই রে!
অরবিন্দ : কী হোলো? আরে—শোনো শোনো—
লিলি : কী?
অরবিন্দ : চলে যাচ্ছো কেন?
লিলি : আপনি কাজে ব্যস্ত।
অরবিন্দ : না—হ্যাঁ, ব্যস্ত মানে—অবশ্য কাজটা দরকারী, তোমার বাবা—
লিলি : আপনি কাজ করুন, আমি যাচ্ছি!
অরবিন্দ : না না, শোনো—একটা কথা—
লিলি : কী, বলুন?
অরবিন্দ : লিলি, তুমি এখনো আপনি বলা ছাড়লে না?
লিলি : বাঃ, আপনি কতো বড়ো, আপনাকে তুমি বলতে পারি?
অরবিন্দ : বড়ো, তা কী হয়েছে? আর—এমন বেশি কী বড়ো? আমি তো—
লিলি : আমি কি শুধু বয়সের কথা বলছি?
অরবিন্দ : তবে?
লিলি : সব দিকে বড়ো। আপনি হলেন ঘোষ অ্যান্ড সান্‌স্‌-এর 'সান'। আপনি হলেন বাঘবন্দী কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস্‌ চেয়ারম্যান—
অরবিন্দ : আবার ঠাট্টা শুরু করলে?
লিলি : ঠাট্টা কোথায় করলাম? কোন্‌টা নন্‌ আপনি এর মধ্যে?
অরবিন্দ : এর একটাকেও তো তুমি এক কানাকড়িও দাম দাও না! আমি যে—
লিলি : কই, কী কথা আছে বলছিলেন, বললেন না?
অরবিন্দ : অ্যাঁ? কী বলছিলাম?
লিপি : বললেন যে কী কথা আছে?
অরবিন্দ : কথা? কথা তো অনেক বলবার আছে, বলে উঠতে পারি কই?

লিলি : (তাড়াতাড়ি) থাক তবে, পরে বলবেন। এখন ব্যস্তও আছেন—

অরবিন্দ : না, ব্যস্ত মানে—এই একটা খসড়া করতে দিয়েছেন তোমার বাবা, সেইটা নিয়ে—

লিলি : কিসের খসড়া?

অরবিন্দ : একটা লিফলেটের। চিদানন্দের একটা স্ল্যান্ডারের জবাব। আশ্চর্য, জানো? তোমার মা সাহিত্যে অনুরাগী—সেটাকে ওরা নিন্দের পয়েন্ট ধরেছে?

লিলি : ধরবেই!

অরবিন্দ : ধরবেই? কেন ধরবে?

লিলি : মায়ের ঐ পত্রিকায় অনেক আধুনিক লেখা বেরোয়।

অরবিন্দ : আধুনিক তো কী? নোংরা লেখা আছে একটাও? একটা লেখাও কেউ বার করতে পারবে যাকে অরুচি—মানে—রুচিসম্মত নয় বলা যেতে পারে?

লিলি : হ্যাঁ, কিন্তু—আপনি জানলেন কী করে?

অরবিন্দ : (আহত) লিলি, আমি কি সাহিত্যের কোনো খবরই রাখি না ভাবো?

লিলি : না না, তা কেন ভাববো? তবে ভাস্বতী পত্রিকার সব লেখা কেউ পড়েছে—ভাবা যায় না।

অরবিন্দ : কেন? কেন? আমি পড়েছি! প্রত্যেকটি লেখা পড়েছি। মাসীমার সঙ্গে কতো আলোচনাও হয়েছে।

লিলি : প্রত্যেকটা পড়েছেন?

অরবিন্দ : প্রত্যেকটা।

লিলি : কোন্ সংখ্যার?

অরবিন্দ : সব ক'টা সংখ্যা—পাঁচটাই। যেটা বেরুবে সামনের মাসে তাও পড়েছি।

লিলি : সেটা আবার কী করে পড়লেন?

অরবিন্দ : বাঃ প্রুফ দেখে দিলাম যে? মাসীমাকে শুধু ফাইন্যাল প্রুফটা দেখতে হয়েছে।

লিলি : এতো কাজ করেন কখন? সারাদিন তো বাবার ইলেক্‌শন নিয়ে খাটছেন।

অরবিন্দ : প্রুফগুলো অফিসে বসে দেখেছি! বাবাকে বলা আছে—মেসোমশাইয়ের ইলেকশন পর্যন্ত আমার ডিউটি এখানে।

লিলি : মায়ের পত্রিকার প্রুফ দেখা বুঝি ইলেকশনের কাজ?

অরবিন্দ : নিশ্চয়ই! অন্তত আমি তাই মনে করি। সেই পয়েন্টটাই লিফলেটে এস্টাবলিশ্ করবার চেষ্টা করছিলাম। ইয়ে—শুনবে, কী লিখেছি?

লিলি : পড়ুন না?

অরবিন্দ : শেষ হয়নি এখনো অবশ্য, তবে—

লিলি : যেটুকু হয়েছে পড়ুন।

অরবিন্দ : (গলা পরিষ্কার করিয়া) 'স্নেহের বাঘবন্দী কনস্টিটুয়েন্সির'—

লিলি : কিসের বাঘবন্দী—?

অরবিন্দ : স্নেহের! মানে—'স্নেহের বাঘবন্দী কনস্টিটুয়েন্সির ভ্রাতা ভগিনিগণ।'

লিলি : ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। পড়ুন। (কষ্টে হাসি চাপিল)

অরবিন্দ : 'ভ্রাতাভগিনিগণ। আপনারা জ্ঞাত আছেন, পরম শ্রদ্ধান্বিত, দেশপ্রেমিক.

কর্মমহাবীর শ্রীমণিভূষণ মজুমদার বিয়ে বিয়েল মহাশয় বাঘবন্দীর—'

লিলি : কী মহাশয়?

অরবিন্দ : বি. এ., বি. এল.—ডিগ্রীগুলো দিয়ে দিলাম।

লিলি : ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি—পড়ুন—

অরবিন্দ : বি. এ. বি. এল. মহাশয় বাঘবন্দীর যোগ্য সন্তান-সন্ততিদের অর্থাৎ আপনাদের ভোটপ্রার্থী। মণিভূষণবাবুর বিচিত্র গুণাবলী আপনাদের সন্নিধানে নূতন করিয়া কীর্তন করা বাহুল্য, কারণ আপনারা তাহা সবই জ্ঞাত আছেন।' এই জ্ঞাত কথাটা দু'বার হয়ে গেছে, বদলে দেবো পরে। 'অদ্য আপনাদের সমক্ষে এই আবেদনের মূল উদ্দেশ্য—এই কেন্দ্রের অপর এক ভুঁইফোঁড় ভোটপ্রার্থী'—আচ্ছা, ভুঁইফোঁড় কথাটার একটা ভালো প্রতিশব্দ বলতে পারো?

লিলি : (হাসি চাপিয়া) ভূমিস্ফোটক?

অরবিন্দ : রাইট! কথাটা জিভে আসছিলো, ঠোঁটে আসছিলো না। 'অপর এক ভূমিস্ফোটক ভোটপ্রার্থীর হাস্যকর এক কুৎসাসংগীতের অপকৃষ্ট প্রচেষ্টার মর্ম উদ্ঘাটন করা। উক্ত ভুঁই'—না ওটা ভূমিস্ফোটক হবে—'উক্ত ভূমিস্ফোটক রটনা করিতেছেন, পরম পূজনীয়া সরস্বতীর আশীর্বাদধন্যা শ্রীমতী মজুমদারের সাহিত্য ড্যাশ—'' ড্যাশ মানে ওটা পেট্রোনাইজিং বলতে চাইছি। কী হবে বাংলাটা বলো তো?

লিলি : পেট্রন তো পৃষ্ঠপোষক।

অরবিন্দ : ঠিক ঠিক। 'শ্রীমতী মজুমদারের সাহিত্য-পৃষ্ঠপোষকতার'—সাহিত্য-পৃষ্ঠ—একটু কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?

লিলি : না না, চমৎকার মানিয়ে গেছে বাকি লেখাটার সঙ্গে।

অরবিন্দ : বলছো? তা হলে ঐ থাক। 'সাহিত্য-পৃষ্টপোষকতা নাকি অপরাধের তুল্য। হে সুধী ভ্রাতা-ভগিনিগণ! আপনারা অবশ্যই এইরূপ হাস্যোদ্দীপক অ-যুক্তি শুনিয়া হাস্যে বিস্ফোরিত হইয়াছেন—'

(লিলি এইবার হাস্যে 'বিস্ফোরিত' হইত যদি না ভাগ্যক্রমে ভিতর হইতে ব্যস্ত-সমস্তভাবে মণিভূষণ প্রবেশ করিতেন)

মণি : এই যে লিলি—তোর মা কোথায় রে?

লিপি : বেরিয়ে গেছেন।

মণি : বেরিয়ে গেছে তা আমিও জানি। কোথায় গেছে জানিস?

লিলি : চঞ্চলা মাসীমার বাড়ি।

মণি : চঞ্চলা মাসীমার বাড়ি—এই সক্কালবেলা?

লিলি : বললো—সাহিত্যসভার ব্যাপারে কী সব অনেক কাজ—

মণি: সাহিত্যসভা! সাহিত্য সাহিত্য করে ক্ষেপে গেলো একেবারে। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, উনি এক কচুর সাহিত্য নিয়ে আছেন! —অরবিন্দ! ওটা হয়েছে লেখা?

অরবিন্দ : একটু বাকি আছে।

মণি : শেষ করে ফেলো, তাড়াতাড়ি! বেশ চুটিয়ে লিখো! কী আশ্চর্য, সাহিত্যে অনুরাগ, সাহিত্য-চর্চা—এটাকে ওরা দোষ বলে চালাতে চায়! মুখ্যু বেটারা, ক-

অক্ষর গোমাংস, সাহিত্যের বুঝবে কী? (অরবিন্দ বসিয়া গেল কাগজ কলম লইয়া
কখন ফিরবে কিছু বলেছে?

লিলি : ঠিক নেই। মা খুব আপসেট্। স্মরজিৎবাবুর জবাব এলো না এখনো—কাল সাহিত্য-সভা?

মণি : কে স্মরজিৎবাবু?

লিলি: বাঃ, স্মরজিৎ সান্যাল! এর মধ্যে ভুলে গেলে?

মণি : ও, সেই কবি? যাকে সাহিত্যসভার প্রেসিডেন্ট করেছে তোর মা?

লিলি : প্রেসিডেন্ট কোথায়? চীফ গেস্ট। প্রেসিডেন্ট তো তুমি!

মণি : আমি প্রেসিডেন্ট, না? আমার ধারণা ছিল আমি চীফ্ গেস্ট।

লিলি : বাঃ। উনি আসবেন কলকাতা থেকে, আর তুমি হলে এখানকার, তুমি গেস্ট হবে কী করে?

মণি : ঐ হলেই হোলো! কী মনে হয় তোর? কিছু কাজ হবে, তোর মায়ের ঐ সাহিত্যসভায়?

লিলি : কী বলছো তুমি? আমাদের সভায় স্মরজিৎ সান্যালকে দেখলে মেয়েদের সলিড ভোট। কলেজের ছাত্রী যারা ভোটার আছে, গার্লস্ স্কুলের টীচাররা—সেন্ট পারসেন্ট। (অরবিন্দ উৎকর্ণ হইল)

মণি : বলিস কী?

অরবিন্দ : স্মরজিৎ সান্যাল—কই, লেখা দেখিনি তো?

লিলি : লেখা দেখেন নি? বিদীর্ণ প্রেষণা? সীতা ও অ্যান্ড্রোমিডা?

অরবিন্দ : মানে ভাস্বতীতে কখনো তো—

লিলি : আপনি কি ভাস্বতী ছাড়া আর কিচ্ছু পড়েন না?

অরবিন্দ : না না, পড়বো না কেন? মানে—

লিলি : ভাস্বতী অবধি এখনো নামেন নি স্মরজিৎ সান্যাল। নামাবার জন্যে মা আর চঞ্চলা মাসীমা জীবনপাত করছেন। এইবার যদি হয়।

মণি : মেয়েদের সলিড ভোট বলছিস?

লিলি : নিশ্চয়ই! অন্তত যে মেয়ে পড়তে পারে।

মণি : তবে তো বেশ খাতির করতে হয়? কাল কখন আসবে?

লিলি : কাল কোথায়? আজ বিকেলে আসবার কথা। অথচ এখনো চিঠি এলো না।

মণি : আজ কেন?

লিলি : মা নেমন্তন্ন করেছে। একটু সময় হাতে না পেলে ভাস্বতীর জন্যে লেখা বার করবে কী করে?

মণি : ঠিক! ভালোই করছে। আজ এলে ওর কালকের বক্তৃতার অ্যাঙ্গলটাও একটু কথাবার্তা বলে নেওয়া যেতে পারে।

অরবিন্দ : স্মরজিৎ সান্যালের লেখা কি শুধু মেয়েরাই পড়ে?

লিলি : তা কেন হতে যাবে?

অরবিন্দ : না, তুমি বললে কি না—মেয়েদের ভোট—

লিলি : তা আমি মেয়েদের কথাই জানি। ছেলেদের কথা আমি বলবো কী করে?

অরবিন্দ : ও হ্যাঁ, তা-ও তো বটে।

মণি। কই অরবিন্দ, কী লিখলে একটু শোনাও তো দেখি?

অরবিন্দ : শুনবেন? স্নেহের বাঘবন্দী কনস্টিটুয়েন্সির ভ্রাতাভগিনিগণ! আপনারা জ্ঞাত আছেন, পরম শ্রদ্ধান্বিত, দেশপ্রেমিক, কর্ম-মহাবীর শ্রীমণিভূষণ মজুমদার বি এ. বি. এল. মহাশয় বাঘবন্দীর যোগ্য সন্তানসন্ততিদের— (মণিভূষণ হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন)

মণি : কই দেখি কাগজটা? (কাগজটি লইয়া পড়িলেন। পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন।) ইয়ে— বেশ হয়েছে। এটা থাক আমার কাছে, একটু দেখে শুনে দেবো।

অরবিন্দ : শেষ হয়নি যে? আর মিনিট দশেক গেলে—

মণি : না না থাক। এটা তেমন জরুরি নয়। অন্য অনেক আর্জেন্ট কাজ পড়ে আছে।

অরবিন্দ : কী, বলুন? আমাকে দিয়ে যদি হয়—

মণি : কেন হবে না? তোমাকে দিয়ে হবে না তো কাকে দিয়ে হবে? ইয়ে—ঐ, কী বলে? তুমি বরং—কোন্‌টা যে বলি ছাই, এতো জরুরি কাজ বাকি—এই—এই লিস্টটা নাও। (টেবিল হইতে একটি ভোটার্স লিস্ট তুলিয়া লইলেন) এই নামগুলো স্লিপে তুলতে হবে। নাম, বাপের নাম, ঠিকানা আর বয়স। দারুণ রেসপন্সিব্‌ল কাজ কিন্তু! এই স্লিপের অ্যাকিউরেসির উপর ভোট। বুঝে নিয়েছো তো?

অববিন্দ : হ্যাঁ, বুঝেছি। নাম, বাপের নাম, ঠিকানা, বয়স। স্লিপ কোথায় পাবো?

মণি . স্লিপ? স্লিপ বোধহয় ওপরে আমার ঘরে টেবিলের নিচে আছে এক গাদা। লিলি, দেখ্ না?

অরবিন্দ : আমি আনছি।

(মহোৎসাহে স্লিপ আনিতে গেল। মণিভূষণ কাগজে আর একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। করিয়া শিহরিলেন।)

লিলি : (ভালোমানুষ) লেখাটা তোমার ভালো লাগলো না বাবা?

মণি। অ্যাঁ? না না, মন্দ হয় নি, তবে— (লিলি এইবার হাসিতে যথার্থই 'বিস্ফোরিত' হইল) হাসছিস কেন? হাসবার কী আছে? ভালো বাংলা লিখতে না পারলেই কেউ আব—ইয়ে হোলো না—না?

লিলি : ওটা আমায় দাও বাবা। আমি রেখে দেবো।

মণি : হাসতে তো খুব পারিস। লিখে দে না জিনিসটা ঠিক করে?

লিলি : আমি? আমি লিখতে পারি না কি?

মণি : লিখতে পারো না—কলেজে শিখছো কী?

লিলি : আমাব তো ইকনমিক্সে অনার্স ছিল। তুমি-ই তো বললে তখন—বাংলা অনার্স তারাই নেয়, যাদের আর কিছু হয় না।

মণি : তখন কি জানতাম লিফ্‌লেট্ লিখতে হবে?—দে না একটু, দেখ্ না চেষ্টা করে! কাকে দিয়ে লেখাই এখন? কাল সকালের মধ্যেই বার করতে হবে এটা!

লিলি : চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু তাতে হবে না তোমার কাজ। তুমি ভালো কাউকে জোগাড় করো এসব কাজের জন্যে।

মণি · আরে. জোগাড় তো হয়েছে ভেবেছিলাম—(সামলাইয়া) না, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।

কিন্তু কে-ই বা আছে? ইলেকশন অফিসে তো ক্লাবের চ্যাংড়ারা। আর তো—ইয়েস্! কী আশ্চর্য! এই কথাটা এখনো— (ঘড়ি দেখিলেন। দেখিয়া ফোন ধরিলেন।) হ্যালো বাঘবন্দী হাইস্কুল দিন তো..নাম্বার দেখে নিন না! আমি মণি মজুমদার কথা বলছি...হ্যালো—হেডমাস্টারমশাই আছেন?...কে—জলধরবাবু? আমি মণি মজুমদার...নমস্কার নমস্কার, শুনুন, আপনার স্কুলে বাংলা কে পড়ায়?...হ্যাঁ, সে তো বটেই, একজনে কী করে হবে? আমি জানতে চাইছিলাম—বাংলায় কোয়ালিফিকেশন কার আছে? বাংলায় অন্—

(লিলি এতক্ষণ অরবিন্দর রচনা লইয়া আপন মনে হাসিতেছিল। অরবিন্দ স্লিপ হাতে প্রবেশ করিতে কাগজটি লুকাইয়া একটি বই তুলিল।)

অরবিন্দ : এইগুলো? (ফোন করিতে দেখিয়া থামিয়া গেল)

মণি! —হুঁ হুম্! এক মিনিট সবুর করুন। (ফোনের মুখ চাপিয়া ধরিলেন)

অরবিন্দ : না না, আপনি ফোন সেরে নিন—

মণি! ঠিক আছে, ফোনের চেয়ে এটা জরুরি। হ্যাঁ, ঐ স্লিপগুলোতে এই লিস্টটা থেকে—তুমি—তুমি বরং ভিতরে আমার অফিসে বসে যাও।

অরবিন্দ : না না, আমি এখানেই বেশ আছি, ভিতরে তো আপনি কাজ করবেন—

মাণি : ও, হ্যাঁ। তা ইয়ে, একটু দেখো তো, অফিসের টেবিলে একটা কাগজ ফেলে এসেছি—

অরবিন্দ : কী কাগজ বলুন?

মণি! একটা ঐ ইয়ে—

লিলি : (ভালোমানুষ) আমি আনছি বাবা। (মণিভূষণ রক্তচক্ষুতে লিলির দিকে চাহিলেন)

অরবিন্দ · না না, আমি নিয়ে আসছি—

(অফিস ঘরে গেল)

মণি : (তাড়াতাড়ি ফোনে) হ্যালো—বাংলা অনার্স কে আছে?...সনৎ বোস? কেমন, বেশ চালাক চতুর? ...লিখতে টিখতে পারে?...সনৎ বোস, সনৎ—ওহো, ঐ যাকে গতবার নিলাম?...ও আচ্ছা, তবে তো প্রবেশনে আছে এখনো...হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে, শুনুন—

(অরবিন্দর প্রবেশ)

অ্যাঁ? কী?

অরবিন্দ : না, ঐ—কী কাগজ, সেটা বললেন না তো? অনেক কাগজ রয়েছে টেবিলে—

মণি : যে কোনো একটা—(সামলাইয়া) একটা ইয়ে—টাইপ করা চিঠি, সামনেই আছে। তাড়াতাড়ি, আমি ফোন ধরে আছি—

(অরবিন্দ আবার ছুটিল)

হ্যালো, হ্যালো—শুনুন তাকে এখুনি পাঠিয়ে দিন আমার বাড়ি...আরে, ক্লাস আছে তো কী? ক্লাস আর কাউকে দিয়ে ম্যানেজ করে দিন...তবে আপনি নিন গিয়ে ক্লাসটা। না হয় ছুটি দিয়ে দিন। স্কুলের সেক্রেটারি ডুবতে বসেছে, আপনি ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত! হ্যাঁ... আচ্ছা, দেরি না হয়, ভীষণ দরকার।

(ফোন রাখিলেন। অরবিন্দর প্রবেশ, হাতে চারখানি চিঠি।)

অরবিন্দ : দেখুন তো, কোন্‌টা এর মধ্যে?
মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ, এইগুলোই—(না দেখিয়াই সব কটি লইলেন)
অরবিন্দ : কানেকশন কেটে গেলো বুঝি?
মণি : কিসের কানেকশন?
অরবিন্দ : ফোনের।
মণি : কাটবে কেন?
অরবিন্দ : না, বললেন ফোন ধরে আছি, আমি ভাবলাম চিঠিটা বুঝি—
মণি : ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তা থাকগে, ও পরেই হবে। তুমি বসে যাও লিস্টটা নিয়ে—
অরবিন্দ : হ্যাঁ, আমি এখুনি আরম্ভ করে দিচ্ছি।

(পাঁচুর প্রবেশ)

পাঁচু : কাপ্তেনবাবু এসেছেন।
মণি : কাপ্তেনবাবু?
পাঁচু : আজ্ঞে জটাইতলা আথ্‌লিক কেলাবের কাপ্তেনবাবু—
মণি : ও মোহন? নিয়ে আয়।

(পাঁচুর প্রস্থান। মণিভূষণ চুরুট বাহির করিলেন। দেশলাই পাইলেন না।)

এগারোটা বাজে, তোর মা এখনো—দেশলাইটা আবার—(অফিসের দিকে ফিরিলেন)

লিলি : আমি দেখছি—
মণি : না না, তুই বোস—

(অফিসে প্রস্থান। লিলি বই হাতে জাঁকাইয়া বসিয়াছে।)

অরবিন্দ : লিলি।
লিলি : কী?
অরবিন্দ : ইয়ে—লোক আসছে।
লিলি : তাতে কী? মোহনবাবু তো?
অরবিন্দ : হ্যাঁ মোহনবাবু, তবু—
লিলি : মোহনবাবুর সঙ্গে বাবার আর কী প্রাইভেট কথা থাকবে?
অরবিন্দ : না, সে কথা নয়, তবে—

(মোহনকে ঘরে আনিয়া দিয়া পাঁচু চলিয়া গেল। মোহন লিলিকে দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করিল।)

মোহন : নমস্কার।

(মোহনের 'স'গুলির উচ্চারণ ইংরাজী S-এর মতো)

অরবিন্দ : (পিছন হইতে গম্ভীরভাবে) নমস্কার।
মোহন : (চমকাইয়া) অ্যাঁ? নমস্কার নমস্কার। (লিলিকে) ভালো আছেন?
অরবিন্দ : (আবার পিছন হইতে) হ্যাঁ ভালো আছি।

(মোহন আবার লিলির দিকে ফিরিয়া একটা কিছু বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মণিভূষণ প্রবেশ করায় বাধা পড়িয়া গেল)

মণি : কী মোহন, কী খবর?

মোহন : নমস্কার স্যার। খবর ভালোই, তবে—

মণি : তবে কী?

মোহন : ঐ ভাস্বতী পত্রিকাটা নিয়ে ওরা খুব ইয়ে করছে।

অরবিন্দ : করতে দিন। তার জবাব বেরুচ্ছে শিগ্‌গিরই। (মণিভূষণ একবার অরবিন্দর দিকে চাহিলেন।)

মণি : হ্যাঁ, ওটা—ওটা দেখছি আমি। আর কী খবর বলো।

মোহন : আজ সকালে জগদানন্দ রোড আর আটপুকুরের খানিকটা ঘোরা হয়েছে। তবে লোক বড়ো কম স্যার।

মণি : লোক কম কী হে? তোমাদের ক্লাবে তো দেড়শো মেম্বার?

মোহন : সবাইকে পাচ্ছি কোথায় স্যার? সবাই তো দেশের কাজ বলে বুঝছে না, বলে—দু'টো সিঙ্গাড়ায় আর ঘোরা যায় না। বুঝুন স্যার, দেশের এই দুর্দিনে এরা সিঙ্গাড়ার কথা ভাবছে!

অরবিন্দ : দরকার নেই অমন লোকের কাজ দিয়ে!

মণি : (তাড়াতাড়ি) না না, সিঙ্গাড়ার কথা ভাববে কেন? ও তোমার ভুল ধারণা মোহন!

মোহন : ভুল ধারণা? জিজ্ঞেস করুন না ডেকে? ঐ তো সর্বেশ্বর সেদিন—

মণি : তুমি সিঙ্গাড়ার সঙ্গে কেক একটা করে ব্যবস্থা করে দাও। ওরা দেশের কাজে প্রাণ দিতে পারে, তাই বলে আমার তো একটা দায়িত্ববোধ আছে। (অরবিন্দ কী একটা বলিতে গেল) না, না, অরবিন্দ—তুমি ওটা শেষ করে ফেলো, ভীষণ জরুরি ওটা! (অরবিন্দ বসিল)

মোহন : কী স্যার? স্লিপ? ও তো সব হয়ে গেছে তৈরি ইলেকশন অফিসে।

মণি : না না, এ অন্য স্লিপ মোহন। এ অন্য কাজে দরকার। তুমি—গগনপুরে কাউকে পাঠাবার এখনো কিছু করে উঠতে পারলে না?

মোহন : কাকে আর পাঠাবো স্যার? ও আমাকেই যেতে হবে। ক্ষিতীশ আর খাঁদাকে নিয়ে কাল চলে যাবো ওদিকে।

মণি : আর এখানে?

মোহন : এখানে বটু রইলো। সন্তুদা আছে।

মণি : ওরা কি পারবে?

মোহন . দু'টো দিন না পারলে উপায় কী স্যার? গগনপুর হোলো চিদানন্দের ঘাঁটি। ওরা সব ব্রহ্মচারী পদবী শুনেই মজেছে। আপনার নামটা—কিছু মনে করবেন না স্যার—ভোটের পক্ষে একটু হাল্কা হয়ে গেছে। (অরবিন্দ আবার কী বলিতে গেল, কিন্তু মণিভূষণের দৃষ্টিতে থামিয়া যাইতে হইল)

লিলি : নাম তো বদলানো যায় বাবা অ্যাফিডেভিট করে?

মণি : তুই থাম!

মোহন : চিদানন্দ নামটাকে ভাঙাচ্ছে কম? গেরুয়া পরছে আজকাল। গগনপুরে চণ্ডীমন্দিরে পুজো করেই ওখানটা হাত করে ফেললো।

মণি : গগনপুরটা—কী মনে হয়? কিছু হবে?

মোহন : আলবাৎ হবে স্যার! দু'দিনে ভোল পাল্টে দেবো! ঐ জন্যে তো নিজে যাচ্ছি। তবে স্যার—পুজোর খরচটা একটু বেশি করতে হবে।

মণি : পুজো?

মোহন : চণ্ডীমন্দিরে পুজো না দিয়ে গগনপুরে কিছু শুরুই করা যাবে না স্যার! তার উপর চিদানন্দ রটাচ্ছে—আপনি নাস্তিক!

মণি : নাস্তিক? আমি নাস্তিক? এ আবার কোত্থেকে পেলো?

মোহন : ঐ ভাস্বতী পত্রিকা স্যার! ভাদ্র সংখ্যা। অমানিশা দেবীর কবিতা।

মণি : কী দেবী?

লিলি : (উঠিয়া) কী হয়েছে অমানিশা দেবীর কবিতায়?

মোহন : (উৎসাহে) ঐ যে লাইন দু'টো আছে না? ঐ যে—
'হে ঈশ্বর, যদি জানিতাম তুমি আছো, তবে
বলিতাম হাঁকি—'

লিলি : কহিতাম ডাকি।

মোহন : হ্যাঁ হ্যাঁ, কহিতাম ডাকি! ও আধুনিক কবিতা, মাথামুণ্ডু মনেও থাকে না ছাই!

লিলি : স্বাভাবিক!

মোহন : অ্যাঁ?

মণি : যদি জানিতাম—ও, আই সী! অর্থাৎ আসলে জানি—নেই?

মোহন : এক্‌জ্যাক্টলি স্যার! ওরা ঐ মানেই করেছে।

মণি : আঃ কী যে লেখা সব ছাপছে! একটু দেখে শুনে দেবে, তা না—

অরবিন্দ : হ্যাঁ, ও লেখাটা আমারও মনে হয়েছে ছাপা ঠিক হয়নি—
(লিলি সহসা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)
কী হোলো?

মণি : কে জানে? অমাবস্যা দেবীর কবিতার ভক্ত বোধ হয়।

মোহন : অমানিশা দেবী স্যার।

মণি : ও একই কথা। (অনুতপ্ত অরবিন্দ চিবুক চুলকাইতে লাগিল)
ভালো কথা বলেছো মোহন। লিফলেটে এ পয়েন্টটার ভালো করে জবাব দিতে হবে!

অরবিন্দ : (উঠিয়া) হ্যাঁ ও লেখাটা একটু বদলানো দরকার—

মণি : না না, তুমি লিস্টটা করে ফেলো, ওটা আগে চাই—

মোহন : আমি তবে চলি স্যার—গগনপুরের ব্যবস্থাটা করে ফেলি।

মণি : আচ্ছা এসো।

মোহন : ইয়ে—ফাণ্ডে এখন খুব বেশি নেই কিন্তু। যদি কেক দিতে হয়—

মণি : কাল অবধি চলবে?

মোহন : হ্যাঁ স্যার। কাল কেন, পরশু হলেও চলে।
(অরবিন্দর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল, তাহাতে ভ্রাতৃভাব বিশেষ প্রকাশ পাইল না। মোহন চলিয়া গেল।)

অরবিন্দ : এ সব চ্যাংড়াদের দিয়ে কী কাজ এগুবে কিছু?

মণি : না না, মোহন খুব কাজের ছেলে। ওর ক্লাবের ছেলেরাও খাটে খুব।

অরবিন্দ : হ্যাঁ, খাটে সিঙ্গাড়ার জন্য। পেছনে কোন ইডিওলজিক্যাল—

মণি : না না, ইডিওলজি—ইডিওলজির কথা ধরতে গেলে—ধরো স্বাধীন ভারতে খাদ্যসমস্যা হোলো সর্বপ্রথম সমস্যা, খাদ্যের কথা মনে রাখতে হবে বৈ কি?

অরবিন্দ : কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিগত খাদ্যচিন্তা—

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, একদিন ভালো করে আলোচনা করা যাবে। আমি—ইয়েটা সেরে ফেলি—

(অফিসে দ্রুত প্রস্থান। অরবিন্দ কাজ লইয়া বসিল। আবার উঠিয়া ইতস্তত করিয়া লিলির সন্ধানে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু বিবেকবুদ্ধির তাড়নায় ফিরিয়া স্লিপ্ লিখিতে আরম্ভ করিল। লিলির মা সুপ্রীতির প্রবেশ। অরবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।)

সুপ্রীতি : বোসো বোসো। কী করছো ওটা?

অরবিন্দ : এই লিস্ট থেকে স্লিপগুলোতে নাম, বাপের নাম, ঠিকানা—

সুপ্রীতি : এগুলো তো ইলেকশন অফিসে করেছে ওরা! তুমি আবার—

অরবিন্দ : না, এগুলো অন্য কাজে লাগবে। মেসোমশাই বললেন।

সুপ্রীতি : বললেন? তা এগুলো তোমাকে দেবার কী মানে হয়? আর কোনো কাজ পেলো না খুঁজে?

অরবিন্দ : এটা খুব রেস্পন্সিব্ল্ কাজ। এর অ্যাকিউরেসির উপরেই ভোট। (সুপ্রীতি অরবিন্দর মুখের দিকে চাহিলেন এক মুহূর্ত)

সুপ্রীতি : তাই বললেন?

অরবিন্দ : হ্যাঁ, তা ছাড়া খুব তাড়াতাড়ি দরকার।

সুপ্রীতি : ও—তা, লিলি কোথায়?

অরবিন্দ : এইখানেই ছিল। একটু আগে ভিতরে গেছে।

সুপ্রীতি : আমি লিলিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ কাজ একা করা যায় না। একজন পড়ে না দিলে—

অরবিন্দ : না না, কেন মিছিমিছি—

সুপ্রীতি : মিছিমিছি কিসের? বাবার ইলেকশন, মেয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে। (ভিতরের দরজার কাছে গেলেন) লিলি! —তুমি অফিসে গেলে না আজ?

অরবিন্দ : না, আজ আর হবে না যাওয়া। এদিকে অনেক কাজ—

সুপ্রীতি : তবে এখানেই খাবে।

(মণিভূষণের প্রবেশ)

মণি : এই যে, এসেছো তবু! বাড়িতে ইলেকশন, আর তুমি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছো!

সুপ্রীতি : গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছি? বলি সাহিত্যসভাটা ইলেকশনের কাজ নয়?

মণি : সাহিত্যসভা! সাহিত্যসভায় ক'টা ভোট হবে?

সুপ্রীতি : ক'টা ভোট হবে? যদি স্মরজিৎ সান্যাল আসে? যতোজন মেয়ে-ভোটার সভায় উপস্থিত থাকবে, যতো মেয়ে তাদের কাছ থেকে শুনবে, যতো মেয়েকে আবার তারা বলবে—

মণি : তুমিও বলছো?

সুপ্রীতি : আমিও—মানে?
মণি : লিলিও ঐ কথা বলছিলো।

(লিলির প্রবেশ)

সুপ্রীতি : লিলি জানে, তাই বলেছে।
লিলি : কী জানে লিলি?
মণি : তোর মা-ও বলছেন শরৎ সান্যালকে দেখলে—
লিলি : স্মরজিৎ সান্যাল।
মণি : ঐ হোলো।
সুপ্রীতি : ঐ হোলো মানে?
মণি : না না স্মরজিৎ স্মরজিৎ! ভুল হয়ে গেছিলো!
সুপ্রীতি : আর যদি ভাস্বতীতে একটা লেখা বার করতে পারি এই সংখ্যায়, তবে তো কথাই নেই!
মণি : তোমার ঐ ভাস্বতী নিয়ে চিদানন্দ খুব হৈ চৈ করছে।
সুপ্রীতি : তা যদি করে, তার নিজের মুখ্যুমি প্রচার করছে। আমাদের ভালোই।
মণি : না, এমনিতে অসুবিধে ছিল না। কিন্তু—নাস্তিক বলছে!
সুপ্রীতি : নাস্তিক?
মণি: হ্যাঁ, কোন্ এক অমাবস্যা দেবীর কবিতা ছাপিয়েছো—
সুপ্রীতি : অমাবস্যা দেবী?
অরবিন্দ : (তাড়াতাড়ি) অমানিশা দেবী।
মণি : ঐ একই—না না, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—অমানিশা! অমানিশা দেবী। (সুপ্রীতি লিলির দিকে চাহিলেন। লিলি মুখ ফিরাইয়া লইল।)
সুপ্রীতি : (মণিভূষণকে) কোন্ কবিতা?
মণি : কোন্ সংখ্যা যেন অরবিন্দ?
অরবিন্দ : ভাদ্র সংখ্যা। 'হানিয়াছ মোরে।'
মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ—হানিয়াছ। কী দু'টো লাইন নাকি আছে—ভগবান তুমি যদি থাকতে—
অরবিন্দ : 'হে ঈশ্বর, যদি জানিতাম তুমি আছ'— (সুপ্রীতি আবার লিলির দিকে চাহিলেন, কিন্তু লিলি ফুলদানির ফুলে ডুবিয়া আছে।)
সুপ্রীতি : কী হয়েছে তাতে?
অরবিন্দ : আমার তো কিছু মনে হয় না। ভালোই তো কবিতাটা।
মণি : বাঃ! 'যদি জানিতাম'। কী মানে দাঁড়ালো?
সুপ্রীতি : কী মানে—বলো?
মণি : আঃ, ভেবে দেখো না একটু। 'যদি জানিতাম' বললে আর ভগবান থাকে? প্রুফ দেখবার সময়ে বুদ্ধি করে 'যদি'টা বাদ দিয়ে দিলে ভগবান রয়ে যেতো, ঝামেলা উঠতো না।
সুপ্রীতি : বলি, কবিতার নামটার কী মানে?
মণি : অ্যাঁ?
সুপ্রীতি : 'হানিয়াছ মোরে'। কে হানিয়াছে?

মণি ! (ভাবিয়া) ভগবান?

সুপ্রীতি : তবে? আর শেষ দু'টো লাইন? কী মানে তার?

মণি : দুত্তোরি, আমি কি শেষ দু'টো লাইন পড়েছি যে তার মানে জানবো?

সুপ্রীতি : তো না পড়েই বলো কেন যা তা?

মণি : আমি বলছি, না চিদানন্দ বলছে?

সুপ্রীতি : চিদানন্দ বললে তার জবাব দেওয়া যায় না?

মণি : আলবাৎ যায়! যায় মানে—যেতে হবে! তুমি ভাদ্র সংখ্যাটা দাও তো আমাকে, সনৎ এলেই তাকে দিয়ে—হুঁ হুম্। আমি একবার শেষ দু'টো লাইন দেখে—

সুপ্রীতি : কে এলে?

মণি : ঐ—সনৎ, হাই স্কুলের টীচার। ইলেকশনে খাটতে চায়, তাই আসতে বলেছি।

সুপ্রীতি : অরবিন্দ! তুমি পড়েছো তো 'হানিয়াছ মোরে'?

অরবিন্দ : হ্যাঁ নিশ্চয়ই! খুব—বলবান কবিতা।

সুপ্রীতি : তুমি একটা জবাবের খসড়া করে ফেলো তো এখুনি।

মণি : (শশব্যস্তে) না না, অরবিন্দ অন্য কাজ করছে—খুব জরুরি! তা ছাড়া ওকে অফিস যেতে হবে।

অরবিন্দ : না, অফিস আজ আর যাবো না।

মণি : তবে যাও, না হয় খাওয়া দাওয়া সেরে এসো—

সুপ্রীতি : কোথায় যাবে? এখানে খাবে ও।

মণি : ও, সে তো ভালোই, সে তো ভালোই। তবে স্নান করে নাও গে, বেলা হোলো—

অরবিন্দ : এই তেলেনিপাড়া রোডটা ধরেছি—

মণি : তেলেনিপাড়া পরে হবে। ইলেকশন্ বলে তো স্নানাহার বাদ দেওয়া যায় না। যাও স্নান করে নাও।

সুপ্রীতি : হ্যাঁ, যাও অরবিন্দ। বেলা কম হয়নি। লিলি যা—ওকে তোয়ালে টোয়ালে দে।

লিলি : (মুখ না ফিরাইয়া) বাথরুমে সবই আছে।

অরবিন্দ : হ্যাঁ হ্যাঁ, ও নিয়ে ভাবতে হবে না—

(অরবিন্দর প্রস্থান)

সুপ্রীতি : (লিলিকে) আছে তা আমিও জানি। একটু গিয়ে দিতে কী হয়? অতিথি—

মণি : আচ্ছা তুমি মহা বিপদে ফেলো আমাকে এক এক সময়ে—

সুপ্রীতি : কেন?

মণি : কেন? ঐ—কাগজটা কোথায় রে লিলি? তোকে দিলাম? (লিলি কাগজ বাহির করিয়া দিল) এই! দেখো, পড়ে দেখো। দেখে বলো অরবিন্দকে দিয়ে কী লেখাবে! (লিলি আবার হাসিয়া ফেলিল) তুমি হেসো না তাই বলে। নিজে লিখতে পারো না এক লাইন—

সুপ্রীতি : (মুখ তুলিয়া) কে লিখতে পারে না?

লিলি : মা!

মণি : তোমার মেয়ে! বলে—ইকনমিক্সে অনার্স ছিল!

সুপ্রীতি : তা ইকনমিক্সে—

লিলি : তুমি পড়ো তো!

সুপ্রীতি : তোর আবার বাড়াবাড়ি! (আবার পড়িলেন। তারপর মুখ তুলিলেন।) অরবিন্দ লিখেছে?

মণি : বলো এখন গিয়ে ওকে—লিফলেট লিখতে!

সুপ্রীতি : তা সকলের সব জিনিস হয় না কি?

মণি : আমি কি বলেছি—হয়? ঐ জন্যে তো ওকে স্লিপ লিখতে দিয়েছি।

সুপ্রীতি : তাই বলে স্লিপ লেখাবার কী মানে হয়?

মণি : দেখো? অরবিন্দর বাবা, আর অরবিন্দর কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন—এই আমার যথেষ্ট। অরবিন্দর কাজ আমার দরকার নেই।

সুপ্রীতি : অরবিন্দ খুব ভালো ছেলে।

মণি : আরে গেলো, আমি কি খারাপ ছেলে বলেছি? আমার পিসীমাও তো খুব ভালো মানুষ, অমন মানুষ হয় না। তাই বলে পিসীমাকে দিয়ে কি আমার বিজনেস্‌টা চলতো?

সুপ্রীতি : কাকে দিয়ে লেখাই তা হলে? লিলি—

লিলি : আমাকে দিয়ে হবে না।

মণি : ও একটা ব্যবস্থা করেছি আমি, তোমায় ভাবতে হবে না। সনৎকে দিয়ে লেখাবো। বাংলার টীচার হাইস্কুলের। বাংলা অনার্স।

সুপ্রীতি : বাংলা অনার্স হলেই যে ভালো বাংলা লিখতে পারবে, তার কী মানে আছে?

মণি : যা পারবে, তাতেই আমার হবে। তোমার শরৎ সান্—মানে ঐ সান্যাল মশাইয়ের কী খবর বলো।

সুপ্রীতি : চিঠি তো এলো না এখনো।

মণি : চিঠিপত্রে এ সব হয়?

সুপ্রীতি : আহা, চিঠিতে তো শুধু দিন তারিখ লিখেছিলাম। কলকাতায় মিসেস গুপ্ত নিজে গিয়ে রাজি করিয়ে ছাড়বেন—আমাকে কথা দিয়ে গেছেন?

মণি : মিসেস গুপ্ত কে?

সুপ্রীতি : স্মরজিৎ সান্যালের ভগ্নীপতির আপন জ্যাঠতুতো বোনের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও না হলে পেতাম কোথায়? আমাদের কে চেনে? বহু বলে কয়ে—

লিলি : শুধু বলে কয়ে? মিসেস গুপ্তর এক অখাদ্য গল্প ভাস্বতীতে ছাপিয়ে—

সুপ্রীতি : তোর আবার—এমন কী অখাদ্য গল্পটা, শুনি?

লিলি : অখাদ্য নয়? তুমি নিজে বলেছো—অখাদ্য।

সুপ্রীতি : স্মরজিৎ সান্যালের লেখা যদি পাই, ও সব চাপা পড়ে যাবে।

মণি! একটা কথা বলো দেখি পরিষ্কার করে? তিনি আসবেন কি আসবেন না?

সুপ্রীতি : এখন যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন—

মণি : শহরময় প্রচার তো করেছো আসবে বলে। তারপর?

সুপ্রীতি : আমি বিকেলের ট্রেনটা দেখি স্টেশনে গিয়ে। যদি না আসেন, কাল সকালে আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাবো কলকাতায়। মিসেস গুপ্তকে নিয়ে ওর বাড়ি গিয়ে তুলে নিয়ে আসবো।

মণি : সেই ব্যবস্থাটা বুদ্ধি করে গোড়াতেই করলে পারতে—

সুপ্রীতি : মিসেস গুপ্ত বললেন—দরকার হবে না। তা ছাড়া, চিনি না—হঠাৎ বাড়ি গিয়ে—

মণি . তুমি না চেনো, যে চেনে তাকে পাঠাতে।

সুপ্রীতি : কে চেনে? এ শহরের কেউ চেনে না। মিসেস গুপ্তর গল্প ছেপেছি কি সাধে?

মণি : তবে স্টেশনে যাচ্ছো, চিনবে কী করে?

সুপ্রীতি : বাঃ, অতো বড়ো সাহিত্যিক—দেখলে চেনা যাবে না?

লিলি : ক'জন সাহিত্যিক নামবে তোমার এই বাঘবন্দী স্টেশনে?

(পাঁচুর প্রবেশ)

পাঁচু : ইস্কুলের মাস্টারবাবু এসেছেন।

মণি : যাক সনৎ এসে গেছে। বসতে বলো, যাচ্ছি।

সুপ্রীতি : কেন, এইখানেই নিয়ে আসুক। দেখি একবার। লিলি যা তো, ভাদ্র সংখ্যা একটা নিয়ে আয়।

(লিলির প্রস্থান)

মণি : ঠিক আছে, এখানেই নিয়ে আয়।

(পাঁচুর প্রস্থান)

ইয়ে—তুমি একটু দু'মিনিটের জন্যে ভিতরে যাও দেখি। ওর প্রবেশনের কথাটা একটু বলে নিতে হবে।

(সুপ্রীতি ভিতরে গেলেন। পাঁচু সনৎকে দিয়া গেল। নিতান্ত গোবেচারা চেহারা, কৃশাঙ্গ। বয়স বেশি নয়।)

সনৎ : নমস্কার স্যর।

মণি : নমস্কার, বোসো বোসো। তুমি বলছি ভাই, কিছু মনে কোরো না। কতোই বা বয়স হবে তোমার?

সনৎ : নিশ্চয়ই, তুমি বলবেন বৈকি!

মণি : বেশ বেশ। তোমার ক'দিন হোলো স্কুলে?

সনৎ : ন'মাস।

মণি : ভালো ভালো, কী রকম চলছে? ক্লাসে ছেলেরা গোলমাল করে না তো?

সনৎ : আজ্ঞে না, ছাত্রদের সঙ্গে আমার রিলেশন ভালোই।

মণি : তা বেশ। তবে বেশি মাখামাখি করতে যেও না আবার ছাত্রদের সঙ্গে। ঐ এক ফ্যাশন হয়েছে আজকাল, ওতে ছাত্রদের শ্রদ্ধা ভয় সব চলে যায়।

সনৎ : না না, সেদিকে সাবধানে চলি। ওরা যথেষ্ট সম্মান করে।

মণি : হ্যাঁ, আর প্রবেশন চলছে তো এখনো। টিচিং লাইন প্রবেশনটা ইম্পর্ট্যান্ট, শুধু কাগজ-কলমের ব্যাপার নয়। জানো তো সেটা?

সনৎ : (ভয়ে ভয়ে) হ্যাঁ স্যার জানি বৈকি?

মণি : ঐ গাঁটটা পেরুতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবে তোমার বিশেষ ভাবনা থাকবে না, আমার হাতেই সব। আমি করে দেবো এখন।

সনৎ : আপনার দয়া স্যার।

মনি : আপাতত ইলেকশনে ফেঁসে আছি, স্কুলের দিকে বেশি নজর দিতে পারছি না! জিতবো ঠিকই, তবে টাফ ফাইট হবে। তোমাদের পাঁচজন একটু সাহায্য না করলে মুস্কিল।

সনৎ : নিশ্চয়ই। যা বলবেন—আমার সাধ্যমতো—

মণি : না না, আজে বাজে কাজ তোমাকে দেবো না। সে ছোকরারা আছে। যেটা ব্রেনের ব্যাপার, লেখাপড়ার ব্যাপার। এই ধরো—

(পত্রিকা হাতে লিলির প্রবেশ)

লিলি : মা কই?

মণি : ভিতরে গেছে। ডেকে আন্ তো।

(লিলির প্রস্থান)

ধরো অপোনেন্ট পার্টি একটা মিথ্যে স্ল্যান্ডার রটাচ্ছে। তার একটা গুছিয়ে জবাব লেখা। সাধারণ লোক তো সব সময়ে সত্যি মিথ্যে বিচার করতে পারে না। কী বলো?

সনৎ : হ্যাঁ সে তো বটেই।

মণি : এই দেখো না, এখনই একটা প্রবলেম্। আমার স্ত্রী একটা কাগজ বের করেন। তাতে একটি কবিতা বেরিয়েছে—অতএব আমি হয়ে গেলাম নাস্তিক।

সনৎ : সে কী!

মণি : ওরা কবিতাটার কদর্থ করছে—ভগবান নেই। অথচ কবিতাটার নামই হচ্ছে—'হানিয়াছ মোরে'। কে হানিয়াছে? অবভীয়াস্‌লি ভগবান! ভগবান যদি না-ই থাকে; তবে হানলো কী করে?

সনৎ : বটেই তো।

মণি : তুমি একজন ইন্টেলিজেন্ট লোক বলে চট করে বুঝতে পারলে। কিন্তু সব ভোটার তো বি.এ. অনার্স নয়। তাদের মিসলীড করছে। এখন এর একটা—

(পাঁচুর প্রবেশ)

পাঁচু : কাপ্তেনবাবু এসেছেন। বলছেন—ভীষণ দরকার।

মণি : কী হোলো আবার? নিয়ে আয়।

(পাঁচুর প্রস্থান)

এখন এর একটা জুৎসই জবাব দিতে হবে। শুধু এ পয়েন্টটা নয়; আমার স্ত্রীর কাগজটা নিয়েই ওরা হল্লা তুলেছে। যেন সাহিত্যচর্চা করাটাই একটা—

(উত্তেজিত মোহনের প্রবেশ)

মোহন : এরকমভাবে চলে না স্যার।

মণি : কেন কেন? কী হোলো?

মোহন : এই দেখুন স্যার! (একটি সচিত্র লিফলেট দিল)

মণি : এ কী! এ তো—আমি! ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কলেজে—এ ছবি ওরা পেলো কোথায়?

মোহন : তিরিশ বছরের পুরোনো কলেজ ম্যাগাজিন ঘেঁটে বের করেছে! এখন এর কী করি বলুন তো স্যার?

মণি : তা এটা—কলেজ ফাংশনে প্রেসিডেন্টের গলায় মালা দিয়েছি তো কী হয়েছে?

মোহন : সায়েব প্রেসিডেন্ট যে! কী লিখেছে দেখুন না পড়ে!

মণি : (পড়িয়া) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর পদলেহী ভৃত্য! বা বা বা, তা কী করে হোলো?

মোহন : সায়েব প্রেসিডেন্ট যে? ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব।

মণি : তা তখনকার দিনে সাহেবরাই ম্যাজিস্ট্রেট ছিল, প্রেসিডেন্টও হোতো, তা আমি কী করবো? ছাত্রজীবনে চিদানন্দ যে এ রকম কিছু করেনি, তা কে বলতে পারে?

মোহন : এক্‌জ্যাকটলি স্যার! আমি ঐ কথাটাই বলতে চাইছি!

মণি : কী কথা?

মোহন : ওরা স্যার আপনার ঠিকুজি কুষ্ঠি পাতি পাতি করে খুঁজে বের করেছে। আমরা কী করছি? চিদানন্দর পুরোনো জীবনের ক'টা খবর জানি আমরা?

মণি : তা ইলেকশন হচ্ছে আজকে আর তিরিশ বছর আগে—

মোহন : স্যার কিছু মনে করবেন না, আপনি গুরুজন, বয়সে বড়ো। কিন্তু আমি স্যার চোদ্দ বছর বয়স থেকে ইলেকশন করছি। সেই যখন হাফপ্যান্ট পরে ক্যাম্বিসের বল পিটতাম—তখন থেকে। এ রকম ভাবে হয় না।

মণি : কী রকম ভাবে?

(লিলি ও সুপ্রীতির প্রবেশ)

এই যে, একটা ইয়ে হয়ে গেছে। তোমরা—তোমরা বরং সনৎকে নিয়ে আমার অফিসঘরে বোসো। ওকে বুঝিয়ে দাও লাইনটা।

সুপ্রীতি : আসুন।

(সুপ্রীতি, লিলি ও সনৎ অফিসঘরে গেল)

হ্যাঁ বলো। (মোহন লিলিকে দেখিতেছিল, ঈষৎ চমকাইল)

মোহন : অ্যাঁ? হ্যাঁ, বলছিলাম—শুধু ভোট ফর চেঁচিয়ে ইলেকশন হয় না। স্কুপ্‌ চাই—স্কুপ্‌।

মণি : স্কুপ্‌?

মোহন : অপোনেন্টের হাঁড়ির খবর বের করতে হয়। চিদানন্দ যে তিরিশ বছর আগে আপনার মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর পদলেহন করেনি—তার প্রমাণ কী?

মণি : তার মানে?

মোহন : না না, মানে—পদলেহন হোলো ইলেকশন টার্ম! যদি বেরোয় কিছু—আমরাও পদলেহন লিখবো।

মণি : ওর যা চেহারা—ওকে কি আর প্রেসিডেন্টের গলায় মালা দিতে বলেছে কেউ?

মোহন : কথার কথা স্যার। খুঁজলে হয়তো আরো কেচ্ছা কিছু বেরুবে। চরিত্রদোষ যদি পাওয়া যায় তো বেস্ট! মোদ্দা কথা—স্কুপ্‌ চাই! স্কুপ্‌ ছাড়া ইলেকশন হয় না।

মণি : স্কুপ্‌ পাচ্ছি কোথায়?

মোহন : লোক লাগাতে হবে স্যার। খরচ করতে হবে।

মণি : লোক জানা আছে তোমার?

মোহন : আছে বৈ কি? কলকাতায় যদি হয়—

মণি : কী হয়?

মোহন : কলেজ লাইফ্ হচ্ছে বেস্ট! মাথা গরম থাকে, নতুন যৌবন—কিছু মনে করবেন না স্যার—

মণি : না না, বলো—

মোহন : কলকাতার কোন্ কলেজে পড়েছে যদি বলতে পারেন—

মণি : কলকাতায় পড়েনি।

মোহন : (নিভিয়া গিয়া) সেরেছে। তবে কোথায়?

মণি : বিষ্ণুনগর কলেজে।

মোহন : (লাফাইয়া উঠিয়া) বিস্টুনগর! লাক্ স্যার লাক্! একে বলে ইলেকশন লাক্। বিস্টুনগর আমার মামাবাড়ি স্যার—সব চেনা আমার!

মণি : পাওয়া যাবে?

মোহন : আমি আজ দুপুরেই চলে যাচ্ছি স্যার বিস্টুনগর। কালকের মধ্যেই যদি কিছু একটা বের করে না আনতে পারি—আমার নামে কুকুর পুষবেন।

মণি : যদি না থাকে কিছু, তবে আর কোত্থেকে—

মোহন : আলবাৎ আছে স্যার! কোন্ মানুষের থাকে না? তার ওপর গেরুয়া ধরেছে, ওর তো না থেকেই পারে না!

মণি : তবে তুমি এখুনি বেরিয়ে পড়ো!

মোহন : কিছু টাকা দরকার স্যার। ফান্ডের টাকা তো সন্তুদাকে দিয়ে যাবো—

মণি : নিশ্চয়ই! এসো আমার সঙ্গে।

(মোহনকে লইয়া অফিসঘরে গেলেন। পর্দা পড়িয়া গেল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পর্দা সরিবার পূর্বে আগের মতো 'ভোট ফর' ধ্বনি শোনা গেল। তুলনামূলকভাবে চিদানন্দর পক্ষের ধ্বনি আরও বেশি জোরদার।

পর্দা সরিলে দেখা গেল—অরবিন্দ একই স্থানে বসিয়া একমনে লিস্ট টুকিতেছে। বিড় বিড় করিতেছে—উনত্রিশ নম্বর তেলেনিপাড়া রোড, মহাবীর মাহাতো। বাবা—শিউশরণ মাহাতো, বয়স ছাব্বিশ। স্লিপের স্তূপ একপাশে।

অল্প পরে ভিতর হইতে সুপ্রীতির প্রবেশ। দরজার নিকট দাঁড়াইয়া অদৃশ্য কোনও ভৃত্যকে চিৎকার করিয়া উপদেশ দিতেছে।)

সুপ্রীতি : অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, নীল পর্দাগুলো—কতোবার বলবো? আর ঘরটা—বুঝলি? ঘরটা আর একবার মুছে দিবি। অ্যাঁ? সকালে মুছেছিস তো কী হয়েছে? আবার মুছবি। যা বলছি করবি! (ভিতরে আসিলেন) এ কী, তুমি সমানে লিখে চলেছো সারা দুপুর?

অরবিন্দ : অনেকগুলো নাম।

সুপ্রীতি : লিলিকে যে বসিয়ে গেলাম পড়ে দিতে—কোথায় গেলো?

অরবিন্দ : খানিকক্ষণ দিয়েছে পড়ে।

সুপ্রীতি : খানিকক্ষণ? আশ্চর্য মেয়ে। (দরজায় গিয়া) লিলি!

অরবিন্দ : আমি একাই পারবো—

সুপ্রীতি : তুমি ছেড়ে দাও ও কাজ এখন। পাঁচটা বাজে—একটু ঘুরে টুরে এসো না হয়।

অরবিন্দ : ঘুরে আসবো কী? এটা খুব জরুরি কাজ—

সুপ্রীতি : হোক জরুরি। ইলেকশন বলে শরীর স্বাস্থ্য কিছু দেখতে হবে না? লিলিকেও না হয় একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো! কুণো হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

অরবিন্দ : আপনি যদি বলেন, তবে না হয়—

(লিলির প্রবেশ, হাতে তুলি।)

লিলি : ডাকছো কেন?

সুপ্রীতি : বেলা পাঁচটায় কী করছিস ঘরে বসে? যা একটু ঘুরে টুরে আয়।

লিলি : কোথায় ঘুরবো?

সুপ্রীতি : যেখানে হয়, কাছাকাছি—পার্কে টার্কে। অরবিন্দ বেচারা সারা দুপুর একা বসে লিখছে—চোখ খারাপ হয়ে যাবে যে?

লিলি : তা উনি ঘুরে আসুন না? বিকেলবেলা কী দরকার লেখবার?

অরবিন্দ : না না, আমি লিস্টটা শেষই করে ফেলি।

সুপ্রীতি : তা একটু সাহায্য তো করতে পারিস। একা একা বসে কতোক্ষণ ঐ কাজ করা যায়?

লিলি : উনি বললেন—একা পারবেন, তাই আমি—

সুপ্রীতি : তাই তুমি গিয়ে ঘুম লাগালে! বলি ইলেকশনটা ওর বাবার না তোমার বাবার?

লিলি : ঘুম লাগিয়েছি আমি? বা বা বা—

সুপ্রীতি : তবে কী মহাকর্মটা করেছো শুনি?

লিলি : আমি তো পোস্টার লিখছি। সারা দুপুর লিখেছি।

সুপ্রীতি : পোস্টার? পোস্টার তো ইলেকশন অফিসে গাদাগুচ্ছের লেখা হচ্ছে রোজ। তুই আবার—

লিলি : সে পোস্টার নয়।

সুপ্রীতি : তবে কী পোস্টার?

লিলি : সাহিত্যসভার পোস্টার। যাতে কাজের কাজ হবে।

সুপ্রীতি : পোস্টার লাগাবে কে শুনি?

লিলি : সে আমাদের ব্যবস্থা আছে।

সুপ্রীতি : তোদের? তোরা কারা?

লিলি : আমি, বীথি, সুরমা, মন্দা, কজ্জলী, মীনা, ডলি, ছায়া, সুনয়নী, শিপ্রা, নন্দিতা,

সুপ্রীতি : হয়েছে হয়েছে—বুঝেছি। আইডিয়াটা ভালো। তা বেশ তো। অরবিন্দ, তুমি লিলির সঙ্গে বসে পোস্টার লেখো না? এর চেয়ে ইন্টারেস্টিং হবে।

অরবিন্দ : আপনি যদি বলেন—

লিলি : (সংশয়ে) আপনি পোস্টার লিখেছেন আগে কখনো?
অরবিন্দ : পোস্টার? না, কই—তেমন—
সুপ্রীতি : লেখেনি তো কী হয়েছে? শিখে নিতে কতোক্ষণ?
(পাঁচুর প্রবেশ)
পাঁচু : মাস্টারবাবু এসেছেন।
সুপ্রীতি : সনৎবাবু?
পাঁচু : আজ্ঞে হ্যাঁ।
সুপ্রীতি : এই রে! তোর বাবা তো ফিরলো না এখনো! কী করি বল তো? আমি তো থাকতে পারছি না আর—
লিলি : ট্রেনের কতো সময় বাকি?
সুপ্রীতি : কোথায় আর বাকি? পাঁচটা দশ হয়ে গেলো।
লিলি : আমি দেখবো?
সুপ্রীতি : তাই দেখ বরং, এটাও না হলে নয়। (পাঁচুকে) ডেকে আন।
(পাঁচুর প্রস্থান)
তুই—ইয়ে—অফিস ঘরে নিয়ে যা বরং, এ ঘরে অরবিন্দ কাজ করছে।
অরবিন্দ : না না, অসুবিধে হবে না।
সুপ্রীতি : না না, অসুবিধে হবে বৈ কি? একটা দরকারী কাজ নিয়ে আছো—
(পাঁচু সনৎকে দিয়া গেল)
সনৎবাবু, উনি বেরিয়েছেন। আমাকেও যেতে হচ্ছে স্টেশন। লিলি আর আপনি ওঘরে বসে ওটা ফাইনালাইজ করে ফেলুন। উনি এসে পড়বেন এক্ষুনি।
লিলি : আসুন।
(লিলি সনৎকে লইয়া অফিসঘরে এল। অরবিন্দ বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল।)
অরবিন্দ : কী কাজ? আমিও না হয় হেল্প করতে পারি।
সুপ্রীতি : না না, তোমার এই কাজটা অনেক বেশি দরকারী। ও একটা ফালতু কাজ—লিলিই পারবে। তুমি—তুমি বরং একটু ঘুরে এসে লিস্টটা শেষ করে ফেলো।
অরবিন্দ : না, ঘুরে এলে হবে না। অনেকটা বাকি। (কাজ লইয়া বসিল গোঁজ হইয়া। কিন্তু সুপ্রীতি অরবিন্দকে রাখিয়া যাইতেও ভরসা পাইতেছেন না।)
সুপ্রীতি : কিন্তু বিকেল বেলা এরকম ঘরে বসে—
অরবিন্দ : তাতে কী হয়েছে? বেড়াবার দিন ইলেকশনের পর অনেক পাওয়া যাবে।
সুপ্রীতি : তাই বলে সারা বিকেল এ রকম—ঠিক হয়েছে! তুমি আমার সঙ্গে চলো স্টেশনে।
অরবিন্দ : স্টেশনে?
সুপ্রীতি : হ্যাঁ চলো। চঞ্চলা আটকে পড়েছে, তখন থেকে ভাবছিলাম—একা যাওয়াটা কেমন দেখাবে।
অরবিন্দ : কিন্তু—এই লিস্ট?
সুপ্রীতি : ও হবে এখন! এটা আরো দরকার।
অরবিন্দ : (করুণভাবে) আপনি যদি বলেন—

সুপ্রীতি : হ্যাঁ, বলছি তো! চলো, আর সময় নেই বেশি।
(অফিসের দরজায় একটি দৃষ্টিপাত করিয়া অরবিন্দ সুপ্রীতির পিছন পিছন বাহির হইয়া গেল। অল্প পরে লিলির প্রবেশ।)

লিলি : মা!—আরে, গেলো কোথায় সব? পাঁচু!
(পাঁচুর প্রবেশ)
মা কি বেরিয়ে গেলেন?

পাঁচু : হ্যাঁ, এই তো—গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন।

লিলি : আর অরবিন্দবাবু?

পাঁচু : উনিও মা-র সঙ্গে গেলেন?

লিলি : মা-র সঙ্গে?

পাঁচু : আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়ি করে।

লিলি : আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই চা নিয়ে আয়—দু'জনের।
(পাঁচু ভিতরে গেল। লিলি অফিসের দরজায়।)
সনৎবাবু, এ ঘরে আসুন। কেউ নেই এখন এ ঘরে।
(সনৎ কাগজপত্র হাতে প্রবেশ করিল। ঘরে যে আর কেহ নাই, তাহাতে তাহার উদ্বেগ বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই।)
বসুন। (সনৎকে সোফায় বসাইয়া নিজে পাশে বসিল। সনৎ যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখিয়া বসিয়াছে, কিন্তু লিলির ভ্রূক্ষেপ নাই, সে কাগজে ডুবিয়া আছে।)
কিন্তু—এ কথাটা তো ঠিক হোলো না।

সনৎ : (সশঙ্কিত) কোন্‌টা?

লিলি : এই যে লাইনটা—অতএব নাস্তিকতা দূরে থাক, কবিতাটিতে এক অনাদি অবিনশ্বর পরম সত্তার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণই সূচিত হইয়াছে—এটা তো অমানিশা দেবীর কবিতার আসল কথা নয়?

সনৎ : না, তা নয়, তবে নাস্তিকতার প্রশ্নটার প্রতিবাদ করতে হবে তো? তাই—

লিলি : তাই বলে কবিতাটার উল্টো মানে করলে তো চলবে না?

সনৎ : না না, তা কী করে চলে?

লিলি : এখানে আত্মসমর্পণও নেই, অস্বীকারও নেই—

সনৎ : না, তা নেই।

লিলি : এখানে যা আছে তো হোলো একটা—একটা অভিযোগ, একটা অভিমান, একটা বিক্ষোভ, একটা অন্তর্দাহের জ্বালা। আপনার তাই মনে হয় না?

সনৎ : হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! ঠিক কথা।

লিলি : তবে আপনার এই লাইনটা আসে কি?

সনৎ : (তৎক্ষণাৎ) না ওটা কেটে দিন।

লিলি : কিন্তু কেটে কী বসাবেন ওখানে?

সনৎ : ইয়ে—ঐ—আসল কথাটা বসিয়ে দিন।

লিলি : কোন্ কথাটা?

সনৎ : ঐ যে বললেন—অভিযোগ, অভিমান, বিক্ষোভ, অন্তর্দাহের জ্বালা?

লিলি : (সংশয়ে) ও কথাগুলো ওভাবে দিলে লিফলেটে ঠিক হবে কি?
সনৎ : না, তা অবশ্য—তা ছাড়া নাস্তিকতার প্রশ্নটা রয়েই যায়।
লিলি : আচ্ছা, যদি শুধু এইভাবে বলা যায়—নাস্তিকতা আস্তিকতার কোনো প্রশ্নই এখানে উঠছে না। ও প্রশ্ন অবান্তর এখানে! ভাষাটা অবশ্য সাজিয়ে লিখতে হবে।
সনৎ : ভালোই হয়, কিন্তু— (থামিয়া গেল)
লিলি : কিন্তু কী?
সনৎ : আপনার বাবা বোধ হয়—মানে এই ইলেকশনের সময়ে উনি হয়তো আরো ডেফিনিট কিছু চাইবেন। অর্থাৎ—
লিলি : আপনি বলছেন—বাবা রাজি হবেন না?
সনৎ : (তাড়াতাড়ি) না, আন্দাজ একটা! আপনি বরং বলে দেখুন না?
লিলি : কিন্তু আপনি তো আমার সঙ্গে একমত?
সনৎ : নিশ্চয়ই!
লিলি : তবে? ইলেকশন বলে কি কবিতার ভাব বদলে দেওয়া যায়? আপনি আর আমি জোর দিয়ে বাবাকে যদি সে কথা বলি—
সনৎ : (ঘাবড়াইয়া) অ্যাঁ? আপনি আর—আমি?
লিলি : কেন? ভয় কিসের?
সনৎ : না, ভয় নয়। তবে প্রবেশন তো—মানে, ইলেকশন তো! এ সময়ে—
লিলি : সনৎবাবু, আপনি চিরজীবন বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে এলেন—
সনৎ : না না চিরজীবন কোথায়? ঐ অনার্সের দু'টো বছর—
লিলি : ইলেকশন বলে আপনি একটা কবিতার কদর্থ করবেন?
সনৎ : না না, আমি কদর্থ করবো কেন? কদর্থ তো ওরা করছে।
লিলি : হ্যাঁ করছে। কিন্তু তাই বলে আর একটা কদর্থ করে তো তার জবাব দেওয়া যায় না!
সনৎ : না না, তা করবো কেন? ওটা—ওটা একটু ভেবে বার করতে হবে—একটা কম্‌প্রোমাইজ যদি পাওয়া যায়।
লিলি : কম্‌প্রোমাইজ্?
সনৎ : হ্যাঁ, ওটা আমায় দিন, আমি বাড়ি গিয়ে দেখি যদি বদলে কিছু খাড়া করা যায়।
লিলি : আবার বাড়ি যাবেন কেন? এইখানেই তো বেশ নিরিবিলি।
সনৎ : অ্যাঁ? হ্যাঁ—নিরিবিলি।
লিলি : এইখানেই করে ফেলা যাক। আমি চা দিতে বলেছি।
সনৎ : চা, না না, চা আবার কেন—
লিলি : বা, আমিও তো খাইনি চা এতোক্ষণ—
সনৎ : ও হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আপনি—মানে আমি—আমার জন্যে—

(সনৎ ক্রমেই যেন দিশাহারা হইয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে যে কেহ ঘরে আসিয়া এক আসনে দু'জনকে দেখিলেই প্রবেশনের বারোটা বাজাইয়া দিবে। হাতে চায়ের কাপ দেখিলে তো কথাই নাই, পত্রপাঠ বরখাস্ত।)

লিলি : কেন, আপনি চা খান না?

সনৎ : না হ্যাঁ, হ্যাঁ খাই—খাই—

(চা না খাইলেও তো চাকুরি যাইতে পারে। ইহারই পিতার হাতে তো চাকুরি।)

লিলি : আচ্ছা ও সব নাস্তিকতা আস্তিকতার প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে—এমনি কবিতাটা আপনার কেমন লাগলো?

সনৎ : (সতর্কভাবে) কেন, ভালোই। বেশ ভালো।

লিলি : কী মনে হয় আপনার? অমানিশা দেবীর—কবি-প্রতিভা আছে?

সনৎ : আমি তো পড়ি নি বিশেষ—অন্য কাগজে তো এঁর লেখা বড়ো একটা—

লিলি : না, অন্য কাগজে বেরোয় নি। ভাস্বতীতেই যা বেরিয়েছে—এই 'হানিয়াছ মোরে', আর আষাঢ় সংখ্যায় 'দিগন্তের চিল'।

সনৎ : দিগন্তের কী?

লিলি : চিল।

সনৎ : মানে ঐ—পাখি চিল?

লিলি : হ্যাঁ, তবে চিলটা একটা সিম্বল। একটা বুভুক্ষু আত্মার প্রতীক। পড়েছেন কবিতাটা?

সনৎ : অ্যাঁ? না, পাইনি তো হাতে। আছে আপনার কাছে?

লিলি : আমার মুখস্থই আছে—

হে চিল দিগন্তে তুমি পক্ষের বিস্তার

মেলিয়াছ বারংবার,

শ্যেনচক্ষু ফেলিয়াছ পৃথিবীর পানে

বুভুক্ষু সন্ধানে—

(মণিভূষণের প্রবেশ। সারিয়াছে। সনৎ লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।)

মণি : বোসো বোসো। (লিলিকে) হ্যাঁ রে, তোর মা বেরিয়ে গেছে?

লিলি : স্টেশনে গেলো।

মণি : চিঠি এলো কিছু?—তোদের ঐ—ইয়ে সান্যালের?

লিলি : নাঃ!

মণি : খেয়েছে! আসবে কি না তারই ঠিক নেই! তোর মায়ের যতো কাঁচা কাজ।

(পাঁচু চা লইয়া আসিল)

লিলি : বাবা, তুমি চা খাবে?

মণি: না না, তোমরা খাও। সনৎ ও-লেখাটার কদ্দুর হোলো?

(পাঁচুর প্রস্থান)

সনৎ : একটা খসড়া করেছি, কিন্তু ইনি—মানে মিস মজুমদার বলছেন—

মণি : কই কী করেছো দেখি— (কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলেন)

লিলি : শেষ হয়নি বাবা। বদলাতে হবে একটু —

মণি : দাঁড়া।—বাঃ, চমৎকার হয়েছে! চমৎকার। তুমি তো জিনিয়াস্ হে সনৎ।

লিলি : কিন্তু একটা লাইন—

মণি: মোক্ষম হয়েছে। আর কথাটি চলবে না। বিশেষ করে এই লাইনটা—নাস্তিকতা

দূরে থাক, কবিতাটিতে এক অনাদি অবিনশ্বর পরম সত্তার নিকট একান্ত আত্মসমর্পণই সূচিত হইয়াছে—মার্ভেলাস।

লিলি : ঐ লাইনটাই বদলাতে হবে।

মণি : কী বললি?

লিলি : ওটা কবিতাটার আসল কথা নয়।

মণি : তুই কবিতার কী বুঝিস? তোর তো ইকনমিক্সে অনার্স ছিল। সনতের বাংলা অনার্স—জানিস?

লিলি : তুমি সনৎবাবুকেই জিজ্ঞেস করো না—ও লাইনটা ঠিক হয়েছে কি না?

(রাজা ও রাজকন্যার যুদ্ধ। সনৎ উলুখাগড়া।)

মণি : বাঃ, ও যদি ঠিক না মনে করবে—তবে লিখলো কেন?

লিলি : সনৎবাবু?

সনৎ : মানে, ইনি বলছিলেন কবিতাটায় একটা অভিযোগ, অভিমান, বিক্ষোভ আর—

মণি: ও কী বলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই সনৎ। ও কবিতার কিচ্ছু বোঝে না।

(পাঁচুর প্রবেশ)

একজন বুড়োপানা ভদ্রলোক এসেছেন। (কার্ড দিল)

মণি : আরে! নিয়ে আয় শিগ্‌গির। খাতির করে আনবি—না দাঁড়া। আমি যাচ্ছি, তুই এগুলো নিয়ে যা— (চায়ের পাত্রগুলি দেখাইলেন) আর চা নিয়ে আয়। তোমরা একটু ও ঘরে বোসো—

(বাহিরে ছুটিলেন। পাঁচু চায়ের ট্রে লইয়া ভিতরে গেল। সনৎ অফিসঘরের দরজা অবধি গিয়াছে।)

লিলি : সনৎবাবু, ও লাইনটা যদি বদলানো না হয়—

সনৎ : হবে হবে, আপনি আসুন—

(অটলবাবুকে লইয়া বিগলিত মণিভূষণের প্রবেশ। অটলবাবু অত্যন্ত গম্ভীর। তিনি লিলি এবং সনতের প্রস্থান লক্ষ্য করিলেন।)

মণি : আসুন আসুন, বসুন অটলবাবু! ভাগ্যিস বাড়ি ছিলাম! সারাদিন ঘুরতে হচ্ছে তো, এইমাত্র ফিরেছি। আপনি এ রকম খবর না দিয়েই পায়ের ধুলো দেবেন—

অটল : খবর ইচ্ছে করেই দিইনি।

মণি : অ্যাঁ? কেন কেন?

অটল : ইলেকশন ক্যাম্পেন কেমন চলছে সেটা নিজের চোখে একবার দেখবার ইচ্ছে ছিল।

মণি : ক্যাম্পেন? ক্যাম্পেন খুব ভালো চলছে। এ শহরের প্রায় সব ভোটারের বাড়ি বাড়ি গেছি। এক গগনপুর ছাড়া আর—আর—সব—জায়গা—

(অটলবাবু পকেট হইতে সেই ছবিওয়ালা লিফলেটের একটি কপি বাহির করিয়াছেন। তাহাতে চোখ আটকাইয়া মণিভূষণের শেষ কথাগুলি স্টেশনে ঢোকা রেলগাড়ির শব্দের মতো খাদে নামিয়া থামিয়া গেল।)

অটল : হ্যাঁ, বলুন?

মণি : ওটা একটা বাজে স্ল্যান্ডার। সেই ইংরেজ আমলে—তিরিশ বছর আগে—কোনো অর্থ হয় না ওর!

অটল : একটা অর্থ হয়।

মণি : আপনি বলতে চান সায়েব প্রেসিডেন্টের গলায় মালা দিলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের—

অটল : না, মোটেই তো বলতে চাই না।

মণি : তবে?

অটল : এর একমাত্র অর্থ—কয়েক শো ভোটের তফাৎ।

মণি : কয়েক শো? না না, এ তো যে কেউ বুঝতে পারবে—

অটল : মণিবাবু, আপনি তো এইবারেই প্রথম নমিনেশন পেলেন।

মণি : অ্যাঁ? হ্যাঁ।

অটল : আমি প্রথম নির্বাচন থেকে পার্টির ইলেকশন ক্যাম্পেন অর্গানাইজ করছি। (মণিভূষণের মুখ হইতে অল্পক্ষণ কথা বাহির হইল না।)

মণি : ওরা পুরোনো কলেজ ম্যাগাজিন থেকে—

অটল : আপনি চিদানন্দর পুরোনো ইতিহাসের ক'টা খবর বার করেছেন এখন অবধি?

মণি : আমি চেষ্টা করছি, প্রাণপণে চেষ্টা করছি—

অটল : চেষ্টা।

মণি! বোধ হয় কালকের—

অটল : বোধ হয়।

মণি : না না, বোধ হয় মানে—

অটল : ইলেকশনের আর ক'দিন বাকি মণিবাবু? (মণি নিরুত্তর) আর কতোদিন আগে ক্যাম্পেন শুরু হয়েছে? (মণি নিরুত্তর) এখনো—চেষ্টা। বোধ হয়। কাল। (মণি তবু নিরুত্তর) ভালো কথা। আপনার স্ত্রী একটি মাসিক পত্রিকা বার করেন?

মণি : (প্রবল প্রতিবাদে) না না—ওটা মিথ্যে কথা একেবারে—

অটল : বার করেন না?

মণি : অ্যাঁ? না বার করেন; তবে—আপনি ঐ কবিতায় নাস্তিকতার কথা বলছেন তো?

অটল : হ্যাঁ।

মণি! সেটা একেবারে মিথ্যে। আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি—এই দেখুন—(পড়িয়া) 'নাস্তিকতা দূরে থাক, কবিতাটিতে এক অনাদি অবিনশ্বর—'

অটল : কী ওটা?

মণি : ওদের স্ল্যান্ডারের জবাব! কাল সকালেই লিফলেট বের করে দেবো—

অটল : কাল? কেন, এতোদিন বেরুলো না কেন? ওটা তো তিনদিনের বাসি প্রোপাগান্ডা?

মণি : আমি, মানে—সনৎকে আজকেই পেলাম—

অটল : কে সনৎ?

মণি : বাংলা অনার্স। ঐ যাকে দেখলেন—ও ঘরে গেলো—

অটল : ও, আমি ভেবেছিলাম আপনার ছেলে।
মণি : না না, আমার ছেলে কেন হবে? ও হাই স্কুলের টীচার।
অটল : মেয়েটিও টীচার?
মণি : না, মেয়েটি আমার মেয়ে!
অটল : ও। (অল্প থামিয়া) মণিবাবু, আমার দৃষ্টিভঙ্গী চিরদিন উদার, প্রগতিশীল। ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশায় আমি কোনো অপরাধ দেখি না। শুধু—ইলেকশনের সময়টা বাদ দিয়ে।
মণি : না না, অবাধ মেলামেশা হবে কেন? ওরা দু'জন ঐ জবাবটা লিখছিলো আলোচনা করে—
অটল : সে কথাটা চিদানন্দ তার পরের লিফলেটে খুলে না-ও লিখতে পারে।
মণি : অ্যাঁ? (এক মুহূর্তে) লিলি!

(লিলির প্রবেশ)

যাও, ভিতরে যাও।
লিলি : ভিতরে?
মণি: হাঁ ভিতরে।
লিলি : কিন্তু সনৎবাবু—
মণি : তর্ক কোরো না। যা বলছি শোনো। (লিলি অফিসের দিকে গেল) আবার ওখানে কোথায় যাচ্ছো?
লিলি : বলে আসি?
মণি : না, কিচ্ছু বলে আসতে হবে না। যা বলবার আমি বলবো।

(লিলি ভিতরে গেল, পদক্ষেপে চাপা বিদ্রোহের জানান দিয়া।)

অটল : ভালো ভালো। বেশ স্পিরিটেড মেয়ে মনে হোলো। (মণিভূষণ গুম হইয়া রহিলেন) আচ্ছা, চলি তাহলে। যতোটা পারেন—চালান।
মণি : (সচকিত হইয়া) অমূল্যবাবু কবে মিটিং করবেন এখানে—তার তারিখ ঠিক হোলো?
অটল : হ্যাঁ সে কথাটাও বলা দরকার।
মণি : ঠিক হয়েছে? যাক, ওটার উপর অনেকখানি ভরসা। কবে ঠিক হোলো?
অটল : অমূল্যবাবু আসতে পারছেন না।
মণি : অ্যাঁ!
অটল : ওঁকে বহু জায়গায় যেতে হচ্ছে ইলেকশন মিটিং করতে। সময় কম।
মণি : এটাও তো ইলেকশনের কাজ। ভাইটাল কাজ!
অটল : বলছেন?
মণি : নিশ্চয়ই! এখানকার ক্যাম্পেনের অর্ধেক দাঁড়িয়ে আছে ঐ মিটিংয়ের উপরে।
অটল : বাকি অর্ধেক কতোখানি?
মণি: বাকি অর্ধেক মানে?
অটল : মণিবাবু! একটা লস্ট্ কজের জন্যে নষ্ট করবার মতো সময় অমূল্যবাবুর হাতে নেই এখন।

মণি : লস্ট্‌ কজ্‌?

অটল : চলি তা হলে।

মণি : পার্টি তা হলে আমার জন্যে কিছুই করবে না?

অটল : পার্টি আপনাকে নমিনেশন দিয়েছে। আপনি কি ভেবেছিলেন, পার্টি আপনাকে কোলে করে অ্যাসেম্‌ব্লির সীটে বসিয়ে দিয়ে আসবে?

মণি : না না, তা কেন? কিন্তু—

অটল : আর পার্টি যদি জানতো আপনি এমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্যাম্পেন চালাবেন, তবে নমিনেশনটা দিতো না।

মণি : ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?

অটল : একটা সীট আপনি ডোবালেন। নমিনেশনের জন্যে ঝোলাঝুলি করবার আগে দায়িত্বটা একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল। (মণিভূষণ মুহ্যমান অবস্থায় এক মুহূর্ত বসিয়া রহিলেন)

মণি : তা হলে অমূল্যবাবু আসবেন না?
(কিন্তু অটলবাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন। পাঁচু ভিতর হইতে প্রবেশ করিল চা লইয়া।)
কী?

পাঁচু : আজ্ঞে চা।

মণি : না, চা খাবো না।

পাঁচু : আজ্ঞে বললেন যে আনতে—

মণি : (মণিভূষণের নিরুদ্ধ আক্রোশ ফাটিয়া পড়িল) বেশ করেছি বলেছি—বাঁদর উল্লুক কোথাকার!

(আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে চায়ের বাসন কোনো মতে বাঁচাইয়া পাঁচু উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। মণিভূষণ পিঞ্জরাবদ্ধ শ্বাপদের মতো পদচারণা করিতে লাগিলেন। সনৎ সতর্কভাবে পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিবে কি না ইতস্তত করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে মণিভূষণের পদচারণার কক্ষপথে একটি টিপয় পড়িল এবং হিংস্র এক পদাঘাতে স্থানচ্যুত হইল। সনৎ টিপয়টির মতই ছিটকাইয়া সরিয়া গেল পর্দা ছাড়িয়া। মণিভূষণ আরও দুইবার ঘুরিলেন। টেবিলের উপর ম্যাজিস্ট্রেটের মাল্যভূষিত সহাস্য মূর্তি নজরে পড়িল। কাগজটি তুলিয়া লইলেন। চোখ মুখ ও দাঁতের ভঙ্গীতে মনে হইল কিছু একটা চিবাইতেছেন। সম্ভবত চিদানন্দর মুণ্ড। তারপর ভীমরবে হাঁকিলেন—)

মণি : সনৎ!
(সনৎ চোরের মতো প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। মণিভূষণ তাহার উপস্থিতি টের পাইলেন না।)

সনৎ : স্যার? (মণিভূষণ ঈষৎ চমকাইয়া চোখ তুলিতেই সনৎ যাহা কিছু বলিবার আছে এক নিঃশ্বাসে দাঁড়ি কমা-র অপেক্ষা না রাখিয়া বলিয়া গেল।) স্যার আমি কি করতে পারি উনি চলে গেলেন মিসেস মজুমদার চলে গেলেন বলে গেলেন ওঁকে মিস্ মজুমদারকে বলে গেলেন লেখাটা দেখে দিতে তারপর এ ঘরে উনিও চলে গেলেন ঐ যে ভদ্রলোক ওখানে বসে কাজ করছিলেন তখন উনি বললেন মিস মজুমদার বললেন এ ঘরে এসে তারপর চা বলেছিলাম চা থাক কিন্তু উনি

বললেন— (মণিভূষণ প্রথমে কথার তোড়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন। এখন হাত নাড়িয়া নিরস্ত করিলেন। সনতের সুর নামিয়া আসিল।) উনি বললেন—উনি চা খান নি।

মণি : কী বলতে চাইছো? কে চা খায় নি?

সনৎ : না খেয়েছেন, পরে খেয়েছেন। মিস মজুমদার।

মণি : তোমাকে চা দিয়েছে? না সে বুদ্ধি হয় নি এদের। লিলি! পাঁচু!

সনৎ : না না, খেয়েছি।

মণি : কখন খেলে?

সনৎ : এই তো, আপনি আসবার পরেই—এইখানেই তো দিয়ে গেলো।

মণি : ও হ্যাঁ।

(পাঁচুর প্রবেশ)

আর খাবে?

সনৎ : না না, আর খাবো না।

মণি : তুমি চেয়ে নেবে সনৎ—যখন যা দরকার হবে। পাঁচু, এই কাগজটা নিয়ে ইলেকশন অফিসে রামবাবুর হাতে দিয়ে আয়। বলবি, সকালের মধ্যে যেন ছেপে বেরোয়। দৌড়ে যাবি।

(পাঁচু দৌড়াইল, নাস্তিকতার প্রতিবাদ লইয়া।)

তুমি এইবার—এইটার একটা জবাব ভাবো দিকি? (সনৎকে সাম্রাজ্যবাদী লিফলেটটি দিলেন) বেশ মোক্ষম একটা—

(লিলির প্রবেশ। ভঙ্গীতে, কণ্ঠে যথেষ্ট ঝাঁজ।)

লিলি : ডাকছো কেন?

মণি : অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, সনৎকে চা—ও না, চা তো খাবে না বললে। তুই দেখিস সনতের কখন কী দরকার হয়।

লিলি : কী যে কখন বলো কিছু বুঝতে পারি না।

মণি : কেন? কী হোলো?

লিলি : কী আবার হবে?

মণি : (মনে পড়িল) ও হ্যাঁ! তাই তো—ইলেকশনের সময়ে এরকম অবাধ—(থামিলেন। মুখে আবার হিংস্রভাব ফুটিল।) ওঃ। আসবার সময় নেই! লস্ট কজ্‌!

লিলি : কী বলছো কী?

মণি : তুই যে সনতের সঙ্গে বসে লিফলেট লিখছিলি—সেটা কি অবাধ মেলামেশা হোলো?

লিলি : অ্যাঁ?

মণি : হ্যাঁ সনৎ? তুমি কি লিলির সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করেছো?

সনৎ : না স্যার, একদম না!

মণি : তবে? অবাধ মেলামেশা যদি করলে—তবে অমন লেখাটা বেরুলো কী করে? সব জেনে বসে আছে একেবারে। এদিকে মিটিং করতে আসার সময় পায় না।

লস্ট্ কজ্! আচ্ছা সনৎ। তুমি তো এই শহরে আছো, ইস্কুলে পড়াচ্ছো, আমার কজ্ কি লস্ট্?

সনৎ : না না, কে বলেছে?

মণি : ঐ অটলটা! আর অমূল্য ঘোষ। কুটোটি নেড়ে হেল্প করবে না ইলেক্শনে, এসে আমার ঘরের ব্যাপারে উপদেশ ঝাড়বে। ঠিক আছে, দরকার নেই! আমার ইলেক্শন আমি আমার মতো করে চালাবো। তুমি ওটা নিয়ে লেগে যাও সনৎ। (সনৎ সঙ্গে সঙ্গে লিফলেট হাতে অফিসের দিকে রওনা হইল।) এখানেই বোসো। অফিসে আমাকে বসতে হবে এখন। (সনৎ চোরের মতো অরবিন্দর টেবিলে গিয়া বসিল)

লিলি : ঐ লেখাটার কী হোলো?

মণি : ওটা প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি। কালকেই বেরিয়ে যাবে, কিচ্ছু ভাবিস নি।

লিলি : কিন্তু ঐ লাইনটা?

মণি : কোন্ লাইনটা?

লিলি : ঐ যে—নাস্তিকতা দূরে থাক—

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ হয়েছে ওটা। ঐ এক লাইনেই কাৎ হয়ে যাবে ওরা।

লিলি : কিন্তু অমানিশা দেবী—

মণি : কে অমানিশা?

লিলি : যে লিখলো কবিতাটা! সে যদি ও কথা না বলে থাকে—

মণি : বলে নি, তুই জানিস? সনৎ ব্যাখ্যা করেছে—

লিলি : ভুল ব্যাখ্যা।

মণি : হ্যাঁ! ভুল ব্যাখ্যা! সনৎ বাংলা অনার্স তার ব্যাখ্যা ভুল, আর তুই ইকনমিক্স পড়ে কবিতায় পণ্ডিত হয়ে বসে আছিস!

লিলি : আমার কথা হচ্ছে না। অমানিশা দেবী নিজে যদি—

মণি : আচ্ছা কোথাকার কে এক অমানিশা—তার জন্যে তোর এতো মাথাব্যথা কেন বল দিকিনি?

লিলি : অমানিশা দেবী আমার বিশেষ বন্ধু।

মণি : আর আমি তোর বিশেষ—আমি তোর বাবা! আমার ইলেকশনের চেয়ে তোর বন্ধু বড়ো হোলো? (লিলি গুম হইয়া বসিল) আচ্ছা অমন করছিস কেন বল তো? দেখছিস অমূল্য ঘোষ এলো না। এখন কোথায় তোরা উঠে পড়ে লাগবি—তা না যতো ব্যাগড়া তুলছিস!

লিলি : (অল্পক্ষণ চুপ করিয়া) আর অমানিশা দেবী যদি প্রতিবাদ লিখে পাঠায়?

মণি : পাঠাক তো আগে!

লিলি : বলো না? যদি পাঠায়, কী করবে?

মণি : ততোদিনে ইলেকশন পার হয়ে যাবে। আমি স্বীকার করে নেবো ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। অবশ্য সনতের যদি আপত্তি না থাকে।

সনৎ : না না, কোনো আপত্তি নেই! ব্যাখ্যাটা সত্যি একটু ইয়ে হয়ে গেছে—

লিলি : স্বীকার করছেন?

সনৎ : আমি তো আগেই স্বীকার করেছি আপনার কাছে!

মণি : ব্যাস ব্যাস! আর কী কথা থাকতে পারে বল? (লিলির কোপ মোটামুটি প্রশমিত) এবার লেগে যা তা হলে ঐ লিফলেটটা নিয়ে!

লিলি : ও তো সনৎবাবু লিখছেন।

মণি : তুই-ও সাহায্য কর না হয়। এটা তো সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপার, তোর ইকনমিক্স হয়তো কাজে লাগবে।

লিলি : (খুশি হইয়া) আমি সাহায্য করতে গেলে হয়তো আরো অসুবিধে হবে সনৎবাবুর।

সনৎ : না না, অসুবিধে হবে কেন? অসুবিধে কিসের? (মুখ দেখিয়া মনে হয় বিলক্ষণ অসুবিধা আছে। কিন্তু লিলি খেয়াল করিল না।)

লিলি : ঠিক বলছেন?

সনৎ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যেটা ভালো মনে করেন—

মণি : বাঃ! ভালো মনে করবে তো তুমি?

সনৎ : আমি? আমার—যেরকম বলবেন—আমার কোনো—

(লিলি আর ঝুঁকি লইল না)

লিলি : তবে এইখানে চলে আসুন সনৎবাবু। (সেই সোফা আবার)

সনৎ : ঐখানে?

লিলি : এখানেই সুবিধে হবে। (ওখানেই যদি সুবিধা হয়, সনতের আর কী বলিবার আছে? পায়ে পায়ে অগ্রসর হইল কাগজপত্র লইয়া।)

মণি : ওটা শেষ করে ফেলা চাই কিন্তু আজকেই।

(পাঁচুর প্রবেশ)

পাঁচু : দিয়ে এসেছি।

মণি: রামবাবুর হাতে দিয়েছিস?

পাঁচু : আজ্ঞে হ্যাঁ। বললেন কাল সকালেই বেরিয়ে যাবে।

মণি : আচ্ছা।

(পাঁচু বাহিরে গেল। মণিভূষণ অফিসে।)

লিলি : আপনি কি কিছু লিখেছেন?

সনৎ : কয়েক লাইন লিখেছি শুধু। (কাগজ দিল। লিলি পড়িল।)

লিলি : (প্রায় দুঃখিতভাবে) সনৎবাবু, আমার সাহায্য আপনার কোনো দরকার নেই।

সনৎ : না না, সে কী? কে বললো?

লিলি : আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো লিখতে পারেন।

সনৎ : না না, কী বলছেন, আমি তো—

লিলি : আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই লেখেন না?

সনৎ : কী লিখি?

লিলি : গল্প, বা কবিতা? (লেখাটা অপরাধ কি না কে জানে?)

সনৎ : না, কই তেমন—ছাত্রজীবনে দু'একটা হয় তো—

লিলি : এখন লেখেন না?

সনৎ : কালেভদ্রে—

লিলি : কী লেখেন? কবিতা?

সনৎ : কবিতা? তা দু'একটা—

লিলি : শোনাবেন?

সনৎ : শোনাবো?

লিলি : মুখস্থ আছে আপনার?

সনৎ : আছে, কিন্তু—

লিলি : শোনান না একটা! কবিতা আমার খুব ভালো লাগে।

সনৎ : এখন? কিন্তু—এই লেখাটা যে আজ রাত্রেই—

লিলি : হ্যাঁ, তাও তো বটে। (আবার সনতের লেখাটি পড়িল) আপনি লিখুন আগে একটা।

সনৎ : লিখবো?

লিলি : হ্যাঁ। তারপর দু'জনে বসা যাবে। (সনৎ সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া অফিস টেবিলের দিকে ফিরিল) উঠছেন কেন? এখানে বসে লিখতে অসুবিধে হচ্ছে?

সনৎ : না না, অসুবিধে হবে কেন?
(আবার সোফায় বসিয়া তীরবেগে কলম চালাইল। তাহার লেখার দুর্বার গতি দেখিয়া মনে হয়, শিক্ষক না হইয়া সংবাদপত্রসেবী হইলে অনেক উন্নতি হইত। লিলি অবাক বিস্ময়ে তাহার লেখা দেখিল অল্পক্ষণ। তারপর উঠিয়া গেল। সনৎ টেরও পাইল না। লিলি দূরে গিয়া আবার দেখিল। কাছে আসিয়া দেখিল। পিছনে দাঁড়াইয়া ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল। তাহার মুখের মুগ্ধ বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সনৎ কিছুই জানিল না, তাহার কলম অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে লাগিল।)

লিলি : বাবা! আপনি— (পাশে যে ছিল তাহার কণ্ঠ মাথার পিছন হইতে আসায় সনৎ ছিটকাইয়া উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। লিলিও চমকাইয়া পিছু হটিল।) কী হোলো?

সনৎ : (লজ্জিত) না, সরি—আমি—বুঝতে পারিনি, হঠাৎ—

লিলি : আপনার কন্‌সানট্রেশন নষ্ট করে দিলাম!

সনৎ : না না, কী বলছিলেন, বলুন।

লিলি : এমন কিছু নয়। বলছিলাম—আপনার লিখতে গেলে ভাববার জন্যেও থামতে হয় না এক সেকেন্ড?

সনৎ : (ঘাবড়াইয়া) অ্যাঁ? ভেবে লেখা উচিত ছিল, না? ঠিক বলেছেন। (লিলি কিছু বলিবার পূর্বেই হন হন করিয়া টেবিলের কাছে গিয়া বাজে কাগজের ঝুড়িতে লেখা কাগজ গুঁজিয়া দিল। টেবিল হইতে সাদা কাগজ লইয়া আবার সোফায় বসিয়া কড়িকাঠে চোখ তুলিয়া ভাবিতে শুরু করিল। লিলি হতবাক হইয়া দেখিল। তারপর মুখ টিপিয়া হাসিল। ঝুড়ি হইতে লেখাটা তুলিয়া আনিয়া সোফায় সনতের পাশে বসিল। সনৎ চমকাইয়া একটু সরিয়া বসিল।)

লিলি : সনৎবাবু আপনি ভুল বুঝেছেন।

সনৎ : কেন কেন, কী ভুল?

লিলি : আপনার এ লেখাটা চমৎকার হচ্ছে।

সনৎ : সে কী? আপনি তো পড়েনও নি!

লিলি পড়েছি।

সনৎ : কখন পড়লেন?

লিলি আপনি যখন লিখছিলেন। খুব ভালো হচ্ছে।

সনৎ : ভালো হচ্ছে? কিন্তু—ভাবা হয়নি যে?

লিলি ভাবলে আপনি কী লিখবেন—তাই ভাবছি।

সনৎ : (স্বীকার করিয়া) না, ভাবলে ওর চেয়ে খুব একটা বেশি কিছু—

লিলি এইটাই শেষ করুন।

সনৎ : বলছেন?

লিলি হ্যাঁ।

(তবে আর কথা কী? সনৎ আবার লিখিতে শুরু করিল। অল্প পরে ফোন বাজিল। লিলি উঠিল, কিন্তু ফোন অবধি যাইবার পূর্বেই মণিভূষণ আসিয়া ফোন ধরিলেন। মণি প্রবেশ করিতে সনৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া লিখিতেছিল। লিলি তাহার কাঁধ ধরিয়া বসাইয়া দিয়া নিজে বসিল।)

মণি হ্যালো...হ্যাঁ মণি মজুমদার বলছি...হ্যাঁ দিন...হ্যালো, মণি মজুমদার...কে? আর একটু জোরে বলুন, শোনা যাচ্ছে না...মোহন? তুমি যাও নি?...বিস্টুনগর? ও, তাও তো বটে, ট্রাঙ্ককল নইলে হবে কেন...কী বললে? (মণি সহসা প্রচণ্ড উৎসুক হইয়া উঠিলেন) ...এর মধ্যে? বলো কী?...কী কী জিনিসটা কী? চিদানন্দ... তবে?...সদানন্দ?...

(যাহা শুনিলেন, তাহাতে চোখ উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শেষে আনন্দে ফাটিয়া পড়িলেন।)

ক্যাপিট্যাল! ক্যাপিট্যাল! (লিলি ও সনৎ লাফাইয়া উঠিল। দেখিয়া মণিভূষণ সংযত হইলেন।) ক্যাপিট্যাল। (হাতের ইঙ্গিতে ইহাদের বসিতে বলিলেন। ইহারা বসিল।) ...কখন আসছো তুমি?...কাল সকালে? কেন রাত্রে গাড়ি নেই?...জাংশনে? তাই চলে এসো। আমি জাংশনে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো...হ্যাঁ হ্যাঁ তিরিশ মাইল তো রাস্তা...এগারোটা কতো?...ঠিক আছে, অতো হিসেবের দরকার নেই, এগারোটা থেকে গাড়ি থাকবে জাংশনে। ...হ্যাঁ...অ্যাঁ?...আলবাৎ! ...হ্যাঁ, আচ্ছা...নমস্কার। (ফোন রাখিয়া পরমানন্দে দুই হাত ঘষিলেন) বুঝলি লিলি! যতোটা পারেন চালান।

লিলি সে আবার কী?

মণি ঐ অটলটা! বলে গেলো—যতোটা পারেন চালান। কতোটা পারি জানলে মুখ দিয়ে বেরুতো না ও কথা।

লিলি কী হয়েছে কী?

মণি দেখবি দেখবি! সময়মতো দেখবি। চিদানন্দ ব্রহ্মচারী এমনি ভু-স্ করে ডুবে যাবে! পাঁচু!—সনৎ, তোমার ওটা কদ্দুর হোলো?

(সনৎ হ্যাঁ করিয়া মণিভূষণের আনন্দ দেখিতেছিল, চমকাইল।)

সনৎ অ্যাঁ? হয়ে গেছে, মানে—একটা খসড়া করেছি, উনি দেখে দিলেই—

(পাঁচুর প্রবেশ)

লিলি আমি দেখেছি বাবা। ওর চেয়ে ভালো আর হয় না কিছু। তুমি দেখো।

সনৎ : না না, দেখে দিন ভালো করে—(লিলির হাতে কাগজটি গছাইয়া দিল)
পাঁচু : বাবু ডাকলেন?
মণি : হ্যাঁ, গঙ্গারামকে ডাক।
পাঁচু : আজ্ঞে ড্রাইভারবাবু তো মাকে নিয়ে গেলো ইস্টিশানে।
মণি : ও, তাই তো। আচ্ছা, এলেই পাঠিয়ে দিবি আমার কাছে। ভীষণ দরকার।

(পাঁচুর প্রস্থান)

লিলি : কী হয়েছে বলো না?
মণি : বলবো বলবো। তুই ওটা দেখে দে আগে।
লিলি : আমি দেখেছি। তুমি দেখো।

(মণিভূষণ লেখাটি খানিকটা করিয়া পড়েন আর সনতের দিকে চাহিয়া প্রশংসাসূচক ভঙ্গী করেন। লিলিরও ভাবখানা এমন, যেন সনতের এই গুণবত্তার কৃতিত্ব তাহারই। শুধু সনৎ একই ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। যেন পরের লাইনেই তাহার প্রবেশন ডুবিবে। অমনি ভুস্ করিয়া।)

মণি : পাঁচু!
সনৎ : (ভয়ে ভয়ে) চলবে স্যার?
মণি : চলবে মানে?

(পাঁচুর প্রবেশ)

ইলেক্‌শন অফিস। রামবাবু। এটাও কাল বেরুনো চাই।

(কাগজ লইয়া পাঁচুর প্রস্থান)

সনৎ, আজ রাত্রে—ইয়ে, তোমার বাড়িতে কে আছেন?

সনৎ : বাড়ি মানে—সব তো দেশে। আমি স্কুলের কোয়ার্টারে আছি। জীবনবাবু আর আমি একটা ঘরে—
মণি : ঠিক আছে। আজ সে ঘরে জীবনবাবুই থাকুন। তুমি এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে রয়ে যাও।
সনৎ : এখানে?
মণি : হ্যাঁ, নইলে রাত বারোটায় তোমাকে কোথায় পাবো?

(স্কুলের সেক্রেটারি রাত বারোটার মহালগ্নে বাংলার শিক্ষককে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলি দিয়াছে—এরূপ নজির নাই। সনৎ ভয় ততোটা পাইল না। কিন্তু এই গৃহে অতক্ষণ বাস করা তাহার পক্ষে খুব আনন্দের সংবাদ নহে।)

সনৎ : রাত বারোটা?
মণি : কাজ আছে সনৎ। ভয়ানক দরকারী কাজ। তুমি ছাড়া লিখবে কে?
সনৎ : ও, লেখা? তা দিন না, আমি এখনই—
মণি : এখন হাতে থাকলে রাত বারোটার কথা বলছি কেন?
সনৎ : তা আমি না হয় আসবো বারোটায়। বেশি দূর তো নয়।
মণি : না না, তাই কী হয়? অতো রাত্রে—কেন এখানে অসুবিধে কী?
সনৎ : না না, অসুবিধে নয়। তবে—জীবনবাবু ভাববেন হয় তো—
মণি : আমি খবর পাঠিয়ে দেবো।

লিলি : বাবা, তুমি যে রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ করে তুললে?

মণি : ওরে, ইলেক্‌শনটা কি তোদের রহস্য সিরিজের চেয়ে কিছু কম? সনৎ বোসো—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চা খেয়েছো?—ও হ্যাঁ, ঐ তো। বোসো তোমরা, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। (অফিসের দিকে ফিরিলেন)

সনৎ : কিন্তু এখন? এখন তাহলে কী করবো?

মণি : অ্যাঁ? কী করবে?

সনৎ : মানে—ওটা তো হয়ে গেলো, এখন কোন্‌টা ধরবো?

মণি : (ফিরিয়া) সনৎ? তুমি কি চাও, চিদানন্দ আধঘণ্টা অন্তর আমার মুণ্ডুপাত করে এক একটা লিফলেট বের করুক?

সনৎ : (ঘাবড়াইয়া) না না স্যার, তা কেন চাইবো?

মণি : তবে এতো ঘড়ি ঘড়ি তোমাকে কাজ দেবো কী করে? আবার সেই রাত বারোটায়।

(সনতের পায়ের নিচ হইতে কাজের তক্তা সরাইয়া মণিভূষণ অফিসে গেলেন। সনৎ অসহায়ভাবে ঝুলিতে লাগিল।)

লিলি : অনেক কাজ আছে সনৎবাবু।

সনৎ : আছে? কই দিন। (সাদা কাগজ লইয়া কলম হাতে বসিয়া গেল)

লিলি : লেখা নয়।

সনৎ : লেখা নয়? (কাগজ কলম রাখিয়া) তবে?

লিলি : আপনার কবিতা শোনাবেন বলেছিলেন না?

সনৎ : আমি আমি আমি কখন বললাম?

লিলি : বাঃ তখন শোনালেন না, বললেন কাজ আছে। এখন তো হয়ে গেছে কাজ!

সনৎ : (অসহায়ভাবে) অ্যাঁ? হ্যাঁ, হয়ে গেছে, কিন্তু—(করুণ আবেদনে) আর কোনো কাজ নেই? (লিলি সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) কী—কী হোলো?

(কিন্তু লিলির হাসি আর থামে না। অরবিন্দ প্রবেশ করিল। লিলির হাসি দেখিল। সনৎকে লিলির পাশে দেখিল। দেখিল স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া। লিলি দেখিল পরে।)

লিলি : আরে, আপনি এসে গেছেন? মা কই? আসেন নি—স্মরজিৎ সান্যাল?

(বলিতে বলিতে বাহিরে সুপ্রীতির অভ্যর্থনার শোরগোল শোনা গেল। সনৎ খাড়া হইয়াছে অরবিন্দকে দেখিয়াই। মহা সমারোহে সুপ্রীতি স্মরজিৎ সান্যালকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। মর্মাহত অরবিন্দ কখন যে তাহার টেবিলে লিস্ট ও স্লিপ লইয়া বসিয়াছে, কেহ খেয়ালই করিল না। খেয়াল করা শক্ত। দীর্ঘদেহী স্মরজিতের মুখে, চোখে, কেশবিন্যাসে, চশমায়, চাদরে, লুণ্ঠিত কোঁচায় কবিপ্রতিভা বিচ্ছুরিত হইতেছে।)

সুপ্রীতি : আসুন আসুন স্মরজিৎবাবু। লিলি তোর বাবা কোথায়? এই আমার মেয়ে লিলি। আপনার লেখার খুব ভক্ত। আর কেই বা ভক্ত নয় বলুন? লিলি, তোর বাবাকে ডাক। বসুন স্মরজিৎবাবু। (সনৎকে দেখিয়া) ও আর ইনি—

(সনৎ স্মরজিৎকে দেখিয়া অবধি সেই যে মুখব্যাদান করিয়াছে, সে মুখ আর বন্ধ হয় নাই। চোখাচোখি হইবামাত্র স্মরজিৎও চমকিত হইলেন এক মুহূর্তের জন্য। লিলি ততক্ষণে অফিসঘরে গিয়াছে মণিভূষণকে ডাকিতে।)

সনৎ : আপনি!

স্মরজিৎ : হ্যাঁ সনৎ, আমি। স্মরজিৎ সান্যাল। ঠিকই চিনেছো। আমিই বরং হঠাৎ চিনতে পারি নি। অনেক বদলে গেছো তুমি!

সুপ্রীতি : আপনাদের পরিচয় আছে? বাঃ!

স্মরজিৎ : একসময়ে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। সনৎ অবশ্য বয়সে অনেক ছোট, আমাকে স্মরজিৎদা বলে। বহুদিন পরে দেখা, কী বলো সনৎ?

(সনতের ঠোঁট নড়িল, কিন্তু কী বলিল শোনা গেল না। মণিভূষণ প্রবেশ করিলেন। পিছনে লিলি।)

মণি : নমস্কার নমস্কার স্মরজিৎবাবু।

স্মরজিৎ : নমস্কার!

মণি : আমাদের সৌভাগ্য আপনি এলেন। আলাপ টালাপ হয়েছে? এই আমাদের মেয়ে লিলি—

স্মরজিৎ : হ্যাঁ, মিসেস মজুমদার সব আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

মণি : বসুন, বসুন।

সুপ্রীতি: জানো, সনৎবাবুর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল।

লিলি : সত্যি? কী আশ্চর্য সনৎবাবু, আপনি তো একবারও বলেন নি?

মণি : এ তো স্বাভাবিক। আপনারও নিশ্চয়ই বাংলা অনার্স ছিল, তাই না স্মরজিৎবাবু?

সুপ্রীতি : আঃ, কী যে তুমি বলো তার ঠিক নেই!

স্মরজিৎ : (হাসিয়া) না না, ঠিকই বলেছেন। অপরাধ স্বীকার করছি। তবে সনতের সঙ্গে সে সূত্রে আলাপ নয়। আলাপ প্রতিবেশী হিসেবে—আর—কী সনৎ? লেখার অভ্যেস ছাড়ো নি তো? (সনতের কোনো জবাব পাওয়া গেল না। সে একইভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া স্মরজিতের দিকে চাহিয়া আছে। অরবিন্দ ঘাড় ফিরাইয়া লেখক সনতকে একবার ভাল করিয়া দেখিল।)

মণি : (উচ্ছ্বসিত) লেখা? দারুণ লেখে সনৎ! ওকে পেয়ে যা উপকার হয়েছে আমার সে আর বলবার কথা নয়।

(পাঁচুর প্রবেশ)

কী?

পাঁচু : রামবাবুর হাতে দিয়ে এসেছি।

মণি : আচ্ছা।

পাঁচু : ড্রাইভারবাবুকে কি আসতে বলবো?

মণি : না, আমি যাচ্ছি একটু পরে।

সুপ্রীতি : পাঁচু দাঁড়া। তোমরা আলাপ করো, আমি চায়ের ব্যবস্থাটা করে আসি। পাঁচু আয়।

(সুপ্রীতি ও পাঁচুর ভিতরে প্রস্থান)

মণি : আমরা তো প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। আপনার চিঠি এলো না। সুপ্রীতি—মানে আমার স্ত্রী তো অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

স্মরজিৎ : হ্যাঁ, আমি চিঠিটা পেলাম বড়ো দেরি করে। সরকারী ডাক বিভাগের সৌজন্যে!

দেখলাম টেলিগ্রাম করলেও আমার খবর তারে চড়ে যতোক্ষণে আসবে, আমি রেলগাড়ি চড়ে স্বশরীরে তার আগে এসে পৌঁছোবো। (লিলি হাঁ করিয়া গিলিতেছে। বড়ো বড়ো কবির কথাবার্তাই অন্যরকম। অরবিন্দর হাতে কলম, কিন্তু হাত সরিতেছে না।)

মণি : পোস্টাল সার্ভিস যা হয়েছে আজকাল, আর বলবেন না! আমি অ্যাসেম্ব্লিতে কোয়েশ্চেন তুলবো—দেখবেন!

স্মরজিৎ : খবরটা দিতে না পারায় আপনাদের বোধহয় খুবই অসুবিধায় ফেলেছি!

মণি : কিছু না, কিছু না। আমি তো বরাবর বলছি—আসবেন যখন কথা দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আসবেন। সুপ্রীতি একটু নার্ভাস হচ্ছিলো—সাহিত্যসভায় আপনি আসবেন বলে খুব প্রচার হয়ে গেছে তো এখানে?

স্মরজিৎ : তাই না কি? সর্বনাশ।

মণি : কেন? সর্বনাশ কেন?

স্মরজিৎ : একটা ভীষণ কিছু হয় তো আশা করে আসবে, এসে আমাকে দেখে সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। (লিলি আর থাকিতে পারিল না)

লিলি : কেন? (স্মরজিতের সহাস্য দৃষ্টি এতো সোজা লিলির মুখে পড়িল যে সে থতমত খাইয়া গেল)

স্মরজিৎ : কেন? আপনিই বলুন না? মনে মনে নিশ্চয়ই একটা চেহারা কল্পনা করে রেখেছিলেন। মিলেছে কি? (লিলি মুখ নিচু করিয়া রহিল। অরবিন্দ ফিরিয়া চাহিল। লিলির উত্তর পাওয়া গেল না।)

মণি : আমি কিন্তু আপনার ঠিক এইরকম চেহারাই কল্পনা করেছিলাম। সুপ্রীতি ভয় পাচ্ছে—স্টেশনে গিয়ে চিনবে কী করে? আমি বললাম—গিয়ে দেখো। কবির চেহারা—দেখলেই চেনা যাবে।

স্মরজিৎ : আশ্চর্য, জানেন? মিসেস মজুমদার কিন্তু সত্যিই এক নজরে ধরে ফেললেন। গাড়ি থেকে নামা মাত্র সোজা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তো অবাক!

লিলি : এ আর আশ্চর্য কী?

স্মরজিৎ : আশ্চর্য নয়? কী বলছেন? আমার ছবি তো আমি কক্ষনো ছাপতে দিই নি আজ অবধি!

লিলি : তাতে কী?

স্মরজিৎ : আপনি গেলে চিনতে পারতেন?

লিলি : নিশ্চয়ই!

স্মরজিৎ : তা হলে বলতে হয় আপনারা সপরিবারে জ্যোতিষচর্চা করেন। (স্মরজিৎ হাসিলেন। মণিভূষণ হাসিলেন—খোলা হাসি। লিলি হাসিল। অরবিন্দ হাসিল না। আর হাসিল না সনৎ। স্মরজিৎ অরবিন্দর দিকে ফিরিলেন।) আপনি অমন এক কোণে গিয়ে বসলেন কেন অরবিন্দবাবু?

অরবিন্দ : (গোঁজ হইয়া) মাপ করবেন। অনেক কাজ আছে ইলেকশনের।

মণি : ও এখন থাক অরবিন্দ। তুমি এখানে এসে বোসো।

অরবিন্দ : না, এ লিস্টটা শেষ হবে না তাহলে।

মণি : তা কালই না হয় হবে।

অরবিন্দ : না, শেষ করে ফেলি।

মণি : অরবিন্দ কাজ-পাগল। কাজ পেলে আর কিছুতে ওকে টানা মুশকিল।

স্মরজিৎ : টানা উচিতও না। সত্যি এই ইলেকশনের সময়ে এসে আমি বোধহয় আপনাদের কাজের অনেক ক্ষতি করে দিচ্ছি!

মণি : না না, মোটেই না! ও কথা ভাববেন না আপনি। ইলেকশন করছি বলে সাহিত্যের কথা ভুললে চলে? ইলেকশনের মিটিংয়ের চেয়ে সাহিত্যসভার দাম অনেক বেশি। আমি তো সেই কথাই বলছিলাম সুপ্রীতিকে—

(সুপ্রীতি প্রবেশ করিলেন)

সুপ্রীতি : কী কথা?

মণি : বলছিলাম না? আগে সহিত্যসভা, তারপর ইলেকশন।

সুপ্রীতি : অরবিন্দ, আবার তুমি ঐ লিস্ট নিয়ে বসেছো?

অরবিন্দ : এটা আজকেই শেষ করা দরকার—

সুপ্রীতি : কিচ্ছু দরকার নেই! কী আশ্চর্য!

মণি : আমি তো বললাম—

সুপ্রীতি : ছেড়ে দাও ওসব। এসো, এখানে এসে বোসো। (কাগজপত্র ছাড়াইয়া অরবিন্দকে প্রায় জোর করিয়া আসরে অধিষ্ঠিত করাইলেন)

স্মরজিৎ : আমি একটু অপরাধী বোধ করছি। সব কাজ ফেলে আপনারা আমাকে নিয়ে পড়েছেন—

মণি : (সহসা মনে পড়ায়) কাজ—ওঃ হো! আমাকে একটু মাপ করবেন স্মরজিৎবাবু, একবার ইলেকশনের জরুরি একটা—

স্মরজিৎ : বিলক্ষণ!

(মণিভূষণ বাহিরে গেলেন)

সুপ্রীতি : চা হচ্ছে স্মরজিৎবাবু। দশ মিনিট।

স্মরজিৎ : আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না?

সুপ্রীতি : সত্যি, আমার কেমন যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না—আপনি এসেছেন, থাকবেন—কাল সন্ধে পর্যন্ত থাকবেন!

স্মরজিৎ : আপনি এমনভাবে বলছেন, যেন আমি কী এক দুষ্প্রাপ্য বস্তু।

সুপ্রীতি : দুষ্প্রাপ্য না? আমি তো যতোদূর শুনেছি—সাহিত্যসভা আপনি সাধ্যমতো এড়িয়ে চলেন।

স্মরজিৎ : (হাসিয়া) হ্যাঁ, ওরকম একটা বদনাম আমার আছে অবশ্য।

লিলি : তবে এখানে আসতে রাজি হলেন যে?

স্মরজিৎ : এখানকার নিমন্ত্রণটা এড়াবার মতো নয় বলতে পারেন।

লিলি : এসে অনুতাপ করছেন না তো!

স্মরজিৎ : বরং ঠিক উল্টো। আসবার আগে যদি বা সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল, এসে আপনাদের এই আন্তরিক আমন্ত্রণের বন্যায় ভেসে গেছি। (একে বলে কবি—লিলি ভাবিল। আদিখ্যেতা—অরবিন্দ ভাবিল।)

অরবিন্দ : আপনি বুঝি শুধু কবিতাই লেখেন?

লিলি : কী বলছেন! 'বাষ্পের তৃষ্ণা 'পড়েন নি?' সীতা ও অ্যান্ড্রোমিডা'? 'মেঘ-চেরা জ্বালা?'

স্মরজিৎ : আপনি আমার সব ক'টি দুষ্কর্মের সঙ্গে পরিচিত দেখছি। কিন্তু সবাই তা হতে যাবে কেন?

লিলি : না, তা অবশ্য ঠিক। সনৎবাবু পড়েছেন?

সনৎ : হ্যাঁ পড়েছি।

স্মরজিৎ : বলো কী সনৎ? দেখুন, একে বলে বান্ধব। দেখা হয় না, তবু সম্বন্ধ ছাড়ে না। হ্যাঁ সনৎ, কবিতাও পড়েছো না কি আমার?

সনৎ : হ্যাঁ পড়েছি।

স্মরজিৎ : বাঃ বেশ বেশ। ভয় নেই, কেমন লেগেছে জিজ্ঞেস করে তোমাকে বিব্রত করবো না।

লিলি : সনৎবাবু 'মেঘ-চেরা জ্বালা' পড়েছেন?

সনৎ : হ্যাঁ পড়েছি।

লিলি : আচ্ছা বিদিশার আত্মহত্যার আসল কারণটা কী মনে হয় আপনার?

সুপ্রীতি : সে কথা লেখককে প্রশ্ন করলেই তো পারিস? উনি যখন উপস্থিত— (লিলি তাহাই চাহিতেছিল)

লিলি : সাহস হয় না।

স্মরজিৎ : কেন, আমাকে দেখে কি খুব ভীতিপ্রদ বলে মনে হচ্ছে?

লিলি : না, মানে—আমি—আচ্ছা, বলুন না?

স্মরজিৎ : কী?

লিলি : বিদিশা কেন আত্মহত্যা করলো?

স্মরজিৎ : কেন? আপনিই বলুন না?

লিপি : বাঃ, আমি কী বলবো?

স্মরজিৎ : আপনি তো পড়েছেন। পড়ে নিশ্চয়ই কিছু একটা মনে হয়েছে?

লিলি : আমি কতোটুকু বুঝি?

স্মরজিৎ : যা বুঝেছেন, বলুন না?

লিলি : আমার—আমার মনে হয়, শান্তনুর চলে যাওয়া বিদিশার আত্মহত্যার আসল কারণ নয়। তাই না?

স্মরজিৎ : বলে যান!

লিলি : না, আমি বুঝি না—

স্মরজিৎ : আপনি ঠিকই বুঝেছেন। বলুন না।

লিলি : (উৎসাহ পাইয়া) আমার মনে হয়—বিদিশার মনে এক শূন্যতা জমেছিলো। এ শূন্যতা তার নার্‌সিসাস কম্‌প্লেক্সের অন্তর্মুখী বেদনার উপরে এ যুগের নিঃসঙ্গ কামনার প্রতিক্রিয়া। তাই বিদিশা ভিতরে ভিতরে—আমি বলতে চাইছি, শান্তনুর চলে যাওয়াটা শুধু ওর এই শূন্যতাটাকে আরো স্পষ্ট, আরো সর্বব্যাপী করে দেওয়া, আর কিছু নয়।

স্মরজিৎ : (সপ্রশংস) মিসেস মজুমদার, আপনার মেয়ের সাহিত্যচেতনার আশ্চর্য গভীরতা।

লিলি : কী যে বলেন?

স্মরজিৎ : না না, সত্যি কথা! বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে এই প্রশ্নটা নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছে, কেউ আপনার মতো এমন দু'কথায় গুছিয়ে বলতে পারেনি।

সুপ্রীতি : (গর্বে) লিলির ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের দিকে ঝোঁক।

স্মরজিৎ : স্বাভাবিক। আপনারই তো মেয়ে!

সুপ্রীতি : আমি আর কতোটুকু বুঝি? তবে হ্যাঁ, সময়টা বাজে কাজে নষ্ট না করে সাহিত্যের সেবায় দিয়ে যাচ্ছি সাধ্যমতো। এই ভাস্বতী পত্রিকাটা—

(মণিভূষণের প্রবেশ)

মণি : মুস্কিল হয়ে গেলো যে?

সুপ্রীতি : কী হোলো?

মণি : আমাকে এখুনি একবার যেতে হচ্ছে ইলেকশন অফিসে।

সুপ্রীতি : বাঃ! স্মরজিৎবাবু এলেন—

স্মরজিৎ : না না, কী আশ্চর্য! আমি এসেছি বলে কাজ পড়লে যাবেন না?

সুপ্রীতি : কী এমন কাজ পড়লো?

মণি : কাজ মানে, প্রেসে একবার যেতেই যবে—তা ছাড়া—যাক্‌গে সেসব খুঁটিনাটি দিয়ে আসরটা নষ্ট করে লাভ নেই। তোমরা গল্প করো, আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি সেরে আসছি। স্মরজিৎবাবু কিছু মনে করবেন না—

স্মরজিৎ : না না, কী আশ্চর্য—

সুপ্রীতি : চা-টা খেয়ে গেলে হবে না?

মণি : না, ঘুরেই আসি।

(প্রস্থান)

সুপ্রীতি : কী বলছিলাম?

অরবিন্দ : ভাস্বতী পত্রিকা।

সুপ্রীতি : হ্যাঁ ভাস্বতী। আপনি দেখেছেন কাগজটা?

স্মরজিৎ : না, হ্যাঁ—ঠিক মনে পড়ছে না—

সুপ্রীতি : লিলি, নিয়ে আয় তো একটা—

লিলি : এই তো ভাদ্র সংখ্যাটা এখানেই আছে। (স্মরজিৎ পাতা উল্টাইতে লাগিলেন)

সুপ্রীতি : এই কাগজটাকে প্রাণপণে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু শুধু খাটলেই তো হয় না! সত্যিকারের ভালো লেখা দু-একটা যদি না পাই— (কিন্তু স্মরজিৎ কথাটা বুঝিলেন বলিয়া মনে হইল না)

অরবিন্দ : কেন, লেখা তো সবগুলোই বেশ ভালো— (সুপ্রীতি এমনভাবে অরবিন্দর দিকে চাহিলেন যে তাহাকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া থামিয়া যাইতে হইল। সুপ্রীতি অন্য রাস্তা ধরিলেন।)

সুপ্রীতি : আপনার শেষ কবিতার বই কী বেরুলো স্মরজিৎবাবু?

স্মরজিৎ : অ্যাঁ? (হাসিয়া) সে আর আমি কী বলবো? আপনারা তো সব খবরই রাখেন। বিশেষ করে মিস্ মজুমদার।

লিলি : 'সোনালী সীম্‌ফনী'র পর আর কিছু বেরিয়েছে বলে তো শুনি নি?

স্মরজিৎ : (সুপ্রীতিকে) দেখলেন তো? (লিলিকে) না, ওর পরে আর কিছু বেরোয় নি।

সুপ্রীতি : লিখেছেন নিশ্চয়ই ওর পরে?

লিলি : বাঃ? এবারকার 'কাকলী'তেই তো বেরিয়েছে—'আমি এক ভাঙাচোরা সিঁড়ি'—

সুপ্রীতি : সে তো দেখেছি। আমি বলছি, এমন কিছু যা এখনো কোথাও বেরোয় নি?

স্মরজিৎ : আছে দু'একটা—

সুপ্রীতি : (মহা আগ্রহে) শোনাবেন?

স্মরজিৎ : অ্যাঁ?

লিলি : (আরও আগ্রহে) হ্যাঁ, শোনান না? (স্মরজিৎ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না)

স্মরজিৎ : শোনাবো? সে—কী আর শুনবেন? শোনবার মতো কিছু নয়—

সুপ্রীতি : কী বলেন স্মরজিৎবাবু! আপনার কবিতা শোনবার মতো নয়?

লিলি : স্মরজিৎবাবু—প্লীজ!

স্মরজিৎ : আমার ভালো করে মনেও নেই। ঐ এক রোগ আমার—লেখা হয়ে গেলে আর মনে থাকে না!

লিলি : যেটুকু মনে পড়ে—শোনান না!

স্মরজিৎ : আচ্ছা, শুনুন তবে। (সুপ্রীতি লিলিকে ইশারা করিলেন। লিলি সনৎকে কাগজ বাড়াইয়া দিয়া লিখিতে ইশারা করিল। স্মরজিৎ অন্যমনস্কভাবে ভাস্বতীর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শুরু করিলেন।)

কোমল মসৃণ গাত্রচর্ম।
রুচি? সে তো অলঙ্কার—
বিশুদ্ধ ও খাঁটি।
অনুসন্ধান করো—
সম্পাদনা।
প্রীতি ও শুভেচ্ছা—
অতি-বেগুনী রশ্মির বিকীরণ
নিউট্রন
ইলেকট্রন
—দুঃসংবাদ!
সুজাতা তবুও স্তব্ধ,
অনেক রাত।
যদি জানিতাম তুমি আছ!
কিন্তু আজ
আগামী সংখ্যার সমাপিকা।

(স্মরজিতের কাব্যিক আকুতি 'যদি জানিতাম তুমি আছ'-তে হাহাকার করিয়া 'সমাপিকা'য় ঘাড় গুঁজিয়া পড়িল। স্মরজিৎ নিজেও ঘাড় গুঁজিয়াছেন। কঠিন মুষ্টিতে ভাস্বতী নিষ্পেষিত। লিলি ও সুপ্রীতি মুগ্ধ। অরবিন্দ বোধহয় অর্থ বুঝিবার চেষ্টা

করিতেছে। সনৎ বাধ্য ছেলের মতো ঢুকিয়াছে, কিন্তু তাহার চোখ আরও গোল হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।)

সুপ্রীতি : অপূর্ব! কী করে লেখেন এমন? (স্মরজিৎ যেন অন্য এক জগৎ হইতে ফিরিয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেন)

স্মরজিৎ : কী বলছেন?

সুপ্রীতি : (অপ্রস্তুত হইয়া) না না, কিছু না। আমি বুঝতে পারিনি আপনি—

স্মরজিৎ : (হাসিয়া) না না বলুন। ও কিছু না।

অরবিন্দ : আচ্ছা -সংখ্যার সমাপিকা কেন?

লিলি : আঃ! অরবিন্দবাবু!

অরবিন্দ : না, আমি শুধু—

স্মরজিৎ : (সুদুর হাসিয়া) সংখ্যারই তো সমাপিকা অরবিন্দবাবু! আর কিসের বলুন?

সুপ্রীতি : বটেই তো। আর কিসের হতে পারে?

লিলি : (অরবিন্দকে) সংখ্যা কাকে বলা হয়েছে এখানে—ভেবে দেখেছেন?

অরবিন্দ : (ঘাবড়াইয়া) ও হ্যাঁ। ঠিক ঠিক—বুঝেছি।

সুপ্রীতি : স্মরজিৎবাবু, একটা অনুরোধ রাখবেন?

স্মরজিৎ : কী বলুন তো?

সুপ্রীতি : এই কবিতাটি আমায় দিতে হবে—ভাস্বতীর জন্যে।

স্মরজিৎ : এইটা?

সুপ্রীতি : বড়ো বেশি চেয়ে ফেললাম, না? কিন্তু ভাস্বতী দাঁড়াবে কী করে যদি আপনার মতো কবির—

স্মরজিৎ : না না, সে কথা নয়। মানে—আচ্ছা, দেবো এখন—

সুপ্রীতি : (উৎসাহে) দেবেন? সত্যি?

স্মরজিৎ : হ্যাঁ, কিন্তু—এখন আর আবৃত্তি করতে বলবেন না। পরে—পরে লিখে দেবো—

লিলি : লিখে দিতে হবে না। লেখা হয়ে গেছে। (সনতের হাত হইতে কাগজটি লইয়া দেখাইল)

স্মরজিৎ : সে কী? কখন?

লিলি : এই তো, সনৎবাবুকে বলেছিলাম লিখতে।

স্মরজিৎ : (হাসিয়া) তবে আর কী? পেয়েই তো গেলেন।

লিলি : আপনার নামটা লিখে দেবেন না?

স্মরজিৎ : (বদান্য হাস্যে) দিন।

(নাম সই করিয়া দিলেন। পাঁচুর প্রবেশ।)

পাঁচু ! মা।

সুপ্রীতি : অ্যাঁ? হ্যাঁ, যাচ্ছি!

(পাঁচুর প্রস্থান)

স্মরজিৎবাবু, চা প্রায় তৈরি, আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন। লিলি, যা দেখিয়ে দে।

লিলি : (কাগজটি দিয়া) সনৎবাবু, এটা রাখুন তো, আসুন স্মরজিৎবাবু।

(লিলি ও স্মরজিতের প্রস্থান)

সুপ্রীতি : অরবিন্দ, তুমি সনৎবাবুর সঙ্গে কথা বলো, আমি খাবারটা সাজিয়ে ফেলি।

(সুপ্রীতির প্রস্থান। সনৎ কবিতাটি দেখিতে লাগিল।)

অরবিন্দ : আপনিও বুঝি সাহিত্যচর্চা করেন?

সনৎ : অ্যাঁ? না, চর্চা আর কই? কলেজে যা একটু আধটু—

অরবিন্দ : কলেজে? কী সাবজেক্ট ছিল আপনার?

সনৎ : বাংলা।

অরবিন্দ : বাংলা অনার্স?

সনৎ : হ্যাঁ।

অরবিন্দ : ও। (গুম হইয়া রহিল। সনতের মনে হইল তাহার কিছু বলা উচিত।)

সনৎ : আপনার?

অরবিন্দ : অ্যাঁ?

সনৎ : আপনার কী ছিল?

অরবিন্দ : কমার্স! (মনে হইল কমার্স পড়া যেন অরবিন্দর জীবনের সব চেয়ে যথেষ্ট ভুল। সনৎ অতো বুঝিল না।)

সনৎ : ভালো করেছেন।

অরবিন্দ : ভালো করেছি?

সনৎ খুব ভালো করেছেন। বাংলা অনার্স নিয়ে যে কী ভুল করেছিলাম—এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

অরবিন্দ : সে কী?

সনৎ : আর কী বলুন? বাংলা সেকেন্ড ক্লাস অনার্সে কী হয়। শুধু মফঃস্বল ইস্কুলের মাস্টারি। তাও রাখতে রাখতে প্রাণান্ত!

অরবিন্দ : কিন্তু সাহিত্য—?

সনৎ : সাহিত্য নিয়ে ধুয়ে খাবো! এই সাহিত্য করে বড়োমামা নিজেও ডুবলেন আমাকেও ডুবিয়ে গেলেন।

অরবিন্দ : বড়োমামা?

সনৎ : বড়োমামার ঠেলায় পড়েই তো বাংলা অনার্স নিলাম। আমার মতো আরো কতো লোকের যে সর্বনাশ ভদ্রলোক করেছেন—তা তিনিই জানেন।

অরবিন্দ : কী রকম?

সনৎ : আরে মশাই, সেই কল্লোলযুগে এক নবীন সাহিত্যের জোয়ার এসেছিলো না। বড়োমামা সেই জোয়ারে হাবুডুবু খেতেন, আর অন্যদের ধরে এনে হাবুডুবু খাওয়াতেন।

অরবিন্দ : আপনার মামা কল্লোলযুগের লেখক?

সনৎ : লেখক না। লেখক হলে তো একাই ডুবতেন, আর পাঁচজন রেহাই পেতো। লেখবার ক্ষমতা ছিল না। ছিল লেখকদের পেছনে লাগবার ক্ষমতা। নবীন লেখকদের জন্যে তিনি পর পর বাংলা পত্রিকা বার করে যেতেন।

অরবিন্দ : পর পর কেন?

সনৎ : বাঁচতো না কোনোটা। সব শিশু-মৃত্যু! তার উপর রেলের চাকরি। যেখানে

বদলি হতেন, কিছু কচি লেখকের মাথায় বদবুদ্ধি নিয়ে নতুন কাগজ বার করতেন। বাংলাদেশে হেন জেলা নেই, যেখানে বড়োমামার কাগজ বেরোয় নি।

অরবিন্দ : সব নিজের খরচে?

সনৎ : সে তো বটেই! আর সে কি সোজা খরচ? প্রতিটি নবীন লেখকের ছবি না ছাপলে বড়োমামার তৃপ্তি হোতো না।

অরবিন্দ : একটাও চললো না?

সনৎ : কী করে চলবে? কলকাতায় রথী মহারথীরা চালাতে পারলো না, আর মফঃস্বল শহরে বড়োমামা। দু'টো পত্রিকা তো বেরুবামাত্র প্রোস্‌ক্রাইব্‌ড্ হয়ে গেলো।

অরবিন্দ : তাই না কি?

সনৎ : হ্যাঁ। কপি বাজেয়াপ্ত, মামলা—এই সবে সর্বস্ব খুইয়ে যখন পটল তুললেন—ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে পেলো কিছু দেনা, আর আমি পেলাম সাহিত্যের বোঝা।

অরবিন্দ : সাহিত্যের বোঝা?

সনৎ : বোঝা নয়? এক বোঝা বাংলা অনার্স, আর এক বোঝো—সে সত্যি সত্যিই এক বস্তা।

অরবিন্দ : বস্তা?

সনৎ : যতো পত্রিকা তিনি বার করেছিলেন, তার কপির ফাইল। ফেলতেও পারি না, রাখতেও পারি না। এর থেকে দেনাটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বাংলা অনার্সটা ছেলের ঘাড়ে চাপালে বাঁচতাম। কিন্তু ছেলে সেয়ানা—ওভারসিয়ারি পড়ে করে খাচ্ছে। ডুবলাম আমিই। (অরবিন্দ হাঁ হইয়া গেল। এ বলে কী?)

অরবিন্দ : সনৎবাবু, আপনি জানেন না আপনার কী আছে।

সনৎ : কী আছে?

অরবিন্দ : আর আমার কী নেই।

সনৎ : কী নেই?

অরবিন্দ : আমি যদি কমার্স না পড়ে—আচ্ছা সনৎবাবু।

সনৎ : কী?

অরবিন্দ : আমাকে ঐ কবিতাটার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

সনৎ : মানে? এইটার?

অরবিন্দ : (লজ্জিতভাবে) আপনার আশ্চর্য লাগছে, কিন্তু আমি সত্যি সাহিত্যের কিছু জানি না। আপনি যদি একটু বুঝিয়ে দেন—

সনৎ : আমি কী করে বোঝাবো? আমি নিজে কি কিছু বুঝেছি না কি?

অরবিন্দ : বোঝেন নি?

সনৎ : এক বর্ণও না।

অরবিন্দ : ঐ—সংখ্যাও বোঝেন নি?

সনৎ : না।

অরবিন্দ : সে কী?

সনৎ কেন?

অরবিন্দ : আপনার তো বাংলা অনার্স?

সনৎ : বাংলা অনার্সে এ সব কবিতা পড়ায় না।

অরবিন্দ : কিন্তু—ওরা তো বুঝলো?

সনৎ : কারা?

অরবিন্দ : লিলি, মাসীমা—

সনৎ : ওঁরা—(জোর সামলাইল) হ্যাঁ ওঁরা বোধহয়—না না, বোধহয় কেন, ওঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন।

অরবিন্দ : আর আপনি বোঝেন নি?

সনৎ : নাঃ! (অরবিন্দ তাজ্জব হইয়া গেল। তারপর ভাবিল।)

অরবিন্দ : আমি কিন্তু একটা লাইন যেন বুঝেছি মনে হচ্ছে।

সনৎ : কোন্‌টা?

অরবিন্দ : ঐ—যদি জানিতাম তুমি আছ। ওটা বোধহয় ঈশ্বরকে বলা হচ্ছে।

সনৎ : অন্তত আর একটা কবিতায় ঈশ্বরকে বলা হয়েছিলো।

অরবিন্দ : ঠিক! অমানিশা দেবীর 'হানিয়াছ মোরে'।

সনৎ : (ভাবিয়া) না, তাও বলা হয় নি।

অরবিন্দ : হয় নি?

সনৎ : সেখানে ছিল একটা অভিযোগ, একটা অভিমান, একটা বিক্ষোভ, একটা অন্তদাহের জ্বালা।

অরবিন্দ : বলেন কী?

সনৎ : আমি ঠিক জানি না অরবিন্দবাবু। আমি যা বা শিখেছিলাম কলেজে, সব যেন ভুলে যাচ্ছি মনে হচ্ছে। একটা ইংরিজি কথা আমার সব বাংলা জ্ঞান ওলট পালট করে দিয়েছে।

অরবিন্দ : ইংরিজি কথা? কী ইংরিজি কথা?

সনৎ : প্রবেশন।

(কথা কহিতে কহিতে স্মরজিৎ ও লিলির প্রবেশ)

স্মরজিৎ : কী, বলুন না?

লিলি : সে শুনলে আপনি হাসবেন।

স্মরজিৎ : হাসবো কেন?

লিপি : মানে—এমন কোয়েন্সিডেন্স—একজন অখ্যাতনামা কবির একটা লাইনের সঙ্গে আপনার কবিতার একটা লাইন হুবহু মিলে গেছে।

স্মরজিৎ : তাই না কি? কী লাইনটা বলুন তো?

অরবিন্দ : যদি জানিতাম তুমি আছ।

স্মরজিৎ : আপনিও জানেন?

অরবিন্দ : হ্যাঁ এই তো—ভাস্বতীর এই সংখ্যাতেই আছে। অমানিশা দেবীর 'হানিয়াছ মোরে'।

স্মরজিৎ : দেখি দেখি।—অদ্ভুত তো?

লিলি : ওখানে অবশ্য একেবারে অন্য অর্থে।

অরবিন্দ : হ্যাঁ, ওখানে হোলো একটা অভিযোগ, একটা অভিমান, একটা—একটা—ইত্যাদি। (লিলি চাহিয়া আছে দেখিয়া দুর্বলভাবে হাসিল)

লিলি : অপনার বোধহয় খারাপ লাগছে?

স্মরজিৎ : খারাপ লাগবে কেন?

লিলি : অমন একটা বাজে কবিতার সঙ্গে আপনার লাইন মিলে গেছে বলে।

স্মরজিৎ : না না, তা কেন?

লিলি : আচ্ছা সত্যি, ও কবিতাটা খুব বাজে, না?

স্মরজিৎ : অ্যাঁ? (পড়িলেন)

লিলি : (উৎকণ্ঠিত) খুব কাঁচা হাতের লেখা, না? (স্মরজিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লিলির উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিলেন। আবার পড়িলেন।)

স্মরজিৎ : না, খুব কাঁচা হাত নয়। (সনৎ অবাক হইয়া চাহিল)

লিলি : নয়?

স্মরজিৎ : নতুন লিখছেন বোঝা যায়—এখনো রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু—সম্ভাবনা আছে।

লিলি : সম্ভাবনা আছে?

সনৎ : সে কী? (মুখ ফস্কাইয়া গিয়াছে, বলিয়াই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল সনৎ।)

স্মরজিৎ : (সনতের চোখে চোখ রাখিয়া) তোমার কি তা মনে হয় না সনৎ?

সনৎ : না না, নিশ্চই, আমি তো বলছিলাম ওঁকে—মানে—আমি অবাক হলাম আপনিও বললেন বলে—

স্মরজিৎ : কেন সনৎ? তোমার যা সাহিত্যবিচার, আমার কি তার উল্টো হওয়া দরকার?

লিলি : আপনিও সত্যি তাই মনে করেন সনৎবাবু?

সনৎ : হ্যাঁ, করি বৈ কি? তবে—স্মরজিৎদাই বলছেন, আমার বলার আর কী দাম?

লিলি : দাম নেই, বাঃ? (সকলেরই কথা দামী হইয়া উঠিল যে?)

অরবিন্দ : হ্যাঁ, আমিও তো গোড়া থেকেই বলে আসছি—

(কিন্তু লিলি এমন বিশ্রীভাবে তাকায়। সুপ্রীতির প্রবেশ।)

সুপ্রীতি : এবার একটু কষ্ট করে আসতে হবে স্মরজিৎবাবু! চায়ের ব্যবস্থাটা পাশের ঘরে করেছি। এ ঘরে মাঝে মাঝে এমন ইলেকশনের দৌড়ঝাঁপ চলে।

স্মরজিৎ : হ্যাঁ, চলুন। ইয়ে, মিসেস মজুমদার!

সুপ্রীতি : কী, বলুন?

স্মরজিৎ : বলছিলাম—ও কবিতাটা ভাস্বতীতে দেবেন না।

সুপ্রীতি : (ধ্বসিয়া গিয়া) দেবো না?

স্মরজিৎ : মানে—ভাস্বতীতেই প্রকাশিত আর একটা কবিতার সঙ্গে ওর একটা লাইন মিলে গেছে।

লিলি : কিন্তু তাই বলে—

সুপ্রীতি : স্মরজিৎবাবু—

স্মরজিৎ : না না, ওর বদলে আর একটা দেবো আমি—

সুপ্রীতি : দেবেন?

লিলি : আর একটা?

স্মরজিৎ : নিশ্চয়ই দেবো। আজ রাত্রেই লিখে দেবো আমি।

সুপ্রীতি : বাঁচালেন। (লোভে) আচ্ছা যদি—যদি দু'টোই—

স্মরজিৎ : না না, এটা থাক।

লিলি : আঃ মা! স্মরজিৎবাবু, আপনার সই-করা কাগজটা রাখতে পারি তো?

স্মরজিৎ : অ্যাঁ? হ্যাঁ, না—কী দরকার? আমি অন্য কবিতাটা নিজের হাতে লিখে—না হয় দু'খানা সই করে দেবো! তাতে হবে না?

সুপ্রীতি : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! যেমন বলবেন। কই—সেটা কোথায়?

সনৎ : এই যে—(স্মরজিৎ কাগজটি লইয়া পকেটে রাখিলেন)

সুপ্রীতি : তা হলে আসুন স্মরজিৎবাবু—(স্মরজিৎ এক সেকেন্ড থামিয়া কী ভাবিলেন)

স্মরজিৎ : পাঁচ মিনিট পরে গেলে চলে? সনতের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা, দু'চারটে পারিবারিক খবর আদানপ্রদান—এতোক্ষণ সুযোগ পাই নি।

সুপ্রীতি : (শশব্যস্তে) নিশ্চয়ই! আমাদেরই খেয়াল করা উচিৎ ছিল। ছি ছি! অরবিন্দ এসো, লিলি আয়—

স্মরজিৎ : কিছু মনে করবেন না—পাঁচ মিনিট—

সুপ্রীতি : না না, যতোক্ষণ ইচ্ছে—আমাদেরই অন্যায়, ছি ছি—

(অরবিন্দ, লিলি ও শেষে 'ছি ছি' করিতে করিতে সুপ্রীতির প্রস্থান। সনৎ লাফাইয়া উঠিল, বহু কথা যেন একসঙ্গে বাহির হইতে চায়।)

সনৎ : কানাইদা! (স্মরজিৎ এই ভয়ই করিতেছিলেন। প্রায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সনৎকে থামাইয়া দরজা হইতে দূরে লইয়া গেলেন।)

স্মরজিৎ : চুপ, গাধা কোথাকার। চেঁচাচ্ছিস কেন?

সনৎ : (চাপা গলায়) কানাইদা—আপনি—

স্মরজিৎ : কে কানাইদা? আমি স্মরজিৎ সান্যাল!

সনৎ : আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমার—

স্মরজিৎ : তুই বুঝতে না পেরেও আমায় জোর বাঁচিয়ে গেছিস ভাই! আমার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠে গলায় আটকে গেছিলো তখন!

সনৎ : কী ব্যাপার কানাইদা আমি—

স্মরজিৎ : আবার কানাইদা? তোর কানাইদাকে মণি মজুমদারের চেলারা কেটে পুঁতে ফেলুক—এই তুই চাস?

সনৎ : অ্যাঁ?

স্মরজিৎ : একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জানতে পারলে তাই করবে। এ ইলেকশন!

সনৎ : আপনি—আপনি কি—চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর দলের লোক?

স্মরজিৎ : কারো দলের লোক আমি নই বাবা, আমি গরিব চাকুরে। খবরের কাগজে চাকরি করি।

সনৎ : হ্যাঁ, তা তো শুনেছি, কিন্তু—

স্মরজিৎ : কাগজটা যে চিদানন্দর—সে কথা শুনেছিস কোনোদিন?

সনৎ : না তো? ওর সম্পাদক তো—

স্মরজিৎ : হ্যাঁ রে হ্যাঁ, চিদানন্দ হোলো সম্পাদকের সম্পাদক! এ দুনিয়ায় কে কার বাবা হয়, খবর রাখা মুস্কিল।

সনৎ : তাই বলে আপনাকে এরকম বাঘের গর্তে—

স্মরজিৎ : না না, ওরা পাঠায় নি। আমিই সেধে এসেছি। নইলে চিরটাকাল ঐ রিপোর্টার থেকে পচতে হয়।

সনৎ : কিন্তু আসল স্মরজিৎ যদি এসে পড়ে?

স্মরজিৎ : কোত্থেকে আসবে? এদের চিঠি তার হাতে পৌঁছোবার আগেই তো চিদানন্দর লোক সেটা হাত করেছে।

সনৎ : কী করে?

স্মরজিৎ : সে আমি জানি না ভাই—সে আমার ডিপার্টমেন্ট না। আমি শুধু দেখলাম—এইরকম দুঃসাহসিক একটা কিছু না করলে অ্যাসোসিয়েট এডিটার হতে বুড়ো হয়ে যাবো।

সনৎ : কিন্তু এখানে কী করতে চান আপনি?

স্মরজিৎ : সাহিত্যসভা।

সনৎ : সহিত্যসভা? তার মানে?

স্মরজিৎ : আরে গাধা, এখানকার সবাই দেখবে স্মরজিৎ সান্যাল সাহিত্যসভা করে গেলো। তারপর আসল স্মরজিৎ সান্যাল নিজে যখন টের পেয়ে প্রতিবাদ করবে, তখন?

সনৎ : তখন কী?

স্মরজিৎ : তুই কি ইলেকশন কিছুই বুঝিস না? লোকে বলবে না—মণি মজুমদার ভোট কুড়োতে জোচ্চুরি করে একটা লোককে স্মরজিৎ সান্যাল সাজিয়ে সাহিত্যসভা করেছে?

সনৎ : সে তো যদি কী হয়েছিলো খুলে বলে সব—

স্মরজিৎ : খুলে বলবে! বললে বিশ্বাস করছে কে? চিদানন্দ কি বসে থাকবে? বিশ্বাস করতে দেবে সে অমন আজগুবি গল্প?

সনৎ : আই সী!

স্মরজিৎ : তার উপর ভাস্বতীর কবিতা। চিদানন্দ নিজে খরচ করে স্মরজিৎ সান্যালকে দিয়ে মামলা করাবে না?

সনৎ : বুঝলাম। কিন্তু—কানাইদা—

স্মরজিৎ : (ধমকাইয়া) স্মরজিৎ!

সনৎ : স্মরজিৎদা!

স্মরজিৎ : কী?

সনৎ : আপনাকে যদি না চিনতাম!

স্মরজিৎ : কেন?

সনৎ : আমি এখানকার স্কুলে মাস্টারি করি। প্রবেশনে আছি।

স্মরজিৎ : তাতে কী?

সনৎ : মণি মজুমদার আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি। (স্মরজিৎ সচকিত হইয়া সনতের দিকে

চাহিলেন)

স্মরজিৎ : মাই গড্! তার মানে—পরে যখন জানবে তুই জেনেশুনে কিছু বলিস্ নি, তোর চাকরিটা—(বাকিটা মুখে আনিতে পারিলেন। না চাকুরি বলিতে কী বোঝায়, দুজনেই বোঝে। এক মুহূর্ত নীরবতা।) নাঃ, এখন আর একরকম কথা বলা যাবে না। তুই কতোক্ষণ আছিস এ বাড়িতে?

সনৎ : আজ রাত্তিরে থাকবো।

স্মরজিৎ : কেন?

সনৎ : কী কাজ করাবে যেন রাত বারোটায়।

স্মরজিৎ : কোন্ ঘরে?

সনৎ : কাজ বোধহয় এই ঘরে, কি ঐ অফিস ঘরে হবে। শোবো কোথায় জানি না।

স্মরজিৎ : যতোক্ষণ পারিস, এই ঘরে থাকিস। আমি যেমন করে পারি সবাইকে কাটিয়ে দেখা করবো তোর সঙ্গে।

সনৎ : পারবেন না। ওরা ঘিরে রাখবে আপনাকে—

স্মরজিৎ : সে আমি বুঝবো। নে চল এখন—(দুই পা গিয়া থামিলেন)
এই, ও রকম প্যাঁচার মতো মুখ করে থাকলে দুজনেই ডুববো। হাস্ তো একটু?
(সনৎ হাসিবার চেষ্টা করিল)
ও রকম না, বেশ জোরে।
(নিজেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। সনৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করলি। স্মরজিৎ সনতের কাঁধে এক চাপড় মারিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন।) বেশ বেশ সনৎ! বড়ো খুশি হলাম শুনে, বড়ো খুশি হলাম—

(বলিতে বলিতে দুইজনে বাহির হইলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

(রাত এগারোটার পর। জমাটি আসর—স্মরজিৎ, লিলি, সুপ্রীতি, মণিভূষণ, সনৎ, অরবিন্দ। স্মরজিতের কোনো এক রসিকতায় হাসির রোল উঠিয়াছে, পর্দাও উঠিয়াছে সেই সঙ্গে। রসিকতাটি সাহিত্য-সংক্রান্ত নয় নিশ্চয়ই, কারণ অরবিন্দও হাসিতেছে। সনৎও পূর্বাপেক্ষা সহজ। মনে হয় স্মরজিৎ মোটামুটি সকলেরই চিত্ত জয় করিয়া আসরের মধ্যমণি হইয়া বসিয়াছে।)

সুপ্রীতি : (হাসিতে হাসিতে চোখের জল মুছিয়া) উঃ! বাবা—আপনি—

স্মরজিৎ : এই ফরাসি ভদ্রতার আর এক নমুনা পেয়েছিলাম দিল্লিতে।

সুপ্রীতি : কী কী—

লিলি : বলুন বলুন—

স্মরজিৎ : অশোকা হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিন লাঞ্চে বেয়ারা নিয়ে গিয়ে একটা টেবিলে বসালো—দেখি এক ফরাসি সাহেব। যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললো—'বনাপেতি।' আমিও পরিচয় দিলাম—স্মরজিৎ সান্যাল। আর

কথাবার্তা এগুলো না খাবার সময়ে। সে একবর্ণ ইংরাজি জানে না, আর আমি ফরাসিতে সমান পণ্ডিত। ডিনারে ফের অমনি হ্যান্ডশেক করে—'বনাপেতি'। ভালো মুস্কিল—ক'বার পরিচয় দেবে? কোনোমতে 'স্মরজিৎ সান্যাল' বলে খেতে বসলাম। পরদিন লাঞ্চে আবার যখন সেই একই ঘটনা ঘটলো, তখন আর পারলাম না। খাওয়া সেরে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপার কী? মাথা খারাপ আছে নাকি? ম্যানেজার তো হেসেই অস্থির! সে নানা দেশের বুকনি শোনে, তার জানা আছে। বন্ আপেতি মানে—গুড্ অ্যাপেটাইট্। অর্থাৎ তোমার ভালো ক্ষিদে হোক, তৃপ্তি করে খাও—এই শুভেচ্ছা। (হাসি শুরু হইল) দাঁড়ান, শেষ হয়নি! বোকা বনে ভাবলাম—পুষিয়ে নিতে হবে। সেদিন ডিনারে গিয়ে ও কিছু বলবার আগে আমিই চোস্ত ফরাসিতে ওকে শুভেচ্ছা জানালাম—'বনাপেতি'। শুনে ওর মুখ হাসিতে ভরে গেলো। আমার হাতটা সজোরে নাড়তে নাড়তে আমার ভাষায় আমাকে শুভেচ্ছা জানালো—'সঁরজিৎ সানিয়াল্।' (উচ্চহাসি। হাসি কমিতে না কমিতে স্মরজিৎ আবার শুরু করিলেন।) ফরাসিদের ভদ্রতা আর ইংরেজদের সভ্যতা! সেই আফ্রিকার ইংরেজ মিশনারির গল্প জানেন তো?

মণি, লিলি, সুপ্রীতি : না না, কী, বলুন বলুন—

স্মরজিৎ : ওটা নিশ্চয়ই শুনেছেন! খুব পরিচিত গল্প—

মণি, লিলি, সুপ্রীতি : না, কী, বলুন না—

স্মরজিৎ : মিশনারি সায়েব আফ্রিকার জঙ্গল থেকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন দেশে বড়ো পাদ্রিসায়েবকে। লিখছেন—এখানকার নরখাদকদের আমি অনেকটা সভ্য করে এনেছি। বড়োসায়েব লিখলেন—সে কী? আমি যে শুনলাম—ওরা এখনো মানুষ মেরে খাচ্ছে? ইংরেজ পাদ্রি জবাবে লিখলেন—হ্যাঁ, তা খাচ্ছে, তবে ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাচ্ছে! (আবার হাসির রোল উঠিল)

লিলি : (হাসি কমিলে) আপনার লেখা পড়ে কখনো মনে হয়নি—আপনি এমন সব মজার মজার গল্প বলতে পারেন।

মণি : কেন কেন? (খেয়াল করিয়া) ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও কখনো আপনার লেখা পড়ে মনে হয় নি আপনি এরকম—ওঃ! কাঁটা ছুরি দিয়ে খাচ্ছে, অ্যাঁ? তবে আর কি, সভ্য তো হয়েই গেছে! (অরবিন্দ হঠাৎ ঘড়ি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল)

অরবিন্দ : এগারোটা দশ! আমি চলি। বাড়িতে বোধহয় ভাবতে শুরু করেছে।

সুপ্রীতি : কাল আসছো তো?

অরবিন্দ : হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সকালেই আসবো। নমস্কার স্মরজিৎবাবু। চলি সনৎবাবু।

(প্রস্থান)

স্মরজিৎ : এ কী? এগারোটা দশ!

লিলি : কী হয়েছে তাতে?

মণি : না, হয়তো সকাল সকাল শোয়া অভ্যেস!

সুপ্রীতি : তাই, স্মরজিৎবাবু?

স্মরজিৎ : না না, মোটেই না, কিন্তু আপনার তো ভাস্বতীর জন্য কবিতা একটা চাই?

সুপ্রীতি : (উৎকণ্ঠিত) আপনি যে বললেন—

স্মরজিৎ : তবে আমাকে একটু সময় দিতে হয়—

সুপ্রীতি: (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! চলুন আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। (সকলেই উঠিল। স্মরজিতের চোখ আটকাইয়াছে ফুলদানিতে। দুই এক পা করিয়া সেদিকে অগ্রসর হইলেন।) কী হোলো?

স্মরজিৎ : (ফিরিয়া) উঁ? (তাঁহার চোখ স্বপ্নাবিষ্ট। তারপর ঝাঁকানি দিয়া যেন জগতে ফিরিলেন) অ্যাঁ, কী বলছেন?

সুপ্রীতি : (ভয়ে ভয়ে) কবিতাটা লিখবেন বলছিলেন, তাই আপনার ঘর দেখিয়ে দেবো বলে—

স্মরজিৎ : (শিহরিয়া) ঘর? যে ঘরে আমি শোবো?

সুপ্রীতি : (আরও ভয় পাইয়া) হ্যাঁ, কেন?

স্মরজিৎ : অসম্ভব! শোবার ঘরে আমি কক্ষনো লিখতে পারি না।

সুপ্রীতি : তবে? (ততক্ষণে স্মরজিৎ গিয়া ফুলদানিতে হাত বুলাইতেছেন)

স্মরজিৎ : ফুলদানি। ফুল-দানি। (সহসা ফিরিয়া) মণিবাবু, এঘরে কি আপনার আর কোনো কাজ আছে আজ রাত্রে?

সুপ্রীতি : না না, কোনো কাজ নেই—

মণি : না, হ্যাঁ, একটু—

সুপ্রীতি : কী আবার কাজ তোমার এতো রাত্তিরে?

মণি : মোহন আসবে বারোটা নাগাদ, খুব জরুরি একটা—

স্মরজিৎ : বারোটা? বারোটার আগে আমি ছেড়ে দেবো—আধঘণ্টা। আধঘণ্টা দিন আমাকে এই ঘর—আমি দুঃখিত, কিন্তু এই ফুলদানি—ফুল-দা-নি—

(স্মরজিৎ আবার আবিষ্ট হইলেন, সুপ্রীতি খেদাইয়া সকলকে বাহির করিলেন।)

সুপ্রীতি : এসো এসো, লিলি আয়, সনৎবাবু—

স্মরজিৎ : (মুখ না ফিরাইয়া) সনৎ থাক।

সুপ্রীতি : অ্যাঁ?

স্মরজিৎ : সনৎকে দরকার। সনৎ একটা কাগজ নিয়ে বোসো। একটু প্লীজ দেখবেন—আধঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ ঘরে এসে পড়ে, তাহলে কিন্তু—

সুপ্রীতি : না না, কেউ আসবে না—

(মণি ও লিলি ভিতরে গেলেন, সুপ্রীতি পিছনে, স্মরজিৎ সহসা ঘুরিয়া সনতের দিকে চাহিয়া গর্জাইয়া উঠিলেন)

স্মরজিৎ : ফুলদানি!

(সুপ্রীতি যদি বা কৌতূহলে দরজার কাছে একটু বিলম্ব করিতেছিলেন, এ হুঙ্কারে ছিটকাইয়া সরিয়া গেলেন। স্মরজিৎ এক সেকেন্ড ভঙ্গীটি রাখিলেন।)

যাক! আধ ঘণ্টার মতো নিশ্চিন্ত! কিন্তু বহু কাজ। আগে কবিতাটা চোকানো যাক।

সনৎ : আপনি সত্যি সত্যি কবিতা লেখা ধরেছেন, আমি জানতাম না।

স্মরজিৎ : কবিতা? আমার বাবাও কোনোদিন কবিতা লেখে নি!

সনৎ : সে তো অনেক কবির বাবাই লেখেন নি।

স্মরজিৎ : তুই তো স্মরজিৎ সান্যালের কবিতা পড়েছিস!

সনৎ : পড়েছি অনেক।

স্মরজিৎ : আমি তাড়াহুড়োতে একটি মাত্র কবিতার বই জোগাড় করতে পেরেছিলাম, ট্রেনে পড়তে পড়তে এসেছি।

সনৎ : একটা মোটে? আর উপন্যাস?

স্মরজিৎ : একটাও পড়ি নি।

সনৎ : তবে ঐ বিদিশার আত্মহত্যা কী করে বললেন?

স্মরজিৎ : কে বলেছে? বলেছে তো লিলি। আমি কে বিদিশা, কে শান্তনু—কোনো খবর জানি?

সনৎ : আপনার সাহস আছে কানাইদা। একটা বই সম্বল করে—

স্মরজিৎ : আবার ক'টা লাগে? কেন, এরা তো স্মরজিৎ গুলে খেয়েছে, ঐ যে মালটা ছাড়লাম, ধরতে পারলো কিছু?

সনৎ : ধরবে কী? একেবারে স্মরজিৎ-ব্র্যান্ড! কিন্তু অতোগুলো উদ্ভট কথা অতো তাড়াতাড়ি বার করলেন—কল্পনাশক্তি আছে আপনার!

স্মরজিৎ : আরে দূর, কল্পনায় কখনো কুলোয়? তার উপর আমার কল্পনা।

সনৎ : তবে পেলেন কোথায়?

স্মরজিৎ : ছাপা রে বাবা, ছাপা, ভাস্বতীতে সব বেরিয়েছে। এই নে, ধর। (কবিতাটি পকেট হইতে বাহির করিয়া সনৎকে দিলেন, নিজে ভাস্বতী তুলিলেন।) পড়ে যা!

সনৎ : কোমল মসৃণ গাত্রচর্ম—

স্মরজিৎ : প্রথম পাতা—সাবানের বিজ্ঞাপন। তারপর?

সনৎ : রুচি? সে তো অলঙ্কার—

স্মরজিৎ : রুচিসম্মত অলঙ্কার—নন্দী জুয়েলার্স, প্রাইভেট লিমিটেড।

সনৎ : বিশুদ্ধ ও খাঁটি—

স্মরজিৎ : গব্য ঘৃত।

সনৎ : অনুসন্ধান করো—

স্মরজিৎ : অনুসন্ধান করুন তিপ্পান্ন নম্বর ইত্যাদি—বিজ্ঞাপন চলছে এখনো—

সনৎ : সম্পাদনা—

স্মরজিৎ : সুপ্রীতি মজুমদার।

সনৎ : অ্যাঁ?

স্মরজিৎ : আরে ভাস্বতীর সম্পাদনা! পয়লা পাতায় এসেছি।

সনৎ : প্রীতি ও শুভেচ্ছা—

স্মরজিৎ : সম্পাদকীয়র শেষ কথা।

সনৎ : অতি-বেগুনী রশ্মির বিকীরণ, নিউট্রন, ইলেকট্রন, দুঃসংবাদ।

স্মরজিৎ : ইলেকট্রন অবধি প্রবন্ধটা—'বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞান'। 'দুঃসংবাদ' পরের গল্পে।

সনৎ : সুজাতা তবুও স্তব্ধ। অনেক রাত—

স্মরজিৎ : গল্প চলছে।

সনৎ : যদি জানিতাম তুমি আছ—

স্মরজিৎ : অ্যাই! এইখানেই কেঁচে গেলাম। নইলে এর মালটাই চলে যেতো বেশ! তখন কি জানি ছাই—অমানিশাদেবী সম্পাদিকার কন্যা?

সনৎ : অ্যাঁ?

স্মরজিৎ : অ্যাঁ কী রে? এটা যে লিলির লেখা, সে তো ওর দু'টো কথা শুনলেই বোঝা যায়। তুই বুঝিসনি?

সনৎ : (ভাবিয়া) হ্যাঁ, ঠিক। বোঝা উচিত ছিল। এ বাড়িতে পা দিয়ে অবধি বুদ্ধি সুদ্ধি খেলছে না আর।

স্মরজিৎ : আরে তাই যদি না হবে, তবে আমি এই অখাদ্যটাকে পড়ে বলি—সম্ভাবনা আছে? কবিতা লিখতে পারি না বলে কি কিছুই বুঝি না? হাজার হোক, জার্নালিস্ট তো।

সনৎ : জোর বেঁচে গেছি।

স্মরজিৎ : কেন রে?

সনৎ : আমাকেও জেরায় ফেলেছিলো। আমি পুরো না বুঝেও ভালো ভালো করে গেছি।

স্মবজিৎ : ভালো করেছিস। *মেয়েদের লেখা কবিতা কক্ষনো খারাপ বলবি না, জেনে রাখ। তার চেয়ে রান্না খারাপ বলা কম বিপজ্জনক। তারপর? আর আছে?*

সনৎ : হ্যাঁ, দু'লাইন। কিন্তু আজ—

স্মরজিৎ : উপন্যাস—কবিতাটার পরে—

সনৎ : আগামী সংখ্যার সমাপিকা। এই লাইনটা নিয়ে খুব হৈ চৈ।

স্মরজিৎ : ঐ উপন্যাস।

সনৎ : সে কী? এরকম লাইন?

স্মরজিৎ : আরে দূর, সিরীয়াল না? আগামী সংখ্যায় সমাপ্য!

সনৎ : আপনি জিনিয়াস!

স্মরজিৎ : বিপদে পড়লে সকলেরই জিনিয়াস বেরোয়। কোথাও কিছু নেই—কবিতা শোনাও। কাগজটা হাতে না থাকলে কী ঝামেলা হেতো বল দিকিন। কিন্তু নতুন কবিতা এখন কোথায় পাই?

সনৎ : কেন, ভাস্বতী?

স্মরজিৎ : ধ্যাৎ! ধরা পড়ে যাবো। তখন কি জানি—তুই টুকছিস, আর ভাস্বতীতে ছাপার মতলব।

সনৎ : তবে কী দেবেন? (টেবিল খুঁজিয়া) এখানে তো সব ভোটার্স লিস্ট!

স্মরজিৎ : ভোটার্স লিস্ট? কই দেখি!

রাধানাথ তালুকদার
বত্রিশ নম্বর
বাবুবাগান রোড—

নাঃ! শুধু নাম ঠিকানা দিয়ে হয় না। প্রথম লাইনটা তো লেখ। ওটা তো রাখতেই হবে।

সনৎ : কী?

স্মরজিৎ : ফুলদানি রে গাধা! যে বুজরুকিতে হ্যাটালাম সবাইকে।—ফুলদানি। (চারিদিকে চাহিয়া) টেবিল। চেয়ার। দরজার পর্দা। —না, এ হচ্ছে না। দেখ না, পকেটে কিছু আছে?

সনৎ : (পকেট ঘাঁটিয়া) পকেটে আবার কী থাকবে?

স্মরজিৎ : ঐ তো ঐ তো—ওটা কী?

সনৎ : কোন্‌টা? এ তো চিঠি একটা—

স্মরজিৎ : প্রাইভেট নয় তো?

সনৎ : মায়ের চিঠি।

স্মরজিৎ : দে তো! ফুলদানি লিখেছিস তো?

সনৎ : হ্যাঁ। ফুলদানি, টেবিল, চেয়ার—

স্মরজিৎ : না না, কেটে দে কেটে দে! শুধু ফুলদানি থাক। ফুলদানি। 'বাবা সনৎ, অনেকদিন হয়ে গেলো তোমার কোনো সংবাদ পাই না।' লেখ্—অনেকদিন তোমার সংবাদ। 'পত্রপাঠ কুশল সংবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত করবে'—নিশ্চিন্ত। 'বাড়িতে যে সকলে চিন্তা করে সেটা ভাবো না কেন?'—বাড়িতে। কেন। হ্যাঁরে? বাড়িতে চিঠি দিস না কেন রে সময়মতো?

সনৎ : আপনি কবিতাটা লিখুন তো?

স্মরজিৎ : 'তোমার চাকরি পাকা হতে আর কতো দেরি?' লেখ—আর কতো দেরি। 'আমরা সকলেই অপেক্ষা করে আছি।' 'অপেক্ষা—অপেক্ষা করে আছি, কবে তোমার ওখানে গিয়ে আবার একসঙ্গে থাকতে পারবো'—আবার—কী এটা? সু—সু—

সনৎ : সুনু। আমার ছোট বোন।

স্মরজিৎ : হ্যাঁ হ্যাঁ সুনু। 'সুনুর বিয়ে না দিলে গ্রামে আর থাকাও মুস্কিল।' —না দিলে। 'বাঘবন্দী তো বড়ো শহর'—বন্দী—'বড়ো শহর, ওখানে হয় তো এ নিয়ে আর যন্ত্রণাভোগ করতে হবে না'—যন্ত্রণাভোগ। 'ধীরেসুস্থে খোঁজ খবর করে ভালো সম্বন্ধ হয় তো'—এই!

সনৎ : কী?

স্মরজিৎ : আমি—আমি কিন্তু তোর পারিবারিক ব্যাপারে ঢুকে পড়ছি। চিঠিটা পড়বো আর?

সনৎ : পড়ুন। পড়ুন। এদেশে ও রকম পারিবারিক ব্যাপার তো ঘরে ঘরে। (স্মরজিৎ একমুহূর্ত তাকাইলেন। তারপর আবার পড়িতে শুরু করিলেন।)

স্মরজিৎ : লেখ—ধীরে। সম্বন্ধ। 'এখানে আর কোথায় পাচ্ছি'—এখানে আর কোথায়। 'খোকার পরীক্ষার ফল এবার'—পরীক্ষার ফল—'খুবই খারাপ হয়েছে। আমার শাসন মানতে চায় না।' শাসন। 'সেজন্যেও আরো বাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি।' —অস্থির। 'চাকরি পাকা হলে ওখানে কি সুবিধা মতো বাসস্থান পাওয়া যাবে?' বাসস্থান। 'আমরা মোটামুটি ভালোই আছি। আমার বাতের বেদনাটা একটু বেড়েছিলো মাঝে।' অনেক—বেদনা, মাঝে।' 'এখন অনেক

ভালো আছি'— 'সেদিন তোমার করালীমামা এসেছিলেন'—করালী—না, লেখ্ করাল। 'সন্ধ্যা অবধি ছিলেন'—সন্ধ্যা। 'অনেক কথাবার্তা হোলো'—অনেক। না না, 'অনেক' দিয়েছি একবার, কেটে দে ওটা। 'রাত্রে থাকতে পারলেন না,' রাত্রে। 'বাড়িতে অসুখ, চলে যেতে হোলো'—চলে যেতে হোলো। লিখেছিস?

সনৎ : হ্যাঁ।

স্মরজিৎ : 'সুনুর লেখাপড়া করবার খুব ইচ্ছে'—ইচ্ছে।' 'এখানে তো অসম্ভব জানো'—অসম্ভব। জানো। 'ওখানে যেতে পারলে তোমার কাছে বাড়িতেও তবু কিছু হতে পারে'—তবু। 'খোকার যদি অতোটা পড়ার দিকে মন থাকতো'—মন। 'তো বাঁচা যেতো'—বাঁচা। চিঠি শেষ হয়ে এলো যে রে? কতোটা হোলো দেখি? (সনৎ কাগজ তুলিয়া দেখাইল)

হয়ে যেতে পারে। দাঁড়া দেখি--'আর কী লিখি'—আর কী। 'তোমার চিঠির আশায় থাকবো প্রতিদিন'—আশায়। প্রতিদিন। 'শরীরের যত্ন নিও'—যত্ন। 'শেষ করি'—শেষ। 'আশীর্বাদিকা, তোমার মা'—আশীর্বাদি —আশীর্বাদিকা? নাঃ থাক। কী লিখলি পড় দেখি?

সনৎ : (গড় গড় করিয়া পড়িয়া গেল) ফুলদানি, অনেকদিন তোমার সংবাদ, নিশ্চিন্ত, বাড়িতে কেন, আর কতো দেরি, অপেক্ষা, আবার, না দিলে, বন্দী, যন্ত্রণাভোগ, ধীরে, সম্বন্ধ—কিছু হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না?

স্মরজিৎ : তুই কবিতা পড়তে জানিস না তো কোত্থেকে হবে? দে আমাকে। (কাগজটি লইয়া অল্প কাটাকুটি করিয়া পড়িলেন।)

ফুলদানি
অনেকদিন তোমার সংবাদ
নিশ্চিন্ত বাড়িতে।
কেন?
আর কতো দেরি?
অপেক্ষা আবার,
না দিলে—
বন্দীর যন্ত্রণাভোগ!
ধীরে ধীরে সম্বন্ধ এখানে,
আর কোথা?
পরীক্ষার ফল?
শাসনে অস্থির।
ফুলদানি,
বাসস্থান বেদনার মাঝে,
অনেক করাল সন্ধ্যা,
রাত্রি,
চলে যেতে হয়।
ইচ্ছা অসম্ভব জানো,

তবু মন বাঁচে।
আর কী?
আশা প্রতিদিন, ফুলদানি—
যত্ন শেষ।

কী রকম?

সনৎ : হ্যাঁ, স্মরজিৎ সান্যাল দাঁড়িয়ে গেছে।

স্মরজিৎ : তবে? পাংচুয়েশন হচ্ছে আসল কথা! তবে একটা খুঁৎ রয়ে গেলো।

সনৎ : কী?

স্মরজিৎ : তোর মা তো ইংরাজি জানেন না বোধ হয়?

সনৎ : না।

স্মরজিৎ : লেজেন্ডস অফ্ গ্রীস অ্যান্ড রোমও পড়েননি অতএব।

সনৎ : না, তা কী করে পড়বে?

স্মরজিৎ : দু'একটা ডায়না, অ্যাফ্রোদিতে, হারকিউলিস-এর মধ্যে ছিটিয়ে দিতে পারলে আরো জমে যেতো।

সনৎ : তো দিন না ছিটিয়ে?

স্মরজিৎ : নাঃ থাক। তোর মা-কে স্মরণ করে এ গিয়েছি, কেন আর বিদেশী দেবতা অপদেবতা টানা? এই থাক। দে একটা কাগজে দে, টুকে ফেলি। (কাগজ লইয়া স্মরজিৎ টুকিতে বসিল)

সনৎ : কিন্তু—ক'টা বাজে?

স্মরজিৎ : (টুকিতে টুকিতে) অনেক সময় আছে, ঘাবড়াস নি।

সনৎ : না, ঘাবড়াচ্ছি না। কিন্তু—ভেবেছেন কিছু?

স্মরজিৎ : ভেবেছি বৈ কি।

সনৎ : ভেবেছেন!

স্মরজিৎ : না তো কি শুধু খোসগল্পই করেছি বসে বসে?

সনৎ : কী, কী?

স্মরজিৎ : চিদানন্দ ব্রহ্মচারী শরণম্।

সনৎ : চিদানন্দ ব্রহ্মচারী?

স্মরজিৎ : দাঁড়া না, বলছি! ভুল হয়ে যাবে টুকতে—কবিতার ভাবার্থ বদলে যাবে!—ধীরে ধীরে সম্বন্ধ এখানে। আর কোথা।

সনৎ : (হাসিয়া) পরীক্ষার ফল? শাসনে অস্থির।

স্মরজিৎ : সে কী রে? তোর মুখস্থ হয়ে গেলো না কি?

সনৎ : যতো পরীক্ষা তো এই মুখস্থ বিদ্যের উপরেই দিলাম।

স্মরজিৎ : অস্থির—

সনৎ : কিন্তু মনে থাকে না। দু'দিন পরেই বিলকুল ভুলে যাই।

স্মরজিৎ : আমারও খানিকটা ঐ রকম—বাসস্থান—বেদনার মাঝে।

সনৎ : আপনাদের এই চিদানন্দ ব্রহ্মচারী নামটা—সকাল থেকে মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

স্মরজিৎ : যাঃ, ওটা তো খবরের কাগজে, পোস্টারে রোজ দেখছিস! অনেক—
সনৎ : না না, আরো আগে। বহু দিন আগে, কোথায় যেন পড়েছি কিম্বা শুনেছি—
স্মরজিৎ : আনন্দমঠে আছে?—চলে যেতে হয়।
সনৎ : উঁহু। আনন্দমঠে—চিদানন্দ তো নেই?
স্মরজিৎ : ইচ্ছা অসম্ভব জানো।
সনৎ : চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। —আঃ! এতো অস্বস্তি লাগে মনে না পড়লে—
স্মরজিৎ : ও তোর ইলিউশন! মডার্ন পাবলিসিটি—কিছুদিন পরে মনে হয় আগের জন্ম থেকে শুনে আসছি।
সনৎ : তা হবে। কিন্তু—
স্মরজিৎ : আশা প্রতিদিন।
সনৎ : অ্যাঁ? (হাসিয়া) ও হ্যাঁ, আশা প্রতিদিন, যত্ন শেষ।
স্মরজিৎ : ধ্যাৎ! ফুলদানি, যত্ন শেষ। মূল কথাটাই ভুলে গেছিস!
সনৎ : ফুলদানিগুলো কোথায় ঢুকিয়েছেন—মনে নেই।
স্মরজিৎ : স্মরজিৎ—সান্যাল! খতম! ও না, দু'টো সই চাই। অ্যাই! মাথার উপর একটা করে দিলাম। সইটা কেমন মারছি বল দেখি?
সনৎ : দারুণ! ঠিক কবিতাটার মতো—এক বর্ণ বোঝবার উপায় নেই।
স্মরজিৎ : (গর্বে) তবে?
সনৎ : কিন্তু কী ঠিক করলেন বলুন।
স্মরজিৎ : তোর চাকরি যায় যাক।
সনৎ : অ্যাঁ?
স্মরজিৎ : তোকে আমি চাকরি দেবো।
সনৎ : আপনি?
স্মরজিৎ : তুই ফরমাস মতো লিখতে পারিস? না শুধু সূক্ষ্ম সাহিত্য লিখিস?
সনৎ : বাঃ! দু'খানা লিফলেট লিখে দিলাম আজকেই। তিলকে তাল করে ছেড়ে দিলাম—ফার্স্ট ড্রাফট প্রেসে চলে গেলো!
স্মরজিৎ : তবে তো কথাই নেই। আমার চাকরিতে তোকে ঢুকিয়ে দেবো।
সনৎ : আপনার চাকরিতে?
স্মরজিৎ : এই কাজটি কাল চুকলে পরশু আমি অ্যাসোসিয়েট এডিটার। সেদিকে পাকা কাজ করে এসেছি। তুই রিপোর্টার হয়ে ঢুকে পড়।
সনৎ : আমায় নেবে?
স্মরজিৎ : নেবে না মানে? পরশু থেকে আমি যা বলবো—চিদানন্দ তাই বলবে। এরকম রিস্ক ক'জন নেয় রে?
সনৎ : ঠিক জানেন?
স্মরজিৎ : আরে বোকা, ওরা তো ঠকছে না, তুমি তো বাংলা অনার্স। আর এমন কী চাকরি রে? তোর মাস্টারির থেকে গোটা পঞ্চাশ টাকাও বেশি হবে কিনা সন্দেহ।
সনৎ : পঞ্চাশ টাকা!

স্মরজিৎ : আমি যতোটা পারি বাড়াবার চেষ্টা করবো।

সনৎ : কানাইদা!

স্মরজিৎ : ফের? তুই ডোবাবি সব!

সনৎ : স্মরজিৎদা, আপনি—আপনাকে যে কী বলবো—

স্মরজিৎ : দাঁড়া দাঁড়া, পুরো একটা দিন বাকি এখনো। ভালোয় ভালোয় পার হতে দে। (বাহিরে ঘ্যাঁচ করিয়া গাড়ির ব্রেক কষিবার আওয়াজ হল। তারপর হর্নের শব্দ। স্মরজিৎ এক ঝটকায় বাজে কাগজ পকেটে ঢুকাইলেন।) শিগ্‌গির! ফুলদানিটা হাতে নিয়ে ঐখানে বোস্!

সনৎ : ফুলদানি?

মোহন : (নেপথ্যে) মণিবাবু!

স্মরজিৎ : আঃ, যা বলছি শোন! (স্মরজিৎ কবিতা-লেখা কাগজটি টেবিলে রাখিয়া কলম হাতে টেবিলে ঝুঁকিয়া বসিলেন। যেন এইমাত্র লেখা শেষ করিয়া সৃষ্টির ক্লান্তিতে উপুড় হইয়া পড়িয়াছেন। ঢুলু ঢুলু নেত্র সনতের হাতের ফুলদানিতে নিবদ্ধ। চাপা গলায়) আর একটু তুলে ধর। কারো কোনো কথার জবাব দিবি না, বুঝলি?

(নেপথ্যে মোহন ডাকিয়া চলিয়াছে। ভিতরে সাড়া, সুপ্রীতি ও মণিভূষণের চাপা গলা দরজার কাছে। মণিভূষণের কথা শোনা গেল পরিষ্কার।)

সুপ্রীতি : না না—

মণি : না গেলে মোহন থামবে না—পা টিপে টিপে চলে যাবো—

(মণিভূষণ পিছন দিয়া পা টিপিয়া মঞ্চ অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। স্মরজিৎ বা সনৎ কেহ দৃকপাত করিল না। দরজায় সুপ্রীতি ও লিলি—পর্দা তুলিয়া সভয়ে দেখিতেছে। মোহনের ডাক থামিল। স্মরজিৎ সহসা নিদ্রোত্থিতের মতো দরজার দিকে চাহিলেন।)

স্মরজিৎ : কে?

সুপ্রীতি : (পিছু হটিয়া) না না—

স্মরজিৎ : আসুন।

সুপ্রীতি : আসবো?

স্মরজিৎ : (ক্লান্ত স্বরে) হ্যাঁ, হয়ে গেছে। (কাগজটি তুলিলেন। সুপ্রীতি ও লিলি একবার ফুলদানি-হস্ত সনতের দিকে চাহিয়া অল্প অগ্রসর হইলেন। এক প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসে) ফুলদানি!

(সুপ্রীতি, লিলি চমকাইয়া থামিয়া গেলেন। স্মরজিৎ কাগজে বোধহয় কবিতার নামটা লিখিলেন একটানে। কাগজটি বাড়াইয়া দিলেন সুপ্রীতির হাতে। তারপর যেন এই প্রথম সনৎকে দেখিলেন।) কে? ও সনৎ! হয়ে গেছে, রেখে দাও। (সনৎ উঠিয়া ফুলদানি যথাস্থানে রাখিল। মণিভূষণ মোহনকে লইয়া প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া অফিস ঘরের দিকে যাইতেছিলেন। স্মরজিৎ চমকাইয়া ফিরিলেন।)

কে? ও। হয়ে গেছে মণিবাবু।

মণি : (স্বস্তির হাসি হাসিয়া) হয়ে গেছে?

স্মরজিৎ : হ্যাঁ। এক গ্লাস জল—

সুপ্রীতি : লিলি—

(লিলি শুনিয়াই ছুটিয়াছে। মোহন হাঁ করিয়া দেখিতেছিল। মণি তাহাকে ঠেলিয়া অফিস ঘরে লইয়া গেলেন। স্মরজিৎ যেন ধীরে ধীরে পার্থিব ভদ্রতার জগতে ফিরিতেছেন।)

স্মরজিৎ : আমি আপনাদের খুব অসুবিধে ঘটালাম—

সুপ্রীতি : কী বলছেন স্মরজিৎবাবু? এ এক অভিজ্ঞতা! আজ খানিকটা বুঝতে পারলাম—এমন কবিতা কী করে বেরোয়!

স্মরজিৎ : ওটা চলবে তো—আপনার ভাস্বতীতে?

সুপ্রীতি : চলবে? ভাস্বতী ধন্য হয়ে গেলো আপনার কবিতা পেয়ে! তার উপর—অপূর্ব! অপূর্ব। এটা যেন আপনার আগের সব কবিতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

(লিলি জল আনিয়া দিল)

দেখেছিস লিলি? (লিলি কবিতাটি লইয়া গিলিতে লাগিল। স্মরজিৎ জলপান করিলেন।)

স্মরজিৎ : আগে যেটা শুনিয়েছিলাম—তার চেয়ে এটাতে সৃষ্টির বেদনা অনেক বেশি পেলাম। এটা আরো ভালো হবার কথা। কী মনে হয়?

লিলি : আশ্চর্য! এটা আশ্চর্য কবিতা! কী করে লিখলেন এমন?

স্মরজিৎ : আমার গুণ নয়। আপনাদেরই ঐ ফুলদানি। (লিলি সুপ্রীতি ফুলদানিটিকে নূতন চক্ষে দেখিলেন)

সুপ্রীতি : স্মরজিৎবাবু, আপনার এই কবিতাটি সৃষ্টি করার ইতিহাসটা যদি ভাস্বতীতে ছাপি—আপনার অনুমতি পাবো?

স্মরজিৎ : (তন্দ্রাচ্ছন্ন) অ্যাঁ? হ্যাঁ—যদি চান। আমার—আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে।

সুপ্রীতি : (শশব্যস্তে) আসুন আসুন—

(সুপ্রীতির সঙ্গে তন্দ্রালু স্মরজিৎ বাহির হইয়া গেলেন)

লিলি : সনৎবাবু, বলুন বলুন, কী হোলো বলুন সব!

সনৎ : অ্যাঁ? কী—হোলো?

লিলি : হ্যাঁ হ্যাঁ! বলুন—

সনৎ : আপনারা চলে গেলেন—

লিলি : হ্যাঁ, তারপর?

সনৎ : উনি আবার বললেন—ফুলদানি!

লিলি : তারপর?

সনৎ : তারপর? তারপর হঠাৎ এসে আমার হাত থেকে কাগজটা টেনে ফেলে দিলেন?

লিলি : ফেলে দিলেন?

সনৎ : হ্যাঁ, দিয়ে কাগজ কলম নিয়ে ঐখানে গিয়ে বসলেন।

লিলি : তারপর?

সনৎ : দশ মিনিট বসেই রইলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—ফুলদানি? ফুলদানি কোথায় গেলো?

লিলি : বলুন বলুন।

সনৎ : আমি তাড়াতাড়ি ফুলদানিটা নিয়ে ঐখানে বসলাম। উনি ফুলদানির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এক লাইন এক লাইন করে লিখতে লাগলেন।

(মণিভূষণ উঁকি মারিলেন। স্মরজিৎ নাই দেখিয়া নিশ্চিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। পিছনে মোহন।)

মণি : স্মরজিৎবাবু কোথায় গেলেন?

লিলি : শুতে গেছেন।

মণি : শুতে গেছেন? সনৎ, এবার তা হলে—লিলি, তুই যা।

লিলি : কাল আরো ভালো করে শুনবো সনৎবাবু।

মোহন : (দাঁত বাহির করিয়া) নমস্কার।

লিলি : নমস্কার—

(লিলির প্রস্থান)

মণি : শোনো সনৎ। দুর্দান্ত স্কুপ পাওয়া গেছে!

মোহন : বহু কষ্টে জোগাড় করেছি স্যার! দিতে কি চায়?

মণি : হ্যাঁ, ইয়ে মোহন, তুমি অনেক খেটেছো, তোমাকে আর আটকাবো না—

মোহন : হ্যাঁ স্যার, যাই, ইয়ে—একটা কথা স্যার—

মণি : কী?

মোহন : পঞ্চাশ টাকার নিচে কিছুতে রাজি করাতে পারলাম না, অতো তো ছিল না সঙ্গে, মামার কাছ থেকে ধার করে—

মণি : কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।

মোহন : (খুশি হইয়া) ঠিক আছে স্যার। চলি স্যার। (আবার ফিরিয়া) তবু যা জিনিস, খুব সস্তাই হয়েছে বলতে হবে।

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তা হলে—

মোহন : চলি স্যার, নমস্কার।

(মোহনের প্রস্থান)

মণি : বোসো নসৎ, বোসো। (দু'জনে বসিলেন। মণি হাতের মোড়ক হইতে সাবধানে একটি ফোটো বাহির করিয়া সনৎকে দিলেন।) দেখো, এই ফোটোটা দেখো,—কী দেখছো?

সনৎ : একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

মণি : আরো ভালো করে দেখো। কী করছে?

সনৎ : বসে আছে।

মণি : কী রকমভাবে?

সনৎ : অ্যাঁ?

মণি : হাতগুলো দেখো!

সনৎ : হাত ধরে আছে।

মণি : ঠিক! আর কী দেখছো?

সনৎ : আর তো কিছু—

মণি : বাঃ! ছেলেটা কোন্ দিকে চেয়ে আছে?

সনৎ : মেয়েটির দিকে।

মণি : আর মেয়েটা?

সনৎ : ছেলেটির দিকে।

মণি : অ্যাঃ! এবার ছবিটা উল্টে দেখো। কী লেখা আছে? দেখছো তো? এইবার এইগুলো দেখো। (কয়েকটি চিঠি দিলেন। সনৎ একটির দুই লাইন পড়িয়াই মুখ তুলিয়া চাহিল।)

সনৎ : পড়বো?

মণি : পড়বে বৈকি? তুমি না পড়লে কে পড়বে?

সনৎ : কিন্তু এ তো, এ তো—

মণি : প্রেমপত্র! ঠিক ধরেছো। কে লিখেছে জানো?

সনৎ : চিদানন্দ?

মণি : (দুঃখিতভাবে) নাঃ! তা হলে তো মেরেই দিয়েছিলাম। ও বেটাচ্ছেলে চরিত্র একেবারে সিধে রেখেছিলো।

সনৎ : তবে?

মণি : সদানন্দ ব্রহ্মচারী। চিদানন্দর ভাই। ওদের পার্টির বীরভূম কমিটির চেয়ারম্যান। এখানে চিদানন্দর হয়ে ক্যাম্পেন করতে আসবে আসছে সপ্তায়।

সনৎ : কিন্তু, এগুলো আপনি—

মণি : কী করে পেলাম, অ্যাঁ?

সনৎ : না না, আমি— গোপন কথা হলে—

মণি : না না, তোমার কাছে গোপন করতে যাবো কেন? সদানন্দও বিস্টুনগরে পড়তো। ঐ মেয়েটা তখন বোর্ডিং-য়ে। মেয়েটার ঘরে ঐ ফোটো আর চিঠি পাওয়া গেছিলো। মেয়েটার বাড়ির বোধহয় ইনফ্লুয়েন্স ছিল কিছু, সুপারিন্টেন্ডেন্ট এগুলো বাজেয়াপ্ত করে ব্যাপারটা চাপা দিয়েছিলো। সেই সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাতিকে টাকা খাইয়ে বার করিয়ে আনলাম মোহনকে দিয়ে।

সনৎ : কিন্তু, জানলেন কী করে?

মণি : হুঁ হুঁ, ও সব জানতে হয়, খোঁজ রাখতে হয়! ইলেকশন কি এমনি এমনি করছি? ঐ সব খোঁজ পেয়েই তো মোহনকে পাঠালাম। যাক গে, সময় বেশি নেই, তুমি শুরু করে দাও। চোস্ত একটি লিফলেট। বড়ো হলে ক্ষতি নেই—বুকলেট করে দেবো। ছবিটা ছাপা হবে, আর মোক্ষম কয়েকটি অংশ তুমি বেছে দেবে চিঠির—ফ্যাসিমিলি ছাপবো। কতোক্ষণ লাগবে?

সনৎ : কখন দরকার আপনার?

মণি : তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারবে। প্রেসে লোক বসে আছে—সন্ধেবেলা বেরিয়েছিলাম কি এমনি এমনি? ছেপে কাল সকালে বার করে দেবো। এখন তোমার ওপর।

সনৎ : এই—ঘণ্টাখানেক?

মণি : রাইট! লেগে যাও। ডকুমেন্টগুলো সাবধান কিন্তু খুব!

সনৎ : হ্যাঁ নিশ্চয়ই!

মণি : আমি এখন আর ডিস্টার্ব করবো না তোমায়—ঠিক একটার সময় আসবো। (সনৎ চিঠি পড়িতে লাগিল। মণিভূষণ ভিতরের দরজা অবধি গিয়া ফিরিলেন।) পাঁচু জেগে থাকবে বাইরে। চা-টা যা দরকার হয় চেয়ে নেবে, কোনোরকম সঙ্কোচ করবে না।

সনৎ : না স্যার, সঙ্কোচ করবো কেন? তবে—কিছু দরকার হবে না—

মণি : তবু, বলে রাখলাম।

(প্রস্থান। সনৎ চিঠি পড়িল অল্পক্ষণ। ছবিটি তুলিয়া দেখিল। তারপর কী যেন ভাবিতে লাগিল।)

সনৎ : (আপনমনে) সদানন্দ। চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। সঙ্কোচ। সঙ্কোচ —শঙ্খচিল— শঙ্খচিল! দ্যাট্স্ ইট! শঙ্খচিল! উঃ, এতোক্ষণ ধরে—

(স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লিখিতে বসিল। পর্দা পড়িয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(পর্দা উঠিবার পূর্বে এবারে প্রথম শোনা গেল—ভোট ফর চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। পূর্বাপেক্ষা দুর্বল ধ্বনি। তারপর সব ছাপাইয়া তুমুল রোল—ভোট ফর মণি মজুমদার। পর্দা উঠিলে উৎফুল্ল মণিভূষণকে দেখা গেল। মোহনও উপস্থিত, মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।)

মণি : বলো কী মোহন?

মোহন : মাইরি বলছি স্যার! ওদের একটা ছেলেও আর রাস্তায় নেই! আমাদের লিফলেট বেরুবার আধঘণ্টার মধ্যে সব সুড়সুড় করে পালিয়েছে।

মণি : কোন লিফলেটটা?

মোহন : মোক্ষমটা স্যার। নাস্তিকতা আর সাম্রাজ্যবাদে ততো কিছু হয়নি স্যার। কিন্তু সদানন্দের প্রেম বেরুতেই সব তড়পানি ঠাণ্ডা! একেই বলে স্কুপ স্যার—বলিনি আপনাকে?

মণি : বলো বলো, আর কী খবর বলো—

মোহন : ওদের ইলেকশন অফিসে জোর মিটিং চলছে স্যার মাতব্বরদের। দরজা বন্ধ করে।

মণি : হাঃ হাঃ! এ ধাক্কা চিদানন্দ সারাদিন মিটিং করেও সামলাতে পারবে না।

মোহন : চিদানন্দ নেই স্যার মিটিং-এ! সেইটাই তো আসল খবর, বলা হয়নি এখনো আপনাকে—

মণি : কী কী কোথায় চিদানন্দ?

মোহন : পালিয়েছে স্যার—ন্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে!

মণি : পালিয়েছে?

মোহন : কলকাতা স্যার! সকালের গাড়িতেই লম্বা!

মণি : ঠিক জানো?

মোহন : কী বলছেন স্যার? ভালো করে না জেনেই আপনাকে বলতে আসবো?
মণি : পালিয়েছে?
মোহন : পালাবে না? এ কি সোজা ঠ্যালা খেলো?
মণি : সদানন্দকে আর এখানে মিটিং করতে হবে না, কী বলো?
মোহন : ক্ষেপেছেন স্যার! সদানন্দ আর এখানে মুখ দেখাতে পারে? ছবিটা ফাস্টক্লাস ছাপা হয়েছে স্যার—পরিষ্কার একেবারে।
মণি : ইস্, অটলবাবু কাল ঘুরে গেলো। আজ যদি থাকতো এখানে!
মোহন : অটলবাবু তো রয়েছে স্যার? আজ সকালেই তো দেখলাম।
মণি : রয়েছে?
মোহন : আমি নিজের চোখে দেখিছি স্যার! বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সদানন্দের প্রেম পড়ছে।
মণি : (মহানন্দে) পড়েছে তাহলে?
মোহন : কে পড়েনি স্যার শহরে?
মণি : এইবার দেখি কী বলে।
মোহন : খবর দেবো স্যার?
মণি : কিছু করতে হবে না, নিজেই সুড়সুড় করে আসবে। এসে বলবে—মণিবাবু। অমূল্যবাবু কবে মিটিং করতে এলে আপনার সুবিধে হয়?
মোহন : অমূল্য ঘোষ?
মণি : হ্যাঁ হে, অমূল্য ঘোষ। আর ভাবতে হবে না মোহন,—নাস্তিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, সদানন্দ, স্মরজিৎ সান্যাল, অমূল্য ঘোষ—তরতর করে ভেসে চলে যাবো। আর ভোট ফর বলে রাস্তায় অতো না চেঁচালেও চলবে।
মোহন : (সভয়ে) না স্যার, তা ভাববেন না। এ ইলেকশন স্যার—ঢিল দিয়েছেন কি গেছেন! চিদানন্দ সোজা মাল নয় স্যার—গেরুয়া ধরেছে। সদানন্দকে বাদ দিয়ে একা লড়ে যাবে।
মণি : ইস, এটা যদি খোদ চিদানন্দ হোতো—
মোহন : ঐ জন্যেই তো বলছি স্যার—ঢিল দেবেন না। চিদানন্দের গেরুয়ার এখনো আঁচড়টি পড়ে নি। বরং স্যার, এই সুযোগে প্রোপাগাণ্ডার জোর বাড়িয়ে দিন, আর ভাবতে হবে না।
মণি : কথাটা ভুল বলো নি—
মোহন : ভুল বলবো কী স্যার? চোদ্দ বছর বয়স থেকে ইলেকশন করছি—সেই যখন স্যার ক্যাম্বিসের বল পিটতাম হাফ প্যান্ট পরে!
মণি : হ্যাঁ, তুমি ছেলেদের বলো উঠে পড়ে লাগতে!
মোহন : সে কি আর বলতে বাকি আছে স্যার? এতোক্ষণে পঞ্চাশ যাটখানা পোস্টার লেখা হয়ে গেলো সদানন্দের ওপরে। তবে একটা কথা স্যার—
মণি : কী?
মোহন : আজ স্যার ছেলেরা আবদার ধরেছে একটু ভালো করে খাবে। তা স্যার আজ তো একটা আনন্দের দিন—

মণি : নিশ্চয়ই, সে আর বলতে!

মোহন : বেশি কিছু দেবো না স্যার—আমি ওদিকে টাইট আছি। উপরি দু'টো সিঙ্গাড়া দু'টো রসোগোল্লা যদি হয়, তবেই খুশি হয়ে যাবে। কতো আর খরচা পড়বে?

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ, লাগিয়ে দাও।

মোহন : এই দিয়ে দেখুন না স্যার কতো কাটিয়ে নিই ওদের।

(স্মরজিৎ ও সুপ্রীতির প্রবেশ)

মণি : এই যে, আসুন আসুন স্মরজিৎবাবু—

মোহন : নমস্কার স্যার। নমস্কার মাসীমা। সাহিত্যসভারও জোর প্রোপাগাণ্ডা হয়েছে—খুব ভিড় হবে—

মণি : আচ্ছা তাহলে মোহন এখন—

মোহন : হ্যাঁ স্যার। ঐ, ইয়ে স্যার, মামাকে আবার—

মণি : ও হ্যাঁ—

মোহন : থাক স্যার এখন, বিকেলেই হবে, একদিনে কি আর মরে যাচ্ছে মামা? চলি স্যার, নমস্কার—

(মোহনের প্রস্থান)

মণি : চা-টা খেয়েছেন তো স্মরজিৎবাবু?

সুপ্রীতি : সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি এখন বাড়ি থাকছো কি না বলো তো?

মণি : হ্যাঁ, কেন?

সুপ্রীতি : সনৎবাবুও বাড়ি গেলেন, লিলিটাও ফিরলো না এখনো—

মণি : সনৎ আসবে একটু পরেই, কিন্তু লিলি গেলো কোথায়?

সুপ্রীতি : ও বেরিয়েছে সাহিত্যসভার পোস্টার নিয়ে ওর দঙ্গলের কার বাড়ি। আমার তো একবার না বেরোলেই নয়। (স্মরজিৎকে) বিকেলে সাহিত্যসভা—বেশির ভাগ কাজ পড়েছে আমার ঘাড়ে, নইলে—

স্মরজিৎ : আমাকে নিয়ে ভাববেন না, আমি বেশ আছি।

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ আমি রইলাম, তুমি কিচ্ছু ভেবো না!

সুপ্রীতি : আমি আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো। তোমার ইলেকশনের দৌড়ঝাঁপ ততোক্ষণ একটু বন্ধ রেখো—

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বাঃ! ইলেকশন তুচ্ছ কথা। সাহিত্যটাই আসল।

সুপ্রীতি : আমি তবে ঘুরে আসি স্মরজিৎ, কিছু মনে করবেন না—

স্মরজিৎ : না না, মনে করবো কী?

(সুপ্রীতির প্রস্থান)

মণি : আপনার চুরুট চলবে?

স্মরজিৎ : না, মাপ করবেন। আমার সঙ্গে সিগারেট আছে, আপনি ভাববেন না। (মণি চুরুট ধরাইলেন। স্মরজিৎ সিগারেট ধরাইয়া প্যাকেটটি আর দেশলাই টেবিলের উপরে রাখিলেন।)

মণি : বুঝলেন স্মরজিৎবাবু—সাহিত্যের প্রতি ছোটবেলা থেকেই আমার ঝোঁক।

স্মরজিৎ : সে তো আপনার বাড়িতে ঢুকলেই বোঝা যায়।

মণি : হ্যাঁ, বাড়িতে একটা সাহিত্যের অ্যাটমোস্ফীয়র সব সময়ে রাখবার চেষ্টা করি। ঐ যে ভাস্বতী—সুপ্রীতিকে বলে বলে আমি-ই বার করালাম। মেয়েটাকেও যতোটা পারি—তা কতো করে বললাম—বাংলা অনার্স নে, নিলো না।

স্মরজিৎ : কেন?

মণি : বললো—বাংলা নিয়ে কী হবে? ইকনমিক্স নেবো।

স্মরজিৎ : কিন্তু ওর সাহিত্যচেতনা, আমি যেটুকু দেখলাম—

মণি : হ্যাঁ, কিছুটা তো হতেই হবে। আমি আছি, সুপ্রীতি আছে, বাড়িতে একটা সাহিত্যের অ্যাটমোস্ফীয়র—খানিকটা না হয়ে যাবে কোথায়?

স্মরজিৎ : সে তো বটেই।

মণি : এই যে আমি অ্যাসম্ব্লিতে যাচ্ছি, আমার প্রধান উদ্দেশ্য কী, জানেন?

স্মরজিৎ : কী?

মণি : সাহিত্য।

স্মরজিৎ : সাহিত্য?

মণি : নিশ্চয়ই! সাহিত্যের প্রশ্ন অ্যাসেম্ব্লিতে একদম ওঠে না। লক্ষ্য করেন নি আপনি?

স্মরজিৎ : তা ঠিক।

মণি : কিন্তু ওঠা উচিৎ, উচিৎ নয়?

স্মরজিৎ : নিশ্চয়ই।

মণি : এইবার দেখবেন। আমি তুলবো প্রশ্ন।

স্মরজিৎ : কী প্রশ্ন?

মণি : সাহিত্যের প্রশ্ন!

স্মরজিৎ : হ্যাঁ, কিন্তু সাহিত্যের কী প্রশ্ন?

মণি : অ্যাঁ? ইয়ে—সব প্রশ্ন! যতো প্রশ্ন আছে! অ্যাসেম্ব্লি যদি বাংলা দেশের হয়, তবে বাংলা সাহিত্যকে বাদ দিয়ে চালায় কী করে? বলুন আপনি?

স্মরজিৎ : হ্যাঁ ঠিক।

মণি : ভাবছি আজ সাহিত্যসভায় আমরা সভাপতির ভাষণে এই পয়েন্টটার উপর কিছু বলবো। আপনি কী বলেন?

স্মরজিৎ : খুব ভালো হয় তাহলে।

মণি : আপনি একমত?

স্মরজিৎ : এতে আর দ্বিমত থাকতে পারে? বিশেষ করে কোনো সাহিত্যিকের?

মণি : (খুশি হইয়া) তা হলে ধরুন, আপনার ভাষণেও যদি খানিকটা —মানে সভাপতির ভাষণ যদি প্রধান অতিথির ভাষণের সঙ্গে—এক সুরে বাঁধা হয়, তা হলে বেশ—ইয়ে হয় না?

স্মরজিৎ : খুবই ভালো হয়। আপনার ভাষণটা তাহলে কীরকম হবে আমায় বলুন একটু?

মণি : আমার ভাষণটা সনৎ—মানে ইয়ে আমার ভাষণটা এখনো খুব ভালো করে ভেবে দেখা হয় নি। সময় পেলাম না তো একেবারে? তবে এই ঘণ্টাখানেক পরে আপনাকে একটা ডেফিনিট আইডিয়া দিতে পারবো।

স্মরজিৎ : বেশ তো বেশ তো। অমনি আমার লাইনটাও যদি একটু কষ্ট করে ছকে দেন— কিন্তু আপনার কি সময় হবে?

মণি : বিলক্ষণ! সাহিত্যের জন্যে সময় হবে না, আর হবে ঐ—ইলেকশনের জন্যে?

স্মরজিৎ : বেশি খাটতে হবে না। আউটলাইনটা শুধু যদি—

মণি : অবশ্য অবশ্য। আউটলাইন কেন, আপনি যদি রাজি থাকেন, সবটাই না হয়—

স্মরজিৎ : রাজি? আমি তো বেঁচে যাই। বক্তৃতা আমার একেবারে আসে না। (টেলিফোন বাজিল। মণিভূষণ উঠিয়া ধরিলেন।)

মণি: মাপ করবেন—(ফোনে) হ্যালো...ট্রাঙ্ককল? কলকাতা?...না মিসেস মজুমদার বাড়ি নেই। আমি মিস্টার মজুমদার...আচ্ছা...হ্যালো...হ্যাঁ, মণি মজুমদার... নমস্কার...মিসেস কী? ...গুপ্ত? মিসেস গুপ্ত? (স্মরজিৎ চমকাইয়া উঠিলেন) ...হ্যাঁ বলুন, বলে দেবো আমি...হ্যাঁ হ্যাঁ জানি...কী বলেছেন স্মরজিৎবাবু? (স্মরজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আসতে পারবেন না বলেছেন? (মণি হাসিয়া উঠিলেন)

আপনার বোধহয় ভুল হয়েছে মিসেস গুপ্ত, স্মরজিৎবাবু—

স্মরজিৎ : না না বলবেন না!

মণি : অ্যাঁ?

স্মরজিৎ : বলবেন না আমি এসেছি!

মণি : কেন?—একে সেকেন্ড (ফোনের মুখ চাপা দিয়া) কেন, কী হোলো?

স্মরজিৎ : বুঝতে পারছেন না? বললে ইয়ে হয়ে যাবে যে? (স্মরজিৎ দ্রুত ভাবিবার চেষ্টা করিতেছেন)

মণি : কী হয়ে যাবে?

স্মরজিৎ : ইয়ে —মানে—ছেঁকে ধরবে সবাই! ঐ যতো সব সাহিত্যসভা-ওয়ালারা! ঐ জন্যেই তো ওকে বলেছিলাম যেতে পারবো না।

মণি : আই সী!

স্মরজিৎ : জানতে পারলে অতিষ্ঠ করে তুলবে।

মণি : তবে কী বলবো?

স্মরজিৎ : বলুন—তাই না কি? বড়ো দুঃখের কথা।

মণি : হ্যালো তাই না কি বড়ো দুঃখের কথা...(আরও জোরে) বললাম তাই নাকি বড়ো দুঃখের কথা...হ্যাঁ হ্যাঁ দুঃখের কথা। ...হ্যাঁ, তা সাহিত্যসভার ব্যবস্থা খানিকটা তো করা হয়েইছিলো...হ্যাঁ, ওঁর নামও প্রচার হয়েছে খানিকটা...না না, আপনি আর কী করবেন?...অ্যাঁ?...আর একবার বলে দেখবেন?

স্মরজিৎ : (তাড়াতাড়ি) বলুন—দরকার নেই—

মণি : (ফোনে) দরকার নেই—

স্মরজিৎ : আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি—

মণি : আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি—

স্মরজিৎ : আর সময় নেই—

মণি : (ফোনে) আর সময় নেই—

স্মরজিৎ : এখন অনিশ্চিতের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না—

মণি : (ফোনে) এখন অনিশ্চিতের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না...(ফোন চাপিয়া) বলছে—আমি অত্যন্ত

স্মরজিৎ : বলুন—না না, তাতে কী হয়েছে?

মণি : (ফোনে) না না, তাতে কী হয়েছে? ...অ্যাঁ? (ফোন চাপিয়া) বলছে—

স্মরজিৎ : বলুন—নমস্কার, বলেই ছেড়ে দিন!

মণি : (ফোনে) নমস্কার। (চট করিয়া রিসিভার রাখিয়া দিলেন। স্মরজিৎ প্রায় হাঁপাইতেছেন। মণি প্রাণখোলা হাসিলেন।) স্মরজিৎ সান্যাল আসতে পারবেন না, অ্যাঁ? মজার ব্যাপার। কী বলেন?

স্মরজিৎ : (কাষ্ঠ হাসিয়া) হ্যাঁ, ভারি মজার ব্যাপার।

মণি : কাল যখন কাগজে পড়বে—ভাববে আমরা আর কাউকে স্মরজিৎ সান্যাল সাজিয়ে সভায় তুলেছি—

(নিজের রসিকতায় প্রচুর হাসিলেন। স্মরজিৎ যতোটা পারেন হাসিলেন। লিলির প্রবেশ। আসিয়াই ধপ করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।)

লিলি : ওঃ!

মণি : যেন ছুটতে ছুটতে এলি মনে হচ্ছে?

লিলি : (হাসিয়া) প্রায় তাই। একগাদা কাজ ছিল। তাড়াহুড়ো করে সেরে আসতে গিয়ে খুব দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে।

মণি : তোর আবার একগাদা কাজ কী?

লিলি : বাঃ! এখান থেকে পোস্টারগুলো নিয়ে গেলাম বীথির বাড়ি। সেখান থেকে বীথিকে নিয়ে সুরমার বাড়ি, তারপর বীথি আর সুরমাকে নিয়ে মন্দার বাড়ি। তারপর বীথি, সুরমা আর মন্দাকে নিয়ে—

মণি : হয়েছে হয়েছে থাম্!

স্মরজিৎ : তা এতো তাড়াহুড়ো করবার কী দরকার ছিল?

লিলি : বাঃ আপনি যে আজ সকালে বললেন—বুঝিয়ে দেবেন?

মণি : কী বুঝিয়ে দেবেন?

লিলি : মীনা কেন পাগল হোলো?

মণি : পাগল হোলো?

লিলি : পাগল হয়ে গেলো না মীনা?

মণি : কে মীনা?

লিলি : বাঃ! পড়ো নি—সীতা এ অ্যান্ড্রোমিডা?

মণি : ও হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যান্ড্রোমিডা! ঠিক ঠিক, ভুলেই গিয়েছিলাম! হ্যাঁ হ্যাঁ, সীতা তো পাগলই হয়ে গেলো—

লিলি : সীতা কোথায়? মীনা তো।

মণি : ও একই ক—না না হ্যাঁ হ্যাঁ মীনা মীনা! সীতা কেন পাগল হবে? সীতা তো ঐ—সীতার তো ইয়ে হোলো। পাগল হোলো তো মীনা। মনে পড়েছে।

লিলি : তা হলে বলুন?

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না! আমারও ঐ প্রশ্নটা খুব মনে হয়েছে।

স্মরজিৎ : পাগল না হলে আর কী হতে পারতো বলুন?

মণি : (লিলিকে) হ্যাঁ ঠিক কথা। পাগল না হলে আর কী হতে পারতো? বল্?

লিলি : ধরুন—পাগল যদি না-ই হোতো—

মণি : (স্মরজিৎকে) হ্যাঁ, ধরুন, পাগল না হলে—পাগল না-হতে পারতো!

স্মরজিৎ : হ্যাঁ, পাগল না হতে পারতো। কিন্তু তা হলে—মূল প্রশ্নটা তো রয়েই যায়।

মণি : (লিলিকে) তবে? মূল প্রশ্নটার কী করবি? সেটা ভেবে দেখেছিস?

(লিলি মূল প্রশ্নের কোন ব্যবস্থা করিবার আগেই পাঁচু প্রবেশ করিল)

পাঁচু : কালকের সেই বুড়োপানা ভদ্দরলোক এসেছেন।

মণি : (লাফাইয়া উঠিয়া) এসেছেন? আসতেই হবে।

লিলি : সেই বুড়ো? স্মরজিৎবাবু, চলুন আমরা উপরে যাই। নইলে আবার অবাধ মেলামেশা নিয়ে বক্তৃতা দেবে।

স্মরজিৎ : কী ব্যাপার, আমি—

মণি : হ্যাঁ উপরেই বসুন, ইলেকশনের সব আজেবাজে কথা—

স্মরজিৎ : ও আচ্ছা আচ্ছা—(উঠিলেন)

মণি : (পাঁচুকে) নিয়ে আয়।

পাঁচু : আজ্ঞে—আমি আনবো?

মণি : হ্যাঁ হ্যাঁ তুই আনবি। আজ আমি নড়ছি না।

(ততক্ষণে লিলি ও স্মরজিৎ ভিতরে গিয়াছেন। পাঁচু বাহিরে গেল।)

(আপন মনে) আসতে তো হোলো ছুটে? লস্ট্ কজ্? এখন? হেঁ হেঁ—

(পাঁচু অটলবাবুকে দিয়া গেল। অটলবাবু যথারীতি গম্ভীর।)

আসুন অটলবাবু আসুন। বসুন। আমি ভেবেছিলাম আপনি চলে গিয়েছেন কাল।

অটল : ভাবলাম—আর একটা দিন থেকে দেখি আপনি কতোটা এগোন। যদি একটু ভালো দেখি, অমূল্যবাবুকে না হয় বলে কয়ে দেখা যাবে।

মণি : তা বেশ বেশ—কী দেখলেন টেখলেন বলুন—

অটল : এই লিফলেটটা দেখলাম—(পকেট হইতে সদানন্দ সংক্রান্ত বুকলেটটি বাহির করিয়া টেবিলে রাখিলেন)

মণি: (তৃপ্ত হাসিয়া) শুধু এটা? কেন আর দু'টো দেখেন নি?

অটল : অন্য দু'টোই আগে দেখেছি। দেখে খানিকটা ভরসা হোলো। তারপর এইটা দেখলাম।

মণি: এটা দেখে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, কী বলেন? হ্যা হ্যা হ্যা—

অটল : হ্যাঁ, একরকম নিশ্চিতই হলাম বলা চলে।

মণি : হ্যা হ্যা হ্যা—অমূল্যবাবুর কিন্তু রবিবারে আসা চাই। রবিবারে মিটিং না করলে এখানে বিশেষ কাজ হয় না—

অটল : অমূল্যবাবু। হ্যাঁ অমূল্যবাবু আসতেও পারেন। বহু দূর অবধি নাড়া দিয়েছেন আপনি।

মণি : হ্যা হ্যা—তবে? নমিনেশন কি এমনি এমনি চেয়েছিলাম? সদানন্দের হাঁড়ির খবর জোগাড় করে তবে চেয়েছি!

অটল : সদানন্দ।—ও ছবিটা কার, আপনার কোনো ধারণা আছে?

মণি : (হকচকাইয়া) কেন? সদানন্দ! সদানন্দ নয় বলতে চান?

অটল : আমি মেয়েটির কথা বলছি।

মণি : (আশ্বস্ত হইয়া) মেয়েটা? মেয়েটা কোথাকার এক চ্যাংড়া মেয়ে—বিষ্টুনগর ইস্কুলে পড়তো—

অটল : নাম জানেন?

মণি : নামটা—কী যেন? এই তো—লিফলেটেই রয়েছে—বেণু বেণু!

অটল : (কাটিয়া কাটিয়া) হ্যাঁ ঠিক। বেণু। ভালো নাম স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা ভদ্র। গামুনিয়া কন্‌স্টিটুয়েন্সির ক্যান্ডিডেট। আমাদের নমিনেশনে। (প্রতিটি উক্তিতে মণি ধ্বসিয়া পড়িতেছেন। এক মুহূর্ত নীরবতা।)

মণি : (দুর্বল স্বরে) স্বর্ণলতা—ভদ্র!

অটল : একটা নয়—দু'টো সীট আপনি ডোবালেন।

মণি : দু'টো সীট?

অটল : বাঘবন্দীর থেকে গামুনিয়া অনেক নিশ্চিত সীট। —ছিল। আজ সকালের আগে।

মণি : কিন্তু আমি—আমি কী করে জানবো—

অটল : স্বর্ণলতা ভদ্র গামুনিয়া থেকে দাঁড়িয়েছে—আপনি জানতেন না?

মণি : না না, তা জানি, কিন্তু—এই যে স্বর্ণলতা ভদ্র, সে কথা—

অটল : প্রত্যেকটি ক্যান্ডিডেটের ছবি খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

মণি : অ্যাঁ? হ্যাঁ, তাই তো—

অটল : আপনি বোধহয় নিজের ছবিটি দেখতে এতো ব্যস্ত ছিলেন, আর কারুরটা দেখবার সময় পান নি! (কথাটা মিথ্যা নয়)

মণি : না, আমি—আমি—

অটল : চিদানন্দ নিজে কলকাতায় গেছে আজ সকালে—গামুনিয়া কনস্টিচুয়েন্সি ডোবাতে।

মণি : সেইজন্যে গেছে?

অটল : তবে? আপনি ভেবেছিলেন—আপনার ভয়ে পালিয়েছে?

মণি : না, আমি—কিন্তু চিদানন্দও তো—মানে সদানন্দর এখানে আসা তো আর—

অটল : (পরম অবজ্ঞায়) আপনাকে হারাতে চিদানন্দ একাই পারবে। সদানন্দকে দরকার হবে না তার। (মণিভূষণ নিরুত্তরে চাহিয়া রহিলেন) কী করবেন? বসেই থাকবেন?

মণি : অ্যাঁ? কী করবো?

অটল : একটা স্টেটমেন্ট লিখে দিন।

মণি : স্টেটমেন্ট?

অটল : তাতে লিখবেন—এ লিফলেট আপনি বার করেন নি। আপনার পক্ষের কেউ বার করে নি।

মণি : সে কী?

অটল : আমাদের পার্টিকে অপদস্থ করবার নীচ উদ্দেশ্য নিয়ে অপরপক্ষ এই ধরনের জালিয়াতি ও মিথ্যা প্রচার করেছে।

মণি : কিন্তু—

অটল : আপনি শুনবেন একটু দয়া করে?

মণি : (চুপসাইয়া) বলুন।

অটল : বাঘবন্দীতে এ রকম কুৎসিৎ একটা ঘটনা ঘটে যাবার জন্য আপনি লজ্জিত। এর পরে আপনি প্রখর দৃষ্টি রাখবেন যাতে এমন নোংরা ব্যাপার আর ভবিষ্যতে এখানে না ঘটে। এইটা ভালো করে সাজিয়ে লিখে এখুনি আমার হাতে দিন।
(মণিভূষণ কী বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। নিঃশব্দে উঠিয়া অফিসঘরে গেলেন। অটলবাবু এতক্ষণের সংযত বিক্ষোভ একটি হিংস্র চাপা ধ্বনিতে প্রকাশ করিলেন।)
ইডিয়ট একটা! (উঠিয়া একবার ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মতো পদচারণা করিলেন। অফিস-দরজা ও বাহিরের দরজার মধ্যবর্তী দেওয়ালে মণিভূষণের একটি সহাস্য ছবির দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন।) ইডিয়ট!
(স্মরজিৎ প্রবেশ করিলেন। সোজা আসিয়া টেবিলে পড়িয়া থাকা সিগারেট ও দেশলাই লইলেন। ফিরিতে গিয়া অটলবাবুর দিকে চোখ পড়ায় পাথর হইয়া গেলেন এক লহমার জন্য, তারপর তাড়াতাড়ি ফিরিতে গেলেন, কিন্তু দেরি হইয়া গিয়াছে, অটলবাবু ফিরিয়া তাকাইয়াছেন। দৃষ্টিবিনিময় হওয়া মাত্র স্মরজিৎ অন্দরের দিকে দ্রুত হাঁটা দিলেন।) আরে, কানাই দত্ত যে! আপনি এখানে কী মনে করে?

স্মরজিৎ : আমি? আমি—ডিউটিতে এসেছি!

অটল : ডিউটি? চিদানন্দর কাগজের?

স্মরজিৎ : না, হ্যাঁ—বাঘবন্দী কাভার করতে দিয়েছে আমাকে—ইয়ে, আপনার শরীর ভালো আছে?

অটল : বাঘবন্দী কাভার করছেন তো এখানে কী?

স্মরজিৎ : এখানে—মণিবাবু প্রেস কন্‌ফারেন্স ডেকেছেন, তাই—

অটল : প্রেস কন্‌ফারেন্স? মণি মজুমদার ডেকেছে?

স্মরজিৎ : হ্যাঁ, আমি একটু আগে এসে পড়েছি— (স্মরজিৎ পায়ে পায়ে ভিতরের দরজার দিকে সরিতেছেন)

অটল : তা মণিবাবু তো এ ঘরে, আপনি অন্দরমহলের দিকে এগোচ্ছেন কেন?

স্মরজিৎ : অ্যাঁ? ওটা অন্দরমহল বুঝি? বুঝতে পারিনি—আমি ভেবেছিলাম—

অটল : আপনি এলেনও তো ঐ দিক থেকে মনে হচ্ছে। এ পাশে তো আমি দাঁড়িয়েছিলাম—

স্মরজিৎ : ঐ দিক থেকে? তা হবে, নতুন তো, ভুল পথে ঢুকে পড়েছি—(খেয়াল করিয়া) না না, তা নয়, ভিতরে—ঐ—মিসেস মজুমদারের সঙ্গে একটু সাহিত্যসভার খবর টবর—

অটল : কী মতলবটা বলুন তো?

স্মরজিৎ : না না, মতলব কেন—মতলব কী থাকবে?

অটল : ব্যাপারটা বুঝতে হচ্ছে—(অফিসের দরজায় গিয়া) মণিবাবু, একবার আসুন তো এ ঘরে—

(অটল ফিরিবামাত্র স্মরজিৎ ভিতরের দরজা দিয়া হাওয়া হইয়া গেলেন। মণিভূষণের প্রবেশ।)

কানাই দত্ত এখানে—এ কী? কোথায় গেলো?

মণি : কে?

অটল : কানাই দত্ত! এইখানে তো ছিল এইমাত্র।

মণি : কে কানাই দত্ত?

অটল : চিদানন্দর কাগজের রিপোর্টার।—আপনি না কি প্রেস কন্‌ফারেন্স ডেকেছেন?

মণি : আমি? আমি প্রেস কন্‌ফারেন্স ডাকবো কী?

অটল : সে তো আমিও ভেবেছিলাম। তবে আপনার মাথায় কখন কী খেলে, বলা যায় না তো? (মণি হজম করিলেন কথাটা) কিন্তু—নিশ্চয়ই ভিতরে গিয়েছে!

মণি : কে ভিতরে গিয়েছে?

অটল : আঃ কতোবার বলতে হবে? কানাই দত্ত। শুধু তাই নয়, ভিতর থেকেই এলো সে।

মণি : কী বলছেন কী? কে ভিতর থেকে—মানে কানাই দত্ত ভিতর থেকে আসবে কী করে?

অটল: সেইটা তো আমিও ভাবছি।

মণি : আপনি ভুল দেখেন নি তো? (অটল মণিভূষণের দিকে চাহিলেন) না, বলছিলাম—আর কেউ নয় তো? আমার মেয়ে কিম্বা—

অটল : আপনার মেয়ে কি পুরুষের পোশাক পরে থাকে?

মণি : না না, তা কেন থাকবে?

অটল : আপনার মেয়ে কি বলবে—প্রেস কন্‌ফারেন্স করতে এসেছি?

মণি : না না, তা কেন বলবে?

অটল : তবে কী বলতে চান আপনি?

মণি : আমি কী বলতে চাইবো? আপনিই তো বলছিলেন—

অটল : হ্যাঁ বলছিলাম। এখনো বলছি।

মণি : কী?

অটল : বলছি—কানাই দত্ত ঐ দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকেছে, আবার ঐ দরজা দিয়ে পালিয়েছে—

মণি : কী করে হবে? ও দরজা দিয়ে শুধু বাড়ির ভিতরে যাওয়া যায়।

অটল : তবে বাড়ির ভিতরেই গেছে।

মণি : অ্যাঁ?—কিন্তু, বাড়ির ভিতর থেকে আসবে কী করে?

অটল : হয়তো আগে ঢুকেছিলো। কিম্বা—এ বাড়ির জানলায় তো গরাদ নেই।

মণি : না, তা নেই। (সহসা ভয় পাইয়া) এই পাঁচু! পাঁচু! গঙ্গারাম! ঠাকুর! লিলি—লিলি কোথায়?

(পাঁচুর প্রবেশ)

এই শিগ্‌গির ভিতরে যা, সব্বাইকে ডেকে নে! গঙ্গারাম কোথা! গঙ্গারাম?

পাঁচু : ড্রাইভারবাবু তো মাকে নিয়ে গেলো গাড়িতে—

মণি : তা তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন হাঁ করে? দৌড়ে যা ভিতরে। সারা বাড়ি খুঁজে দেখ! আবার দাঁড়িয়ে থাকে!

পাঁচু : আজ্ঞে—কী খুঁজে দেখবো?

মণি : কানাই দত্ত খুঁজবি! কতোবার বলতে হয় এককথা, বুদ্ধু কোথাকার—

(পাঁচু ভিতরে ছুটিল)

লিলি! লিলি!—আমি দেখি গে—(ভিতরের দিকে গেলেন)

অটল : অতো ব্যস্ত হবার কিছু নেই—

মণি : ব্যস্ত হবার কিছু নেই? কানাই দত্ত বাড়ির ভেতর ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে—

অটল : কানাই দত্ত চোর-ডাকাত নয়। ও এসেছে নিশ্চয়ই কিছু খবর বার করতে!

মণি : খবর? কী খবর?

অটল : ইলেকশনের কোনো খবর।

মণি : ইলেকশনের খবর বাড়ির ভেতর কী পাবে?

(লিলির দ্রুত প্রবেশ)

লিলি : কী—কী হয়েছে বাবা?

মণি : তুই কানাই দত্তকে ভিতরে ঢুকতে দেখেছিস?

লিলি : কে কানাই দত্ত?

মণি : আরে, কাউকে ঢুকতে দেখেছিস?

লিলি : কই, না তো?

মণি : ঢুকেছে!

লিলি : কে ঢুকেছে?

মণি : আরে কানাই দত্ত! কতোবার বলবো?

লিলি : বললে কোথায়? পাঁচু, ঠাকুর, সৈরভী সব কানাই দত্ত কানাই দত্ত করে বাড়ি মাথায় করছে, তুমিও—

অটল : কানাই দত্ত চিদানন্দর লোক।

লিলি : চিদানন্দর লোক এ বাড়িতে আসবে কী করতে?

মণি! খবর বার করতে, আবার কী করতে?

লিলি : খবর? কী খবর?

মণি : আরে ইলেকশনের খবর! তাও কি বলে দিতে হবে?

লিলি : ইলেকশনের খবর বাড়ির ভিতর কী পাবে?

(এইরকম নির্বুদ্ধি প্রশ্ন করিলে মণিভূষণ কী করিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখেন?)

মণি : বাড়ির ভিতর কী পাবে, সে আমি জানবো কোত্থেকে? সে যদি ঢোকে বাড়ির মধ্যে আমি কী করতে পারি?

লিলি : তুমি ভুল দেখেছো।

মণি : আমি দেখতে যাবো কেন? অটলবাবু দেখেছেন!

অটল : আমি ভুল দেখেছি বলতে চান?

মণি : আমি কোথায় বললাম? লিলি তো বলছে—
লিলি : বাঃ, আমি সে কথা কখন বললাম? আমি তো বললাম—'তুমি' ভুল দেখেছো!
মণি : আঃ! বলছি যতো আমি দেখিনি—

(পাঁচুর প্রবেশ)

কী রে?
পাঁচু : আজ্ঞে পেলাম না তো কাউকে?
মণি : পেলি না?
অটল : তবে নিশ্চয়ই পালিয়েছে কোনো জানলা দিয়ে।
মণি : সর্বনাশ!

(সনতের প্রবেশ। হাতে একটা খবরের কাগজের মোড়ক। ঢুকিয়া ভাব দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল।)

সনৎ : সরি, বাইরে কেউ নেই দেখে ভিতরে চলে এসেছি—
মণি : আসবে বৈ কি, তুমি তো ঘরের লোক—
সনৎ : এই একটা জিনিস পেলাম স্যার ঘরে, আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে—
মণি : আর কাজ! সর্বনাশ হয়ে গেছে!
সনৎ : কেন স্যার, কী হোলো?
মণি : কানাই দত্ত এসে ইলেকশনের সব খবর বার করে নিয়ে গেলো! (সনৎ প্রচণ্ড চমকাইল, কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার অবস্থা নয় কাহারও।)
সনৎ : কানাই দত্ত!
মণি : হ্যাঁ জানলা দিয়ে পালিয়ে গেলো, ধরতে পারলাম না। এই পাঁচুটা! কোনো কাজের না!
পাঁচু : আজ্ঞে আমি—
মণি : যা বেরো এখান থেকে! মাসে মাসে মাইনে খাচ্ছে, বাড়িতে কানাই দত্ত ঢুকলে দেখতে পায় না।

(পাঁচু বাহিরে পালাইয়া বাঁচিল। কিন্তু সনতের সব গুলাইয়া যাইতেছে। কানাই দত্ত যদি জানলা দিয়ে পলায়ন করে, তবে স্মরজিৎ সান্যাল কী করিতেছে? সে-ই বা ঘরের লোক হয় কী করিয়া?)

লিলি : ইলেকশনের কী খবর বার করে নিয়ে গেলো?
মণি : অ্যাঁ? তা কী করে বলবো?
লিলি : আমার কিন্তু মনে হয়, কেউ আসে নি।
অটল : আমি নিজের চোখে দেখেছি।
লিলি : (বিনীত হাস্যে) ভুল তো হয় মানুষের।
অটল : (চটিয়া) ভুল! আমি এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম—ঐদিকে তাকিয়ে। যেই ফিরেছি, দেখি কানাই দত্ত ঐখানে ঐ টেবিল থেকে কী একটা তুলে নিচ্ছে।
মণি : তুলে নিচ্ছে? সর্বনাশ!
লিলি : কী নিচ্ছিলে বলুন তো? সিগারেট?
অটল : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক! সিগারেট!

লিলি : গায়ে চাদর? চোখে চশমা?

অটল : ঠিক! ঠিক! (লিলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

লিলি : বললাম—ভুল হয়েছে!

অটল : ভুল হয়েছে?

লিলি : (হাসিতে হাসিতে) বাবা, স্মরজিৎবাবুকে দেখে উনি কানাই দত্ত ভেবেছেন!

মণি : অ্যাঁ?

লিলি : স্মরজিৎবাবু মীনার পাগল হবার কথা বলতে বলতে হঠাৎ বললেন—সিগারেটটা নিচে ফেলে এলাম। আমি আসছিলাম, তা উনি বললেন—না আপনি কেন যাবেন, ও ঘরে তো সেই বুড়ো আছে—

অটল : কী?

লিলি : (তাড়াতাড়ি) না না, বললেন—সেই ভদ্রলোক আছেন, আমিই যাই। বলে নিচে এলেন।

মণি : (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া) তাই বল্! উঃ এতোক্ষণ এই নিয়ে কী দৌড়ঝাঁপ—

লিলি : বললাম তোমাকে ভুল হয়েছে—

অটল : (চিৎকার করিয়া) কক্ষনো ভুল হয় নি! কমপক্ষে দশটা প্রেস কনফারেন্সে আমি কানাই দত্তকে দেখেছি! ও-ই কানাই দত্ত। (পথ খোলা পাইলে সনৎ হয়তো পলায়ন করিত, কিন্তু ওদিকে অটল।)

মণি : কী বলছেন অটলবাবু? স্মরজিৎ সান্যাল কানাই দত্ত হবে কী করে?

অটল: কানাই দত্ত স্মরজিৎ সান্যাল সেজে বাড়িতে ঢুকেছে।

মণি : তাই কী কখনো হতে পারে—

লিলি : কী অসম্ভব কথা আপনি—

অটল : আমি বলছি—ও-ই কানাই দত্ত!

মণি : অটলবাবু, শুনুন—

অটল : স্মরজিৎ সান্যালকে আপনারা দেখেছেন আগে?

মণি : না, কিন্তু—

অটল : ছবি দেখেছেন?

মণি : না, কিন্তু—

অটল : তবে?

লিলি : স্মরজিৎ সান্যালকে দেখলেই চেনা যায়।

অটল : হুঃ!

লিলি : (চটিয়া) স্মরজিৎবাবু এইখানে বসে কবিতা লিখেছেন, জানেন? সে কবিতা কানাই দত্ত লিখবে কোত্থেকে?

অটল : কবিতা। হুঃ।

লিলি : আপনি গায়ের জোরে বললে তো হবে না—

মণি : লিলি!

অটল : গায়ের জোরে? পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—কেউ স্মরজিৎ সান্যালকে দেখে নি, তার ছবি দেখে নি—

লিলি : কে বললো দেখে নি? সনৎবাবু দেখেছেন!

মণি : হ্যাঁ, তাই তো!

লিলি : সনৎবাবুর সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়। সনৎবাবু স্মরজিৎ-দা বলে ডাকেন।

মণি : হ্যাঁ, তাই তো!

অটল : (সনৎকে) আপনি চেনেন স্মরজিৎ সান্যালকে?

লিলি : নিশ্চয়ই চেনেন! কাল কতো কথা হোলো ওঁদের—পারিবারিক কথা। আমরা এ ঘর থেকে চলে গেলাম যাতে মন খুলে কথা বলতে পারেন। তারপর সনৎবাবু ফুলদানি ধরলেন—

অটল : অতো কথায় কাজ কী? স্মরজিৎ সান্যালকে ডেকে আনো এখানে।

লিলি : (দুর্বিনীতভাবে) কেন?

মণি : আঃ লিলি, কী হচ্ছে?

লিলি : উনি স্মরজিৎবাবুর নামে যা তা বলবেন কেন? (অটলবাবু কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া কণ্ঠস্বর নরম করিলেন)

অটল : তুমি ভুল বুঝেছো, আমি স্মরজিৎবাবুর সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কিছু বলিনি। বরং আমি তাঁর কবিতার খুব ভক্ত। উনি যদি দয়া করে একবার অসেন, আলাপ করার সুযোগটা পাই। (লিলি একমুহূর্ত গোঁজ হইয়া রহিল)

লিলি : স্মরজিৎবাবু স্নান করতে গেছেন।

অটল : স্নান করতে গেছেন?

লিলি : সিগারেট নিয়ে ফিরে বললেন—মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, স্নান করা দরকার। আমি দোতলার বাথরুমে তোয়ালে টোয়ালে দিয়ে—

অটল : (উত্তেজনা চাপিয়া) এতোক্ষণে হয়ে গেছে বোধহয়, দেখো না?

(লিলি ভিতরে গেলো)

স্নানের ঘরের জানলা কোন্ দিকে?

মণি : বাগানের দিকে, কিন্তু—

অটল : শিগ্গির দেখতে বলুন বাগানে গিয়ে—

মণি : কিন্তু অটলবাবু—(অটলবাবু নিজেই দরজার নিকট গিয়া হাঁকিলেন)

অটল : পাঁচু!

মণি : অটলবাবু, আপনি—

(পাঁচুর প্রবেশ)

অটল : শিগগির বাগানে গিয়ে দোতলার বাথরুমের জানলাটা দেখে এসো।

পাঁচু : বাথরুম?

অটল : হ্যাঁ হ্যাঁ, বাথরুমের জানলা!

পাঁচু : শুধু দেখে আসবো?

অটল : হ্যাঁ হ্যাঁ দৌড়ে যাও।

(পাঁচু ছুটিল)

মণি : আপনি কিছু মনে করবেন না অটলবাবু, কিন্তু এ আপনার—

অটল . আপানে থামুন! আপনার বুদ্ধির পরিচয়—এই এইখানে দেখা গেছে!

(টেবিলের উপর হইতে সদানন্দের ফ্রেম তুলিয়া আছাড় মারলেন। মণিভূষণ থামিয়া গেলেন। অটলবাবু পায়চারি করিতে লাগিলেন।)

সনৎ : আমি—আমি যাই স্যার—

মণি : অ্যাঁ? না না, কোথায় যাবে? অনেক কাজ আছে, বোসো।

(লিলির প্রবেশ)

লিলি : না, বেরোননি এখনো।

অটল : আর বেরোবেনও না।

লিলি : তার মানে?

(পাঁচুর প্রবেশ)

পাঁচু : আজ্ঞে দেখে এলাম।

অটল: কী দেখলে?

পাঁচু : জানলাটা খোলা।

অটল : খোলা তো?

পাঁচু : আজ্ঞে হ্যাঁ। আর কবিবাবুর চাদরটা ঝুলছে।

মণি : কার কী ঝুলছে?

পাঁচু : আজ্ঞে কবিবাবুর চাদরটা। যে চাদরটা ওনার গায়ে থাকে।

মণি : ঝুলছে মানে?

পাঁচু : একদিক জানলায় বাঁধা, অন্য দিকটা বাইরে ঝুলছে।

লিলি : কী বলছিস যা তা?

পাঁচু : হ্যাঁ দিদিমণি, আপনি দেখুন এসে—

(লিলি বাহিরে ছুটিল, পিছনে পাঁচু)

অটল : কী মণিবাবু?

মণি : ইম্‌পসিবল্‌!

অটল : এখনো ইম্‌পসিবল?

মণি : কিন্তু সনৎ? তুমি—তুমি তো চিনতে?

সনৎ : আমি—আমি—অনেকদিন আগে দেখেছি, চিনতে ভুল করেছি—

অটল : বটে!

মণি: তা হতে পারে। আমরা সবাই ভুল করলাম। আমি পর্যন্ত ভুল করলাম—ওর তো ভুল হতেই পারে—

অটল : বটে! আপনি কাকে চিনতেন? স্মরজিৎ সান্যালকে, না কানাই দত্তকে?

সনৎ : আমি—আমি—

অটল : আপনিও বুঝি চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর লোক?

সনৎ : না না, বিশ্বাস করুন—

(লিলির প্রবেশ)

লিলি : আমি কিছু বুঝতে পারছি না—

অটল : এখনো বুঝতে পারছো না?

লিলি : হয়তো কোথাও গেছেন—

অটল: বাথরুমের জানলা দিয়ে? চাদর বেয়ে নেমে?

লিলি : কবিদের কথা কিছু বলা যায়? হয়তো ভাব এসেছিলো।

অটল : ভাব! হুঁঃ!

(লিলি রুখিয়া কী যেন বলিতে গেল। তারপর দুম দুম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।)

আপনি স্টেটমেন্টটা লিখেছেন মণিবাবু?

মণি : স্টেটমেন্ট? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু বাকি—

অটল : ওটা করে দিন, আমাকে গাড়ি ধরতে হবে।

(মণিভূষণ অফিসে ছুটিলেন)

আপনি কী করেন সনৎবাবু?

সনৎ : আমি? আমি বাঘবন্দী হাইস্কুলের টীচার। বাংলার টীচার।

অটল : ওখানে কদ্দিন আছেন?

সনৎ : ন' মাস।

অটল : এর আগে কোথায় কাজ করতেন?

সনৎ : এর আগে কোথাও কাজ করিনি। পড়তাম।

অটল : কোথায়?

সনৎ : কলকাতায়।

অটল : আই সী। কানাই দত্তের সঙ্গে তা হলে আপনার কলকাতায় আলাপ?

সনৎ : না না—কানাই দত্ত—

অটল : (ধমকাইয়া) কেন মিছে কথা বলছেন?

সনৎ : না, বিশ্বাস করুন—

(মণির প্রবেশ, হাতে কাগজ। কাগজটি নীরবে অটলের হাতে দিলেন। অটল পড়িয়া পকেটে রাখিলেন)

অটল : এতেই হবে। আমার হাতে আর সময় নেই, আমি চললাম। একটা কথা শুধু—স্কুলের সেক্রেটারি আপনি, স্কুলের কোন্ টীচার চিদানন্দের চর সে খোঁজটাও রাখতে পারেন না?

মণি : চিদানন্দর চর? কে? নিশ্চয়ই ঐ ইংরিজির মাস্টার, আমার গোড়া থেকেই—

অটল : ইংরিজি নয়, বাংলা। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মণি : সনৎ? না না! সনৎ চিদানন্দর চর কী করে হবে?

অটল : না, তা কী করে হবে? শুধু—চিদানন্দর চর কানাই দত্তকে আড়াল করছে।

মণি : না না, আড়াল করবে কেন? বহুদিন স্মরজিৎকে দেখে নি, ভুল করেছে চিনতে।

অটল : মাথাটা একটু খাটান মণিবাবু। কানাইও বহুদিন স্মরজিতের বন্ধু সনৎবাবুকে দেখেনি তাই ভুল করে পারিবারিক আলোচনা করে গেলো।

(অটল বাহির হইয়া গেলেন। সনৎ কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। মণিবাবু অটলের কথাটা মনে মনে ভাবিয়া ওজন করিয়া অঙ্ক কষিয়া দেখিলেন। সনতের দিকে চাহিলেন। আবার ভাবিলেন।)

মণি : সনৎ! (সনৎ শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল)
সত্যি কথা খুলে বলো তো? তুমি কানাই দত্তকে চিনতে? (সনৎ নিরুত্তর) বলো!

সনৎ : (ধীরে ধীরে) হ্যাঁ চিনতাম।

মণি : তুমি তা হলে জানতে—ও স্মরজিৎ নয়?

সনৎ : হ্যাঁ জানতাম।

মণি : তবু বলো নি?

সনৎ : কানাইদা আর আমি কলকাতায় এক মেসে থেকেছি চার বছর।

মণি : (প্রায় দুঃখিত স্বরে) এর পর তো তোমার কনফার্মেশন আমি রেকমেন্ড করতে পারবো না। (সে তো জানা কথা। সনৎ আর কী বলিবে?) তুমি তাহলে সত্যিই চিদানদ ব্রহ্মচারীর লোক?

সনৎ : (প্রবল প্রতিবাদে) না স্যার, আমি চিদানন্দর লোক নই! আমি—আমি কারুর লোক নই! কানাইদাকে আমি আড়াল করেছি সত্যি—কানাইদা আমাকে বড়ো ভালোবাসতো—কিন্তু চিদানন্দর লোক আমি নই স্যার—বিশ্বাস করুন!

মণি : কী করে বিশ্বাস করবো?

সনৎ : আপনি জিজ্ঞেস করুন—স্কুলে খোঁজ করুন—জীবনবাবু আছেন, সব্বাই বলবে—হেডমাস্টারমশাইও বলবেন—আমি স্যার সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না—

মণি : আমিই ধরতে পারলাম না, আর ইস্কুলের টীচাররা ধরবে?

সনৎ : স্যার আমি চিদানন্দর লোক হলে আপনার লিফলেট লিখলাম কেন?

মণি : সে তো চাকরি যাবার ভয়ে!

সনৎ : হ্যাঁ, হতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে—

মণি : আর কিছু বলবার নেই সনৎ। তুমি যাও। (মণিবাবু পিছন ফিরিলেন, সনৎ অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে দরজার দিকে গেল। সনতের মোড়কটি মণিবাবুর চোখে পড়িল। তুলিয়া লইলেন।) এটা ফেলে যাচ্ছো। (সনৎ ফিরিল। তারপর ছোঁ মারিয়া মোড়কটি লইল।)

সনৎ : এই দেখুন স্যার! আমি যদি চিদানন্দর লোক হবো, তবে এটা কেন নিয়ে আসবো আপনার কাছে? বলুন স্যার! এটা তো আপনি জানতেনও না! আমি নিজে থেকে এনেছি!

মণি : কী ওটা?

সনৎ : আমি এসেই বলেছি—আপনার হয়তো কাজে লাগবে, তাই নিয়ে এলাম! মনে করে দেখুন স্যার—বলেছি কিনা?

মণি : হ্যাঁ, কিন্তু কী ওটা?

সনৎ : প্রমাণ স্যার! আমি যে চিদানন্দর লোক নই তার প্রমাণ।

মণি : আর জিনিসটা কী বলবে তো?

সনৎ : (সনৎ মোড়কটি খুলিতে লাগিল) শঙ্খচিল!

মণি : (এক পা পিছাইয়া) শঙ্খচিল! (মোড়কের ভিতর হইতে একটি পুরাতন পত্রিকা বাহির হইল)

সনৎ : এই দেখুন স্যার—শঙ্খচিল! সম্পাদক—জগৎপতি গুহ—আমার বড়োমামা।

মণি : বড়োমামা?

সনৎ : হ্যাঁ স্যার—আমার আপন বড়োমামা! প্রোস্‌ক্রাইবড্ হয়ে গেছিলো পত্রিকাটা বেরুবামাত্র। এই এক কপি বড়োমামা লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর কোথাও পাবেন না স্যার!

মণি : ও নিয়ে আমার কী হবে?

সনৎ : চিদানন্দ স্যার! চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর কবিতা আছে এতে! ছবিও আছে! বড়োমামা সব লেখকের ছবি ছাপতেন।

মণি : তাতে কী হবে? বিপ্লবী কবিতা লেখা—সে তো ওর পক্ষের পয়েন্ট।

সনৎ : (চিৎকার করিয়া) বিপ্লবী কবিতা নয় স্যার—পড়ে দেখুন! অশ্লীলতার জন্যে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিলো শঙ্খচিল!

(একমুহূর্ত নীরবতা, ছুঁচ পড়িলে শোনা যায়।)

মণি : (ধীরে ধীরে) কী বললে? অশ্লীলতার জন্যে? চিদানন্দ—(সহসা পত্রিকাটি ছিনাইয়া লইয়া উন্মত্তের মতো পাতা উল্টাইয়া কবিতাটি বাহির করিলেন) চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। তোমার পরশে— (থামিয়া গেলেন। সনতের দিকে চাহিলেন। সনৎ মুখ ফিরাইয়া লইল। মণিভূষণ একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোগ্রাসে কবিতাটি গিলিলেন। মাঝে একবার আড়চোখে সনৎকে দেখিয়া লইলেন। কিন্তু সনৎ মুখ ফিরায় নাই। মণি পত্রিকা বন্ধ করিয়া মুখ তুলিলেন। তাঁহার চোখ চকচক করিতেছে।) সনৎ!

সনৎ : বলুন স্যার?

মণি : (আনন্দের চিৎকারে) সনৎ! (সনতের মুখেও হাসি ফুটিল)

সনৎ : বল্লুন স্যার? (মণিভূষণ টেবিলের উপর শঙ্খচিল ফেলিয়া দুই হাতে সনতের বাহু চাপিয়া ধরিলেন।)

মণি : স্কুপ, সনৎ স্কুপ! চিদানন্দ ব্রহ্মচারী অশ্লীল কবিতা লিখেছে! সদানন্দ নয়—চিদানন্দ স্বয়ং! গেরুয়াধারী চিদানন্দ! নাম আছে, ছবি আছে! তোমাকে—তোমাকে যে আমি কী দেবো সনৎ!

সনৎ : (সঙ্গে সঙ্গে) কনফার্মেশন স্যার।

মণি : কনফার্মেশন! কনফার্মেশন সামান্য কথা সনৎ, সামান্য কথা। আর কী দিতে পারি তাই ভাবছি।

সনৎ : আর কিছু চাই না স্যার।

মণি : (হঠাৎ কাজের লোক) আচ্ছা সে পরে হবে, এখন সময় নষ্ট করলে চলবে না। একটু ভাবো দেখি—কী ভাবে গুছিয়ে লেখা যায়? ধরো—

সুপ্রীতি : (নেপথ্যে) মালাগুলো সাবধানে নামা—গাধা কোথাকার! এ দিকটা ধর ভালো করে!

মণি : এ ঘরে এসো, এ ঘরে এসো—ওটা ঠিক করে ফেলা যাক!

(সনৎকে টানিয়া লইয়া অফিসঘরে গেলেন। সুপ্রীতির প্রবেশ। পিছনে দুইখানি জগদ্দল

মালা ঘাড়ে পাঁচু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে লিলির প্রবেশ। তাহার মনমেজাজ ভয়ানক খারাপ। মালা দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, যেন উষ্ট্রকুঞ্জে শেষ খড়!)

সুপ্রীতি : (এক গাল হাসিয়া) এই যে লিলি, দেখ্ তো? স্মরজিৎবাবুর মালাটা কী রকম হয়েছে?

(লিলি বসিয়া পড়িল। দ্রুত যবনিকা।)

জানুয়ারি, ১৯৬৪

বাদল সরকার

নাটক সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ডের সম্ভাব্য সূচি

❖

বিচিত্রানুষ্ঠান • বাকি ইতিহাস • বাঘ

পরে কোনোদিন • যদি আর একবার • প্রলাপ

ত্রিংশ শতাব্দী • বিবর • পাগলা ঘোড়া • সার্কাস